বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক রাহবার
পীরে কামেল মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশ্‌বন্দী-এর বয়ান

খুতুবাতে যুলফিকার



খুতুবাতে যুলফিকার

[পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড]

মূল

হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

অনুবাদ

মুফতী শফি বিন নূর
দাওরায়ে হাদীস,
জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী এণ্ড নূর রিয়েল স্টেট,
মুহাম্মদপুর, ঢাকা

তামীম রায়হান
দাওরায়ে হাদীস,
জামিআ কুরআনিয়া আরাবিয়া
লালবাগ, ঢাকা-১২১১

সম্পাদনা

মওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
দাওরায়ে হাদীস (১৯৯০)
মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা
প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দারুল উলুম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



প্রথম প্রকাশ	জানুয়ারি : ২০১৬
প্রকাশক	মাওলানা শহীদুল ইসলাম দারুল উলূম লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল	০১৯১৮১৮৮০৮৫, ০১৭১২৫০৭৮৭৭
স্বত্ব	প্রকাশককর্তৃক সংরক্ষিত
বর্ণবিন্যাস	পরশ কম্পিউটার, রায়েরবাগ, ঢাকা
প্রচ্ছদ	দি ব্রাইট, বাংলাবাজার, ঢাকা
	ISBN : 978-984-94571-3-8

মূল্য : ৫০০ টাকা মাত্র

খুতুবাতে যুলফিকার– ৫

- আল্লাহর শোকর আদায় করা / ২৯
- সবরের বরকত / ৬৫
- ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা / ৯৯
- তাহাজ্জুদের প্রতি যত্নবান হোন / ১৩৯
- আল্লাহর প্রেমে মুগ্ধ যেজন এবং এই রঙিন দুনিয়া / ১৬৫
- লজ্জা জীবনের সবচেয়ে বড় অলংকার / ১৮৫
- আল্লাহর দেওয়া তিনটি বড় নেয়ামত / ২১৫
- হুকুকুল ইবাদ : মানুষের অধিকার / ২৪৭
- ইল্‌ম, আমল ও ইখলাস / ২৬৫
- হৃদয়কাড়া নসীহত / ২৮১

খুতুবাতে যুলফিকার– ৬

- আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য / ৩০৩
- ফাযায়েলে সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) /৩২৫
- হিজরতের সফরের উপর কিছু আলোকপাত / ৩৫৫
- ওলামায়ে দেওবন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকা / ৩৮৭
- শুদ্ধিকথন / ৩৮৭
- বরকত নাকি আধিক্য (কসরত) / ৪১৮
- হেফাজতে কুরআন / ৪৪১
- গায়েবি সমর্থন / ৪৫৩
- আল্লাহর ভয় / ৪৭৭

খুতুবাতে যুলফিকার– ৫

আল্লাহর শোকর আদায় করা

আল্লাহর সৃষ্টির এক অপার বিস্ময় মানুষ ২৯
ঈমানের দৌলত এক মহান নেয়ামত ৩০
শুকরিয়ার অনুভূতি ৩১
আজ আমরা কেমন যেন হয়ে গেছি! ৩২
চোখের ভ্রূ ৩২
অভিযোগের পর অভিযোগ ৩৩
আল্লাহ্ বান্দাকে নানারূপ অবস্থার শেকলে বন্দী রাখেন ৩৪
রিযিক বন্টন ৩৪
শুকরিয়া আদায়ের জন্য প্রস্তুত হোন ৩৫
নেয়ামতে কম বেশি হওয়ার মূলনীতি ৩৫
মৌখিক ও শারীরিক শুকরিয়া ৩৬
দুই প্রকারের নেয়ামত ৩৬
চোখ একটি নেয়ামত ৩৭
বাকশক্তি : কথা বলার ক্ষমতা ৩৭
শ্রবণশক্তি একটি বড় নেয়ামত ৩৮
হজমশক্তিও একটি বড় নেয়ামত ৩৯
শ্বাস-প্রশ্বাস একটি বড় নেয়ামত ৪০
ঘর-বাড়িও নেয়ামত ৪০
হাত পাতলেই নাজাত ৪১
জীবনে সন্তান একটি বড় নেয়ামত ৪২
স্ত্রীও একটি বড় নেয়ামত ৪৫
আমাদের হাল-হাকীকত ৪৬
আল্লাহর নেয়ামতের পরিসংখ্যান ৪৭
নেয়ামতের অবমূল্যায়ন করার মুসিবত ৪৮
ক্ষুধা অনাহার সংকীর্ণতা ও ভয়ের পোশাক ৪৯
আল্লাহ্ কী পছন্দ করেন ৫০
আমাদের অভিযোগের মূল রহস্য ৫০
আল্লাহর ইহসান ও অনুগ্রহ ৫০
শুকরিয়ায় ঘাটতি করার শাস্তি ৫২

কাওমে সাবার উপর আল্লাহর নেয়ামতরাজি ৫২
শুকরিয়া আদায়ে পদ্ধতি ৫৩
আবরণে ঢাকা আমাদের দোষ ৫৪
আল্লাহর প্রশংসা ৫৫
ভিখারীর সাথে ভালো আচরণের পদ্ধতি ৫৫
আলহামদুলিল্লাহ্ বলার অভ্যাস ৫৬
তিন ব্যক্তির পরীক্ষা ৫৯
আল্লাহর তারিফ করুন ৬২
আল্লাহর কদর করুন ৬২

সবরের বরকত

সময়ের বিবর্তন : অবস্থার পরিবর্তন ৬৫
সুখ দুঃখের উপকরণ ৬৬
শয়তানের সূক্ষ্ম ফাঁদ ৬৮
জান্নাতের প্রবেশপত্র ৬৮
ঘরে প্রদীপ নিভে যাওয়াও এক প্রকার মুসিবত ৬৮
কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে সেও সাওয়াব পায় ৬৯
অসুস্থ ব্যক্তির দু'আ কবুল হয় ৬৯
সায়্যিদুনা হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ধৈর্যের বর্ণনা ৭০
সাইয়্যেদুনা আইয়ুব (আ.)-এর তিনটি পুরস্কার ৭৩
আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত আইয়ূব (আ.)-এর অসুস্থতার খোঁজখবর জিজ্ঞাসা ৭৩
সবর কাকে বলে? ৭৪
একটি উত্তম হেকমত ৭৪
প্রেমিক ও প্রেমিকার প্রতিশোধ ৭৫
আজ আমরা আল্লাহর সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছি ৭৬
নবীজির সাথে যারা বিদ্বেষ পোষণ করে ৭৭
ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)-এর ধৈর্য ৭৭

সবরের স্তর

১. তাওবাকারীদের সবর ৭৮
২. দুনিয়াবিমুখদের সবর ৭৮
৩. সিদ্দীকীনের সবর ৭৯
সবর মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম ৮০

বিপদে পড়ে অশ্রু ফেলার বিনিময় ৮০
বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ ৮১
আল্লাহর পক্ষ থেকে উযর প্রকাশ ৮১
আল্লাহর দরবারে গরীবের কদর ৮১
একটি মূল্যবান কথা ৮১
কবিরাজের দরবারে ৮৩
হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর ফরমান ৮৩
হযরত উমর (রাযি.)-এর ফরমান ৮৩
হযরত উসমান (রাযি.)-এর ফরমান ৮৩
আল্লাহর নুসরত প্রাপ্ত হওয়ার সহজ একটি পথ ৮৪
একটি জ্ঞানগর্ভ কথা ৮৪
প্রথম দলীল ৮৪
দ্বিতীয় দলিল ৮৫
আমরা বদলা নিব না ৮৬
পিচ্ছিল পথে এ কোন দৌড় প্রতিযোগিতা! ৮৭
পেরেশানি দূর করার সহজ পথ ৮৭
সবর আল্লাহপ্রাপ্তির মাধ্যম ৮৯
মাফ করার এক আজব বাহানা ৯০
এক মুসিবতের পর আসবে দুই কল্যাণ ৯০
সুখে-দুঃখে কেমন থাকতেন আল্লাহওয়ালাগণ ৯১
গুনাহের কাফফারা ৯৩
এক নারী সাহাবীর শিক্ষণীয় ঘটনা ৯৩

ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা

আমেরিকা সফর ৯৯
নতুন টেকনোলজি ৯৯
চাঁদের দেশের সন্ধান ১০০
রুশ ও আমেরিকার মাঝে সন্ধিচুক্তি ১০০
এক ইউনিভার্সিটির কম্পিউটারের সংখ্যা ১০১
জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নতুন জিজ্ঞাসা ১০১
সৃষ্টিজীবকে অধীন করার প্রতি ইঙ্গিত ১০১
পেট কাটা ছাড়াই অপারেশন ১০২

অপারেশন ছাড়াই পাথর গলিয়ে ফেলা ১০২
অপারেশন ছাড়াই গুলি বের করা ১০২
ইউরোপিয়ান লোকদের দাবি ১০৩
যৌনপুজা ১০৩
পশ্চিমাদের সুন্দর দিক ১০৪
সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর কথা ১০৪
রাষ্ট্রপতির অযোগ্যতার প্রমাণ ১০৪
পার্লামেন্টের সদস্যের উত্তর প্রকাশ ১০৫
ইউরোপে সামাজিক জীবনের অধিকারগুলোর প্রতি যত্ন প্রদান ১০৬
রাজনৈতিক পার্থক্য ১০৮
শিক্ষাব্যবস্থা ১০৮
রুশদের একটি আশ্চর্য অভিযোগ ১০৮
শিশু শিক্ষাব্যবস্থা ১০৯
নিয়ম-নীতি ১১০

পশ্চিমাদের অধঃপতিত সভ্যতা

মাতা-পিতাকে নিঃসঙ্গ রেখে যাওয়া ১১২
সুইডেনে তালাকের অবস্থা ১১৩
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম নেই ১১৫
ইসলামের বরকত ১১৫
সন্তান গ্রহণের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ১১৬
এক বৃদ্ধা মহিলার কথা ১১৭
মা থেকেও কুকুর প্রিয় ১১৮
জার্মানে কন্যার সাথে পিতার আচরণ ১১৯
ইসলামে কন্যার মূল্যায়ন ১১৯
মায়ের আযমত : মায়ের গুরুত্ব ১২০
একটু চিন্তা করুন ১২১
ফিরিঙ্গিদের কাছে একটি প্রশ্ন ১২২
ফিরিঙ্গিদের ইসলাম গ্রহণ ১২৩
শান্তিময় জীবনের সন্ধানে ১২৩
ভালোবাসা রক্ষা করো ১২৪
ইসলামে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার মহান শিক্ষা ১২৫
এক নির্বোধ মুসলমান ১২৬
ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করা ১২৬

মসজিদের মিনার, নাকি রকেটলাঞ্চার ১২৭
নামাযীদের জন্য পেরেশানি ১২৭
মুসলিম তরুণদের অবস্থা ১২৭
এক ইংরেজ যুবকের ইসলাম গ্রহণ ১২৮
একটি সুবর্ণ মূলনীতি ১২৯
এক যুবকের ইসলাম গ্রহণ ১২৯
তিনটি হৃদয়কাড়া প্রশ্ন ১৩০
কারাগারে ইসলাম ১৩২
ইসলামের প্রভাব ১৩২
সুইডেনে মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ১৩৩
এক সত্যপ্রেমিকের কাহিনী ১৩৪
এক সুইডিশ যুবকের ইসলাম গ্রহণ ১৩৪
অস্ট্রেলিয়ায় এক নারীর সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা ১৩৫

তাহাজ্জুদের প্রতি যত্নবান হোন

ইনসানিয়্যাত ১৩৯
বেআমলীর মূল কারণ ১৩৯
দিন বদলাল না ১৪০
আমাদের অসহায়ত্ব ১৪১
আগের অবস্থা ও বর্তমান যুগ ১৪১
তাহাজ্জুদ থেকে মাহরুম হওয়ার কারণ ১৪২
তাহাজ্জুদের সময় ফেরেশতাদের তিনটি জামাত ১৪২
১. আদুরে চাপড় দিয়ে ঘুম পাড়ানোর ফেরেশতা ১৪৩
২. পেখমের পরশে জাগানোর ফেরেশতা ১৪৩
তিন ঘণ্টার ঘুম তিন মিনিটে ১৪৪
৩. নেক বান্দাদের পার্শ্ব পরিবর্তনের ফেরেশতা ১৪৪
একটি উদাহরণ ১৪৫
নওজোয়ানদের অবস্থা ১৪৫
একটি ভ্রান্ত ধারণা ও তার জবাব ১৪৫
রাজ্য হারানোর আলামত ১৪৬
নূরাণী ভোর ১৪৬
আমলের অভাব ১৪৭
দুর্লভ লাল ঘোড়ার চেয়েও দামী ১৪৭
তিন রাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ ১৪৭
আল্লাহর যিকিরের ফায়দা ১৪৮
স্বামী-স্ত্রীর সময় ১৪৮

ওযুর সাথে থাকতে চেষ্টা করতেন সর্বদা ১৪৯
এক বাদীর ইবাদাতের আগ্রহ ১৪৯
প্রত্যহ সত্তরটি তাওয়াফকারী বুজুর্গ ১৫০
ইবাদাতের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ১৫১
একটি দুর্লভ তামান্না ১৫১
ইবাদাতের গভীর অনুরাগ সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাযি.)-এর ১৫১
তাহাজ্জুদের নামায এবং শত টাকা ১৫২
তাহাজ্জুদ থেকে মাহরুমীর চিকিৎসা ১৫২
সন্দেহযুক্ত খাবারের অশুভ পরিণতি ১৫২
তাহাজ্জুদ থেকে মাহরুম হয়ে যাওয়ার এক আশ্চর্য কারণ ১৫৩
৪২ বছর পর্যন্ত তিলাওয়াতে কুরআন ১৫৩
২৭ বছর যাবত আওয়াবীনের নামায ছোটেনি ১৫৩
ইবাদাতের গভীর অনুরাগে একজন নারী ১৫৪
বর্তমানের অবস্থা ১৫৪
ইবাদাতের আগ্রহ জন্ম নেয় কীভাবে? ১৫৪
রাত জেগে থাকার বরকত ১৫৫
রাত জেগে ইবাদাতকারীদের একাউন্ট ১৫৫
বিনিময় ছাড়া রাত জাগে যারা ১৫৬
রাত জেগে কোন আমল করা হবে ১৫৬
আল্লাহর ভয় কাকে বলে ১৫৭
আযাযীল থেকে শয়তান : পাঁচটি কারণ ১৫৭
তাওবা কবুলের পাঁচটি দিক ১৫৭
আমাদের যিম্মাদারী ১৫৮
ইবাদাতের মজা কেমন ১৫৮
একটি উদাহরণ ১৫৯
আমাদের ওষুধ তাদের আহার ১৬০
মসজিদে গাধা ১৬০
ইবাদাতে খুশি হোন ১৬০
বাইআত করানোর সময় হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রহ.)-এর অবস্থা ১৬০
জান রক্ষা করা ১৬১
রুহানিয়াতের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্যের অবস্থান ১৬১
ইজতেমায়ী কাজের ফযীলত ১৬২
গত রমযানের ক্লান্তি মনে নেই ১৬২
নফসের উপর চাপ সৃষ্টি করুন ১৬২
রাত জেগে ইবাদাত করার এই আয়োজন কেন? ১৬৩
হাদীছের একটি ঘটনা ১৬৩

আল্লাহর প্রেমে মুগ্ধ যেজন এবং এই রঙিন দুনিয়া

রঙিন দুনিয়ার শত উপকরণ ১৬৫
কুদরতে ইলাহীর প্রকাশ ১৬৬
রূহানী উপকরণ ১৬৭
ব্যবস্থাপনা দু'প্রকার ১৬৭
১. ফেরেশতার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ১৬৭
২. মানুষের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ১৬৮
(১) একটি সাধারণ জনসাধারণের বাহিনী ১৬৮
(২) একটি এমন বাহিনী থাকে যারা বাদশাহর কাজে নিয়োজিত ১৬৮
(৩) তৃতীয় দলটি থাকে এমন যারা বাদশাহর সরাসরি পুলিশ বা সেনাবাহিনী ১৬৮
আল্লাহর নীতি ও পরিচালনা ১৬৮
১. সাধারণ লোক ১৬৮
কুতুবে এরশাদের দায়িত্ব ১৬৯
কুতুবে মাদারের দায়িত্ব ১৬৯
কুতুবে ইরশাদের ফযীলত ১৭০
কাকে বলে মাজনূন আর কাকে বলে মাজযূব ১৭০
মাজযূব হওয়ার জন্য হাত তুলুন ১৭১
মাজযূবের প্রকারভেদ ১৭১
১. ওহাবী মাজযূব ১৭১
২. কাসবী তথা নিজের চেষ্টায় যে মাজযূবের স্তরে উন্নীত হয় ১৭২
হযরত বাবুজী আব্দুল্লাহ (রহ.)-এর উপর এক মাজযূবের প্রভাব ১৭২
এম.বি.বি.এস ডাক্তার আবদাল হলো যেভাবে ১৭২
মাজযূবের একটি বিশেষ অবস্থা ১৭৪
কামেল মাজযূবের পরিচয় ১৭৪
মাজনূন লোকদের জান্নাতে প্রবেশ ১৭৪

মাজযূবদের আশ্চর্য সব ঘটনা

মাজযূবের দু'আর ফল ১৭৫
এক মাজযূবের সাথে ইবনে আরাবীর সাক্ষাত ১৭৫
খাজা নিজামুদ্দিন আওলিয়ার সাথে এক মাজযূবের সাক্ষাত ১৭৬
বংশধারায় বাদশাহী ১৭৬
মাজযূব হাতিকে ফেলে দিয়েছেন ১৭৬
চাঁদকে লুকিয়ে নিলেন পেয়ালায় ১৭৭

এক মাজযূবার পর্দা রক্ষার ঘটনা ১৭৭
বকরী রক্ষক বাঘ ১৭৭
খাজা বাকী বিল্লাহকে এক মাজযূবের নসীহত ১৭৭
হৃদয়ের তাফসীর ১৭৮
বাদশাহ আলমগীরের বাদশাহী লাভের ঘটনা ১৭৮
হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী (রহ.) ১৮০
খাজা ফরীদুদ্দিন আত্তার (রহ.) ১৮১
মাওলানা তাজ মাহমুদ আমরুটী ১৮১
খাজা আব্দুল মালেক সিদ্দীকী (রহ.) ১৮১
খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার (রহ.) ১৮২
মূল কর্তা ১৮২

লজ্জা জীবনের সবচেয়ে বড় অলংকার

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ১৮৫
লজ্জা ঈমানের একটি শাখা ১৮৫
নবীজির লজ্জাবোধ ১৮৬
আত্মমর্যাদাবোধের অবস্থান ১৮৬
শরীয়তে ইসলামীর সৌন্দর্য ১৮৭
বেপর্দা নারীর পরিণাম ১৮৮
ইয়ামান থেকে মদীনা : লজ্জার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৮৮
আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ১৮৯
নফসের অবস্থা ১৮৯
আধ্যাত্মিক রোগের নিদর্শন ১৯০
আত্মশুদ্ধি না করলে কী হবে? ১৯০
মুমিন বান্দার উপমা ১৯১
মৃত্যু আসবে কবে? ১৯১
ইমাম আযম আবু হানিফার (রহ.) লজ্জা ১৯২
এক নারীর পবিত্র জীবনধারার বরকতে দুর্ভিক্ষ চলে গেল ১৯২
লজ্জা দ্বারা জীবনের পেরেশানি দূর হয়ে যায় ১৯৩
ঈমানের স্বাদ কীভাবে অর্জন করা হবে ১৯৩
দু'আ কবুলের সময় ১৯৪
ব্যভিচার ও অবৈধ সম্পর্কের কাছে ধারেও যাবে না ১৯৪
বদ-আমলের কারণে হায়াত কমে যায় ১৯৫
সাহাবায়ে কেরামের লজ্জা ১৯৫

যে দরজা বন্ধ হয়ে যায় দ্রুত ১৯৬
দুটি অঙ্গের হেফাযত করো ১৯৬
হযরত উসমান (রাযি.)-এর লজ্জা ১৯৭
লজ্জার বিনিময়ে ইলাহী নুসরত ১৯৭
আল্লাহর সাহায্য ১৯৭
মারইয়ামের পবিত্রতা প্রমাণ ১৯৭
হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা প্রমাণিত করা ২০২
উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাযি.)-এর কাহিনী ২০২
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর বিবাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ২০৪
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর বৈশিষ্ট্য ২০৪
উম্মে আব্দুল্লাহ ... হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) ২০৪
আয়েশা (রাযি.)-এর প্রতি নবীজির ভালোবাসা ২০৫
হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর ইল্‌ম ও তাক্‌ওয়া ২০৫
ফিকহের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর অবস্থান ২০৫
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে উম্মুহাতুল মুমিনীনকে অধিকার প্রদান ২০৫
হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর পবিত্রতার সাক্ষ্য ঘোষণা এবং প্রমাণ ২০৬
ইসলামে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা ২১০
নবীজির অভ্যাস ২১০
ইসলামে বোনের মর্যাদা ২১০
ইসলামে মায়ের মর্যাদা ২১১
চাঁদ দেখা এবং হযরত ফাতেমার (রাযি.)-এর লজ্জা ২১১
তিন দিন ক্ষুধার্ত ২১২
কীভাবে দূর হবে পেরেশানি ২১২
সাহাবায়ে কেরামের রিযিকের মাঝে বরকত ২১৩
তাক্‌ওয়ার বরকত ২১৩

আল্লাহর দেওয়া তিনটি বড় নেয়ামত

প্রথম নেয়ামত

আকল কাকে বলে ২১৫
আকল অনুসারে জান্নাতের স্তর বণ্টন ২১৬
عقل معاش দুনিয়ার বিষয়ে অন্বেষণের আকল ২১৬
عقل معاد নবী ও তাঁর অনুসারীদের আকল ২১৬

দ্বিতীয় বড় নেয়ামত

নকশবন্দী তরীকা গিয়ে মিলবে ইমাম মাহদীর জামাতে ২১৮
তালেবুল ইল্‌ম-এর এক একটি কদমের ফযীলত ২১৮
ইল্‌মের ফযীলত ২১৮
সাইয়্যেদুনা সুলাইমান (আ.)-এর ইল্‌ম ২১৯
এক হাজার রহমত ২১৯
ইল্‌ম ও মাকামে ইল্লিইয়ীন ২১৯
ইল্‌ম ও মহবতে এলাহী ২১৯
আলেমকে ইকরাম করো ২২০
আলেমের সঙ্গ অর্জনকারী নবীর সঙ্গ অর্জনকারীর সমান ২২০
কিয়ামতের দিন উলামায়ে কেরামের ইকরাম ২২০
কাকে বলে ইল্‌ম : ইল্‌মের মর্ম কী ২২০
বে-আমল আলেম : বদকার আলেম ২২১
শূকরের গলায় মুতি ২২১
ইমাম বোখারীর ইল্‌মের কদর ও মর্যাদাদান ২২১
আলেম ও মূর্খের মাঝে পার্থক্য ২২১
উলামায়ে কেরাম উম্মতের আয়না ২২২
বদকার আলেম : নেককার আলেম ২২২
গোমরাহীর পথ ২২৩
ইল্‌ম ও আম্বিয়া কেরাম ২২৩
হযরত খিজির (আ.) ২২৪
সাধারণ জনতার ইল্‌ম শিক্ষা ২২৪

তৃতীয় বড় নেয়ামত

হযরত থানভী (রহ.)-এর বাণী ২২৫
হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী ও আদব ২২৬
ইল্‌ম শিক্ষা করার সময় কিবলার দিকে ফিরে বসবে ২২৬
আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) ও ইল্‌মের আদব ২২৬
যাদুকর এবং আদব ২২৭
আমাদের সিজদার রুপরেখা ২২৮
নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আদব ২২৮
আদব হাসিল করার পথ ও পন্থা ২২৯
কাকে বলে আল্লাহর ভয় ২৩০
সাথে যেন আল্লাহ আছেন ২৩০
একটি দলিল ২৩১
এভাবে উপায়-উপকরণের ভাবনায় নবীগণও পড়েছেন ২৩২
মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর বাণী ২৩৩

হযরত মারইয়াম (আ.) ২৩৩
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ২৩৪
দুই নম্বর আল্লাহপ্রেমিক ২৩৬
আল্লাহর ভয় : আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ২৩৬
পূর্বসূরীর মাঝে আল্লাহর ভয় ২৩৭
হযরত মাওলানা হুসাইন আলী ও আল্লাহর ভয় ২৩৭
আখেরাতের অলংকার: আখেরাতের পাথেয় ২৩৭
হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর খোদাভীতি ২৩৮
হযরত উমর (রাযি.)-এর মাঝে খোদাভীতি ২৩৯
মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর খোদাভীতি ২৩৯
একজন মুহাদ্দিসের খোদাভীতি ২৪০
চিন্তার বিষয় ২৪০
কুরআনের আয়নায় আমাদের ছবি ২৪১
পূর্বসূরীদের তাওয়াক্কুল ২৪২
ইল্‌মের দাবি ২৪৩
আল্লাহর বান্দাদের খুঁজে ফিরি ২৪৩

হুকুকুল ইবাদ : মানুষের অধিকার

ন্যায়পরায়ণতা ও মিথ্যাচার ২৪৭
হক বা অধিকার দুই প্রকার ২৪৭
সবাই আজ রুগী ২৪৭
কিয়ামতের দিন আল্লাহর ঘোষণা ২৪৮
বনী ইসরাইলকে সতর্ক করা ২৪৮
দুজন ব্যক্তির মতো বিরোধ ২৪৯
মর্মার্থ ২৪৯
মানুষের দোষ তালাশ করবেন না ২৪৯
এক আশেকে রাসূলের ঘটনা ২৫০
প্রত্যেক কাজে শুকরিয়া আদায় করা ২৫০
রাগ দমন ২৫১
আকলের যাকাত ২৫১
মানুষ দুপ্রকার ২৫১
ইতর মানুষ ২৫২
স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর অভিযোগ ২৫৩
মানুষের মূল্য দিন ২৫৩
একটি চমৎকার ঘটনা ২৫৩

ভুল বোঝাবুঝির ক্ষতি ২৫৪
প্রকৃত বীর কে? ২৫৪
প্রকৃত বন্ধা যে নারী ২৫৫
প্রকৃত দরিদ্র কে ২৫৫
মুখ সাবধানে ব্যবহার করুন ২৫৬
মৃত্যুর পর মানুষকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে ২৫৬
হিংসার আগুন ২৫৬
গীবতের বিপদ ২৫৬
অন্যের মঙ্গল কামনা করা : একটি উত্তম গুণ ২৫৭
মুসলমানদের তিনটি হক ২৫৭
অন্যের হৃদয় জ্বালানো ২৫৭
কেঁদে লাভ হবে না তখন ২৫৮
দুনিয়ায় লজ্জা পাওয়া সহজ ২৫৮
অন্যের কল্যাণ কামনার ফায়দা ২৫৯
আল্লাহওয়ালাদের ভালোবাসা ২৫৯
আল্লাহর ভালোবাসায় কমতি করবে না ২৬০
ঘৃণার উৎস কুফরীতে ২৬০
হৃদয়ের ধনি ২৬১
নিজের চরিত্রকে সুন্দর বানাতে হবে ২৬১

ইল্‌ম, আমল ও ইখলাস

সম্মান অর্জনের পথ দুটি ২৬৫
সম্পদের উপর ইল্‌মের শ্রেষ্ঠত্ব ২৬৫
সম্পদের স্থায়িত্ব নেই ২৬৬
জ্ঞান ও মূর্খতা কুরআনের আলোকে ২৬৭
কুরআন মজীদে ইল্‌মের ফযীলত ২৬৮
হযরত আদম (আ.) ও ইল্‌ম ২৬৯
হযরত দাউদ (আ.) ও ইল্‌ম ২৬৯
হযরত সুলাইমান (আ.) ও ইল্‌ম ২৬৯
হযরত ইউসূফ (আ.) ও ইল্‌ম ২৬৯
হযরত ঈসা (আ.) ও ইল্‌ম ২৭০
হযরত খিজির (আ.) ও ইল্‌ম ২৭০
হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইল্‌ম ২৭১
জ্ঞানীজন ২৭১
অমূল্য কথন ২৭১

আমল চাই ২৭২
পাশাপাশি ইখলাস চাই ২৭২
ইল্‌ম, আমল ও ইখলাসের বরকত ২৭২
হযরত উমর (রাযি.)-এর ইল্‌ম, আমল ও ইখলাসের বরকত ২৭৩
বাতাসের উপর শাসন ২৭৪
যমিনের উপর শাসন ২৭৪
আগুনের উপর তাঁর রাজত্ব ২৭৪
পানির উপর তাঁর রাজত্ব ২৭৪
বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় ২৭৫
ইল্‌মের প্রদীপ প্রজ্বালিত করুন ২৭৫
নবীজির দু'আ ২৭৫
একটু চিন্তা করুন ২৭৬
গুনাহ থেকে মাফ চাইবে ২৭৭
আল্লাহর দরজা ২৭৮
আল্লাহকে সন্তুষ্ট করুন ২৭৮
একজন গ্রাম্যলোকের আশ্চর্য দু'আ ২৭৮

হৃদয়কাড়া নসীহত

মানবজীবনে তিনটি দিনের গুরুত্ব ২৮১
সবচেয়ে বড় ধোঁকা ২৮২
জীবনের নানা দিক নানা স্তর ২৮২
সফল মানুষ ২৮৩
খারাপ লোকদের পরিচয় ২৮৩
ভালোবাসা এমনই হতে হবে ২৮৪
সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি ২৮৪
একটি সতর্কবাণী ২৮৫
তাহাজ্জুদ থেকে মাহরুম হয়ে যাওয়ার কারণ ২৮৫
নিজের চিন্তা করুন ২৮৫
আল্লাহর যিকিরের গুরুত্ব ২৮৬
একটি হাদীছ ২৮৬
بسم الله الرحمن الرحيم সম্পর্কে আলোচনা ২৮৬
মানবজাতির সতর ২৮৬
জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাওয়ার অর্থ ২৮৭
গুনাহের কাফফারা ২৮৭
তিন প্রকার গুনাহ থেকে মুক্তি ২৮৭

আল্লাহর সন্তুষ্টির দলিল ২৮৭
নেয়ামতের মূল্যায়ন করা চাই ২৮৮
আলহামদুলিল্লাহ বললে পুরস্কার পাওয়া যায় ২৮৮
কালিমায়ে তায়্যিবা ২৮৯
মাসনূন দু'আসমূহের দুটি বড় ফায়েদা ২৯০
রোযা ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ২৯১
আম্বিয়া কেরাম (আ.) ও নফল রোযা ২৯১
হযরত আবু দাজাজাহ (রাযি.) ২৯২
অন্যের মঙ্গল কামনা করুন ২৯২
খায়েরখাহীর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ ২৯২
যে কুকুরটি জান্নাতে যাবে ২৯৩
মহব্বতে ইলাহীতে সতর্কতা ২৯৩
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর খোদাপ্রেম ২৯৩
হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর আল্লাহপ্রেম ২৯৩
একটি মৌলিক কথা ২৯৪
হযরত মুসা (আ.) ও দিদারে ইলাহী ২৯৪
একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ২৯৫
তাওহীদের সবক ২৯৫
লায়লার মাজনু ২৯৬
পাখির ডিম দেখে মারেফাতের শিক্ষা নিন ২৯৬
শয়তানের হাত থেকে বাঁচার পথ ২৯৭
হৃদয়ের চাবি ২৯৭
মহব্বতে ইলাহীর বিজয় ২৯৮
হযরত মা'রুফ কারখী (রহ.)-এর আল্লাহ প্রেম ২৯৯
বরকতময় নাম ২৯৯

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

খুতুবাতে জুলফিকার -৬

আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য

আল্লাহর সান্নিধ্যের জ্ঞান ৩০৩
জ্ঞান আর সর্বদা স্মরণ থাকার মধ্যে পার্থক্য ৩০৩
ওয়াজিফা ও দু'আসমূহের বৈশিষ্ট্য ৩০৪
নকশবন্দি সিলিসিলায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ ৩০৪
নবুওয়াতি দৃষ্টির বরকত ৩০৪
মুরাকাবা কী? ৩০৫
আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টির পদ্ধতি ৩০৫
ওয়াজিফা ও দু'আর উদ্দেশ্য ৩০৫
একটি উপমা ৩০৫
আওলিয়ায়ে কেরাম ও আল্লাহর হেফাজত ৩০৬
তাসাউফ ও সুলুকের উদ্দেশ্য ৩০৬
'ফানা'র স্তর ৩০৭
ফানা অর্জন করার পদ্ধতি ৩০৭
আসল জিনিস মুরাকাবা ৩০৮
হাজার বছরের পরীক্ষিত মেহনত ৩০৮
সবচেয়ে বড় মুসিবত ৩০৮
গোনাহের অপবিত্রতার ক্ষতি ৩০৯
মজ্জিলের সামনে এসে হাল ছেড়ে দেওয়া মুসাফির ৩০৯
গোনাহ থেকে কীভাবে বাঁচবেন? ৩১০
আমেরিকায় চুরি বন্ধ করা ৩১০
মানুষের চিন্তায় পরিবেশের প্রভাব ৩১০
কার্যকারণের অন্তরালের (মুসাবিবুল আসবাব) স্মরণ ৩১১
হযরত যাকারিয়া (আ.) ও হযরত মারইয়াম (আ.)-এর উপর পরিবেশের প্রভাব .৩১১
ঈমানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার পদ্ধতি ৩১৪
হাত ধরে মজ্জিলে পৌঁছানেওয়ালা ৩১৪
শ্রেষ্ঠ ঈমান ৩১৪
অশুভ চিন্তার চিকিৎসা ৩১৫
অন্তরের ব্যাধির আলামত ৩১৫
আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ ৩১৬
মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ৩১৬
হযরত আলী (রাযি.) ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ৩১৬
এক রাখালের অন্তরে আল্লাহর সান্নিধ্যের এস্তেহজার ৩১৬
এক মেয়ের অন্তরে আল্লাহর সান্নিধ্যের এস্তেহজার ৩১৭

এক ছেলের অন্তরে আল্লাহর সান্নিধ্যের এস্তেহজার ৩১৮
সাবধান! আল্লাহ তা'আলা দেখছেন ৩১৮
হযরত খাজা বাহাউদ্দিন যাকারিয়া (রহ.) ও আল্লাহর সান্নিধ্য ৩১৯
তাসাওউফ অস্বীকারকারী ও এহসানের স্তও ৩১৯
আল্লাহওয়ালাদের উপর আল্লাহর স্মরণের প্রভাব ৩২০
খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব (রহ.) ও আল্লাহর সান্নিধ্য ৩২১
এক বাদশাহর শিক্ষণীয় ঘটনা ৩২২

ফাযায়েলে সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)

সাদেকীন বলতে যা বুঝায় ৩২৫
সাদেকীন সব সময় থাকবে ৩২৫
সাদেকীন (সত্যবাদী)দের খোঁজ ৩২৫
বরকত শুধুই বরকত ৩২৬
বরকত অর্জনের একটি শর্ত ৩২৬
বস্তুর অপর দিক দেখার মতো দৃষ্টি ৩২৬
তাকবীরে তাহরীমার আগে বাইতুল্লাহর জিয়ারত ৩২৬
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দু'আ ৩২৭
অভিসম্পাত সেইসব পীরের উপর ৩২৭
একটি ব্যক্তিগত ঘটনা ৩২৭
সমর্পণ ও স্নেহ ৩২৮
সিলসিলায়ে নকশবন্দিয়ার নামকরণের কারণ ৩২৮
সিদ্দীকি সম্পর্ক (নেসবত) একটি মজবুত সম্পর্ক ৩২৮
নেসবত ও খেলাফত ৩২৯
হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মর্যাদার আসল কারণ ৩২৯
ফাজায়েল ও মানাকিব (মর্যাদা ও সম্মান) ৩৩০
বিনাদ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ ৩৩০
সাহাবায়ে কেরামের সবচেয়ে বড় গুণ ৩৩০
উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব ৩৩১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহবত ও সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) ৩৩১
হযরত হামযা (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ ৩৩২
জান্নাতের সুসংবাদ ৩৩২
সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর ফজিলত ও হাদীছে নববী ৩৩৩
'বকর' শব্দ এর তাহকীক ৩৩৩
প্রথম হওয়া ৩৩৩
হিজরতের সফরের উপর কিছু আলোকপাত ৩৩৪
সিদ্দীকে আকবরের দরজায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ৩৩৪
একান্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৩৪

ছাওর গুহায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত ৩৩৫
হযরত আসমা (রাযি.)-এর বুদ্ধি ৩৩৫
এস্তেকামাত (দীনের উপর অটল থাকা) এরকমই হতে হয় ৩৩৬
সিদ্দীকে আকবরের এহসানের বদলা ৩৩৬
হযরত আলী (রাযি.)-এর অনুরোধ ৩৩৭
মাহবুবের হেফাজত ৩৩৭
ইমাম বুসীরি (রহ.)-এর ভক্তি ৩৩৭
প্রিয়তম রাসূলের রূপ আর সিদ্দীকি ভালোবাসার চমৎকার সম্মিলন! ৩৩৮
নবীপ্রেমের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত ৩৪০
নবীজির থুতুসম্পর্কিত মুজিযা বা কতিপয় অলৌকিক ঘটনা ৩৪০
নূরের সঙ্গী আর মানুষ সঙ্গীর বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠান ৩৪১
মঞ্জিলে মকসুদ পর্যন্ত সঙ্গ ৩৪১
আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয় ৩৪১
মর্যাদায় সবার উপরে ৩৪১
আল্লাহর আমানতের হেফাজত ৩৪২
কবরের সাথী ৩৪২
আল্লাহর সান্নিধ্যের সুসংবাদ ৩৪২
ছানিয়াছনাইন (দুই এর দ্বিতীয়) এর উপাধি ৩৪৩
হযরত ওমর (রাযি.)এর কাছে তিন রাতের মর্যাদা ৩৪৪
তারকার চেয়েও বেশি নেকী ৩৪৪
হযরত আবুবকরের ঈমানের ওজন ৩৪৪
হযরত আবুবকরের বুকে নবুওয়াতের নূও ৩৪৫
নেসবতের বরকত ৩৪৫
সিদ্দীকে আকবর-এর ফানা ফিল্লাহ হওয়া ৩৪৫
সিদ্দীকে আকবরের জন্য বিশেষ তাজাল্লী ৩৪৫
নেসবতের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ৩৪৬
নকশবন্দি সিলসিলার বৈশিষ্ট্য ৩৪৬
সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন ৩৪৬
নেসবতের বরকতসম্পৃক্ত আশ্চর্য এক ঘটনা ৩৪৭
সুন্দর সমাপ্তির সুখবর ৩৪৯
সিদ্দীকে আকবরের কথাটাই অন্য রকম ৩৪৯
নেসবত উৎকৃষ্ট হওয়ার প্রমাণ ৩৫০
হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.)-এর স্থান ৩৫০
আনুগত্যময় জীবন গড়ে তোলা ৩৫০
নেসবত হাসিলের মাধ্যমসমূহ ৩৫১
গোপন সেবা ৩৫১

সিদ্দীকে আকবরের আশ্চর্য ওসিয়ত ৩৫২
সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) ও খোদাভীতি ৩৫৩
চিন্তাময় সময় ৩৫৩

ওলামায়ে দেওবন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকা

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জ্ঞানের মোহনা ৩৫৫
ইল্‌মি উত্তরাধিকারের সংরক্ষণ ৩৫৬
পশ্চিমা সংস্কৃতির মোকাবেলায় কর্মকাণ্ড ৩৫৬
ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠা ৩৫৬
প্রসাশনিক কর্মকাণ্ডে অনুপ্রবেশ ৩৫৭
শাহ ওলিউল্লাহ (রহ.)-এর জন্ম ৩৫৭
ইল্‌ম অর্জন ৩৫৭
শাহ ওলিউল্লাহ (রহ.)-এর সন্তান ৩৫৭
ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতোয়া ৩৫৮
ফতওয়ার ফলাফল ৩৫৮
সারাঙ্গাপটমের লড়াই ৩৫৮
পলাশীর যুদ্ধ ৩৫৯
রঞ্জিত সিং এর সাহায্য-সহযোগিতা ৩৫৯
রঞ্জিত সিং-এর নির্মম নির্যাতন ৩৫৯
সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর জিহাদ ৩৬০
শাহ ইসমাঈল (রহ.)-এর জিহাদ ৩৬০
সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর দুটি দাঁতভাঙা জবাব ৩৬০
দুই সেনাপতির শাহাদাতবরণ ৩৬০
শাহ ইসমাঈল (রহ.)-এর কারামাত ৩৬১
শাহ ইসমাঈল (রহ.)-এর রচনাবলী ৩৬১
ইংরেজদের বিপক্ষে ওলামায়ে দেওবন্দের পরামর্শসভা ৩৬২
আযাদী আন্দোলন ৩৬২
তিনটি বড় প্রতিবন্ধকতা ৩৬৩
নির্বিচার আলেমহত্যা ৩৬৩
মাওলানা আহমদ উল্লাহ গুজরাটির উত্তর ৩৬৩
সীমাহীন নির্যাতন ৩৬৪
জিহাদের প্রেরণা ধ্বংস করার অপচেষ্টা ৩৬৫
বন্ধ হলো দশ হাজার মাদরাসা ৩৬৫
যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো দারুল উলূম দেওবন্দ ৩৬৫
শাহ্ হুসাইন আহমদ (রহ.)-এর খোদাভীতি ৩৬৬
দারুল উলূম দেওবন্দের ফয়েজ ও ফল্গুধারা ৩৬৭
জ্ঞানের পাহাড় ৩৬৭
দারুল উলূম দেওবন্দ বনাম আলীগড় কলেজ ৩৬৮
শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর আলীগড় আগমন ৩৬৮

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর ইল্‌মি ফয়েজ ৩৬৯
শোরেশ কাশ্মিরি (রহ.)-এর আকিদার বহিঃপ্রকাশ ৩৬৯
মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহ.) ও ইশকে রাসূল ৩৭০
সুন্নাতের অনুসরণ ৩৭২
মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর ইশকে রাসূল ৩৭৩
হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) ও খোদাভীতি ৩৭৪
সীমাহীন নির্যাতন ৩৭৫
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর ইল্‌মি মাকাম ৩৭৬
রচিত গ্রন্থাবলী ৩৭৭
হযরত কাশ্মিরি (রহ.)-এর অতুলনীয় স্মরণশক্তি ৩৭৭
হিন্দুদের ইসলামগ্রহণ ৩৭৮
হযরত মাদানী (রহ.) ও ইশ্‌কে রাসূল ৩৭৮
এমন সাহসই কাম্য ৩৭৯
পূর্বসূরীদের কাফেলা ৩৭৯
আল্লাহপাকের চয়ন ৩৮০
আমরা নাম-পরিচয়হীন আম নই ৩৮১
পবিত্র ইল্‌মি পরম্পরা ৩৮১
যিকিরের মৌলিক উদ্দেশ্য ৩৮৩
জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বৃষ্টিধারা ৩৮৩

শুদ্ধিকথন

জমিন আর পাহাড়ের অপারগতা ৩৮৭
মানুষের গোপন দুটি গুণ ৩৮৭
পরিশুদ্ধ আত্মা তৈরির ক্ষেত্র ৩৮৮
একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ৩৮৮
রহমতের ফয়সালা ৩৮৯
একটি অমূল্য বাণী ৩৮৯
অধীন করে দেওয়ার অর্থ ৩৯০
দেহের ওপর মনের হুকুম ৩৯০
অধীনকরণের পর্যায় ৩৯১
খাজা আব্দুল মালেক সিদ্দীকী (রহ.) ও তাস্‌খীরের পর্যায় ৩৯১
তাস্‌খীরের স্তর এবং সোপর্দকরণ ও সন্তুষ্টি ৩৯১
সাইয়্যেদ আহমাদ দরবন্দী (রহ.) ও তাসখীরের স্তও ৩৯১
তাতার রাজপুত্রের ইসলামগ্রহণ ৩৯২
মুখনিঃসৃত কথার মর্যাদা ৩৯৩
চাটাইয়ে বসার সুখ ৩৯৩
ক্ষুধার তৃপ্তি ৩৯৩
অন্তরে এতই প্রশান্তি ৩৯৪
ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর স্তও ৩৯৪

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর হৃদয়ের মূল্য ৩৯৫
কেবলই আনুগত্য ৩৯৫
সাইয়্যেদুনা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) ও তাসখীরের স্তর ৩৯৫
বর্বর জাতির ইসলামগ্রহণ ৩৯৬
সাহসের সংকীর্ণতা ৩৯৬
আমানতের ভার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ৩৯৭

তিনটি বুনিয়াদি পাপ

সৌন্দর্য ও সম্পদের ফাঁদ ৩৯৮
খানকাহ্র মূল উদ্দেশ্য ৩৯৮
যিকিরের পরিবেশের আবশ্যকতা ৩৯৮
অন্তরের জাগৃতি ৩৯৯
ওযিফার গুরুত্ব ৩৯৯
সালিকের অবস্থার ওপর শায়খের দৃষ্টি ৪০০
শয়তানের ভ্রমণ ৪০০
শোওয়া অবস্থায় মোরাকাবা করা ৪০১
আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তির গোপন দরজা ৪০১
ইল্মেরও পুরস্কার, যিকিরেরও পুরস্কার ৪০২
আল্লাহর যিকির, সর্বদা অপরিহার্য ৪০২
শয়তানের আশ্চর্য এক চাল ৪০২
অভিজ্ঞতালব্ধ একটি কথা ৪০৩
এক ঘণ্টার সান্নিধ্যের ফয়েজ ৪০৩
বায়আতের সাথে-সাথেই এজাযত ও খেলাফত দান ৪০৩
শায়খের ইহসানের বদলা ৪০৪
সালিকদের ওপর শায়খের তাওয়াজ্জুহ্র প্রভাব ৪০৪
বিশ্বাসগত ব্যাধি ৪০৪
অপরাধ কার? ৪০৫
শাস্তির বিভিন্ন স্তর ৪০৫
দ্বিতীয় পাপ ৪০৫
তৃতীয় পাপ ৪০৬
এই তিন পাপের ক্ষতিকর দিকসমূহ ৪০৬
পাপ তিনটার পরিণাম ৪০৬
হিংসা এক ভয়ঙ্কর বিপদ ৪০৭
শয়তানের কুমন্ত্রণা ৪০৮
হিংসা থেকে সৃষ্ট খারাবি ৪০৮
দৃষ্টির হেফাজত ৪০৮
যিনা-ব্যভিচারের প্রথম ধাপ ৪০৯
ইউসুফ (আ.) ও জোলেখা এবং দৃষ্টির হেফাজত ৪০৯
মা হাওয়া (আ.)-এর ভুলের কারণ ৪০৯
শায়খের দৃষ্টি ৪০৯
রূপ ও ধন-সম্পদ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ ৪১০

সাধারণ নারীদের মধ্যে ইহুদিদের তিনটা বৈশিষ্ট্য ৪১০
নেককার মহিলার প্রতিদানে বৃদ্ধি ৪১১
চরকার আওয়াজে আল্লাহু আকবার বলার সাওয়াব দান ৪১১
স্বামীকে পোশাক ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিদান ৪১১
একটি আশ্চর্য কথা ৪১২
অনেক বড় একটি ভুল ধারণা ৪১২
ঘরের কাজ করে দেওয়া ৪১২
সত্তর বছরের গোনাহ মাফ ৪১৩
মধ্যপন্থা ৪১৩
উল্টা কাজ ৪১৩
একটি ইল্‌মি সূক্ষ্ম বিষয় ৪১৩
রাবেয়া বসরি ও আল্লাহর ভয় ৪১৪
পুরস্কার হিসেবে দুটি জান্নাত ৪১৪
ক্ষমার অপূর্ব দৃষ্টান্ত ৪১৫
আল্লাহর রহমতের আশ্চর্য ঘটনা ৪১৫

রকত নাকি আধিক্য (কসরত)

একটি ভুল ধারণা দূরীকরণ ৪১৯
সমস্যা যেই সেই ৪১৯
এক ভদ্রমহিলার পেরেশানি ৪২০
বরকতের দ্বারা সমস্যার সমাধান ৪২১
হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর রিযিকে বরকত ৪২১
আমাদের অবস্থা ৪২৩
একটি রুটি খাওয়ার বিনিময় ৪২৩
অপরের মুখাপেক্ষিতা ৪২৩
হযরত মুরশিদে আলম (রহ.)-এর স্বাস্থ্যে বরকত ৪২৪
অজুর হেফাজত ৪২৪
স্বাস্থ্যের মধ্যে বরকত ৪২৫
হায়াতে বরকতের আশ্চর্য ঘটনা ৪২৫
কোটিপতি মানুষদের ঋণ ৪২৬
হযরত আবুহুরাইরা (রাযি.)-এর স্মৃতিশক্তিতে বরকত ৪২৬
আব্দুল্লাহ ইবনে আবি দাউদ (রহ.)-এর স্মৃতি ৪২৭
ইমামুল আছাল (রহ.)-এর স্মৃতি ৪২৭
হযরত আবু জুর'আহ (রহ.)-এর স্মৃতিশক্তি ৪২৭
ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ইবাদাতের প্রতি আগ্রহ ৪২৮
দৈনিক ত্রিশ পারা তেলাওয়াত ৪২৯
ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নজিরবিহীন স্মৃতিশক্তি ৪২৯
হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর স্মৃতিশক্তি ৪৩০

এক দিনারের বরকত ৪৩১
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৪৩১
বরকতের অভাব ৪৩৪
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৪৩৫
রিযিকের বরকতের একটি আশ্চর্য উদাহরণ ৪৩৬
পূর্বসূরীদের জীবনে বরকত ৪৩৬
সাহাবায়ে কেরামের রিযিকে বরকত ৪৩৬
হযরত আনাস (রাযি.)-এর রিযিক আর সন্তানে বরকত ৪৩৭
বরকত কীভাবে অর্জন করতে পারি? ৪৩৭
পেরেশানির বৃষ্টি ৪৩৮
বরকত কামনা করার পদ্ধতি ৪৩৮
দু'আর শর্ত ৪৩৮

হেফাজতে কুরআন

কুরআন মজিদের দুটি আসল নাম ৪৪১
দুই পদ্ধতিতে কুরআন মজিদের হেফাজত ৪৪১
তাতারী ফেতনার সময় মুসলমানদের গণহত্যা ৪৪২
নূরের খাযানা ৪৪২
ইহুদি আর খৃষ্টান আলেমের পরাজয় ৪৪২
এক পাদ্রীর আগ্রহ ৪৪৩
পাঁচ বছর বয়সি হাফেযে কুরআন! ৪৪৪
নবই বছর বয়সে কুরআনের হেফয ৪৪৪
নগদ বদলা ৪৪৫
একটি আশ্চর্য ঘটনা ৪৪৫
অহংকারের শাস্তি ৪৪৬
একটি আদর্শ মাদ্রাসার ভালো ছাত্র ৪৪৭
বিশ্বরেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত ৪৪৭
আল্লাহর সৈনিক ৪৪৮
হাফেযে কুরআনের সুপারিশ ৪৪৮
একটি উপমা ৪৪৮
এক ডক্টরের পেরেশানি ৪৪৯
দ্বিগুণ আযাব আর লানতের বৃষ্টি ৪৪৯

গায়েবি সমর্থন

বিপরীত জিনিসের সমষ্টি ৪৫৩
রূহ-এর গুরুত্ব ৪৫৩
রূহের উপমা ৪৫৪
রূহ ছাড়া শরীরের অবস্থা ৪৫৪
ইসলামমুক্ত ঘরের অবস্থা ৪৫৫

কুরআন মজীদের মোজেজা ৪৫৫
দীন ইসলামের বিজয় ৪৫৬
আল্লাহ্ তা'আলার হেফাজত ৪৫৭
আহযাব যুদ্ধের ঘটনা ৪৫৮
কুরআন দ্বারা সাক্ষী ৪৬০
আল্লাহর সাহায্যের ওয়াদা ৪৬১
হযরত মুসা (আ.) ও আল্লাহর সাহায্য ৪৬২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহর সাহায্য ৪৬৩
কাফেরের ইসলাম গ্রহণ করা ৪৬৪
বাহ্যিক উপকরণ যোগাড় করার আদেশ ৪৬৪
কাফেরদের আবদার ৪৬৫
পরাশক্তির পূজা ৪৬৬
কাফেরদের আযাব ৪৬৬
আল্লাহর উপর ঈমানদারদের ইয়াকীন ৪৬৭
হযরত মুসা (আ.)-এর ঘটনা ৪৬৭
আল্লাহর সাহায্যের আশ্চর্য ওয়াদা ৪৭০
কাফেরদের অবিচার ৪৭২
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ছাওয়াব ৪৭২
ইসলামের বিজয় ৪৭২
নবযুগের উত্থান ৪৭৩
হিম্মতে মরদাঁ মদদে খোদা (বান্দার চেষ্টা আল্লাহর সাহায্য) ৪৭৪

আল্লাহর ভয়

ভয় আর আশার সারমম ৪৭৭
আশা আর ভয় কোনটা কখন হওয়া উচিৎ? ৪৭৭
মুমিন আর ফাসেকের অবস্থা ৪৭৮
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৪৭৮
গোনাহ্ থেকে বাঁচার একটি উপায় ৪৭৯
দুশ্চিন্তা আর ভয়ের মধ্যে পার্থক্য ৪৭৯
দুধের বাটির হেফাজত ৪৮০
পবিত্র ব্যক্তিবর্গ ৪৮১
আল্লাহর ভয় আসার জন্য মাছনুন দু'আ ৪৮১
এক রাখালের অন্তরে আল্লাহর ভয় ৪৮১
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৪৮২
আল্লাহর ভয়ের স্তর ৪৮২
১. সাধারণ মানুষের ভয় ৪৮২
২. সালেহীনদের ভয় ৪৮৩
৩. আরেফীনদের ভয় ৪৮৩
৪. কামেলীনদের ভয় ৪৮৩

আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের ভয় ৪৮৪
হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাযি.)-এর অন্তরে আল্লাহর ভয় ৪৮৪
হযরত ওমর (রাযি.) ও আল্লাহর ভয় ৪৮৫
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর আল্লাহর ভয় ৪৮৫
হযরত হাসান বছরী (রহ.) ও আল্লাহর ভয় ৪৮৬
রাবেয়া বসরীর আল্লাহর ভয় ৪৮৬
হযরত হানযালা (রাযি.) ও আল্লাহর ভয় ৪৮৬
মুনাফিকির ভয় ৪৮৬
একটি ইলহামী কথা ৪৮৭
সবচেয়ে উচ্চ স্তরের ভয় ৪৮৭
ভয় কত টুকু? ৪৮৮
আল্লাহর ভয় কামনা করার পদ্ধতি ৪৮৯
ভয়ের স্তর ৪৮৯
ফেরেশতাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় ৪৮৯
হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আল্লাহর ভয় ৪৮৯
আরশে আল্লাহর জালালের প্রভাব ৪৯০
মাখলুকাতের তাসবীহ ৪৯০
মাখলুকাতের মধ্যে নামাযের আরকানের ভাগ ৪৯১
গাছের রুকু ও সিজদা ৪৯২
উটের মনে আল্লাহর ভয় ৪৯২
আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের আল্লাহর ভয় ৪৯৩
আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার পদ্ধতি ৪৯৪
একটি আশ্চর্য ঘটনা ৪৯৪
একটি মর্মস্পর্শী দু'আ ৪৯৫

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

'সৌন্দর্যের হাজারো উপকরণ দিয়ে আমাদের রব্বে কারীম সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবীতে হাজারো প্রাণী ও সৃষ্টিজীব। অনেক ভালোবেসে আমাদের সৃষ্টি করেছেন মানবরূপে! অগণিত নেয়ামতে আকীর্ণ করেছেন আমাদের জীবন। হাত-পা, নাক-কান, চোখ-মুখ, মন-মেজাজ-মস্তিষ্ক ইত্যাদি অজস্র অকল্পনীয় নেয়ামত দিয়েছেন আমাদের। আমরা কি রবের এসব নেয়ামতের যথাযথ কদর করছি! আমরা কি তার মূল্য দিচ্ছি! সঠিক কাজে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ব্যবহার করছি? আজ এই প্রশ্ন করি আমরা নিজেদের কাছে নিজেরাই!'

আল্লাহর শোকর আদায় করা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيْدٌ . وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِيْنٍ وَشِمَالٍ كُلُوْا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

আল্লাহর সৃষ্টির এক অপার বিস্ময় মানুষ

সৃষ্টিজগতের মধ্যে ইনসান আশরাফুল মাখলুকাত। সকল সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি। আল্লাহ রাব্বুল ইযযাতের মহাকর্ম, অপূর্ব সৃষ্টিশৈলী আর অপার বিস্ময়কর অবদান। আমাদের উপর আমাদের রব্বে কারীমের কত অনুগ্রহ! কত অনুকমম্পা! আমাদের উপর আমাদের আল্লাহর কত মেহেরবানি। আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত আমাদের মানুষ বানিয়েছেন। আল্লাহ যদি আমাদেরকে পশু বানাতেন, অন্য কোনো প্রাণী বানাতেন, তাহলে তাও তাঁর ইচ্ছাধীন ও আওতাধীন ছিল।

মনে করুন, আল্লাহ যদি আমাদের বানর বানাতেন, তাহলে কে তাঁর এই ইচ্ছার উপর কথা বলতে পারত? লোকেরা তখন আমাদের গলায় রশি বেঁধে অলি-গলিতে আমাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াত। যদি আমাদের গাধা বানতেন, কে আল্লাহকে বারণ করত? তখন মানুষ আমাদের পিঠে বোঝা তুলে দিত। আমাদেরকে নানারূপ খাটা-খাটুনির কাজে ব্যবহার করত। আমাদেরকে বেত্রাঘাতের পর বেত্রাঘাত করত। এত কিছুর পরও তো আমরা কথা বলতে

পারতাম না। আমাদের ভাষা থাকত না। আমরা আমাদের দুঃখও প্রকাশ করতে পারতাম না। আলহামদুলিল্লাহ! পারওয়ারদেগারে আলম আমাদেরকে মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন। আমরা তো এর জন্য দরখাস্তও দেয়নি।

ঈমানের দৌলত এক মহান নেয়ামত

আমাদের উপর আল্লাহর আরেকটি ইহসান, আরেকটি বড় অনুগ্রহ হচ্ছে, আল্লাহ আমাদের ঈমান নামক মহাদৌলত দান করে প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতরূপে সৃষ্টি করেছেন। এটি আল্লাহ রাব্বুল ইযযাতের এমন একটি নেয়ামত যে, আমরা তার শুকরিয়া আদায় করতেই সক্ষম নই। এই পৃথিবীতে, এ জগতে, এ সময়েও তো কত মানুষ আছে, যারা ঈমানের পরিবেশ পায়নি। তারা বরং কুফরীর পরিবেশ পেয়েছে। তারা ইহুদী-নাসারা মা-বাবার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের মা-বাবা তাদের ইহুদী নাসারা বানিয়ে দিয়েছে। তাদেরকে কাফেরে পরিণত করেছে। আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত আমাদেরকে এমন মা-বাবার কোলে পয়দা করেছেন, যারা ঈমানের অধিকারী ছিলেন। সেই ছোট্ট থেকেই আমরা ঈমানের আলো বাতাস পাচ্ছি। সেই শিশু বয়স থেকেই আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নাম শুনতে পাচ্ছি। সেই খোকা বয়সেই আমাদের মা আমাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন বিসমিল্লাহ পড়ে, আল্লাহর নাম নিয়ে! সকাল-সন্ধ্যা আমাদেরকে আমাদের মা-বাবা শুনিয়েছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মধুর কালিমা। ঘুমিয়েছি আমরা হাসবী রাব্বী ইল্লাল্লাহর গান শুনে-শুনে। তাঁরা আমাদের কোলে-পিঠে মানুষ করেছেন আল্লাহ আল্লাহ যিকির করে-করে। আমরা দেখেছি আমাদের বাবা-মাকে রাতে-দিনে জায়নামাযে দণ্ডায়মান। দেখেছি কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল। দারুণ আবেগ নিয়ে তাসবীহ দানার ছড়ায় চুমু খেতে দেখেছি আমাদের মা-বাবাকে। কত সুন্দর ঈমানী পরিবেশ আমরা পেয়েছি। সেই আঁতুড় ঘরে, জন্মের পরে প্রথম দিনে আমাদের এক কানে আযানধ্বনি শোনানো হয়েছিল, আরেক কানে শোনানো হয়েছিল ইকামাত। সেই অবুঝ বয়সে, যখন খালিক মালিক কী আমরা তা বুঝতাম না, আমাদের যখন সামান্য বোধশক্তিও ছিল না, তখন থেকেই আমাদের মুসলিম মাতা-পিতার বরকতে আমাদের কানে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের রব্বে কারীম আল্লাহর নাম আছড়ে পড়ছে, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কত সুন্দর ঈমানী পরিবেশে আমাদের বেড়ে ওঠা। আমাদের উপর আল্লাহর কত বড় নেয়ামত এটি।

এরপর আমরা যখন চলা-ফেরা করার মতো হলাম, আমাদের বয়স যখন সামান্য বাড়ল, আমরা চাঞ্চল্যের ঘোরে ছিলাম, দোস্ত-দুশমন চিনতাম না, শত্রু-মিত্র চিনতাম না। লাভ-ক্ষতি বুঝতাম না, তখন থেকেই আমাদের পিতা আমাদের হাত ধরে-ধরে নিয়ে গেছেন আল্লাহর ঘর মসজিদে। আমরা আজ মুসলমান। আল্লাহর কত রহমত বর্ষিত হয়েছে আমাদের উপর যে, আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত আমাদেরকে ঈমানের দৌলতে ধন্য করেছেন। ঈমানের স্বাদ ও সৌভাগ্য তিনি আমাদের দান করেছেন। আমাদের শারীরিক নেয়ামতও তো অসংখ্য অগণিত। আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত আমাদের কত সুন্দর ও সুস্থ্য-সবল দেহ দান করেছেন। নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন। আমাদের খালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি চাইতেন, তাহলে তো আমাদেরকে মা'যুর করে, প্রতিবন্ধীরূপে সৃষ্টি করতে পারতেন। যে কোনো রোগ আমাদের মাঝে দিয়ে দিতে পারতেন। কোনো একটি অঙ্গ আমাদের দোষযুক্ত করে দিতে পারতেন। এই যে আমাদের এমন সুস্থ্য দেহ দান করলেন, এটি আমাদের উপর আল্লাহর অনেক বড় করুণা, অনেক বড় দয়া। অনেক বড় মেহেরবানি।

শুকরিয়ার অনুভূতি

একব্যক্তি জোহরের নামায আদায় করল। তার দরিদ্রতা এত প্রবল ছিল যে, তার জুতাও ছিল না। তখন গরমের মৌসুম। উত্তপ্ত গরম যমিনে খালি পায়ে হেঁটেই সে মসজিদে আসে। একবার সে এভাবে খালি পায়ে ঘর অভিমুখে রওয়া দিয়েছে। মনে মনে বলছে, হে পরওয়ারদেগার, হে আল্লাহ! আমি তো আপনার সামনে সিজদায় মাথা নত করি, সালাত আদায় করি। অথচ আপনি তো আমাকে জুতাও দেননি। একথা সে চিন্তা করছে আর অমনি দেখল, এক ল্যংড়া খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে আসছে। লোকটি অত্যন্ত কষ্ট করে-করে অগ্রসর হচ্ছে। এদৃশ্য দেখে সাথে-সাথে তার দিলে ধাক্কা লাগল। আহ! জুতা নেই বলে আমি আল্লাহর সামনে কত অভিযোগ করছি। এই যে ল্যংড়া লোকটা; এও তো মানুষ। একে তো খোদা পা-ও দেননি। লাঠিতে ভর দিয়ে কেমন কষ্ট করে চলা-ফেরা করে বেচারা। আমি কেন জুতার জন্য আল্লাহর কাছে শেকায়েত করছি?

তো দেখুন, যখন এ লোকটি নিজের চেয়ে আরও বেশি কষ্টে পতিত লোকটাকে দেখল, তখন তার ভিতরে শুকরিয়ার অনুভূতি জেগে উঠল। তার মাঝে কৃতজ্ঞতা আদায়ের মানসিকতা তৈরি হলো।

আজ আমরা কেমন যেন হয়ে গেছি!

একটি মূলনীতি স্মরণ রাখবেন। দ্বীনের বিষয়ে নিজের চেয়ে উন্নতকে দেখবেন, যেন আমল করার আগ্রহ-উদ্দীপনা বেড়ে যায়। আর দুনিয়ার বিষয়ে নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকের অবস্থার দিকে তাকাবেন, যেন শুকরিয়া আদায়ের মানসিকতা তৈরি হয়। আজ তো আমাদের অবস্থা উল্টো হয়ে গেছে। আমরা দ্বীনের বিষয়ে নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকের দিকে তাকাই। আপনি ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে যদি বলেন, নামায পড়ো, সাথে-সাথে স্ত্রী বলে উঠবে, তোমার বোন তো নামায পড়ে না; তাকে বলতে পার না? সোজাসুজি বলে দেয়, অমুক যদি মাফ পেয়ে যায়, তাহলে আমিও তো পেয়ে যাব। তারা নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোক দিয়ে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করবে।

আর দুনিয়ার বিষয়ে যদি বলেন, দেখ, আমার বাড়িটা কত সুন্দর করে বানিয়েছি, তখন সাথে-সাথে আপনার স্ত্রী বলে উঠবে, অমুকের ঘরের ডিজাইন আরও সুন্দর। আমাদের ঘরের রূপ-রং অমুকের ঘরের চেয়ে খারাপ।

তো আমাদের দুর্ভাগ্য দেখুন, আজ দুনিয়ার বিষয়ে আমরা আমাদের চেয়ে উন্নতদের দেখছি। আজ আমাদের মাঝে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ কত বেড়ে গেছে আর দ্বীনের বিষয়ে আমরা আমাদের চেয়ে নিচুস্তরের লোকদের দেখি। ফলে দ্বীনের বিষয়ে আমরা উদাসীন হয়ে যাচ্ছি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও খারাপ কথা। এ বড়ই অধঃপতন!

চোখের ভ্রূ

দেখুন, চোখের উপরে একেবারে হালকা কিছু পশম আছে। এগুলো চোখের ভ্রূ। এক ব্যক্তি দুর্ঘটনার শিকার হলো। এতে কোনোভাবে চোখের ভ্রূ কেটে গেল। চোখ আছে তো ঠিক; কিন্তু ভ্রূ নেই। ভ্রূ চোখের সুরক্ষাকারী। ধুলা-বালি-ময়লা ঐ ব্যক্তির চোখে পড়তে লাগল। ভ্রূ নেই বলে সেই ময়লা চোখের ভেতরে চলে যেত। বারবার চোখ ধুইতে হতো। কিছু দিন পর এই পানিও তাকে ক্ষতি করতে লাগল। অবস্থা এমন হলো যে, দু-মাস পর এখন সে আর চোখে পানি ব্যবহারই করতে পারে না। মনে হলো, চোখ যখম হয়ে গেছে, সব সময় জ্বালা-পোড়া করে। পানি দিলে মনে হয়, গরম ও তপ্ত পানি তাতে দেওয়া হচ্ছে। ডাক্তারের কাছে গেলেই ডাক্তার বলে, কোঠর ধুতে হবে। কারণ, বাতাসে ময়লার ছোট-ছোট অনুকণা উড়তে থাকে। সেগুলো

আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। সেই ময়লাগুলোই চোখে এসে এসে পড়ে। আর ভ্রূ না থাকায় চোখ এগুলো থেকে সুরক্ষা পায় না। ভ্রূ থাকলে তো তাতে এসেই এসব ময়লা বাধাপ্রাপ্ত হতো। ফলে তাকে বারবার চোখ ধৌত করতে হচ্ছে। আর পানি লাগতে-লাগতে এখন চোখও যেন আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

পাঁচ-ছয় ঘন্টা যদি কেউ নিজের হাত পানিতে ডুবিয়ে রাখে, তাহলে দেখবেন, তার হাতের আঙ্গুল, চামড়া কেমন হয়ে গেছে। তো ঐ লোকটির চেহারা-চোখও এখন সেরকম হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারও হতাশ হয়ে গেল। বলে দিল, আমি তো আর কিছু করতে পারব না। আমার দ্বারা এর চিকিৎসা সম্ভব নয়।

তারপর আরেক ডাক্তার তাকে বুঝিয়ে দিল, মানুষের চোখের এই ভ্রূ পর্দার মতো, এর মাঝে একটা স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম আছে। পানি ও ময়লা-আবর্জনা থেকে এই ভ্রূ পর্দার মতো চোখকে সুরক্ষিত রাখে। চোখের ভেতরকে পরিচ্ছন্ন রাখে।

এখন বুঝে এল, চোখের এ পশম, এ ভ্রূ অতি সাধারণ হতে পারে; কিন্তু এগুলা অত্যন্ত জরুরি জিনিস। অনেক বড় নেয়ামত এগুলো। এই ভ্রূ নেই বলে একজন মানুষের জীবন কেমন বিষণ্ন হয়ে উঠেছে। একটি মানুষের চোখ কতখানি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। তো যখন বোঝা গেল, এমন ছোট ও সাধারণ জিনিসও এমন বড় নেয়ামত, তাহলে বড়-বড় জিনিসগুলো কত বড় নেয়ামত! একটু চিন্তা করেই দেখুন-না।

বাতাসে ও শূন্যে অত্যন্ত ছোট-ছোট অণু-কনা উড়ে বেড়ায়। এগুলো আমরা সাধারণত দেখতে পাই না। অনেক সময় এগুলো দেহের অভ্যন্তরে রোগের সৃষ্টি করে। কতগুলো তো ইনফেকশনই সৃষ্টি করে, মানুষের ক্ষতি সাধন করে। অথচ আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত এর থেকে আমাদের কতভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

চোখকে হেফাজত করেছেন ভ্রূর মাধ্যমে। কানকে হেফাজত করেছেন কানের পর্দা ও পশম ইত্যাদির মাধ্যমে। তো দেখুন, আল্লাহ বান্দাকে কতভাবে হেফাজত করছেন। এসবের শুকরিয়া কি আমরা আদায় করি?

অভিযোগের পর অভিযোগ

আজকে তো আমরা অভিযোগের পর অভিযোগ করছি। প্রত্যেক নারী এবং প্রত্যেক পুরুষই আর্থিক বিষয়ে এবং জীবন যাপনের ব্যাপার নিয়ে

অভিযোগ তুলছে। কেউ-কেউ সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে অভিযোগ তুলছে। কেউ আবার চাকরি-বাকরির ব্যাপারে অভিযোগ তুলছে। তবে মাশাআল্লাহ আমার আল্লাহ আমাকে যে অবস্থায় রেখেছেন, সে অবস্থায় অনেক ভালো আছি! আলহামদুলিল্লাহ।

অথচ অন্যরা তো সবাই বলে, আমি বড় পেরেশানিতে আছি। সবাই ভালো আছে – আমি খারাপ আছি। অথচ যদি এ লোকটিকেই আরেকজনের পেরেশানিগুলো দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এর জীবনও বড় কঠিন হয়ে যাবে। তাই বলছি, আল্লাহ রব্বালু ইযযাত যাকে যে অবস্থায় রেখেছেন, আমাদের উচিত তার ব্যাপারে শুকরিয়া আদায় করা। সেই অবস্থার উপরই সন্তুষ্ট থাকা।

আল্লাহ বান্দাকে নানারূপ অবস্থার শেকলে বন্দী রাখেন

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার অবস্থা জানেন। আল্লাহর কিছু বান্দা এমন আছে, (আল্লাহ জানেন) তারা যদি জরুরতের অতিরিক্ত সম্পদের মালিক হয়ে যায়, তাহলে তারা উদাসীনতায় পড়ে যাবে। তারা অবাধ্য হয়ে যাবে। তারা অহংকার করবে। ঈমানের দৌলতকে হাতছাড়া করে ফেলবে। সেই জন্যেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কষ্টের মধ্যে রাখেন। আল্লাহ তখন দেখেন, আমার বান্দা মুশকিল অবস্থায়, কঠিন পরিস্থিতিতে আমাকে ডাকছে, আমাকে স্মরণ করছে। তার ঈমান এতে নিরাপদ থাকবে। তার ঈমান এতে সঠিক অবস্থায় থাকবে।

কিছু বান্দা এমন আছে, যদি জরুরত অনুযায়ী রিযিকপ্রাপ্ত হয়, তাহলে নামাযও আদায় করবে, চাকুরি বাকুরী, কাজ কারবারও চালিয়ে যাবে, তাসবীহাতও আদায় করবে। যদি এতে সামান্য হেরফের হয় বা সামান্য সমস্যা হয়, তাহলে সব কিছু ছেড়ে, সব আমল ছুড়ে ফেলে বসে পড়বে। আমাদের রব্বে কারীম যেহেতু বড় মেহেরবান, তাই তিনি বান্দার জরুরত মোতাবেক বান্দাকে দান করে থাকেন, যেন আল্লাহর বান্দা আল্লাহর সামনে সিজদা করে, রুকু করে, আল্লাহর ইবাদত করে। আবার নিজের কাজ-করবারও চালিয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ বান্দাকে এমন অবস্থার শেকলে বেঁধে রেখে নিজের কাছাকাছি রাখেন। বান্দাকে ভ্রষ্ট হতে দেন না, বিভ্রান্ত হতে দেন না।

রিযিক বন্টন

আমাদের রব্বে কারীম বান্দাদের মাঝে রিযিক বন্টন করেছেন। তিনি বান্দাকে সেকথা তাঁর কালামেও বলে দিয়েছেন–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ

'আমি মানবজাতির মাঝে তাদের রিযিক বন্টন করে দিয়েছি।'[১]

লক্ষ করুন, কতজন বান্দা আল্লাহর এই বন্টনের উপর সন্তুষ্ট? তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট এমন মানুষের সংখ্যা অনেক কম। সব বান্দাই তো শেকায়েত করে, অভিযোগ তোলে। বলে, আল্লাহ আমাকে কী দিলেন? আমাকে এটা দিলেন না, আমি তো অমুক জিনিস পেলাম না। আমাদের উচিত ছিল, এভাবে ভাবা ও চিন্তা করা যে কোনো পিতা যদি তার দুজন সন্তানের মাঝে কোনো জিনিস বন্টন করে দেয়, তাহলে বাবার এই বন্টনকে সাদরে যেমনভাবে সন্তানেরা মেনে নেয়, তেমনিভাবে আমাদের উচিত খালেক, মালেক ও রব্বে কারীমের বণ্টনকে মেনে নেওয়া। কারণ, বাপের চেয়ে বেশী ইনসাফ করে থাকেন আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার উপর। আমাদের উচিত, আল্লাহ তা'আলা আমাদের যে অবস্থায় রেখেছেন, আমরা সেই অবস্থার উপরই সন্তুষ্ট থাকব।

শুকরিয়া আদায়ের জন্য প্রস্তুত হোন

সত্যি কথা তো এই, আল্লাহ তা'আলা আমাকে হাজারো মানুষ থেকে ভালো রেখেছেন। প্রত্যেকে নিজের ব্যাপারে এভাবেই চিন্তা করা চাই। এতে তো কোনো সন্দেহ নেই। প্রত্যেকে নিজের অবস্থা নিয়ে সামান্য ভাবুন, একটু কল্পনা করুন। কত-কত বিষয় আপনি এমন পাবেন যে, নিজের অন্তরই সাক্ষ্য দান করবে, আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত আমাদের বহু মানুষ থেকে ভালো রেখেছেন। এমন করে নিজেকে নিয়ে, নিজের অবস্থা নিয়ে সামান্য ভাবলে এবং অন্যদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যাবে, আমাদের কত বেশী শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কত বেশী পরিমাণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এভাবে চিন্তা করলে নিজের মাঝে শুকরিয়া আদায় করার মানসিকতা তৈরী হয়। নিজেকে আল্লাহর স্মরণে, আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় নিবেদিত থাকার জন্যে প্রস্তুত করে তোলে, অনুপ্রাণিত করে তোলে।

নেয়ামতে কম বেশি হওয়ার মূলনীতি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

১. সূরা যুখরুফ, আয়াত- ৩২

যদি তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় কর, তাহলে আমি তোমাদের নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দেব।[১]

তাই বোঝা গেল, আমরা যত বেশি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করব, আল্লাহর যত বেশি শুকরিয়া জ্ঞাপন করব, আল্লাহ তত বেশি আমাদের নেয়ামত বাড়িয়ে দিবেন।

তারপরই আল্লাহ তা'আলা বলে দিচ্ছেন–

وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

'আর যদি তোমরা আমার নেয়ামত পেয়েও অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে জেনে রাখো আমার আযাব অত্যন্ত কঠিন।'[২]

দেখুন, যদি নেয়াতমতের নাশুকরী করা হয়, তাহলে নেয়ামত কমে যাবে। আল্লাহ নেয়ামত কমিয়ে দেবেন।

মৌখিক ও শারীরিক শুকরিয়া

শুকরিয়া আদায়ের দুটি পদ্ধতি আছে। একটি হচ্ছে, তার যবানের মাধ্যমে, তথা মৌখিকভাবে শুকরিয়া আদায় করা, আলহামদুলিল্লাহ বলা, সুবহানাল্লাহ বলা। এটিও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার মাধ্যম। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিজ দেহের মাধ্যমে। শারীরিকভাবে পরওয়ারদেগারের হুকুমের পাবন্দি করা। এটিও আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যম। মৌখিকভাবে শোকর আদায় করবে। নিজের শরীর দিয়েও শুকরিয়া আদায় করবে। শরীরের মাধ্যমেও আল্লাহর ইতাআত ও অনুসরণ করবে। তাহলেই বোঝা যাবে, এই বান্দা আল্লাহর শুকরিয়া আদায়কারী বান্দা। যদি এ ব্যাপারে কমতি এসে যায়, যদি এ বিষয়ে দুর্বলতা এসে যায়, তাহলে অনেক সময়ই আল্লাহ তা'আলা বান্দার নেয়ামতকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। বান্দার নেয়ামত কমিয়ে দেন। তো এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করা উচিত।

দুই প্রকারের নেয়ামত

হযরত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেছেন, নেয়ামত দুই প্রকার।

---

১. সূরা ইবরাহীম, আয়াত- ৭

২. সূরা ইবরাহীম, আয়াত- ৭

এক. نعمت وجودی অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়ার নেয়ামত।

দুই. نعمت عدمی অর্থাৎ পাওয়া যায়নি এমন নেয়ামত। তো আল্লাহ তা'আলা তো আমাদেরকে উজুদী নেয়ামত দুনিয়াতেই দিয়ে দিচ্ছেন। আর আদমী নেয়ামত আখেরাতে দান করবেন।

চোখ একটি নেয়ামত

একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন, আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কত নেয়ামত দান করেছেন। আপনার চোখের বিষয়টি চিন্তা করুন। চোখ কত বড় নেয়ামত। চোখের গুরুত্ব বুঝতে হলে অন্ধ ব্যক্তিকে দেখুন। অন্ধ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করুন। যেব্যক্তি মায়ের পেট থেকেই অন্ধ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে, সে তো তার মাকেও জীবনে দেখতে পায়নি। সে তার বাবার চেহারাও দেখতে পায়নি সারা জনমে।

আমার প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! লোকটির দিলে কত দুঃখ চিন্তা করে দেখুন। লোকটি ভাবে, হায় এক মুহূর্তের জন্যও যদি আমি আমার মা-বাবার চেহারা দেখে নিতে পারতাম! এই কুরআন যদি একটিবারের মতোও দেখতে পেতাম! আল্লাহর ঘরকে যদি দেখতে পেতাম! এসব নেয়ামত দেখে আমার চক্ষুকে শীতল করতাম।

কিন্তু দোস্ত! অন্ধ লোকটির এই চক্ষু নামক নেয়ামত নেই। আমাদের জন্য অন্ধকার আসে রাতে; কিন্তু অন্ধ লোকটির তো দিনও অন্ধকার, রাত ও অন্ধকার। সামান্য হলেও চিন্তা করুন। লোকটির জীবন কীভাবে কাটছে। এখানে ওখানে ধাক্কা খায়। এদিকে একবার পড়ে যায়, ওদিকে আবার পড়ে যায়। কেউ চাইলে লোকটিকে হাতে ধরে সামান্য অগ্রসর করে দেয়। আর তা না হলে নিজেই পা টিপে-টিপে, লাঠি দিয়ে এদিক-ওদিক হাতড়িয়ে বড় কষ্ট করে পথ পার হয়। তাদের জীবনটা কেমন বলুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের উপর কতবড় অনুগ্রহ করেছেন। ভাবুন! আল্লাহ আমাদের সুন্দর করে স্পষ্টভাবে সব কিছু দেখার মতো চক্ষু দান করেছেন। সেই চক্ষু দিয়ে গোটা পৃথিবী আমরা দেখতে পাচ্ছি। চিন্তা করুন। খুব চিন্তা করুন। আল্লাহ আমাদের উপর কত বড় দয়া করেছেন! চিন্তা করুন।

বাকশক্তি : কথা বলার ক্ষমতা

একটু চিন্তা করুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন। বাকশক্তি দান করেছেন। আজ তার দাম কত একটু চিন্তা করুন।

বোবা ব্যক্তিকে, বাকশক্তিহীন ব্যক্তিকে দেখুন। সে নিজের অন্তরের ভাব-ভাবনা, মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছেগুলো প্রকাশ করতে পারে না। কারো সামনে খুলে বলতে পারে না তার স্বপ্নের কথা। আমরা তো কাউকে ভালোবাসলে কত সুমধুর শব্দ-বাক্যে তাকে মনের ভাব ও ভাবনাগুলো বলি। নিজেদের ভালোবাসা প্রকাশ করি। কবু এ ভালোবাসা প্রকাশ করি মা-বাবার সামনে, কবু প্রকাশ করি নিজের ওস্তাদের সামনে, কবু নিজেদের জীবনসঙ্গিনীর সামনে। কত রকম শব্দ বাক্য আর সুমধুর করে বলি মনের কথা। চলে হৃদয়ের কথন, প্রেম ও ভালোবাসার কথন।

কিন্তু দেখুন, যে মানুষটি বোবা, যে মানুষটি বাকশক্তি হীন, যে মানুষটি কথা বলতে পারে না, সে কাউকে তার মনের কথাগুলো বলতে পারে না। সে কাউকে ভালোবাসলে তা প্রকাশ করতে পারে না। সে কারো সাথে প্রেম করলে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে না। সে তার স্ত্রীকে মনের মতো করে সম্বোধন করতে পারে না। সে তার মাকে ডাকতে পারে না। নিজের ভেতরের ব্যথা বেদনা মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারে না। একটি সাধারণ প্রাণী যেমন চুপ করে থাকে, বোবা মানুষটিও তেমনি চুপ করে থাকে। কারো সাথে সে গল্প করতে পারে না। আল্লাহ তাকে বোবা বানিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

শ্রবণশক্তি একটি বড় নেয়ামত

আমরা কান দিয়ে শ্রবণ করি। এ কান আমাদের জন্য কত বড় নেয়ামত আমরা কি সেকথা কখনও কল্পনা করেছি? কত কত মানুষ আছে, দেখতে তারা বড় সুন্দর। কিন্তু তারা শ্রবণশক্তি পায়নি। আল্লাহ তাদের বধির করে সৃষ্টি করেছেন। তারা কোনো কিছু শুনতে পায় না। অনেক সন্তান জন্ম থেকেই শ্রবণশক্তিহীন। এ কারণেই তারা কথাও বলতে পারে না। যারা কারো কথা শোনে না, তারা কথা বলবে কোন ভাষায়? তো দেখুন, শ্রবণশক্তির নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তারা কথা বলার শক্তিও পায়নি। কারণ, শুনতে পায় না বলে সে বলতেও পারে না। ডাক্তাররা বলেন, যার শ্রবণশক্তি ঠিক হয়ে যাবে, সে এমনিতেই কথা বলতে পারবে। তবে যে বোবাদের মূল সমস্যাই মুখে, তাদের কথা ভিন্ন। তো দেখুন! পরওয়ারদেগার রব্বে কারীম আমাদের শোনার শক্তি দান করেছেন। দেখুন, যখন আযানের ধ্বনি বেজে ওঠে, তখন আল্লাহু আকবারের ঘোষণা আমাদের শুনিয়ে দেওয়া হয়। যদি কখনো কেউ কুরআন তেলাওয়াত করে, তখন কানে সেই আওয়াজ আসে। কেউ হামদ বা না'ত পরিবেশন করলে সেই সুর আমাদের কানে

বাজে। সুবহানাল্লাহ! দেখুন, আমরা কত মধুর-মধুর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমাদের স্ত্রীদের সুমধুর ডাক আমরা শুনতে পাচ্ছি। সন্তানদের ডাক শুনতে পাচ্ছি। মায়ের মধুর সুর শুনতে পাচ্ছি। কেউ আমাদের ডাকলে আমরা তা শুনতে পাচ্ছি। ওস্তাদ দরস দান করলে, পাঠদান করলে আমরা সেই দরস ও পাঠ শুনতে পাচ্ছি। এটি আমাদের উপর আল্লাহ রাব্বুল ইযযাতের অনেক বড় নেয়ামত ও রহমত।

হজমশক্তিও একটি বড় নেয়ামত

একটু চিন্তা করুন। নিজেকে নিয়ে একটু ভাবুন। আমরা ভক্ষণ করি। কত সহজে আমরা খাবার-দাবার গ্রহণ করি। আবার কত সহজে সেই খাবার হজম হয়ে যাচ্ছে। এটি আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। দুনিয়ায় কত লোক এমন আছে, যাদের হজমশক্তি ভালো নয়। তারা কিছু খেতে পারে না। খেলেই পেটে গণ্ডগোল দেখা দেয়। আমার কাছে এক নারী একবার তাবিজ নিতে এসেছিল। সে পর্দার আড়াল থেকেই তার অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছিল। বলল, সাত বছর হয়েছে আমি সাধারণ পানি বা কোমল পানি ছাড়া কোনো কিছু পেটে নিতে পারি না। আমি নিজে নানা রকম সুস্বাদু খাবার রান্না করি। সেই খাবার আমি শুধু দেখতে পারি – খেতে পারি না।

তো দেখুন, কেমন আশ্চর্য ব্যাপার! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের উপর কেমন দয়া ও করুণা করেছেন। মহিলা প্রতিদিনই নানা রকম খাবার রান্না করে। সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করে; অথচ তার হাতের রান্না সে নিজেই খেতে পারে না। রুটি-সালন কিছুই খেতে পারে না। শুধু পানি! শুধু পানির উপরই তার জীবন চলছে। খাদ্য জাতীয় খাবার গ্রহণে সে অক্ষম। কোনো কিছু খেলেই তার পেট খারাপ হয়ে যায়। তার বমি হয়ে যায়। তাই সে বড় পেরেশান। সে আমাকে বলেছে, আমার জন্য এমন কোনো দু'আ করুন, যেন আমি সুস্থ্য হয়ে যাই এবং এমন দু'আ শিখিয়ে দিন, যেন আমি সেই দু'আ পড়ে ভালো হয়ে যাই। সব রকম খাবার যেন আমি খেতে পারি। যেন ২ ঘন্টার মধ্যে একটিবার হলেও খাবার গ্রহণ করতে পারি। আমার অন্তরে তখন একথা এল যে, আমার বান্দা! তুমি আমার উপর সামান্য চিন্তা করো। নিজেকে নিয়ে সামান্য ভাবো। সারা দিন তুমি কত খাবার খাচ্ছ! অথচ তা হজম হয়ে যাচ্ছে। আজ তুমি এই নেয়ামতের কদর করছ না, শুকরিয়া আদায় করছ না।

তো দেখুন, আমরা যা-ই খাচ্ছি, তার হজম হয়ে যাওয়া আল্লাহর কত বড় নেয়ামত। আমরা তো এই নেয়ামতটিরও শুকরিয়া আদায় করতে পারব

না। আবার যা খেলাম তা যদি হজম না হয়ে যেত, পেট থেকে তা যদি আবার বের না হতো, তাহলে আমাদের বিপদের শেষ থাকত না। পেট ফেটে যেত। আমাদের শরীর অসুস্থ হয়ে যেত।

শ্বাস-প্রশ্বাস একটি বড় নেয়ামত

আমরা ২৪ ঘন্টায় কত হাজারবার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করি। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের আসা-যাওয়া আল্লাহ তা'আলার কত বড় রহমত। শ্বাস কষ্টের রুগীকে কি কখনও দেখেছেন? হাঁপানি রুগীকে কি কখনও দেখেছেন, যখন শ্বাস গ্রহণ করে, তখন তার অবস্থা কেমন হয়? আবার যখন শ্বাস ত্যাগ করে, তখন কেমন হয়? যেন তার জান বের হয়ে যাবে। প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে।

কখনও অর্ধেক শ্বাস বাইরে বের হয় আর অর্ধেক শ্বাস ভেতরে রয়ে যায়। অবস্থা তখন করুণ হয়ে দাঁড়ায়। চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। আর আমরা যারা সুস্থ আছি, আমাদের কি সামান্য কষ্ট হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতে, ত্যাগ করতে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের উপর বড়ই দায় করেছেন। বড় করম ও রহম করেছেন। আমাদের সুস্থ দেহ দান করেছেন। কত আরাম আমাদের দিয়েছেন। আজ যদি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় বা শ্বাস-প্রশ্বাসে সামান্য সমস্যা দেখা দেয়, ঠিক তখনই বোঝা যাবে শ্বাস-প্রশ্বাস কত বড় নেয়ামত।

ঘর-বাড়িও নেয়ামত

এতক্ষণ তো আমাদের দেহের বিষয়গুলো বললাম। এসব তো সৃষ্টিগতভাবে আমরা পেয়েছি। এবার ঐসব নেয়ামতের কথা ভাবুন, যা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে। যেমন আমাদের ঘরবাড়িগুলো। এসব আমাদের জন্য আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। ফুটপাতে আজ যারা জীবন কাটাচ্ছে, তাদের দিকে তাকান। তাদের একটু জিজ্ঞেস করুন। তাদেরও হৃদয় আছে। সে হৃদয়ে স্বপ্ন ও চাহিদা আছে। ঘরবাড়ি বানানোর আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে। তারাও ভাবে, হায়! আমাদের যদি সামান্য একটু মাথা গোজার ঠাঁই হয়ে যেত! আমিও যদি সামান্য একটা জীর্ণ কুটিরেরও মালিক হত পারতাম!

তারা তো আজ কাগজ টাঙিয়ে কাপড়ের ছাউনি দিয়ে, তাঁবু টাঙিয়ে জিন্দেগী পার করে। সামান্য ঝড় এলেই সব এলমেল হয়ে যায়। তুফান এলে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয় তাদের বাসস্থানগুলো। সামান্য বৃষ্টি হলে তাদের নিদ্রা বন্ধ হয়ে যায়। তাদের আরাম হারাম হয়ে যায়। তারা এই জীর্ণ-শীর্ণ

ফুটপাতের ছাউনিতে ডিসেম্বর ও জানুয়ারির কঠিন শীতেও জীবন কাটায়। অথচ আমরা কত আয়াসে, কত শান্তিতে, কত ইযযাতের সাথে ঘরে-বাড়িতে অবস্থান করি। আমাদের উপর আল্লাহ কত বড় অনুগ্রহ ও দয়া করেছেন। কত বড় ইহসান করেছেন। আমরা কত সুন্দর করে ঘর-বাড়ি বানিয়ে জীবন যাপন করছি। আমাদের উপর শুধু আকাশের সুনীল ছাদই নয় – ঘরের এক আশ্রয়ী ছাদও আছে। অথচ কত মানুষ আজো ঘুমিয়ে দিন কাটায় খোলা আকাশের ছাদের ছায়ায়।

প্রিয় ভাইয়েরা! খুব আরাম ও ইতমিনানের সাথে শুনুন। সকলে আরামে বসুন। মন দিয়ে শুনুন। আরে ভাই, আপনারা যখন শুনতে থাকবেন, তখনই তো আমি আমার মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করতে পারব। যাদের কাজ আছে, তারাও যাচ্ছে। আবার যাদের কাজ নেই, তারাও যাচ্ছে। কেউ ওঠাউঠি না করি। সকলে খামুশ থাকি (যখন বয়ানের মধ্যে মানুষ কিছুটা এলোমেল হয়ে গিয়েছিল তখন হযরত এ কথাগুলো বলছিলেন)

আমার কথাগুলো শুনুন! মনোযোগ দিয়ে শুনুন! চিন্তা করুন। আল্লাহ আমাদের কতশত নেয়ামতে অবতীর্ণ করে রেখেছেন, তা একটু চিন্তা করে দেখুন।

আমি তো আমার শায়খদের থেকে যে কথাগুলো শুনেছি; তাই আপনাদের বলছি। আমি তো আমার কোনো কথা বলছি না। আল্লাহর দরবারে আঁচল পেতে ধরুন। আল্লাহ আশার চেয়েও অতিরিক্ত দান করবেন। আল্লাহর দরবারে সত্যিকার পিপাসা নিয়ে এলে, সত্যিকার চাহিদা নিয়ে আঁচল পেতে ধরলে আল্লাহ চাওয়ার চেয়েও বেশি দান করবেন। তাই সবাই আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জু থাকি।

হাত পাতলেই নাজাত

সামান্য চিন্তা করুন। আপনি যখন রাস্তায় চলাচলে কোনো কাফেরকে ভিক্ষা চাইতে দেখেন – সে পুরুষ হোক আর নারী হোক – সেও তো একজন মানুষ। কিন্তু রব্বে কারীম তো তাকে এমন এক অবস্থায় রেখেছেন যে, তাকে আরেকজন থেকে চাইতে হয়। তারা ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পরে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ; অথচ একটু ভালো উন্নত পোশাক তারা পায় না। তারা মানুষের দুয়ারে-দুয়ারে চেয়ে বেড়ায়। তারা তো কারো বোন! কারো মেয়ে! কারো মা! কারো ভাই বা বাবা! আমাদের মেয়েরা তো আমাদের ঘরে বড় সম্মান, মর্যাদা ও আদরের জিন্দেগী যাপন করে। আর এই নারীরা তো অন্যের কাছে

চেয়ে খেতে হয়। কখনও একটু রুটি পায়, কখনও পায় একটি ফল। আর আমাদের ঘরের নারীরা? কোনো কষ্ট-ক্লেশ ছাড়া তাজা-তাজা খাবার বাজার থেকে আনা হচ্ছে আর তারা তা গ্রহণ ও ভক্ষণ করছে। আমাদের নারীরা তো কোনো কষ্টই করতে হয় না। এটি আমাদের উপর আল্লাহর কত বড় ইহসান! আমাদের নারীরা অন্যের সামনে হাত পাততে হয় না। আমাদের ভাই-বাবারা কারো সামনে হাত পাততে হয় না। অন্যের প্রতি তারা মুখাপেক্ষী নয়। তারা কারো করুণার শিকার হতে হয় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের কাজ-কারবার দিয়েছেন। চাকরি দিয়েছেন। ফলে এর উসিলায় আমাদের সাংসারিক জীবন, বড় শান্তি ও সুখসমৃদ্ধ।

জীবনে সন্তান একটি বড় নেয়ামত

একটু আগে বেড়ে চিন্তা করুন। নিজেকে নিয়ে ভাবুন। আল্লাহকে পেয়ে যাবেন। সন্তান সন্ততি আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। সন্তানের মূল্য কত তা ঐ নারীকে জিজ্ঞেস করুন, যে নারীর বিবাহ হয়েছে। অনেক বছর চলে গেছে; কিন্তু তার সন্তান হচ্ছে না। তার হৃদয়টা সন্তানের জন্যে কতটা ব্যাকুল, সে কতটা প্রত্যাশী ও আকাঙ্ক্ষী তা ঐ রমণীকে জিজ্ঞেস করুন। সারাদিন আল্লাহর দরবারে সিজদাবমস্তকে শুধু ফরিয়াদ করে, হে আল্লাহ! আমাকে একটি সন্তান দাও। আমাকে একটি সন্তান দাও। আমার ঘর আলোকিত করো। আমার ঘরে খেলাধুলাকারী দাও! আমার ঘরকে আবাদ করো। আজ আমার এঘর আমার কাছে বড় নির্জন মনে হয়। উজাড় মনে হয়।

তো দেখুন, ঐ নারীর তামান্না কত! আমি বহু নারীর সম্বন্ধে জানি, যারা স্বামীর প্রেম-ভালোবাসাও প্রাপ্ত হয়েছে, ধন-দৌলত আর সর্বপ্রকার আয়েশ আরামও পেয়েছে। বড় বাড়ি-বড় ঘরে থাকে। কিন্তু তাদের সন্তান নেই বলে তারা যেন অশান্তির এক কঠিন তপ্ত দাবানলে পুড়ছে। তারা বলে বেড়ায়, হায় আমাদের এত বড় ঘর কী জন্য? এখানে এই ঘরে খেলাধুলা করার কেউ যে নেই। এই ঘরকে মাতিয়ে রাখবার কেউ যে নেই। হায় আল্লাহ! আমার ঘরটাকে সরগরম রাখার জন্য একটি সন্তানও যে তুমি আমাকে দাওনি। ঐ রমণীর হৃদয় কতটা ব্যথিত ও বিধ্বস্ত থাকে একটু ভেবে দেখুন। ঐ সন্তানহীন নারীকে কাছে ডেকে একদিন জিজ্ঞেস করে দেখুন, তার হৃদয়ের ব্যথাটা একদিন খবর নিয়ে দেখুন। এ মায়ের আকুতি এভাবে উপলব্ধি করুন। ঐ নারী যখন রাতে তাহাজ্জুদের জন্য ওঠে, তখন সে আল্লাহর সামনে সিজদায় মাথা নত করে সন্তান পাওয়ার জন্য কায়মনবাক্যে দু'আ

করে। দু'আর জন্য যখন হাত তোলে, তখন তার প্রথম চাওয়াটি, প্রথম তামান্নাটি এবং প্রথম দু'আটি হয়, হে আল্লাহ! আমাকে সন্তান দাও! আমার কোলটা ভরে দাও! হে আল্লাহ! আমাকে সন্তান দাও! অন্যরা আরামের ঘুমে বিভোর থাকে আর এই নারী রাতের গভীরে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে, তিলাওয়াত করে, রুকু সিজদা করে আল্লাহর কাছে তার এই একটি আকুতি পেশ করে। একটিমাত্র নেয়ামত প্রাপ্তির তামান্না ব্যক্ত করে। যে নেয়ামতটি তার হাতের বাইরে সে এই মহা নেয়ামতটি পেতে চায়। সে সন্তান কামনা করে।

যখনই ভালো কোনো কাজ করে ঐ ভালো কাজের বিনিময়ে সে আল্লাহর কাছে সন্তান চায়। একটিমাত্র সন্তানের জন্য সে কেমন আকুতি-মিনতি করতে থাকে।

কখনও কোনো মাহফিল বা দ্বীনি মজলিস হলে এ নারী সেখানে চলে যায় এবং আল্লাহর কাছে সন্তান পাওয়ার জন্য দু'আ করে। বলে, হে আল্লাহ! এখানে তোমার নেক বান্দাদের মাহফিল, তোমার নেক বান্দাদের বরকতে আমাকে সন্তান দান করো। এ নারী কখনও হজ্জে গমন করলে কা'বার গিলাফ ধরে-ধরে কা'বাঘর জড়িয়ে ধরে কেঁদে-কেঁদে দু'আ করে, হে আমার রব্বে কারীম! আমাকে সন্তানের নেয়ামত দান করো। এই নারী মাকামে ইবরাহিমে নফল নামায পড়ে দু'আ করে, হে আমার রব্বে কারীম! আমাকে সন্তানের নেয়ামত দান করো। এ নারী যে স্থানকেই জানে যে এটি দু'আ কবুলের জায়গা, সে ঐ স্থানে গিয়ে প্রথম যে দু'আটি করে, তা হচ্ছে হে আমার রব, আমাকে সন্তান দান করো। তাকে যদি কোনো তাসবীহ পড়তে বলেন, তাকে যদি কোনো মা'মূল আদায় করতে বলেন, সন্তানের আশায় সে তা-ই করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। উযু করে ঐ বেচারী মুসল্লায় বসে যায়। তার ঘরে সে তার অন্তঃকরণ শান্তকারী কাউকে পায় না। তার আদর-আহলাদ কাউকে উজাড় করে দান করার এত পায় না। এমন বড় ঘর, বড় বাড়ি তার কাছে বিরান মরুপ্রান্তরের এত মনে হয়। তার কাছেও দৌলত আছে। তার রূপ-লবণ্যও আছে। স্বামীর প্রাণভরা ভালোবাসাও সে পায়। সম্মান-মর্যাদাও তার আছে। কিন্তু এত সব নেয়ামত তার কাছে বড় মামুলী মনে হয়। মূল্যহীন মনে হয়। কারণ, তার সন্তান নেই। যদি এই সকল ধন-দৌলতের বিনিময়ে সন্তান কেনা যেত, তাহলে এ নারী তা করতে প্রস্তুত। যদি কোনো কাজের বিনিময়ে সন্তান পাওয়া যেত, তবে সে তা-ই করতে প্রস্তুত। এই নারী পাহাড়ের চূড়ায় উঠে কোনো কাজ করার বিনিময়ে সন্তান পাওয়ার

আশ্বাস যদি পেত,তবে সে তা-ই করত। কিন্তু এই নেয়ামত তো অন্য কোনোভাবে পাওয়া যায় না। এই নেয়ামত তো আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছে করেন, তাকে দান করেন। আল্লাহ যদি কাউকে সন্তান দান না করেন, তাহলে দুনিয়ার শত-শত ডাক্তার-কবিরাজ একত্র হয়ে যুগের পর যুগ চেষ্টা করলেও একটি সন্তান জন্মাতে পারবে না। সকল হাকীমের হেকীমী এখানে অকার্যকর। সকল ডাক্তারের ডাক্তারী এখানে মূল্যহীন। আমার মাওলার মর্জি নেই তাই বছরের পর বছর চলে যায়; কিন্তু সন্তান হয় না। এমনকি অনেকের যৌবন অতিবাহিত হয়ে যায়; তবুও সন্তান হয় না। হৃদয়ের তামান্না থেকে যায় হৃদয়েই। আশাগুলো থেকে থেকে তাকে আরো বিমর্ষ করে তোলে। শুধু দু'আ! শুধু দু'আ।

আরে ভাই! আমি আপনি, আমরা সাধারণদের কথা কী বলব? সন্তানের জন্য। সন্তান নামক নেয়ামতের জন্য তো হাহাকার করেছেন খোদ আম্বিয়া কেরামও। সন্তানের জন্য ব্যাকুল হয়ে দু'আ করেছেন তো নবীগণও। এ ব্যাপারে কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে। আল্লাহর নবী যিনি আল্লাহর মাকবূল বান্দা। তাকেই আল্লাহ সন্তান দিচ্ছেন না। তার হৃদয়ে আল্লাহ এমন মহব্বত ঢেলে দিয়েছেন যে, হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত আছে; তাঁর চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল। শরীর দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। বার্ধক্য তাকে কাবু করে নিয়েছিল। চামড়ায় ভাঁজ ধরে গেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা সন্তানের জন্য হৃদয়ে এমন তামান্না ও আকুতি দান করলেন যে, সন্তানের জন্য সন্তান পাওয়ার জন্য দু'আ করে করে তার জীবন কাটল। তো যুগের নবী, তাঁর তো কত প্রকার দু'আ হয়ে থাকে। অথচ এই সন্তানের দু'আ করতে করতেই জীবন শেষ হয়ে গেল। যৌবন শেষ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত দু'আ করতে-করতে বললেন–

رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي

'আমার পরওয়ারদেগার! আমার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে।'[১]

وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا

'আমার চুল সাদা হয়ে গেছে। হে আমার মাওলা আপনি আমার দু'আকে কবুল করুন।'[১]

---

১. সূরা মারয়াম, আয়াত- ৪

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

তোমাকে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি।[২]

আল্লাহ! সারাটা জীবন আমি তোমার দুয়ারে করাঘাত করে গেলাম। হে রব! আজো আমি নিরাশ হইনি। এই বৃদ্ধ বয়সেও হৃদয়ে সন্তানের কামনা রয়েছে। প্রত্যাশা রয়েছে। হে আমার রব! তোমার দুয়ার কখনও না কখনও খুলবে। তুমি আমাকে এই নেয়ামত দান করবে। এভাবে প্রাণ ভরে তিনি দু'আ করে গেলেন। আল্লাহ রব্বুল ইযযাত তাঁর দু'আ কবুলও করলেন। এই বৃদ্ধ বয়সেই আল্লাহ তাঁকে সন্তানের জনক বানালেন।

তো দেখুন, সন্তান এমন এক নেয়ামত, যার জন্য আম্বিয়া কেরামও দু'আ করেছেন। আবার শত দু'আর পর সেই বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা সে দু'আ কবুলও করেছেন।

আমার বন্ধুগণ! আমাদের অনেকেরই বিবাহ হয়েছে। আবার আল্লাহ দু-বছরের মধ্যেই তাদের সন্তান দিয়েছেন। একাধিক সন্তানও হয়ে গেছে অনেকের । এটি আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নেয়ামত। ঘরের মধ্যে এই বাচ্চারা খেলাধুলা করতে থাকে। কত ভালোবাসি আমরা এদের । আবার তারাও আমাদের ভালোবাসে। আব্বু-আম্মু বলে বলে ডাকে। আবার কখনও জিদ ধরে, অভিমান করে। খাবার খায় আবার কখনও খেতে চায় না। জোর-জবরদস্তি করে খাবার খাওয়াতে হয়। আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত কষ্ট ছাড়াই আমাদের এই নেয়ামত দান করেছেন। আমরা যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ খরচ করে দিতাম, তবুও তো এই নেয়ামত পেতাম না যদি আল্লাহ আমাদের তা না দিতেন। আল্লাহর কত শুকরিয়া আদায় করা উচিত একটু চিন্তা করুন।

স্ত্রীও একটি বড় নেয়ামত

আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি হচ্ছে, যখনই স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি পড়বে, স্ত্রীর দিকে তাকাব, তখনই শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহ রব্বুল ইযযাত এমন এক নারীর সাথে আমাদের সাদী করিয়েছেন, যে নারী ঈমানদার স্বামীর সাথে তার পুরো সময়টা কাটিয়ে দেয়। যে নারী পরপুরুষের দিকে চোখ তুলেও

---

১. সূরা মারয়াম, আয়াত- ৪

২. সূরা মারয়াম, আয়াত- ৪

তাকায় না। যার অবয়বে আল্লাহ লজ্জা ও শরমের আবরণ দিয়ে দিয়েছেন। নামায পড়ার তাওফীক যাকে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন। যে নারী মানুষের জন্য ইজ্জতের মাধ্যম। যে স্ত্রী মানুষকে নেককার ও পবিত্র রাখার মাধ্যম, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যম। যে নারী সন্তানকে তারবিয়াত করার মাধ্যম। যে নারী স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার মাল-সম্পদ ও ঘরবাড়ি সন্তান-সন্ততির হেফাযত করে। এটি আল্লাহ তা'আলার কত বড় নেয়ামত। এই নেয়ামত কত সহজে রাব্বুল আলামীন আমাদের দান করেছেন। আমাদের উচিত এই সোনার সংসারের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আমাদের সন্তানদের দিকে তাকিয়ে শুকরিয়া আদায় করা। আমাদের শারীরিক সুস্থতার দিকে তাকিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আমাদের রূপ-বর্ণের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর কত মেহেরবানি করেছেন।

আমাদের হাল-হাকীকত

আমাদের অবস্থা তো এমন যে, আমরা নানা রকম সুস্বাদু খাবার খাই; অথচ বিসমিল্লাহও পড়ি না। আমরা খানা খেয়ে উঠে যাই অথচ খানার শেষের দু'আটা পড়তেও ভুলে যাই। আল্লাহ আমাদের সুস্বাদু পানীয় পান করান। অথচ আমরা তার এই মধুর পানীয় পান করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যাই। চিন্তা করুন, এ-ই তো আমাদের হালত। এ-ই তো আমাদের অবস্থা। এই যে রুটি আমাদের সামনে। এটি তো গমের একটি দানা ছিল। কৃষক এটি ক্ষেতে বুনেছে। একজন মাটি প্রস্তুত করেছে। ২য়জন ফসল বুনেছে। উপর থেকে সূর্য আলো দিয়েছে। চাঁদ তাতে রশ্মি দিয়েছে। বাতাস তার উপর প্রবাহিত হয়ে উর্বর ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। বহু খাটা-খাটুনির পর গাছে ফসল আসে। একদল লোক এ ফসল কাটে। তারপর একদল লোক মাড়াই করে। আরেক দল শুকিয়ে তৈরি করে। তারপর তা পিষে গুড়ো করে আটা বা ময়দা তৈরি করে আরেক দল। এভাবে কত মানুষের কর্মের ফলে এই গম ময়দা হয়ে আমাদের মাঝে এসেছে। তারপর আমাদের ঘরের লোকেরা তাকে খামিরা তৈরি করে রুটি বানিয়ে আমাদের মাঝে পরিবেশন করেছে। এতগুলো স্তর পেরিয়ে যখন এই রূপে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে, তখনই আমরা তা খেতে পারছি। এটি ভক্ষণের উপযোগী হয়েছে। আর আমরা! আমরা এই রুটি খেতে গিয়ে বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেছি। আমাদের হালত তো এই! অথচ অন্তত এতটুকু তো আমাদের উচিত এই

রুটি, আল্লাহর এই নেয়ামত ভক্ষণ করতে শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া আর শেষে শুকরিয়ার দু'আ পড়া। হায় রব্বে কারীম! তোমার কত শত নেয়ামত আজ আমরা খেয়ে-পরে বিচরণ করছি পৃথিবীর বুকে। জীবন যাপন করছি এই দুনিয়াতে।

আল্লাহর নেয়ামতের পরিসংখ্যান

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا

'যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতের পরিসংখ্যান করতে চাও, তবে তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না।'[১]

কত সত্য কথা এটি। যদি কেউ আপনাকে প্রশ্ন করে, বলো তো দেখি তুমি, বৃষ্টির পানির ফোটার সংখ্যা কত? তাহলে নিশ্চয়ই আপনি বলতে পারবেন না। কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে আসমানের তারকাগুলো গুণতে পারবে? তাহলে নিশ্চয়ই আপনি বলবেন, না। আপনাকে যদি কেউ বলে, সারা দুনিয়ার পদার্থগুলো গুণতে পারবে? আপনি নিশ্চয়ই বলবেন, না। কেউ আপনাকে যদি বলে, সারা দুনিয়ার সকল গাছের পাতাগুলো কি গুণতে পারবে? আপনি নিশ্চয়ই বলবেন, পারব না। তবে আমার হে বন্ধু! আমি তবুও বলছি, বৃষ্টির পানির প্রতিটি ফোঁটা গণনা করা সম্ভব। সারা দুনিয়ার সমস্ত গাছের সংখ্যা গণনা করা সম্ভব। সারা দুনিয়ার সব পদার্থের সংখ্যা গণনা করা সম্ভব। কিন্তু মাওলায়ে কারীম আমাদের উপর কত শত ইহসান ও অনুগ্রহ করেছেন, তা গণনা করা আমাদের পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। অসম্ভব সবকিছু সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর নেয়ামতের গণনা সম্ভব হবে না। কারণ, এই নেয়ামতের ব্যাপারে তো বলেই দেওয়া হয়েছে

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا

'যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতের পরিসংখ্যান করতে চাও, তবে তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না।'[২]

বৃষ্টির ফোঁটা গাছের পাতা আর আকাশের তারকারাজির ব্যাপারে তো এমন কোনো কথা বলা হয়নি। তবুও এগুলো গণনা অসম্ভব। তাহলে যেটার

---

১. সূরা ইবরাহীম, আয়াত- ৩৪

২. সূরা ইবরাহীম, আয়াত- ৩৪

গণনা অসম্ভব বলে কুরআনে বলে দেওয়া হয়েছে সেটা গণনা কী করে সম্ভব হবে একটু চিন্তা করে বলুন তো শুনি! তাই আমাদের উচিত, কায়মনোবাক্যে আল্লাহর সমীপে বলে বেড়ানো হে আল্লাহ! তোমার এ তো অযুত-কোটি নেয়ামতের অবিরত ধারার মাঝে আমরা ডুবে আছি। তোমার কোন-কোন নেয়ামতের শুকরিয়া আমরা আদায় করব হে আমাদের মালিক!

নেয়ামতের অবমূল্যায়ন করার মুসিবত

কুরআনুল কারীমের একটি আয়াত আছে। আয়াতটি একটু মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–

فَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا

আল্লাহর দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ বয়ান করেন।[১]

قَرْيَةً

একটি জনপদের অধিবাসীর।[২]

كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً

যাদের মাঝে নিরাপত্তা ছিল এবং তারা সুখময় ছিল। তারা নিশ্চিন্ত ও খুশী ছিল।[৩]

তো এখানে একটি জনপদবাসীর জন্য দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

১. اٰمِنَةً যার অর্থ নিরাপদ।

২. مُّطْمَئِنَّةً নিশ্চিন্ত ও খুশী।

اٰمِنَةً তথা নিরাপত্তার দ্বারা উদ্দেশ্য বহিরাগত দুশমনের কোনো ভয় তাদের নেই। আর مُّطْمَئِنَّةً তথা নিশ্চিন্ত ও খুশী। এর অর্থ ভেতরগত কোনো দুশমনের শঙ্কাও তাদের নেই। তো আল্লাহ তা'আলা এ জনগোষ্ঠীকে এমন নিরাপদ জীবনও দিয়েছেন যে, তাদের উপর বহিরাগতদের আক্রমণের ভয় নেই, কোনো শঙ্কা নেই। ভেতরগত কারো ভয় শঙ্কা নেই তাদের। আল্লাহ রব্বুল ইযযাত বলেন–

---

১. সূরা নাহাল, আয়াত- ১১২
২. সূরা নাহাল, আয়াত- ১১২
৩. সূরা নাহল, আয়াত- ১১২

يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

তাদের সর্বপ্রকার রিযিক প্রদান করা হয়েছে।[১]

فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ

তারা আল্লাহর নেয়ামতের অবমূল্যায়ন করেছে।[২] নেয়ামতের নাশুকরি করেছে।

তারপর কী হয়েছে? কুরআনের ঘোষণা-

فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ

তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ভয় ও শঙ্কার মাঝে নিপতিত করে দিলেন। ভয়–ভীতি, শঙ্কা ও অশান্তির পোশাক তাদের পরিয়ে দিলেন।[৩]

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

এসব কিছু তার বিনিময়ে হয়েছে।[৪]

ক্ষুধা অনাহার সংকীর্ণতা ও ভয়ের পোশাক

আমরা যদি আামাদের চার পাশে তাকাই, আমরা যদি আমাদের নিয়ে ভাবি, তবে দেখতে পাব আমাদের মাঝে এমন বহু মানুষ আছে যারা পূর্বে সর্বপ্রকার জিনিস প্রাপ্ত হয়েছে। অথচ পরবর্তী কালে আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষুধা, অনাহার, সংকীর্ণতা ও ভয়-শঙ্কার পোশাক পরিয়ে দিয়েছেন। তারা আমার কাছে এসে বলে, হযরত! বুঝতে পারছি না, কী হতে কী হয়ে গেল। প্রথমে তো এমন অবস্থা ছিল যে, মাটির মধ্যে হাত লাগালেও তা যেন সোনা হয়ে যেত। আর এখন অবস্থা এমন যে, যেন সোনায় হাত লাগালে তা মাটি হয়ে যায়। তারা বলে, হযরত! বুঝতে পারছি না, এখন বড় শঙ্কায় ও আতঙ্কে থাকি। কখনও অসুস্থ থাকি। কখনও মেয়েটা অসুস্থ থাকে। কখনও বাবা অসুস্থ থাকেন। এভাবে কঠিন এক হাহাকার ও আতঙ্কের মধ্যে জীবন কাটছে। তো এই যে অবস্থা। এ অবস্থাটা কেন হয়েছে? আল্লাহর নেয়ামতের নাশুকরি করার কারণে হয়েছে। আল্লাহর নেয়ামতের অবমূল্যায়ন করার

---

১. সূরা নাহল, আয়াত- ১১২
২. সূরা নাহল, আয়াত- ১১২
৩. সূরা নাহল, আয়াত- ১১২
৪. সূরা নাহল, আয়াত- ১১২

কারণে হয়েছে। আজ আল্লাহ তা'আলা তকে ভয় ও অনাহারের পোশাক পরিয়ে দিয়েছেন। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও আজ তার কিছুই নেই। ফলে সে কেঁদে-কেঁদে মরছে। তার হৃদয় শঙ্কিত। সে আতঙ্কিত। যদি আল্লাহর নেয়ামতের অবমূল্যায়ন ও নাশোকরী করা হয়, তবে আল্লাহ এভাবে সংকীর্ণতা, ভয়-ভীতি ও লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন।

আল্লাহ কী পছন্দ করেন

আমাদের পরওয়ারদেগার! আল্লাহ আমাদের জন্য এটি পছন্দ করেন যে, আমাদের উপর তার নেয়ামতের নিদর্শন প্রকাশ পাক। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَّرٰى أَثَرَ نِعْمَتِهٖ عَلٰى عَبْدِهٖ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তাঁর নেয়ামতের নিদর্শন তাঁর বান্দার মাঝে দেখতে পান।'

তো আল্লাহ চান যে, বান্দাদের আমি নেয়ামত দিব; সে ওই নেয়ামতগুলো ব্যবহার করুক। সাথে-সাথে এটিও চান যে, যে বান্দা আমার নেয়ামত পেল সে আমার শুকরিয়া আদায় করুক। কারণ, প্রত্যেক দাতা-ই চান, যখন কাউকে কোনো কিছু দেওয়া হবে, তখন সে তাকে ইহসান বলে মেনে নিবে যে, হ্যাঁ; আমার উপর ইহসান করা হচ্ছে। আমাদের রব তো বড় আযমতওয়ালা। তিনি আমাদের এতকিছু দিয়েছেন এবং কোনো চাওয়া ছাড়াই দিয়েছেন। এখন আমাদের উচিত, আমরা তার ইহসানকে মেনে নেব এবং তার শুকরিয়া আদায় করব।

আমাদের অভিযোগের মূল রহস্য

আজ আমরা প্রায়ই অভিযোগ করে বেড়াই, আল্লাহ আমাদের দু'আ শোনেন না। আমার দু'আ তো কবুল হয় না। আমি দু'আ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই যে আমাদের এসব অভিযোগ; এগুলোর মূল রহস্য কী? কেন এসব অভিযোগ আমরা করছি? কারণ, আমরা মনে করছি, ইবাদতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর উপর ইহসান করে ফেলেছি। আমাদের সকল অভিযোগের মূল কারণ এটিই। আমরা মনে করছি, আমরা আল্লাহর কাজ খুব করে ফেলেছি।

আল্লাহর ইহসান ও অনুগ্রহ

আমার প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! কবি বলেছেন,

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی

منت از وشناس کہ در خدمت گزاشت

হে খাদেম! তুমি বাদশাহকে এভাবে খোটা দিয়ে বলো না যে, তুমি বাদশাহর খেদমত করছ। আরে ভাই! তুমি তো বরং এভাবে বলো, বাদশাহ তার খেদমতে আমাকে লাগিয়েছেন। আমাকে তাঁর খেদমত করার সুযোগ দিয়েছেন। বাদশাহর খেদমত করার জন্য তো বহু মানুষ আছে। এটি তো বাদশাহর অনুগ্রহ যে, তোমাকে তার খেদমতে রেখেছেন তিনি।

তো, আমরা আজ আল্লাহকে খোটা দেওয়া শুরু করেছি। আমরা আল্লাহর ইবাদত করছি। আরে ভাই! আল্লাহর ইবাদত করার এত লোকের অভাব নেই বরং আল্লাহই আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। করুণা করেছেন। তিনি আমাদেরকে ইবাদতের জন্য আসার তাওফীক দিয়েছেন। তাই বলছি, আমাদের উচিত একথা মেনে নেওয়া যে, আল্লাহ আমাদের উপর ইহসান করেছেন, আমাদের উপর দয়া করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন।

شکر ہے تیرا خدایا تو اس قابل نہ تھا

تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا

তোমার শোকর আদায় করি ওগো মাওলা! আমি তো উপযুক্ত ছিলাম না। তুমি তোমার ঘরে আমাকে ডেকে এনেছ ওগো মাওলা! আমি তো এর উপযুক্ত ছিলাম না।

میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی

گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا

আমি তো ছিলাম দিকভ্রান্ত, পথহারা। তুমিই আমার হাত ধরেছ। তুমিই আমায় কা'বার আঙিনায় নিয়ে এসেছ। আমি তো এর উপযুক্ত ছিলাম না।

مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا

جام زمزم کا پلایا میں تو اس کے قابل نہ تھا

পিপাসাকাতর এই প্রাণে প্রভু তুমি দিয়েছ পানির ছোঁয়া। তুমি ভরে দিয়েছ পানীয়তে। জমজমের পেয়ালা তুমি পান করিয়েছ করুণা করে। আমি তো ছিলাম না এর উপযুক্ত।

ڈال دی ٹھنڈک مرے سینے میں تو نے ساقیا

اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا

হে সাকী! ওগো শরাব বিতরণকারী! তুমি শীতলতার পরশ দিয়েছ আমায়। আমার বক্ষ মিলিয়ে নিয়েছ বক্ষে তোমার। আমি তো ছিলাম না এর উপযুক্ত।

تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب

گنبد خضریٰ کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا

তোমারই দয়ায় তোমার করুণায় নসীব হয়েছে সবুজ গম্বুজের শীতল ছায়া। আমি তো ছিলাম না ওগো এর উপযুক্ত।

بارگاہ سید الکونین میں آکر نفیس

سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا

এই সৃষ্টিজীবের সেরা মানব মহান নেতার দরবারে এসে আজ চিন্তা করছি, ওগো মাওলা! কেমন করে এলাম আমি এই যে মহান আঙিনায়। ছিলাম না তো ওগো খোদা! আমি এর উপযুক্ত।

আমরা তো কোনো কিছুই পাবার উপযুক্ত ছিলাম না। আল্লাহ দয়া করে আমাদের সব দিয়েছেন।

শুকরিয়ায় ঘাটতি করার শাস্তি

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমাদের উচিত একথা ভাবা যে, আমরা আমাদের যবান দ্বারা, জিহবা দ্বারা, আমাদের শরীর দ্বারা, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ দ্বারা, আমাদের ইবাদত দ্বারা আল্লাহর যত শুকরিয়াই আদায় করছি তা অনেক কম। অত্যন্ত কম। আজ এই আমলটিতে ঘাটতি দেখা দিয়েছে উম্মতের মধ্যে। ফলে আল্লাহও তাঁর নেয়ামতগুলো আমাদের থেকে উঠিয়ে নিচ্ছেন। আমাদের কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করছেন।

কাওমে সাবার উপর আল্লাহর নেয়ামতরাজি

আল্লাহ তা'আলা একটি কাওমের ব্যাপারে বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ

'তোমাদের জন্য কাওমে সাবার মাঝে নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।'[১]

তারা ওই জাতি ছিল, যাদের বিস্তৃত বাগান ছিল। তারা যে পথে চলত, তার অবস্থা এমন ছিল

جَنَّتَانِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ

'ডানে ও বামে দুটি বাগান।'[২]

তাদের ডানেও বাগান আবার বামেও বাগান। তারপর পরওয়ারদেগার আল্লাহ তা'আলা তাদের বললেন–

كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ

'তোমরা তোমাদের রবের দেওয়া নেয়ামত থেকে খাও আর তোমাদের রবের শুকরিয়া আদায় করো।'[৩]

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ

এটি কত চমৎকার শহর।[৪]

وَرَبٌّ غَفُوْرٌ

আর রব তো গুনাহ মাফকারী।[৫]

আল্লাহ রব্বুল ইযযাত তো চান, আমার দেওয়া জিনিস খাও এবং আমার শুকরিয়া আদায় করো। এতে আমি তোমাদের বাহ্যিক সম্মানও দান করব। আর তোমাদের গুনাহও মাফ করে দেব। ফলে তোমরা রোজ কিয়ামতের দিনে বড় সম্মানিত হবে। কিন্তু আফসোস, আমরা সেই রবের শুকরিয়া আদায় করিনি।

শুকরিয়া আদায়ে পদ্ধতি

আমদের অবস্থা তো এরকম যে, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তোমার কাজ-কর্ম কেমন চলছে? তখন আমরা জবাবে বলে দেই, যাচ্ছে কোনো রকম। অথচ এই জবাব এমন ব্যক্তি প্রদান করে, যার কয়েকটা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আছে। কয়েকটা বাড়ি আছে। কোটি-কোটি টাকার মালিক। আরে ও

---

১. সূরা সাবা, আয়াত- ১৫
২. সূরা সাবা, আয়াত- ১৫
৩. সূরা সাবা, আয়াত- ১৫
৪. সূরা সাবা, আয়াত- ১৫
৫. সূরা সাবা, আয়াত- ১৫

আল্লাহর বান্দা! এ জবাব দেওয়ার সময় তোমার যবান এত ছোট হয় কেন? তোমার যবান থেকে তোমার রবের প্রশংসাবাণী কেন বের হয় না? যদি কোনো মন্ত্রী তোমার সন্তানকে চাকরি দেয়, তাহলে স্থানে-স্থানে তো মুখ ফুটে বলে বেড়াও। মন্ত্রীর প্রশংসা করে বেড়াও! আরে ওই মন্ত্রী তো তোমার উপর অতি সামান্য ইহসান করেছে। এতে তুমি এত গুণগ্রাহী আর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যাও আর তোমার রব্বে কারীম তোমাকে এত ইহসান করলেন; অথচ তুমি তার সামান্য প্রশংসাও করতে পারলে না!

তোমার তো উচিত ছিল, এভাবে বলা যে, আমার মাওলায়ে কারীম আমাকে ভালো রেখেছেন। আমার তো কোনো ক্ষমতা নেই। আমার তো এত উপযুক্ততা নেই। আমার রব আমাকে দান করেছেন। তোমার তো উচিত ছিল, মাওলায়ে কারীমের শুকরিয়া আদায় করা। আমার বন্ধুগণ! আমাদের উচিত আল্লাহর গুণ কীর্তন করা। আল্লাহর প্রশংসা করা। আল্লাহর তারিফ করা। বাস্তবেই আমরা তো এর উপযুক্ত নই। আমাদের তো উচিত সারাটা জীবন সিজদায় পড়ে থাকা। তবুও তো শুকরিয়া আদায় হতো না। আমরা যদি সারাটা জীবনও তার ইবাদতে মশগুল থাকি, তবুও তার শুকরিয়া আদায় হবে না। তাঁর হক আদায় সম্ভব নয়। আমাদের উচিত আমরা এমনভাবে জবাব দেওয়া যে, যাতে আল্লাহর মহব্বত, আযমত প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ আমাদের উপর কত ইহসান করেছেন। আল্লাহর শোকর আদায় করার সবক আজ আমরা নতুন করে গ্রহণ করা উচিত। আমরা যদি চিন্তা করি, তাহলে আমাদের চার পাশেই আমরা এমনসব নেয়ামত দেখতে পাব, যা দেখে মনের অজান্তেই বেরিয়ে আসবে। মুখ ফুটে উচ্চারিত হবে, আমার রব আমাকে এত দিয়েছেন। আমি এর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারব না।

আবরণে ঢাকা আমাদের দোষ

দেখুন ভাইয়েরা! আল্লাহ্ কীভাবে আমাদের দোষগুলো চেপে রেখেছেন আবরণের মাধ্যমে। আমরা যারা অন্যায় করি, সেই অন্যায় গোপন রখেন আল্লাহ্! ফলে আমরা এই দুনিয়ায় বড় মর্যাদা ও সম্মানের সাথে জীবন যাপন করছি। রব্বে কারীম আমাদের সব কিছু গোপন রাখেন। আমাদের সারা শরীর থাকে কাপড়ের আড়ালে। আমাদের পোশাক আমাদের সবকিছু লুকিয়ে রেখেছে। এই পোশাক আমাদের জন্য অনেক বড় নেয়ামত।

আমাদের এই ইযযত ও সম্মানের জীবন, এটি আমাদের রব্বে কারীমেরই মহান দান। এটি আমাদের উপর আল্লাহর সাত্তার গুণের মহা

অনুগ্রহ। যদি আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর ستار (গোপনকারী) এর সিফাত প্রসারিত করে না দিতেন। আমাদের উপর তার রহমতের চাদর যদি মেলে না ধরতেন, তাহলে আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি মানুষের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যেত। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনাগুলোকে যদি শারীরিক আকৃতি দান করে লোকদের সামনে উপস্থাপন করে দেওয়া হতো, তাহলে লজ্জা-শরমের আর অন্ত থাকত না। আমরা তো তখন মানুষকে চেহারা-ই দেখাতে পারতাম না। চিন্তা করুণ। আমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা মানুষের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায় না। বরং আমাদের ভালো কথাগুলো, ভালো কাজগুলো ও ভালো বিষয়গুলোই লোকদের সামনে প্রকাশিত হয়, যার কারণে লোকেরা আমাদের ভালোবাসে, প্রশংসা করে। এটি আমাদের কোনো কীর্তি নয়। এটি আল্লাহ পাকের দান।

আল্লাহর প্রশংসা

যদি কেউ আমাদের তারিফ করল, তাহলে সে তো আল্লাহরই তারিফ করল। সে তো ستار (গোপনকারী) আল্লাহরই তারিফ করল। সত্য হলো, মাখলুক যদি মাখলুকের তারিফ করে, তবে তা মাওলা পাকেরই তারিফ হয়। আর মাখলুক যদি স্রষ্টার তারিফ করে, তাহলে তা খালিক ও মালিক মাওলা পাকেরই তারিফ হয়।

আবার খালিক ও মালিক আল্লাহ যদি কোনো মাখলুকের তারিফ করেন, তাহলেও তা হবে মাওলা পাকেরই তারিফ। আবার খালিক ও মালিক যদি নিজের তারিফ নিজেই করে, তাহলে তাওতো হবে মাওলা পাকেরই তারিফ। পৃথিবীর সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। পৃথিবীর সমস্ত তারিফ তাঁরই। পৃথিবীর সমস্ত প্রশংসাবাণী তাঁরই। সমস্ত তারিফ ও প্রশংসার মালিকও একমাত্র আমাদের রব্বে কারীমই। সকল তারিফ ও প্রশংসা লুটিয়ে পড়ে তাঁরই সামনে। আমাদের উচিত, আমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহের কথা ভেবে-ভেবে তাঁর তারিফও প্রশংসায় মগ্ন থাকি, তাঁর শোকর ও সুজুদ আদায় করি।

ভিখারীর সাথে ভালো আচরণের পদ্ধতি

যদি কোনো ভিখারী এসে আমাদের কাছে ভিক্ষা চায়, তাহলে সে সুস্থ কি অসুস্থ আমরা সেদিকে তাকাব না। তাকে ধমক দিব না। বরং কিছু না কিছু দিয়ে তাকে বিদায় করব। যদি লোকটিকে মা'যূর দেখতে পাই, রোগাক্রান্ত ও

অসুস্থ দেখতে পাই, তাহলে তাকে একটু বেশি করে দান করব। খালিহাতে ফিরিয়ে দিব না। আমাদের পরওয়ারদেগারের হুকুম তো তাই। ইরশাদ হচ্ছে–

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

'তোমরা ভিক্ষাকারীকে ফিরিয়ে দিয়ো না। তাকে ধমক দিয়ো না।' [১]

তার অবস্থা কেমন সে সম্পর্কে তো লোকটি নিজেই ভালো জানে। সে নিজেই ভিক্ষা করার লজ্জা লাঞ্ছনাকে সহ্য করেছে। আপনি অন্তত এদিকে তাকিয়ে হলেও তাকে কিছু দিয়ে দিন। আল্লাহ তো আপনাকে দিয়ে দেবেন। আল্লাহ আপনাকে দাতা বানিয়েছেন; ভিখারী তো বানাননি।

যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে আপনাকে তার মতো আর তাকে আপনার মতো বানাতে পারতেন। আমাদের রব্বে কারীম আজ আপনাকে দাতা বানিয়েছেন। তাই যখনই কোনো ভিক্ষুক আসবে, তখনই আপনি নিজের দিকে তাকিয়ে একটু হলেও প্রকম্পিত হোন এবং আল্লাহর শুকরে সেজদায় অবনত হোন। বলুন, হে রব্বে কারীম! তোমার দয়া ও অনুগ্রহ আমার উপর কত বেশী। তুমি তো চাইলে আমাকে এমন মানুষের দুয়ারের ভিক্ষারী বানাতে পারতে। আমার মেয়েকে এমন ভিখারী বানাতে পারতে। আমার ছেলেকে ভিখারী বানাতে পারতে। আমার স্ত্রীকে ভিখারী বানাতে পারতে। তোমার কত রহম ও করম আমার উপর। তুমি আমাকে কত সম্মানের জীবন দিয়েছ। আমাকে কত মর্যাদায় রেখেছ। আমাকে ভিক্ষুক না বানিয়ে দাতা বানিয়েছ। এই ভেবে এই ভিক্ষুককে কিছু দিয়ে দিন। তাকে সাহায্য করুন, সহায়তা করুন।

আলহামদুলিল্লাহ বলার অভ্যাস

আপনি নিজেকে নিয়ে ভাবুন। নিজের কাজ-কর্মের দিকে তাকান। দেখবেন, আমাদের মুখে শব্দে-শব্দে আলহামদুলিল্লাহ উচ্চারণ হচ্ছে না। আমরা কথায়-কথায় আলহামদুলিল্লাহ বলি না। আমাদের অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। কেউ যদি প্রশ্ন করে, ভাই কেমন আছ, তখন আমরা সাধারণত বলি না, আলহামদুলিল্লাহ! আমার শরীর ভালো আছে। আমি ভালো হালতে আছি। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে ভালো রেখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুন্দর ঘরবাড়ি দিয়েছেন।

---

১. সূরা আদ-দোহা, আয়াত- ১০

আলহামদুল্লিাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে সন্তান সন্তোতি দিয়েছেন। আলহামদুল্লিাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে খাবার দিয়েছেন। এভাবে আমরা বলি না। আমাদের কথাবার্তায় আলহামদুলিল্লাহ শব্দ উচ্চারিত হয় না। আরে ভাই! তাই তো আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত নিজেই বলেছেন,

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

'আমার বান্দাদের মধ্যে খুব কম লোকই শুকরিয়া আদায় করে।'[১]

দেখুন, আল্লাহ নিজেই বলে দিলেন। আল্লাহর নেয়ামত তো তামাম ইনসানের উপর প্রসারিত। তিনি আপন করে, ঈমানদার-বেঈমান, কাফের-মুশরিক, মুসলমান সকলকেই সমানহারে দান করেন। সেই আল্লাহর এত হাজার নেয়ামত পেয়ে আমরা কি প্রকৃত শুকরিয়া আদায় করতে পারছি?

একটা কুকুরের দিকে তাকান, যাকে তার মালিক একটা শুকনা রুটি দান করেন মাত্র। সেই শুকনা রুটি পেয়েই কুকুর তার মালিকের কত অনুগত হয়। সারা রাত জেগে-জেগে মালিকের ঘর পাহারা দেয়। মালিক খাবার খেতে থাকলে মালিকের জুতার উপর বসে মালিককে দেখতে থাকে। মালিক গোশত থেকে হাড্ডিটা তার দিকে ছুড়ে দেয়। তা-ই পেয়ে লেজ নাড়াতে-নাড়াতে বড় খুশী মনে খেয়ে নেয়। কিছু যদি ছুড়ে নাও দেয়, তবুও সবরের সাথে ওই স্থানেই বসে থাকে। কুকুর কখনও অভিযোগ তোলে না।

হে বান্দা! তোমার পরওয়ারদেগার তোমাকে সকালে-দুপুরে-সন্ধ্যায় খাবার দেন, তুমি তোমার মর্জি মোতাবেক খাবার খাও। সামান্য ঊনিশ-বিশ হলেই তুমি ক্ষেপে যাও। অভিযোগ তোল, বলতে শুরু কর, হায় রে, আমি কত দু'আ করি, আমার দু'আ কবুলই হয় না।

বাস্তব কথা তো এই যে, আমাদের মাঝে অহংকার বেড়ে গেছে। যখন আমরা বলি, আল্লাহ আমার দু'আ শোনেন না, তখন আমরা তো যেন একথাই বলি যে, হে আল্লাহ! আমি তো প্লানটা এমন-এমন করেছি; এখন তুমি এটি বাস্তবায়ন করে দাও। আরে ভাই! আল্লাহ আমাদের পরওয়ারদেগার তিনি। আজ আমরা (নাউযুবিল্লাহ) তাকে চাকরের মতো হুকুম দিচ্ছি। বলে দিচ্ছি, এটা এমন করে দাও, ওটা অমন করে দাও। আরে ভাই! পরওয়ারদেগার আল্লাহর তো শান এই যে, তিনি চাইলে বান্দার দু'আ কবুল করতে পারেন। আর না চাইলে কবুল নাও করতে পারেন। তিনি তো

---

১. সূরা সাবা, আয়াত- ১৩

ইচ্ছে করলে নবীদের দু'আও ফিরিয়ে দেন। তাঁকে বাধা দেওয়ার কে আছে? তাকে নিষেধ করে এমন কার ক্ষমতা আছে? যদি আল্লাহ ইচ্ছে করেন, তাহলে ফাসেক ও ফাজের অবাধ্য বান্দার দু'আও কবুল করতে পারেন। আর ইচ্ছে করলে নেককারের দু'আও ফিরিয়ে দিতে পারেন। তিনি তো অমুখাপেক্ষী মাওলা।

আমার বন্ধুগণ! আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অমুখাপেক্ষিতার শান তো এই যে, তিনি ইচ্ছে করেছেন তো বালআম বাউর-এর ৫০০ বছরের ইবাদত বিফল করে দিয়েছেন। আবার তিনিই ইচ্ছে করেছেন তো ডাকাতদলের সরদার ফুযাইল ইবনে ইয়াযকে রহমতের ছায়ায় স্থান দিয়েছেন।

ডাকাতসরদার থেকে উঠিয়ে আল্লাহ তাঁকে ওলিদের সরদার বানিয়ে দিয়েছেন। পরওয়ারদেগার হচ্ছেন অমুখাপেক্ষী সত্তা। এমন যেন না হয় যে, আমাদের উপর তিনি নারাজ হয়ে যান এবং বেনিয়াজী যাহির করে দেন। তাহলে তো আমরা বড় কষ্টের জীবনে পড়ে যাব। মনে রাখুন, আল্লাহ যদি কারো উপর নারাজ হয়ে যান, তবে তার সব উল্টে যায়। তার কাপড় খুলে যায়। সে ঘরে বসেও বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার জীবন যাপন করতে থাকে। বড় বড় ইযযাতওয়ালা লোকেরাও তখন চেহারা দেখাতে পারে না। তাই পরওয়ারদেগার আল্লাহ যেন নারাজ না হয়ে যান। যদি আল্লাহ নারাজ হয়ে যান, তাহলে চলতে ফিরতে ওই বান্দা লাঞ্ছিত হবে। তার ভেতরের মানবসত্তা মরে যাবে। তার ভেতরের ইনসান যিন্দা থাকবে না। লোকেরা বলে, আমরা তো এখন এত লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে গেছি যেন মরে গেছি। আমাদের এ জীবন তো কোনো জীবনই নয়।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ যেন কখনও নারাজ না হন এ দিকে লক্ষ রাখতে হবে। দু'আ করতে হবে, রব্বে কারীম! আপনি আমাদের উপর রাজী থাকুন। আমাদের উপর মেহেরবানি করুন। আমাদের ভুলের কারণে আমাদের উপর নারাজ হয়ে যাবেন না। যখন আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি বান্দা থেকে সরে যায়, তখন বান্দার জীবনতরী হেঁচকা টান খেতে থাকে। ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তখন ঈমান হেফাযত করাও কঠিন হয়ে পড়ে। তখন মানুষের সম্মান হেফাযত করাই মুশকিল হয়ে পড়ে। আমাদের উচিত শুকরিয়া আদায় করা। আর যে সকল বিষয় আমাদের কাঙ্ক্ষিত রয়েছে, তা আল্লাহর নিকট চাওয়া। সে ব্যাপারে প্রার্থনা করা। আল্লাহর দরজায় সর্বদা করাঘাত করতে থাকা। একটি সময় আসবে, আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত দরজা খুলে দিবেন। আমাদেরকে ওই নেয়ামতও দান করবেন। তাই এই সবক,

এই শিক্ষা ভালোভাবে হৃদয়ে ধারণ করা চাই। যখন আমরা শুকরিয়া আদায় করায় অভ্যস্ত হয়ে যাব, তখন আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত তাঁর নেয়ামতকে আমাদের উপর বাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা তখন আমাদেরকে দুনিয়ার নেয়ামতেও ধন্য করবেন, আখেরাতের নেয়ামতেও ধন্য করবেন। রুহানী নেয়ামতেও আমাদের ভরে দেবেন।

তিন ব্যক্তির পরীক্ষা

হযরত মাওলানা বদরে আলম (রহ.) তরজমানুসসুন্নাহ কিতাবে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, বনী ইসরাঈলের তিনজন ব্যক্তি ছিল। একজনের চেহারায় শ্বেত রোগের দাগ ছিল। দ্বিতীয়জনের মাথায় টাক ছিল আর তৃতীয়জনের চোখ অন্ধ ছিল। এই তিনজনের সাথে এক আজব কাণ্ড ঘটল। তো যার চেহারায় শ্বেতের দাগ ছিল, তার চেহারাটা বড় বিশ্রী দেখাত। মানুষ তাকে দেখতে চাইত না। কেউ তার দিকে তাকাত না। কোনো মাহফিল বা সভায় উপস্থিত হয়ে সে নিজেকে পাপী ও অন্যায়কারী মনে করত। মনমরা হয়ে থাকত। ফলে তার কাজ-কারবার ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুই টিকল না।

তার কাছে একজন মানুষ এল। বলল! তোমার কি কোনো পেরেশানি আছে? বলো তো! লোকটি বলতে লাগল হ্যাঁ আছে। জিজ্ঞেস করা হলো, কী সেই পেরেশানি? লোকটি বলল, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই শ্বেত রোগ দিয়েছেন। আমি এখন কোনো কাজ-কারবার করতে পারি না। আগত লোকটি বলল, তুমি এখন কী চাও। রুগী বলল, আমি এর থেকে পরিত্রাণ চাই। আল্লাহ যেন আমার রোগটা ভালো করে দেন। আমার চেহারা যেন এমন হয়ে যায় যে আমি সম্মানের সাথে লোকদের মাঝে ওঠাবসা করতে পারি। আল্লাহ যেন আমার কাজ-কারবার ঠিক করে দেন। কামাই রুজি যেন করতে পারি। আমার এতটুকুই যথেষ্ট।

আগত লোকটি তার জন্য দু'আ করল। ফলে লোকটি সুস্থ হয়ে গেল। লোকটি তাকে একটি উটনী দিল। ঐ উটনী পরে একটা বাচ্চা দিল এবং বংশ বিস্তার করতে করতে এমন হলো যে, লোকটি বহু উটের মালিক হয়ে গেল। এবার লোকটির মান-সম্মান বেড়ে গেল। সকলের মাঝে তার আলাদা স্থান তৈরি হলো।

এই লোকটি এবার টাকওয়ালার কাছে গিয়ে বলল, তোমার কি কোনো চাওয়া-পাওয়া আছে? লোকটি বলল, আরে ভাই! আমি বড় কষ্টে আছি।

লোকেরা আমাকে নিয়ে মজাক করে। আমাকে টাকওয়ালা বলে ডাকে। আমি হাসির পাত্র হয়ে আছি। কোথাও গেলে সম্মান পাই না। আমি ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারি না। আমার কথার মূল্য দেওয়া হয় না। বড় করুণ অবস্থায় আছি। আমি চাই আমার মাথায় চুল গজিয়ে উঠুক। আগত লোকটি তার জন্য দু'আ করে দিল। ফলে তার রোগ সেরে গেল। মাথায় চুল গজাল। লোকটি তাকে একটি গাভী দিল। এই গাভী বংশবিস্তার করল। সে বহু গাভীর মালিক হয়ে গেল। তার ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার হয়ে গেল। লোকটি বেশ অর্থ-কড়ির মালিক হয়ে গেল।

এবার আগত লোকটি তৃতীয় ব্যক্তি তথা অন্ধের কাছে গেল। বলল, তোমার অবস্থা কী বলো।

লোকটি বলল, আমি তো অন্ধ। চোখে দেখি না। আমি এর সাথে ধাক্কা খাই, ওর সাথে ধাক্কা খাই। কাজ-কারবার করতে পারি না। আমি লোকদের কাছে ভিক্ষা করে বেড়াই। আমার জীবন বড়ই কষ্টের জীবন।

আমি কত অসহায় তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না। আপনি একটু দু'আ করে দিন, আল্লাহ যেন আমাকে সুস্থ করে দেন। লোকটি দু'আ করে দিল। আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দিলেন। লোকটি এই অন্ধকে একটি ছাগল দিয়ে গেল। ছাগলটি বংশবিস্তার করল। লোকটি অনেক ছাগলের মালিক হয়ে গেল। অনেক অর্থ-সম্পদ হলো তার। সমাজে এখন সে প্রথম সারির ব্যক্তি। সমাজে এখন সে মাথা উঁচু করে কথা বলে।

কয়েক বছর পর। লোকেরা তো এই ফাঁকে ওই তিন ব্যক্তিকে বড় সম্মান ও মর্যাদা দিতে লাগল। তার বড় সুখে জীবন যাপন করতে লাগল। একদিন হঠাৎ ঐ লোকটি এল, যে তাদের উট, গাভী ও ছাগল দিয়ে গেছে। ফলে তারা ধনবান হয়েছে। সে এল। তাদের প্রত্যেকের কাছে গেল। প্রথমে শ্বেত রুগীর কাছে গেল। বলল, ভাই! একটা সময়ে তো তুমি গরীব ছিলে। আল্লাহ তোমাকে এখন ধন-দৌলত দিয়েছেন। তো ওই আল্লাহর জন্য কিছু দাও। একথা শুনে এই রুগী লোকটি ক্ষেপে গেল। বলল, আরে মিয়া আমি কখনো ফকির ছিলাম না। আমি অসহায় ছিলাম না। আমি বংশগত ধনী। আমি তো সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছি। আরে মিয়া! আমি তো খান্দানী আমীর। তুমি কী বলছ এসব! এভাবে দীর্ঘ বক্তব্যে লোকটি প্রকাশ করল তার অবাধ্যতার কথা। তার নাশুকরির কথা। লোকটি অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করল। আল্লাহকে ভুলে গেল। আগত লোকটি বলল, তুমি আগে যেমন ছিলে আল্লাহ

তোমাকে তেমন করে দেন। একথা বলে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। সাথে-সাথে এই লোকের আবার শ্বেত রোগ দেখা দিল। সমস্ত অর্থ-কড়ি নষ্ট হয়ে গেল। উটগুলো সব মরে গেল। সকাল বেলায় ধনী সন্ধ্যায় ফকির হয়ে গেল।

আগত লোকটি এবার দ্বিতীয়জনের কাছে গিয়ে একই ভঙ্গিতে আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চাইল। সে ক্ষেপে গেল। বলল, তুমি এসব পাগলের প্রলাপ বকছ। আমি কখনও গরীব ছিলাম না। আমি সব সময়ই ধনী। তুমি আবার কে। কোথা থেকে এসেছ। যাও মিয়া। এভাবে লোকটি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। আগত লোকটি শুধু বলল, আল্লাহ তোমাকে তেমন করে দিন, যেমন তুমি আগে ছিলে। এ কথা বলে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। সাথে-সাথে টাকু আবার টাকু হয়ে গেল। তার সকল গাভী মরে গেল। তার সব সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল।

এবার আগত লোকটি অন্ধের কাছে গেল। তাকে বলল, আমি একজন অভাবী লোক। বড় কষ্টে আছি। আমি না খেয়ে আছি। আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দাও। আপনার তো আগে কিছুই ছিল না। আল্লাহ আপনাকে সব কিছু দিয়েছেন। আপনি আমাকে দিছু দান করুন। একথা শোনার সাথে-সাথে তার মাঝে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। তার চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। লোকটি কাঁদতে লাগল এবং বলতে লাগল, তুমি সত্য বলেছ। আমি গরীব ছিলাম। আল্লাহ আমাকে ধনী বানিয়েছেন। আমি দরিদ্র ছিলাম। আল্লাহ আমাকে স্বচ্ছল বানিয়েছেন। নাও, তোমার যা লাগে আমার এখান থেকে নাও। তুমি যা চাও যতটুকু চাও আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও। আমার তো কিছু নেই। সবই আমার আল্লাহর! আমার মাওলার। তুমি এখান থেকে ইচ্ছেমতো ছাগল নিয়ে যাও। ইচ্ছেতো সম্পদ নিয়ে যাও। আমি আমার অতীতকে ভুলতে পারি না। আমি আমার কষ্টের দিনগুলোর কথা ভুলতে পারি না। আমার মাওলা তো আমার উপর দয়া করেছেন। আমি এখন দয়া করব না কেন? এবার এই অভ্যাগত লোকটি বলল, হ্যাঁ ভাই, তুমি জিতেছ! আমি আসলে মানুষ নই। আমি ফেরেশতা। তোমাদের পরীক্ষা করতে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি তোমাদের পরীক্ষা নিলাম। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। বাকী দুজন অকৃতকার্য হয়েছ। তারা তাদের অতীতকে ভুলে গেছে। তুমি ভোলোনি। আল্লাহ তোমার ইজ্জত ও মাল-সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেবেন। আর তাদের মালকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

আল্লাহর তারিফ করুন

আমার বন্ধুগণ! আমাদের উচিত, আমরা আমাদের সময়কে স্মরণ রাখব। আমারেদ উচিত আমরা আমাদের অতীতকে মনে রাখব। আমরা দুনিয়ায় কিছুই নিয়ে আসতে পারিনি। আমাদের শরীরে তখন পোশাকও ছিল না। অন্য জিনিস থাকা দূরের কথা। আজ আমরা যা কিছু পেয়েছি আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর দেওয়া জিনিসই ভোগ করছি। তাই তাঁরই তারিফ করা উচিত। তাঁর তারিফ করতে থাকা উচিত। অবিরত তাঁর প্রশংসা করে যাওয়া উচিত। সবসময় মুখে তার প্রশংসা থাকবে। সর্বদা ওই পরওয়ারদেগারের শান বর্ণনা করা উচিত। এমন প্রশংসা করা উচিত, যেন লোকেরা আমাদের পাগল বলতে শুরু করে। আমরা যদি পাগলের মতো আমাদের রবের শোকর করতে পারি, তবুও তো তার রহমতের শুকরিয়া আমরা আদায় করতে পারব না।

আমার বন্ধুগণ! সত্য কথাই বলছি। আজ তো রাসূলের মিম্বরে বসে আছি। যদি আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাকে চোখ না দিতেন, তাহলে আমি অন্ধ হতাম। তিনি যদি আমাকে বাকশক্তি না দিতেন, তাহলে আমি বোবা হতাম। তিনি যদি আমাকে শ্রবণশক্তি না দিতেন, তাহলে আমি বধির হতাম। আমাকে যদি তিনি আকল ও জ্ঞান না দিতেন, তবে আমি উন্মাদ হতাম। আমাকে যদি তিনি সুস্থতা না দিতেন, তাহলে আমি আজ রুগী হতাম। তিনি যদি আমাকে সন্তান না দিতেন, তাহলে আমি আজ সন্তানহীন হতাম। আমি পিতা হতে পারতাম না। তিনি যদি আমাকে সম্পদ না দিতেন, তাহলে আমি ক্ষুধার্ত হতাম। এত এত নেয়ামত আমি পেয়েছি সবই আমার রব্বে কারীমের, আমার আল্লাহর দয়ার দানে পেয়েছি।

আল্লাহর কদর করুন

আজ কেন আঁচল পেতে দেব না মালিকের সামনে? কেন আজ হাত তুলে ধরব না রবের সমীপে? মালিকের শুককিয়া আদায় করা চাই। হে রব্বে কারীম! তুমি অসীম নেয়ামত আমাকে দিয়েছ। আমি যদি তোমার পথে কুরবানও হই, তবুও তোমার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় হবে না। আল্লাহ! আজ পর্যন্ত যত ভুল করেছি, নাশোকরি কথাবার্তা বলেছি, তা তুমি মাফ করো। কুরআনে আমাদের ব্যাপারেই তো বলা হয়েছে–

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ

'আমার বান্দাদের মধ্যে খুব কম লোকই শুকরিয়া আদায় করে।'[১]

আরো বলা হয়েছে–

وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

'তারা আল্লাহর সঠিক কদর করেনি।'[২]

বাস্তবেই আমরা কদর করিনি। যেমন- শুকরিয়া আদায় করার দরকার ছিল তেমন করিনি। হে পরওয়ারদেগার! আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দাও। আমাদেরকে তোমার যথাযথ শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দাও।

ছোট-বড় বিপদাপদগুলো আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই মালিকের হাজার-কোটি নেয়ামত তো পেয়েছি। এর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আর ছোট-খাট যে বিপদ-মসিবতই আসে, তাতে সবর করা দরকার। আল্লাহ তা'আলা সবরকারীদেরকে জান্নাত দিবেন। শুকরিয়া আদায়কারীদেরও জান্নাত দিবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

---

১. সূরা সাবা, আয়াত- ১৩

২. সূরা আনআম, আয়াত- ৯১

'সুখ-দুঃখ আর হাসি-কান্না নিয়েই আমাদের জীবন। জীবনের বাগানে কখনও মনমাতানো বসন্ত আসে। কখনও আসে শীত-হেমন্ত। কখনও সুখ আসে। কখনও আসে দুঃখ। এটিই জীবন।

এখানে ব্যথা-বেদনা ও হাসি আনন্দ গলাগলি করে চলে। এখানে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিরা একসাথে অবগাহন করে। এখানে সব আছে। অনন্ত কাল ধরে জীবনের গতিধারা চলছে এমনই করে। তবে বিপদে যে সবর করেছে, সে সফল হয়েছে। আর যে ভেঙে পড়েছে, তার জীবন হয়েছে বিফল।

তাই সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে রাখা এবং সব বিষয়ে আল্লাহর ফয়সালাকে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

সবরের বরকত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

সময়ের বিবর্তন : অবস্থার পরিবর্তন

নদীর স্রোতের মতোই সময় এগিয়ে চলছে। এগিয়ে চলছে দিন, মাস, বছর হয়ে যুগ যুগান্তরের পথ বেয়ে। সময়ের সাথে-সাথে চলছে মানবজাতির জীবনধারা! মানুষের জীবন একটি স্রোতধারার মতো। এরও পরিবর্তন হয়। নানা রকম হাওড়-বাওড় আর বাঁক পেরিয়েই অবিরত চলছে এ জীবন! নানা রূপ-রঙে, নানা বর্ণে সুশোভিত কিংবা বিমর্ষ হয় আমাদের জীবনের পর্যায়গুলো। কখনও বা উচ্ছ্বাস আসে, জোয়ার আসে এ জীবনে। কখনওবা ভাঙন আসে, ভাটা আসে। কখনও আসে রিক্ততা। আবার কখনও আমাদের এ জীবন ভরে ওঠে প্রাণপ্রাচুর্যে। কখনও হাসি-আনন্দ-উচ্ছলতা আসে। আবার এ জীবনেই কখনও আসে শোক-তাপ আর ব্যথা-বেদনা। কখনও উচ্ছ্বসিত যৌবন থাকে আর কখনও এ যৌবনের সমাপন ঘটে। আসে নুয়ে পড়া বার্ধক্য। কখনও সুস্থতা থাকে। আবার কখনও আসে রোগ-বালাই-অসুস্থতা! আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুখ, প্রশান্তি-অস্থিরতা আর রিক্ততা-প্রাচুর্য। এসবের মাঝ দিয়েই তো আমাদের জীবননদী বয়ে চলছে। মানুষ বুঝে, বুঝতে পারে, তার সময়, তার হায়াত, তার জীবন চলে যাচ্ছে। অথচ; মৃত্যুর সময় আরো খোলামেলাভাবে বুঝতে পারে- এ সময়, এ হায়াত, এ জীবন এমনকি এই দুনিয়া তো শেষ হয়ে গেল। সাথে-সাথে শেষ হয়ে গেলাম আমিই। এই কথাটি মানুষ সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে মৃত্যুর সময়। যখন আর কিছুই বলবার, নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার সামর্থ্য থাকে না।

ایک ہی کام سب کو کرنا ہے

یعنی جینا ہے اور مرنا ہے

رہ گئی بات رنج وراحت کی

یہ فقط وقت کا گزرنا ہے

একটি কাজই তো করবে সবাই। হয়ত বাঁচবে, না হয় করবে মৃত্যুবরণ। থেকে যাবে জীবনের এই সুখ-দুঃখের সকল ইতিহাস। এ জীবন তো শুধুই সময় অতিবাহিত হওয়া। হায়াত নিঃশেষ হওয়া।

তো সবাইকে একটি কাজ তো করতেই হবে! হয়ত জীবন যাপন করবে, না হয় করবে মৃত্যুবরণ! জীবন আর মরণ মানে অন্য কিছু তো নয়। এ তো বরং আমল করা আর জিন্দেগীর হিসাব দেওয়া। আর এই যে হাসি-আনন্দ, খুশি-বেদনা এটি আমাদের জীবন নামক তাসবীহগুচ্ছের এক একটি দানা। তাই জীবনটাকে সেইভাবে ছকে বেঁধে পরিচালনা করা চাই।

সুখ দুঃখের উপকরণ

যখন মানুষের উপর আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের জামাল ও সৌন্দর্য এবং তার নূরের ঝলক পতিত হয়, তখন মানুষ আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে। তখন এ মানুষ মাটিতে হাত স্পর্শ করলে সে মাটিও সোনায় পরিণত হয়। বড়-বড় অকল্পনীয় কাজও তখন মালিক সহজ করে দেন। উল্টো কাজকে সোজা করে দেন। দুনিয়ায় চারদিকে মানুষ তখন এই বান্দাটিকে বাহবা দেয়। শাবাশ দেয়। সকল কাজে এই বান্দাটি বিজয়ী হয়। আবার এই মানুষের উপর যখন নেমে আসে ক্রোধ ও রাগ, আল্লাহর জালাল ও ক্ষোভ যখন নেমে আসে, তখন এই মানুষই পতিত হয় সর্বপ্রকার মুসিবতে। হাজার রকম বিপদ তখন ঘিরে নেয় এই মানুষটিকে। চারদিকে সে অন্ধকার দেখে। ডান কদম উঠায় তো পেরেশানি দেখে, বাম কদম উঠায় তো পেরেশানি দেখে। সকল কাজে সে বিফল হয়। সোনা হাতে নিলে মনে হয় সে সোনাও মাটি হয়ে যায়। দুর্ভাগ্য তার ললাটের লিখন হয়ে যায়। কোনো কাজে সে বিজয়ী হতে পারে না। সর্বদিক থেকে অনিষ্ঠতা, খারাবী, পেরেশানি, মসিবত, অস্থিরতা ও অসুস্থতায় ঐ মানুষটি পতিত হয়। এসব হয় আল্লাহর জালাল ও ক্রোধ যখন বান্দার উপর নেমে এসে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

'আল্লাহই তো নিয়ন্ত্রণকারী। আল্লাহই সংকট সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহই স্বচ্ছলতা দান করেন। আর তাঁরই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।'[১]

আল্লাহর একটি নাম হচ্ছে قابض আরেকটি নাম হচ্ছে باسط। باسط মানে আয়ত্তে নিয়ে আসা। নিজের কব্জায় রাখা। এ হিসেবে قابض অর্থ হচ্ছে আয়ত্তে আনয়নকারী। باسط এর মানে খুলে দেওয়া। যিনি উন্মুক্ত করে দেন, খুলে দেন, তাঁকে বলা হয় باسط আল্লাহর قابض সিফাত যখন বান্দার উপর পতিত হবে, তখন তার সমস্ত অবস্থা সঙ্কুচিত ও সংকীর্ণ হয়ে যাবে। আর যার উপর আল্লাহর باسط সিফাত পতিত হবে, তখন ওই বান্দার জীবন হাসি-আনন্দ ও সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে যাবে।

তাই তো বান্দা কখনও হয় সুখী আবার কখনও হয় দুঃখী। এই সুখ-দুঃখ নিয়েই তো আমাদের জীবন।

کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں صحرا پر
کبھی ذرے میں گم ہو کر اسے صحرا سمجھتے ہیں

কখনও আবেগ-অনুভূতি এতটা প্রবল হয়ে যায় যে, মরুবিয়াবান আর প্রশস্ত হাওড়কেও ছেয়ে ফেলে আবার কখনও সবুজ-শ্যামল জীবন্ত হাওড়কে মনে হয় মৃত মরুভূমি।

শয়তানের সূক্ষ্ম ফাঁদ

এমন আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ আর প্রান্তিক দুই অবস্থার সুযোগ নিয়ে শয়তান মানুষের পদস্খলন ঘটাতে চায়। সুখী-সমৃদ্ধ ও প্রাচুর্যময় হালাতের মাঝে বান্দাকে শয়তান ডুবিয়ে দেয় গাফলতের ঘোর অমানিশায়। আবার রিক্ত, নিঃস্ব ও দুঃখের সময় শয়তান মানুষকে ডুবিয়ে দেয় হতাশা-নিরাশা ও অসহায়ত্বের অতলে। ফলে গাফলতে পতিত ব্যক্তি হয়ে যায় পথহারা আবার হতাশায় বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিও হয়ে যায় পদস্খলিত। আমাদের এই যে মজলিসগুলো এগুলোর মূল লক্ষ-উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের ভিতরে এই

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত : ২৪৫

অনুভূতি ও উপলব্ধিকে জাগিয়ে তোলা। এখানে নিজের প্রতিভা বয়ান করার যোগ্যতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নয়। বরং সঠিক দিকনির্দেশনা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী নিজেকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালিত করা। নিজের জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করা। পরিবর্তন সাধন করা।

জান্নাতের প্রবেশপত্র

আমার স্মরণ আছে, আগের মাহফিলে আমি আপনাদের খেদমতে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতরাজির শুকরিয়া আদায়ের কথা বয়ান করেছিলাম। আজ মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছি। দেখুন, শুকরিয়া আদায়কারীও জান্নাতে যাবে আবার সবরকারীও জান্নাতে যাবে। তো শুকরিয়াও জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম আবার সবরও জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম। শুকরিয়াও জান্নাতে যাওয়ার প্রবেশপত্র আবার সবরও জান্নাতে যাওয়ার প্রবেশপত্র। শুকরিয়াও জান্নাতে যাওয়ার টিকিট আবার সবরও জান্নাতে যাওয়ার টিকিট। আর দেখুন শুকরিয়া আদায়ের বিষয়টি থাকবে মানুষ যখন সুখী-সমৃদ্ধ থাকবে। আর সবরের বিষয়টি বাস্তবায়িত হবে মানুষ যখন মুসিবতের মধ্যে থাকবে। অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় শুকরিয়া আদায় করবে আর পেরেশান অবস্থায় সবর ও ধৈর্য ধারণ করবে।

ঘরে প্রদীপ নিভে যাওয়াও এক প্রকার মুসিবত

এই দুনিয়ায় মুমিন বান্দার যে পেরেশানিই আসুক না কেন, ছোট বা বড় যে বিপদই আসুক না কেন, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাতের দরবারে এর কারণে বড় ধরনের বিনিময়ের ভাগিদার হওয়া যায়। হযরত সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) একবার দেখলেন, রাতে প্রদীপ জ্বলছে। হঠাৎ বাতাস এল। বাতাসের ঝাপটায় প্রদীপটি নিভে গেল। নবীজি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সাথে-সাথে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পড়লেন। আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর প্রিয় রাসূল! এই আয়াত ও দু'আ তো বড় ধরনের বিপদ ও মুসিবতের সময় মানুষ পাঠ করে। প্রদীপ নিভে যাওয়া এমন কী মসিবত যে, এতে ইন্না লিল্লাহ পড়তে হবে?

নবীজি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, মুমিনের জন্য এই প্রদীপ নিভে যাওয়াও এক প্রকার মসিবত। আর এই প্রদীপ নিভে যাওয়ার কারণে যে এই দু'আ ও আয়াত তিলাওয়াত করবে, আল্লাহর দরবারে সেও

বড় ধরনের বিনিময়প্রাপ্ত হবে। তো ঘরে প্রদীপ যদি কখনও নিভে যায়, বান্দা এর বিনিময়ে সাওয়াব ও আজর প্রাপ্ত হয়। তো যে ব্যক্তির ছেলেমেয়ের জীবনপ্রদীপ নিভে যাবে, সে যদি এর উপর ধৈর্য ধারণ করতে পারে, এর উপর সবর ইখতিয়ার করতে পারে, তাহলে সে বড় ধরনের সাওয়াবের অধিকারী হবে। অনেক বড় ধরনের সাওয়াবের অধিকারী হবে।

কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে সেও সাওয়াব পায়

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কোনো বান্দা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে আল্লাহ রব্বুল ইযযাত ফেরেশতাদের নির্দেশ প্রদান করেন, এই বান্দা অসুস্থতার দরুণ যে আহ-আহ আওয়াজ করে,তার প্রতিটি আহ শব্দের বিনিময়ে সুবহানাল্লাহ বলার সাওয়াব লিখে দাও। যদি প্রবল ব্যথা-বেদনায় কাতর হয়ে সে খিঁচুনী দিতে লাগে, তাহলে তার বিনিময়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলার সাওয়াব লিখে দাও। ওই রোগী যখন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, তখন তার প্রতিটি নিঃশ্বাসের বিনিময়ে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করার মতো সাওয়াব লিখে দেওয়া হয়। ওই অসুস্থ ব্যক্তি তার বিছানায় শুয়ে থাকলেও মুসল্লায় দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার সাওয়াব পাবে।

ওই অসুস্থ ব্যক্তি যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করবে, তখন তার বিনিময়ে অসুস্থ তাকে আল্লাহর রাস্তায় দুশমন বাহিনীর উপর বারবার আক্রমণ করার সাওয়াব প্রদান করা হবে। হাদীছে পাকে বর্ণিত হয়েছে, যখন কোনো মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন তার উচিত এই দু'আটি পড়ে নেওয়া–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

যদি কেউ অসুস্থ হয়ে এই দু'আটি ৪০ বার পাঠ করে, তাহলে এই লোকটি সুস্থ হয়ে গেলে তার গুনাহগুলো থেকে তাকে পবিত্র করে দেওয়া হয়। আর এই অসুস্থতার মাঝেই যদি তার মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'অলা কিয়ামতের দিন ওই লোকটিকে শহীদদের কাতারে দাঁড় করাবেন।

অসুস্থ ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়

হাদীছ পাকে বর্ণিত হয়েছে, যখন তোমরা কোনো অসুস্থ ব্যক্তির নিকট তার পরিচর্যা বা খোঁজখবর নিতে যাবে, তখন তাকে দিয়ে তোমাদের জন্য দু'আ করিয়ে নিয়ো। কারণ, অসুস্থতার সময় আল্লাহ বান্দার দু'আকে

এমনভাবে কবুল করেন, যেমনভাবে তিনি তার (মনোনীত) ফেরেশতাদের দু'আ কবুল করে থাকেন।

সায়্যিদুনা হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ধৈর্যের বর্ণনা

হযরত আইয়ুব (আ.) ছিলেন একজন সম্মানিত নবী। আল্লাহ রব্বুল ইযযাত তাঁকে সম্পদ দান করেছিলেন, সন্তান দান করলেন। এমনকি সত্যিকার নেয়ামতও দান করলেন। শয়তান বলতে লাগল, এই আইয়ুব তো ধন সম্পদের জন্যই ইবাদাত করে। সম্পদগুলো হারিয়ে গেলে, ধ্বংস হয়ে গেলেই দেখা যাবে আইয়ুব কত ইবাদাতগুজার। আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়ুব (আ.)-এর পরীক্ষা নিতে চাইলেন। আল্লাহর নির্দেশে হযরত আইয়ুব (আ.)-এর সমস্ত সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেল। তাঁর সন্তানগুলো কোনো এক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। নিজের চোখের সামনে একে-একে ইন্তেকাল ঘটল নিজের প্রিয় সন্তানগুলোর। তারপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়ুব (আ.)কে অসুস্থতা দিলেন। ফোড়ার দানার মতো এক ধরনের রোগ তার দেহে দেখা দিল। জিহ্বা, চোখ ছাড়া পুরো শরীর এ রোগে ছেয়ে গেল। এগুলো এমন জখম ও ক্ষত হয়ে গেল যে, তাতে পোকা ধরে গেল। হযরত মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, হযরত আইয়ুব (আ.)-এর এই অসুস্থতার মাঝে আঠারো বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর প্রত্যেকটি দিন তাঁর এই সবরের বিনিময়ে আল্লাহর দরবারে দরজাত বুলন্দ হতে থাকে। তাঁর মর্যাদা আল্লাহর দরবারে উঁচু হতে থাকে। মুখে তিনি কোনোদিন অভিযোগ তোলেননি। শেকায়েত করেননি। এমনকি কোনো পোকা যদি শরীর থেকে পড়ে যেত, তিনি সেই পোকা আবার শরীরে উঠিয়ে দিতেন আর বলতেন, আমার শরীরকে যখন আল্লাহই তোমার খাদ্য বানিয়েছেন, তো তুমি নিচে পড়ে যাবে কেন? এসব হাদীস নয় ২/৪১-৪৩ পৃষ্ঠা

আঠারো বছর পর। শয়তান বড় বিস্মিত হলো। দেখল, আল্লাহর কত নৈকট্যপ্রাপ্ত এই বান্দা! এই বান্দা এত কঠিন পরীক্ষার সময়েও তার মুখ দিয়ে অধৈর্যের একটি শব্দ বের করল না। নাশোকরি ও অকৃতজ্ঞতামূলক একটি কথাও বলল না। শয়তানকে এমন বিস্মিত দেখে তার চেলা চামুন্ডরা বলল, বস! আপনি যেভাবে মানুষকে ধোঁকায় ফেলতে পারেন তার তো কোনো তুলনা নেই। আসুন আমরা আইয়ুবকে একটা দ্বিমুখী সঙ্কটে ফেলে দেই। তাকে আমরা পরীক্ষায় ফেলে দেই। নেতা বলল, কথাটি খারাপ নয়। চলো একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

শয়তান এক ডাক্তারের আকৃতি ধারণ করে হযরত আইয়ুব (আ.)-এর স্ত্রীর কাছে আগমন করল। বলল, দেখো আইয়ুবের স্ত্রী! আমি তোমাকে একটি কথা বলার জন্য এসেছি। তোমার স্বামী যাতে সুস্থ হয়ে যায় তার জন্য একটি পরামর্শ তোমাকে দিতে এসেছি। স্ত্রী বড় খুশী হলেন। বললেন, বলুন তো শুনি কী সেই পরামর্শ? শয়তানের মাথায় হচ্ছে শয়তানী বুদ্ধি আর এই মুমিন নারীর মাথায় হচ্ছে সরলতা। শয়তান এই সরলতা কাজে লাগাতে চাইল। বলল, আমি তোমাকে একটি চিকিৎসার পথ বলে দেব। তবে আমার এ চিকিৎসা নিতে হলে তোমরা খোদাকে যেভাবে সেজদা কর একবার আমাকেও সেভাবে সেজদা করতে হবে। তাহলে আমি তোমাকে সেই চিকিৎসাপদ্ধতি বলে দেব, যাতে তোমার স্বামী একেবারে সুস্থ হয়ে যাবে। স্ত্রী একথা শুনে তো একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। বলতে লাগল, আমি আমার স্বামীর নিকট যাব। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করব।

তাফসীরে আছে, স্ত্রী হযরত আইয়ুব (আ.)-এর কাছে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আইয়ুব (আ.) শুনে বড় রাগ হলেন। বললেন, তুমি কেন ঐ মরদূদ শয়তানকে বলে দাওনি, তুই তো শয়তান। তুই বিতাড়িত। একথা কেন বলেছ যে, আমি নবীকে জিজ্ঞেস করে তারপর বলব? আল্লাহ যদি আমাকে সুস্থতা দান করেন, তাহলে আমি তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করব এই অপরাধে যে, তুমি ঈমানী গায়রত কেন প্রকাশ করনি। এই শয়তানকে মুখের উপর কেন খণ্ডন করে দাওনি।

এমন কঠিন ভাষায় হযরত আইয়ুব (আ.) তার স্ত্রীকে শাসালেন। তা দেখে শয়তান চুপসে গেল। শয়তান তখনো চিন্তা করল, এভাবে দু-চার বছর কাটলে আইয়ুব তার অসুস্থতার কারণে অস্থির হয়ে যাবে। সুস্থ হওয়ার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠবে। তখন তাকে আবারো এভাবে প্রতারিত করা যাবে।

একদিন শয়তান শুনতে পেল, হযরত আইয়ুব (আ.) দু'আ করনে, হে আল্লাহ! আমার জীবনের যে সময়টা অতিবাহিত হয়ে গেছে তা তো চলেই গেছে। যেহেতু এই অসুস্থতা ও কঠিনতা তোমারই পক্ষ থেকে তাই যদি শত বছরও যদি আমার হায়াত থাকে, শতবর্ষও যদি আমি এভাবে আক্রান্ত থাকি, তবুও আমি আপনার উপর অভিযোগ তুলব না। আপনার এই সিদ্ধান্তকে আমি আমার জন্য কল্যাণকর বলে মেনে নেব। শয়তান যখন একথা শুনল, তখন সে বলতে লাগল, আহ! বাস্তবিক আইয়ুব আল্লাহ তা'আলার এতই নৈকট্যপ্রাপ্ত যে, তার উপর আমার কোনো কৌশলই কাজ করবে না। আল্লাহ রব্বুল ইযযাত আবার ঐ বান্দাকে সুস্থ করে দিলেন। এখন তো তিনি সুস্থ

হয়ে গেছেন। অসুস্থ থাকতে তো বলেছিলেন, স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করব। এখন তো একথাও বাস্তবায়ন করতে হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা ওই স্ত্রীর উপর রহম করলেন। আইয়ুব (আ.)কে আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন, তুমি চিকন-চিকন, ছোট-ছোট মেসওয়াকের সমান কতগুলো কাঠি বানাও! একশত কাঠি এভাবে একসাথে বেঁধে স্ত্রীর দেহে একটি আঘাত করো। তাহলেই একশত আঘাত করেছ বলে ধরে নেওয়া হবে।

এখান থেকে একটি কথা এই বোঝা যায় যে, যখন রব্বে কারীম আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দা থেকে তার ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিতে চান, তখন তিনি তার জন্য সহজ ও সুন্দর পথ নিজেই বলে দেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ রব্বুল ইযযাত যখন বান্দাকে ক্ষমা করে দিতে চান, তখন তিনি সামান্য ওসীলার মাধ্যমেই মাফ করে দেন। এই যে দেখুন- আমাদের নেকী ও বদী লিপিবদ্ধ করার জন্য দুজন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যে ফেরেশতা নেক লেখেন, তাকে প্রত্যেকদিন পরিবর্তন করা হয়। অর্থাৎ নেক লেখার কাজে প্রত্যেক দিন নতুন-নতুন একজন করে ফেরেশতা নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রত্যেকদিন নেকী লেখার ফেরেশতাকে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। আর বদ লেখার ফেরেশতা একজনই থাকেন; তাঁকে বদলি করা হয় না। প্রত্যেকদিন নতুন একজন ফেরেশতা নিযুক্ত হয় বান্দার নেক লেখার কাজে। আর বদ রেখার কাজে নিযুক্ত ফেরেশতার পরিবর্তন হয় না। তিনি একজনই। মৃত্যু পর্যন্ত একজনই বান্দার বদ লিখে যায়। তো কিয়ামতের দিন বান্দার আমলনামায় গুনাহ লিখা থাকবে ঠিক; তবে সেই গুনাহের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে একজন মাত্র ফেরেশতা, যিনি আজীবন বান্দার বদ লিখে গেছেন। তার বিপরীতে নেক কাজের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে ওই বান্দা যতদিন পৃথিবীতে জীবিত ছিল, ততজন ফেরেশতা। কারণ, প্রত্যেকদিনই তো নতুন-নতুন ফেরেশতা এসে এই বান্দার নেক লিখে ছিল। তো যখন বান্দার নেক আমলের ব্যাপারে ওই বান্দা যতটা দিন পৃথিবীতে বেঁচে ছিল, ততজন ফেরেশতা সাক্ষ্য প্রদান করবে। তখন আমাদের রব্বে কারীম আল্লাহ সুবহানুহু তা'আলা বলবেন, আমার বান্দার নেক আমলের ব্যাপারে যেহেতু এতজন সাক্ষ্য প্রদান করেছে, সেহেতু আমি এই ফেরেশতাগুলোর সাক্ষ্য কবুল না করে একজনের সাক্ষ্য কীভাবে কবুল করব। যাও বান্দা, আমি রহমান রব্বে কারীম তোমাকে মাফ করে দিলাম।

তো প্রিয় ভাইয়েরা! বেশী সংখ্যক নেকী লেখার ফেরেশতা নিযুক্ত করলেনও আল্লাহ তা'আলা আবার আমাদের এই নেকীর ফেরেশতাদের

সাক্ষ্যের কারণে মাফও করে দিবেন আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ আমাদের মাফ করার জন্য শুধু উসিলা খোঁজেন। আল্লাহ কত মেহেরবান। কত দয়াবান।

সাইয়্যেদুনা আইয়ুব (আ.)-এর তিনটি পুরস্কার

আল্লাহ রব্বুল ইযযাত হযরত সাইয়্যেদুনা আইয়ুব (আ.) সম্পর্কে বলেছেন- إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا

'আমি তাকে ধৈর্য ধারণকারী পেয়েছি।'[১]

হে আমার প্রিয় নবী আইয়ুব! আমি আপনাকে সবরকারীরূপে দেখতে পেয়েছি। আপনাকে আমি সবর ও ধৈর্যধারণকারী পেয়েছি। তারপর বলা হয়েছে– نِعْمَ الْعَبْدُ

কতই না উত্তম বান্দা (আইয়ুব আ.)।[২]

إِنَّهُ أَوَّابٌ

সে তো আমারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।[৩]

তো আল্লাহ এখানে তিনটি কথা বললেন। বরং বলতে হয় তিনটি পুরস্কার দিলেন। আর এর দ্বারা তো ১৮ বছরের এই কষ্ট-শ্রম এই রুগ্ন থাকার পরীক্ষার পুরস্কার ও প্রতিদানই যেন দিয়ে দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত এই প্রশংসাবাণী, এই সিফাত ও গুণাবলিসহ হযরত আইয়ুব (আ.)-এর নাম উচ্চারিত হবে, আলোচিত হবে।

তো দীর্ঘদিন অসুস্থ রেখে আল্লাহ তা'আলাই হযরত আইয়ুব (আ.)কে বিশাল পুরস্কার দান করেছেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত আইয়ূব (আ.)-এর অসুস্থতার খোঁজখবর জিজ্ঞাসা

কোনো এক বুযুর্গ বলেছেন, হযরত আইয়ুব (আ.)কে তাঁর অসুস্থতার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হযরত! এই সুস্থতার যমানা আপনার নিকট ভালো, নাকি ওই অসুস্থতার যমানা ভালো ছিল? উত্তরে তিনি বললেন,

---

১. সূরা সোয়াদ, আয়াত- ৪৪
২. সূরা সোয়াদ, আয়াত- ৪৪
৩. সূরা সোয়াদ, আয়াত- ৪৪

দেখো, সুস্থতাও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত অসুস্থতাও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। তবে শুনে রাখো, একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, যখন আমি অসুস্থ ছিলাম, তখনকার অবস্থা ছিল, সকাল হলেই আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, আইয়ুব! তোমার হালত কী? কেমন আছ তুমি? আমার রবের সেই প্রশ্নটি শুনে আমার এমন স্বাদ ও মজা অনুভব হতো যে, সারাটা দিন আমার কাছে আর কোনো কষ্টকে কষ্টই মনে হতো না। আবার যখন সন্ধ্যা আগমন করত, তখন আবারও আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, আইয়ুব তোমার কী হাল? কেমন আছ তুমি? এখন তোমার কাছে কেমন লাগছে? আমার আল্লাহর এই মমতাময়ী প্রশ্ন আমার কাছে এত মধুর লাগত যে, আমি কোনো কষ্টই অনুভব করতাম না। সারাটা রাত আমার কোনো কষ্ট অনুভব হতো না।

তো দেখুন, আজ আমার অসুস্থতা তো চলে গেছে ঠিক; কিন্তু আজ তো আমাকে আমার আল্লাহ আর ঐ রকম মমতাভরে প্রশ্ন করেন না। বলো আমার আল্লাহর এমন ডাকের সামনে আমার জীবনের কী মূল্য! আজো আমার মনে পড়ে আমার রব্বে কারীমের সেই মমতামাখা ডাক। সেই সুমধুর জিজ্ঞাসা! আজো আমি সেই মধুর স্বাদ মনে-মনে উপভোগ করি।

সবর কাকে বলে?

সবর বলা হয় কোনো প্রকার কষ্টকর বিষয়ের সম্মুখীন হয়ে গেলে মুখ দিয়েও কোনোরূপ শরীয়তবিরোধী শব্দ উচ্চারণ না করা, শরীরের কোনো অঙ্গের মাধ্যমে শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ না করা। বরং নিজেকে দমিয়ে রাখা, স্থির রাখা। মুখেও আল্লাহ তা'আলার নাশোকরি হয় এমন কথা বলবে না। নিজের কাজ-কর্মের দ্বারাও আল্লাহর অবাধ্যতা হয় এমন কিছু করবে না। সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালাকে মেনে নিতে পারলেই তাকে বলা হবে সবর। তাকে বলা হবে ধৈর্য। সাধারণভাবে দেখা যায়, আমাদের মাঝে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় আমরা যদি কোনো কষ্টকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, তখন আমরা অস্থির হয়ে যাই। নিজেদের ভাষায়, নিজেদের কাজকর্মে আল্লাহর অবাধ্যতা করে বসি। অথচ এমন করা আমাদের কোনোভাবেই উচিত নয়।

একটি উত্তম হেকমত

দেখুন, আমাদের যদি কেউ কটু কথা বলে আমরাও কিন্তু জবাবে আবার কটু কথা বলে দেই। আমরা চিন্তা করি, ইটের জবাব ইট দ্বারা দিব। আমরা

যখন পরস্পর ঝগড়ায় জড়িয়ে যাই, তখন আমরা চিন্তা করি, আমাকে একটা বললে আমি দশটা বলব। আমাকে যদি একটা খারাপ কথা বলে তাহলে আমি দশটি কথা বলে দিব। এটা উচিত নয়। উচিত হচ্ছে ওই মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করা। তা নাহলে আল্লাহ তা'আলা নারাজ হয়ে যাবেন। আল্লাহ বলবেন, তোমরা তো ধৈর্য ধরার প্রতিদানের কথা জান। যদি ধৈর্য ধারণ করতে, তাহলে আমিই তোমাদের বিপরীত দলের থেকে বদলা গ্রহণকারী হয়ে যেতাম। আমি তোমার যিম্মাদার হয়ে যেতাম। এখন তুমি ধৈর্য না ধরে নিজেই প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছ। নিজেই নিজের বিচার হাতে তুলে নিয়েছ। তো তোমার কাজের যিম্মাদার তুমিই! তোমার দায়িত্ব আমি তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম। তো এতে বান্দার বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যায়। তাই সবচেয়ে উত্তম হেকমত হচ্ছে, যখনই কোনো কষ্টকর বিষয়ের সম্মুখীন হব তখন তার ভার, তার দায়িত্ব আল্লাহর হাতে সমর্পণ করে আল্লাহকেই যিম্মাদার বানানো।

প্রেমিক ও প্রেমিকার প্রতিশোধ

একটি ঘটনা। একজন আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন। তখন শীতকাল ছিল। সাথে বৃষ্টিও হচ্ছিল। এদিকে এক দম্পতি আসছিল সম্মুখ দিক থেকে। বুজুর্গ রাস্তায় হাঁটছিলেন। বুজুর্গের সেন্ডেলের সাথে উঠে আসা কিছু কাদা এসে মহিলার কাপড়ে লেগে গেল। মহিলার স্বামী তা দেখে বড় রাগান্বিত হলো। বলতে লাগল, তুমি অন্ধ নাকি! তুমি কি দেখ না। তুমি আমার স্ত্রীর কাপড় ময়লা করে দিয়েছ। রাগের চোটে লোকটা আল্লাহওয়ালা বুজুর্গকে একটা চড় দিয়ে দিল। স্ত্রী তো বড়ই খুশী হয়ে গেল। ভাবল এবং বলল প্রিয় স্বামী! তুমি আমার প্রতিশোধ নিয়ে দিয়েছ। অত্যন্ত খুশী মনে দুজনে ঘরে গেল। বুজুর্গও চলে গেলেন সামনের দিকে।

সামান্য সামনে গিয়ে বুজুর্গ দেখলেন একটি মিষ্টির দোকান। দোকানদার আগে থেকেই নিয়ত করে রেখেছে, আজ তো ঠাণ্ডার দিন। আজ যে ব্যক্তিকেই আমি আমার দোকানের সামনে দিয়ে সর্বপ্রথম যেতে দেখব, তাকে আমি এক পেয়ালা গরম দুধ পান করাব। লোকটি অপেক্ষা করছিল। এই বুজুর্গ ওই দোকানেব পাশ দিয়ে যেতে লাগলেন। দোকানদার তাঁকে ডাকলেন। আদর-যত্ন করে বসালেন। গরম দুধের পেয়ালাটা তার সামনে পেশ করলেন। শীতের মৌসুম। বুজুর্গ গরম দুধ পান করলেন এবং আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। দোকান থেকে বের হয়ে, আসমানের দিকে

তাকালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তোমার শান কত আজীব! কত আশ্চর্যজনক! একস্থানে চড় দিয়েছ! আরেক স্থানে গরম দুগ্ধ পান করিয়েছ!

এরই মধ্যে উক্ত দম্পতি নিজেদের ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। হঠাৎ স্বামী পা পিছলে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল এবং মাথায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত পেল এবং সাথে-সাথে মারা গেল। আশপাশের লোকেরা ছুটে এল। মহিলা কাঁদতে লাগল এবং বলতে লাগল, ওই লোকের বদদু'আয় মনে হয় আমার স্বামী মারা গেছে। আমার স্বামী ওই লোককে চড় দিয়েছিল। ঘটনাক্রমে ওই বুজুর্গও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। এবার লোকেরা তাকে বলল, তুমি একে বদ দু'আ না দিলেও তো পারতে। কেন তাকে বদদু'আ দিয়েছ? না বুঝে না হয় সে তোমাকে একটা আঘাত করেছে। এখন তো তোমার বদদু'আয় এ লোকটা মরেই গেল। বুজুর্গ ব্যক্তি বলতে লাগলেন, দেখুন, আমি লোকটিকে একটুও বদদু'আ করিনি। আমি কিছুই বলিনি। আমি আমার পথে চলে গিয়েছিলাম। বাস্তব কথা হলো, এই লোকটি তার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসে। তাই তার স্ত্রীর সামান্য কষ্ট হয়েছে দেখে সে আমার উপর রেগে গেছে এবং আমাকে চড় মেরে প্রতিশোধ নিয়েছে। তো আমিও তো আমার আল্লাহকে ভালোবাসি। তাই আমার কষ্ট হয়েছে দেখে তিনি আমার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন। আমি তো কিছু করিনি।

তো যখন বান্দা নিজের জিম্মাদার আল্লাহকে বানাবে, তার সমস্ত দায় আল্লাহই নিয়ে নিবেন।

আজ আমরা আল্লাহর সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছি

বর্ণিত হয়েছে-

مَنْ عَادَىٰ لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

'যে আমার ওলির সাথে দুশমনী করবে, তার সাথে আমার যুদ্ধের ঘোষণা।'

মূলত এমন লোকেরা ওলির সাথে নয় আল্লাহর সাথেই দুশমনী করে। আর এর মানেই হলো আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তার ঘাড় মটকে দিবেন। তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করবেন এই দুনিয়াতেও, আখেরাতেও।

নবীজির সাথে যারা বিদ্বেষ পোষণ করে

এটি একটি অত্যন্ত সহজ মূলনীতি যে, দুনিয়ায় যত বড়-বড় ব্যক্তিত্ব ও মহান মনীষী অতীত হয়েছেন, তাঁদের বিরোধী-বিদ্বেষীরাও বড়-বড় ছিল এবং অনেক বেশী ছিল। তাই তো দেখা যায়, আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমনের সংখ্যা অনেক বেশী। সেই জন্যে দুশমনের দুশমনী থেকে বাঁচার তরে এবং হিংসুকের হিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আল্লাহ রব্বুল ইযযাত একটি আয়াতে কারীমা নাযিল করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে[১]

مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

হযরত সায়্যিদা ফাতেমাতুয যুহরা (রাযি.) বলেছেন যে, আমার পিতাজী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এমনসব মসিবত এসেছে- যদি সেসব মসিবত দিবসের উপর আসত, তবে তা রজনীতে পরিণত হতো।

ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)-এর ধৈর্য

ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)-এরও দুশমন ছিল। তাঁর এক দুশমনের কাছে খবর গেল, ইমাম সাহেবের পিতা ইন্তেকাল করেছেন। মাতা তো বৃদ্ধা ছিলেন। ৯০ বছরের মতো বয়স ছিল তার। তো ওই দুশমন এসে বলল, শরীয়তে তো বলা হয়েছে, তোমরা বিধবাদের বিয়ে দিয়ে দাও। তো তোমার মাও তো বিধবা! আমি শুনেছি, তোমার মা খুব সুন্দরী। তো আমি তোমার মাকে বিয়ে করতে চাই। হযরত ইমাম আযম সাহেব থমকে গেলেন। তাঁর রেগে যাওয়ার কথা। কিন্তু তিনি রাগ হলেন না! তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন! বললেন, আরে ভাই! আমার মা তো একজন প্রাপ্তবয়স্কা নারী। আর প্রাপ্তবয়স্কাদের শরীয়ত এই ইখতিয়ার দিয়েছে যে, তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই গ্রহণ করবে। চলো, তোমাকে তার সাথে কথা বলিয়ে দেই।

লোকটি বলল, ঠিক আছে চলো। হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) নিজের বাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য মাত্র দুকদম অগ্রসর হলেন। অমনি লোকটির পেটব্যথা শুরু হয়ে গেছে। মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে! লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। একটু পর লোকটি সেখানেই মারা গেল। ইমাম আযম (রহ.) বললেন, আবু হানীফার ধৈর্য এক বান্দার জান কবজ করে দিয়েছে।

---

১. সূরা ফালাক, আয়াত- ৫

সবরের স্তর

প্রিয় হাজিরীন! সবর তিন স্তরে বিন্যস্ত।

১. তাওবাকারীদের সবর

প্রথম স্তরের সবর হচ্ছে তাওবাকারীদের সবর! এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষটি তার নিজের মধ্যকার চিন্তা-পেরেশানি, হাহাকার-হাহুতাশ অন্যের কাছে বলবে না এমন নয়। ব্যাপারটি এমনও নয় যে, স্বামী তার স্ত্রীর কাছেও নিজের অস্থিরতা প্রকাশ করবে না। ছেলে তার বাবার কাছে তার নিজের অস্থিরতা প্রকাশ করবে না। অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসককে তার নিজের অস্থিরতা বলবে না। ব্যাপারটি কোনোদিনও এমন নয়। এগুলো বরং জরুরি বিষয়। একটি হচ্ছে নিজের অবস্থার আলোচনা। এর কাছে বলে বেড়ানো, ওর কাছে বলে বেড়ানো। এই বলার মাঝে, এই আলোচনার মাঝে কোনো সার্থকতা নেই। এটি নিষিদ্ধ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে, অসুস্থ হয়েছে তো ডাক্তারকে বিষয়টি খুলে বলা। অস্থিরতা হয়েছে তো বাবাকে তা জানানো কিংবা স্বামীকে অবগত করানো। এটি নিষিদ্ধ নয়। এভাবে নিজের দুরবস্থা প্রকাশ করা নিষেধ নয়। বরং তা আরো উত্তম। কারণ, অনেক সময় স্বামী, ডাক্তার বা বাবা সেই সমস্যাটির সমাধানের জন্য চেষ্টা করে থাকেন এবং সফলও হন। তো স্বামীর কাছে স্ত্রী বা স্ত্রীর কাছে স্বামী তার নিজের অস্থিরতা ও পেরেশানির কথা প্রকাশ করা দোষের কিছু নয়। ডাক্তারের কাছে রোগী তার অস্থিরতার কথা প্রকাশ করা দোষের কিছু নয়। পিতার কাছে পুত্র তার নিজের অবস্থা বলে দেওয়া দোষের কিছু নয়। তবে মানুষের দ্বারে-দ্বারে, এখানে-ওখানে, এর কাছে ওর কাছে বিপদের কথা বলে বেড়ানো বড়ই অন্যায়।

কিছু মানুষ আছে, তারা যেখানেই যাক, যেখানেই বসুক একথা ওকথা বলতেই থাকে। হায় হায় কী করব! বড় মুসিবতের মধ্যে আছি। বড়ই সমস্যায় আছি। আল্লাহ তো মনে হয় আমার কথা শোনেনই না। আল্লাহ যে আমাকে কোন পরীক্ষায় ফেললেন! এরকম হাজার প্রকার কথা তারা বলে বেড়ায়।

২. দুনিয়াবিমুখদের সবর

দ্বিতীয় স্তরের সবর হচ্ছে দুনিয়াবিমুখদের সবর। সেই স্তরটি হচ্ছে এই যে, মানুষের উপর কোনো মসিবত এলে সে তার উপর সন্তুষ্ট থাকে। যখন

বান্দা সর্বাবস্থায় রাজী ও সন্তুষ্ট থাকে; ভালো অবস্থায়ও খুশী থাকে, খারাপ অবস্থায়ও খুশী থাকে, সুখেও খুশী থাকে, দুঃখেও খুশী থাকে, সুস্থতায়ও খুশী থাকে, অসুস্থতায়ও খুশী থাকে, তখন এই স্তরের সবরকে বলা হবে দুনিয়াবিমুখ বান্দার সবর!

কবির ভাষায়-

لطف بجن دم بدم قہر بجن گاہ گاہ

ایں بھی بجن واہ واہ اوں بھی بجن واوہ واہ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার দয়া-অনুগ্রহ তো পাচ্ছি সর্বদাই প্রতি নিঃশ্বাসে, প্রতিটি কদমে। মাঝে-মাঝে কিছু সংকীর্ণতা আসে। দয়া-অনুগ্রহ হলেও আমি খুশী, সংকট-সংকীর্ণতায় পড়লেও আমি খুশী।

৩. সিদ্দীকীনের সবর

সবরের ৩য় স্তরটি হচ্ছে সিদ্দীকীনের স্তর। এ স্তরের বিবরণ এই যে, যখন বান্দার উপর কোনো বিপদ বা মসিবত আসে, তখন সে ওই মুসিবতের উপর সন্তুষ্ট থাকে। ভাবে, আমার আল্লাহ, আমার মালিক আমার উপর তো সন্তুষ্টই। কারণ, হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

সুখ ও আনন্দরা হাত বেঁধে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় আর বলে, হে আল্লাহ! আমরা কাদের কাছে যাব? আমাদের ব্যাপারে আপনার ফয়সালা কী?

তখন আল্লাহ তা'আলা বলে দেন, অমুক-অমুক জালেম ও অত্যাচারী ফাসেকদের কাছে যাও। তো আল্লাহ সুখ ও আনন্দদের জালেম-ফাসেকদের কাছে পাঠিয়ে দেন।

তারপর দারিদ্র্য, অসহায়ত্ব ও দুঃখরা আসে। আল্লাহ বলে দেন, শোনো, তোমরা আমার প্রিয় বান্দাদের কাছে চলে যাও। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বত বেশী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যার প্রেমের সম্পর্ক বেশী গাঢ়, আল্লাহ তা'আলা দুঃখ, কষ্ট, পেরেশানি ও অসহায়ত্ব তাদের উপর দিয়ে দেন। তো নেককার ভালো মানুষের উপর বিপদাপদ, পেরেশানি তো আসে। তবে তা সাময়িক। এই পেরেশানি চিরস্থায়ী নয়। শত বছর বা অর্ধশত বছরের এই জিন্দেগীতে পেরেশানি থাকে মাত্র কয়েকটা দিন। কিয়ামতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সামনে দু-চারটা দিনের দুঃখ-কষ্টের কতটুকু প্রভাব আছে? যখন অনাগত সেই চিরস্থায়ী জীবনে

যাওয়া হবে, তখন এসব দুঃখ-কষ্ট-পেরেশানির প্রতিদান দেখে তো মানুষ বিস্মিত হয়ে যাবে। তাই আল্লাহওয়ালাগণ সাধারণত প্রস্তুত থাকেন। তাঁরা চিন্তা করেন, আমি যদি আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হতে চাই, তাহলে এমন দুঃখ-কষ্ট আমাকে সহ্য করতে হবেই। আমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবই। আর পরীক্ষা ছাড়া তো মানুষ উত্তীর্ণ হতে পারে না।

সবর মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম

অনেক সময় শুধু ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে বান্দা ওই উচ্চতায় পৌঁছতে পারে না, যে উচ্চতায় আল্লাহ বান্দাকে পৌঁছাতে চান। তাই আল্লাহ বান্দাকে সামান্য কিছু বিপদের সম্মুখীন করেন। বান্দা যখন বিপদে পড়েও সবর করে, তখন আল্লাহ এই সবরের কারণে, এই ধৈর্য ধারণ করার কারণে বান্দাকে এমন বুলন্দ মাকাম, সুউচ্চ আসন দান করেন, যে আসনে তাকে আসীন করাতে চেয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। তাই তো বর্ণনায় পাওয়া যায়, যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যায়, তখন সে তার গুনাহ থেকেও এমন পবিত্র হয়ে যায়, যেমন নবজাতক শিশু পবিত্র থাকে। কেমন যেন আজই সে নিষ্পাপ শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। শীতের মৌসুমে গাছের পাতা যেভাবে ঝরে যায়, অসুস্থ ব্যক্তির থেকেও তেমন করে গুণাহসমূহ ঝরে যায়। বান্দা অসুস্থতার দ্বারা গুণাহমুক্ত হয়ে যায়।

বিপদে পড়ে অশ্রু ফেলার বিনিময়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, যখন কিয়ামত দিন সংঘটিত হয়ে যাবে, তখনো হিসেব-কিতাব শুরু হবে না, তখন এক ঘোষক ঘোষণা করতে থাকবে, যে সকল লোকেরা আল্লাহর কাছে হক পাওনা রয়েছে, তারা তাদের হক নিয়ে নাও। সমস্ত সৃষ্টিকূল বড় অবাক হয়ে ভাববে, আল্লাহর কাছে কে আবার হক পাওনা থাকতে পারে! তাঁরা জিজ্ঞেস করবে, আল্লাহর নিকট কে আবার হক পাওনা রয়েছে? তখন ঘোষক ফেরেশতা বলবে, যে বান্দা দুনিয়ায় কষ্ট ও পেরেশানিতে পতিত হয়েছিল, বিপদে পড়ে যাদের চোখ আঁধার হয়ে গিয়েছিল, তারা আজ তাদের বিনিময় প্রাপ্ত হবে। একথা শুনে লোকেরা ঝাঁক বেঁধে দাঁড়াবে। বলতে থাকবে, দুনিয়ায় আমি বিপদে পড়েছিলাম, আমি এই বিপদে পড়েছিলাম। আমি এই বিপদে পড়েছিলাম। বিপদে পড়ে আমিও কেঁদেছিলাম। আমিও অশ্রুসিক্ত হয়েছিলাম। তো কিয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বুল ইযযাত তাঁর শান মোতাবেক

বান্দাকে প্রতিদান দিবেন। বিপদে পড়ার বিনিময় আল্লাহ আমাদের দান করবেন। তো বিপদের কারণে আল্লাহ মানুষের গুনাহ মাফ করে দেবেন।

বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন; তখনো মিযান ও পরিমাপ শুরু হবে না। তখন এক ফেরেশতা এলান করবে, সবরকারীরা কোথায়? ধৈর্যধারণকারীগণ কোথায়? তখন সবরকারীরা দাঁড়িয়ে যাবে। ফেরেশতা তাদের নিয়ে জান্নাতে চলে যাবে এবং বলবে, যাও, যাও। তো সবরকারী সকলেই জান্নাতের গেটের কাছে চলে যাবে এবং বলবে, জান্নাতের গেট খুলে দাও। আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করতে দাও। একথা শুনে জান্নাতের গেটের দারোয়ান রেজওয়ান বড় বিস্মিত হয়ে আল্লাহকে বলবে, হে আল্লাহ! এখনো তো মিযানের কার্যক্রম শুরু হয়নি। আমলের পরিমাপ শুরু হয়নি। অথচ আপনার এই বান্দাগুলো জান্নাতে প্রবেশ করে ফেলতে চাচ্ছে। হে আল্লাহ! এখন আমার করণীয় কী বলুন। আল্লাহ রব্বুল ইযযাত ইরশাদ করবেন, আমি তো আমার নির্দেশনা এবং এর সিদ্ধান্ত আমার কিতাবের মধ্যে নাযিল করে দিয়েছি।

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'যারা সবরকারী, তারা তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।[১]

শোনো, এরা আমার এমন বান্দা, যারা বিপদে ধৈর্যধারণ করেছে, যারা সবর করেছে। আজ তো তাদের প্রতিদান দিতে হবে বিনা হিসাবে। শোনো রেজওয়ান! জান্নাতের গেট খুলে দাও আর সবরকারীদের বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। আজ আমার সেই প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাদের থেকে কোনো হিসাব নেওয়া যাবে না।

তো কিয়ামতের দিন বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে আল্লাহর সবরকারী বান্দারা।

আল্লাহর পক্ষ থেকে উযর প্রকাশ

কোনো-কোনো বুজুর্গ লিখেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বুল ইযযাত এক বান্দাকে দাঁড় করাবেন। সে ওই বান্দা, যাকে দুনিয়ায় রিযিক সামান্যই

---

১. সূরা যুমার, আয়াত- ১০

প্রদান করা হয়েছিল। তাকে সংকীর্ণতা প্রদান করা হয়েছিল। সে দুনিয়ায় বড় ধৈর্যের সাথে সময় পার করেছে। সংকীর্ণতার মাঝে সে সবর করেছে। শুকরিয়া আদায় করেছে। আল্লাহ বান্দার কাছে এমনভাবে ওযরখাহী করবেন, এমনভাবে দুঃখ প্রকাশ করবেন যেমনভাবে বন্ধু বন্ধুর কাছে করে থাকে।

বলবেন, হে আমার প্রিয় বান্দা! আমি তোমাকে দুনিয়ায় সংকীর্ণতা দান করেছিলাম, রিযিক কম দিয়েছিলাম। এটি কোনো বিষয় নয়। আজ তোমাকে আমার বড় নেয়ামত প্রদান করব। একথা বলে আল্লাহ ওই বান্দাকে জান্নাত দান করবেন।

আল্লাহর দরবারে গরীবের কদর

দুনিয়ায় যে ব্যক্তি গরিবী জিন্দেগী কাটিয়েছিল, সে পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সেই আখেরাতের একটি দিন দুনিয়ার সত্তর হাজার বছরের সমান। এবার বুঝুন একেকটি বছর কত লম্বা-লম্বা হবে। আর পাঁচশত বছর কত দীর্ঘ হবে!

এটি ঈমানওয়ালাদের কথা। দুনিয়ার ঈমানদার গরীব লোকেরা ঈমানদার ধনী সুখী সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে যেতে পারবে। এর চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে? যে বান্দা দুনিয়ার মধ্যে অধৈর্য হয়ে যাবে, যে বান্দা বেসবরি করবে, যে বান্দা ধৈর্যহারা হয়ে যাবে, সে তো তার এই সুবিশাল বিনিময়কে মূলত নষ্টই করে দিল।

একটি মূল্যবান কথা

এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেছেন, হে দোস্ত! তুমি মসিবত আসার আগের দিন ওই কাজটি করে নাও, যে কাজটি মানুষ মসিবত আসার তৃতীয় দিনে করে।

দু'আ করে-করে নিজ-নিজ কাজে চলে যাবে! এতে তৃতীয় দিন যখন সবর করার মতো কাজ চলে আসবে, তখন তা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। কারণ, তিন পর্যন্তই সীমানা। আপনি দেখবেন, তৃতীয় দিন আপনার বিপদ কেটে গেছে। মানুষ যে-কাজটি তিন দিন পরে করবে কেন যে তার জন্য দু'আ তিন দিন আগে শুরু করে না। এতে মানুষ সবর করার সাওয়াব ও প্রতিদান পেয়ে যাবে। স্মরণ রাখুন, বেসবর হয়ে গেলে, অস্থির হয়ে গেলে ধৈর্যহারা হয়ে গেলে মসিবত কোনোভাবেই কমে যাবে না। যতটুকু মসিবতে আপনি পতিত হওয়ার তা আপনার সামনে আসবেই। তাই ধৈর্যহারা হয়ে তার প্রতিদান বিনষ্ট না করা চাই। কারণ, এই বেসবরির কারণে মানুষ মাহরুম হয়ে যাবে। মাহরুম হয়ে যাবে বিশাল প্রতিদান থেকে।

কবিরাজের দরবারে

কিছু মানুষকে দেখা যায় সামান্য বিপদ-মসিবত এলেই তাবিজ-কবজ আনতে ছুটে যায়। গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে কবিরাজের সামনে। ছি-ছি! কত নিকৃষ্ট বিষয়! আল্লাহর দরবার ছেড়ে কবিরাজের দরবারে হাঁটু গেড়ে বসা? হায় রে মানুষ! কিছু মানুষ তো অন্যের অনিষ্ট সাধনের জন্যে কবিরাজের পায়ের উপর পড়ে থাকে। জাদু করে, তাবিজ করে, যেন তার বিপরীত ব্যক্তিটি ব্যবসায় বা কাজ কারবারে লাভবান না হতে পারে। যেন বিপরীত লোকটির সন্তান না হয় ইত্যাদি! তো এমন কাজ করা জঘন্য অপরাধ।

হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর ফরমান

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) বলতেন, যে ব্যক্তি কোনো মসিবতের কারণে অধৈর্য হয়ে কোনো কথা বলবে, বেসবরি প্রকাশ পায় এমন কোনো শব্দ উচ্চারণ করবে বা কালো পোশাক পরিধান করবে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকে এত গুনাহ দিবেন যে, ওই গুনাহগুলো তার সারা জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস পরিমাণ হয়ে যাবে।

হযরত উমর (রাযি.)-এর ফরমান

হযরত উমর (রাযি.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মসিবত আসার পর ধৈর্যহারা হয়ে যাবে এবং বেসবরি করবে, লোকদের সামনে আল্লাহর শেকায়েত করবে তাহলে আল্লাহ তার আমলনামায় এত পরিমাণ গুনাহ লিখবেন, যে তা নীল দরিয়ার পানির সমান হয়ে যাবে।

হযরত উসমান (রাযি.)-এর ফরমান

হযরত উসমান (রাযি.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রেরিত মসিবতে ধৈর্যহারা ও বেসবর হয়ে যাবে এবং অধৈর্য প্রকাশক শব্দ উচ্চারণ করবে বা কাপড় কালো করবে বা হা-হুতাশ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার আমলনামায় এত পরিমাণ গুনাহ লিখবেন যে, সেই গুনাহগুলো সারা দুনিয়ার রাত-দিনকে ছেয়ে ফেলবে।

তো বোঝা গেল, বেসবরির কারণে ধৈর্যহারা হয়ে যাওয়ার কারণে নেক প্রাপ্তির পথও বন্ধ হয়ে যায় আবার গুনাহও লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়। পুরো আমলনামা গুনাহে ভরে যায়।

আল্লাহর নুসরত প্রাপ্ত হওয়ার সহজ একটি পথ

মুহতারাম হাজিরীন! যদি কোনো মানুষ আপনার বিরোধিতা করে থাকে, দুশমনী করে থাকে অথবা আপনার সাথে হিংসা করে, তাহলে আপনি আপনার মুআমালা আল্লাহর সমীপে অর্পণ করুন। আপনি আল্লাহকে আপনার যিম্মাদার হিসেবে গ্রহণ করুন। আপনি আপনার সকল কিছুর ব্যাপারে আল্লাহকে দায়িত্ব দিয়ে দিন। কবিরাজের কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো তাবিজ-কবজের প্রয়োজন নেই। যাদু-মন্ত্রেরও প্রয়োজন নেই। আপনি দু'আকে হাতিয়াররূপে গ্রহণ করুন। আপনি মাওলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। তারপর দেখুন আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কেমন সাহায্য প্রদান করেন।

একটি জ্ঞানগর্ভ কথা

এখানে একটি ইল্‌মী কথা বলছি। একটি জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পেশ করছি। হয়ত সকলে বুঝবেন না। তবে উলামায়ে কেরাম কথাটি ভালো করে বুঝতে পারবেন।

আপনার শত্রু যে পদ্ধতিতে আপনার সাথে শত্রুতা পোষণ করছে আর আপনিও তাতে সবর করছেন, আল্লাহ ওই সবরের কারণে আপনাকে প্রশান্তি দান করবেন। মুসিবতে পড়ে বান্দা যে ধারায় সবর করে, সেই ধারায়ই আল্লাহ রব্বুল ইযযাত তার ক্ষতি পুষিয়ে দেন। তাকে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি দিয়ে দেন।

প্রথম দলীল

আপনি আমার এই দাবির স্বপক্ষে কুরআন থেকে দলীল গ্রহণ করুন। কারণ, কুরআন থেকে দলীল না হলে আমার কথা আর অকাট্য থাকবে না। মাহফিলের মজা-ই নষ্ট হয়ে যাবে। সাইয়্যেদুনা মুসা (আ.)-এর মাতা যখন তাঁকে নদীতে ছেড়ে দিচ্ছিলেন, তখন উত্তাল জলরাশি দেখে মা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বড় পেরেশানি ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এই অস্থিরতা ও পেরেশানি ছিল ছেলেকে পানিতে ছেড়ে দেওয়ার কারণে। তার হৃদয় তখন বড়ই ব্যথিত। কিন্তু ইলাহী ফরমান তো বাস্তবায়ন করতেই হয়। অবশ্যই মায়ের মমতা ভিন্ন এক জিনিস। সেই মমতার রশি তো কারো নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তিনি সেই কঠিন মুহূর্তে বড় ধৈর্যের সাথে সবরের সাথে ছেলেকে আল্লাহর নির্দেশে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। এই দরিয়ার অথৈ পানি তার পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়াল। ইরশাদ হচ্ছে-

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَٰرِغًا

সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল।[১]

তার হৃদয় তখন এত পেরেশান ছিল যে, সারাটা রাত তিনি অস্থিরভাবে পেরেশানিতে কাটিয়েছেন। তো এই পানি তার পরীক্ষার মাধ্যম হয়েছিল। এই পানি তাঁর মসিবত ও পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনকে পানিতে ডুবিয়ে মেরে দেখিয়েছেন যে মসিবতের বদলা কীভাবে নেওয়া হয়। যে পানি একটি দুশ্চিন্তার কারণ ছিল, সে পানি দিয়েই একদিন আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাইলকে নাজাত দিয়েছেন।

জালেম ফেরাউনের নিষ্ঠুরতার কবল থেকে মুক্তির এটিই আল্লাহর শান! বিপদ আসে যে পদ্ধতিতে বিপদ থেকে মুক্তিও দান করেন আল্লাহ তা'আলা সেই পদ্ধতিতে!

দ্বিতীয় দলিল

সম্মানিত সুধীবৃন্দ! দ্বিতীয় দলিলটিও শুনে নিন। যেন আমার কথাটি আরো শক্তিশালী হয়, দৃঢ় ও মজবুত হয়। কুরআনের উসূলও যেন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। সাইয়্যেদুনা ইয়াকুব (আ.)-এর ঘটনা দেখুন। হযরত ইয়াকুব (আ.)এর সামনে তাঁর অন্য সন্তানরা ইউসুফ (আ.)-এর জামা নিয়ে এসেছিল। ইরশাদ হচ্ছে-

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ

'তারা রাতের বেলা ক্রন্দনরত অবস্থায় এল।'[২]

এবং বলতে লাগল, আমাদের ভাইকে রেখে আমরা দৌড়ঝাপ ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলাম। এদিকে ভাইকে নেকড়ে এসে খেয়ে ফেলেছে। ইয়াকুব (আ.)কে তারা কাপড় দেখিয়েছিল। এই কাপড় দেখেই হযরত ইয়াকুব (আ.) বেশি ব্যথিত ও আহত হয়েছেন। তিনি প্রচণ্ডভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। তো এখানে দুঃখ পাওয়ার বাহ্যিক কারণ হলো জামা। তবে হযরত ইয়াকুব (আ.) এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করেছেন। এরপর বহুকাল পর এমন একটি সময় এল, যখন হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদের বলেছিলেন, আমাকে আমার আল্লাহ এই ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করেছেন।

---

১. সূরা কাসাস, আয়াত- ১৪

২. সূরা ইউসূফ, আয়াত- ১৬

তিনি একজনকে নিজের একটি কাপড় দিয়ে পাঠালেন এবং বললেন, যাও এ কাপড়খানা আমার পিতাকে দাও। হযরত ইয়াকুব (আ.) কাঁদতে-কাঁদতে তার চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। যখন ইউসুফ (আ.)-এর জামাটা তার চোখে লাগানো হলো। আল্লাহর কী শান! সাথে-সাথে আল্লাহ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)কে তার বাবা ইয়াকুব (আ.)-এর সাথে মিলিত করলেন। যে জামা একসময় হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সামনে শোকের দিগন্ত প্রসারিত করেছিল, সে জামাই একদিন আবার তাঁর সকল কষ্টকে গুটিয়ে দিয়েছিল। তাঁকে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছিল। আল্লাহ এই জামাকেই সুখের মাধ্যম বানালেন।

একটি মূলনীতি বুঝে নিন। একটি কুরআনী ফয়সালা বুঝে নিন। যে সকল কারণে মানুষ দুঃখিত ও ব্যথিত হয়, মসিবতের শিকার হয়, যদি বান্দা সবর করতে পারে, তবে আল্লাহ সেই জিনিসটি দ্বারাই বান্দাকে সুখী করেন। বান্দাকে ধন্য করে দেন। তাহলে বলুন, মসিবতে পড়ে হা-হুতাশ করার কী প্রয়োজন? কী প্রয়োজন অসহায় বোধ করার এবং বেসবর ও অধৈর্য হয়ে যাওয়ার?

যখন কোনো মসিবত সামনে আসবে, তখন মানুষ পাহাড়ের এত অটল ও অবিচল থাকবে। নিজের হৃদয়কে প্রশস্ত রাখবে। আত্মাকে শক্তিশালী রাখবে। তারপরই দেখবে, রব্বে কারীম কেমন মেহেরবানি করেন।

আমরা বদলা নিব না

স্বাভাবিকভাবে সাধারণত আমরা কোনো ছোট বাচ্চার উপর তার সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপিয়ে দেই না। অথচ আমাদের মাঝে যে কী পরিমাণ কমতি বিদ্যমান রয়েছে, তা আল্লাহ অবশ্যই জানেন। আমরা কম আকলের মানুষ হয়ে যদি বিবেক বিবেচনা করে কাজ করতে পারি, তাহলে রাহমানুর রহীম মেহেরবান আল্লাহ কী করবেন একটু চিন্তা করে দেখুন। তিনি তো দয়ার সাগর। গাফফার, সাত্তার, রহমান, গাফুর, সেই পরওয়ারদেগার কি আমাদের উপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেবেন? না, তা হবে না। হতে পারে না। তিনি তো বরং এদিকে সবচেয়ে বেশী খেয়াল রাখেন। তাই সামান্য মসিবত যদিও বান্দার উপর আসে কিন্তু এর মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই বলছি, আল্লাহর উপর ভরসা করে প্রত্যেক বিপদে-মুসিবতে সবর করা উচিত। খুব সতর্ক থাকা উচিত। অধৈর্য প্রকাশ পায় এমন শব্দও উচ্চারণ না করা উচিত। দুনিয়াতে বদলা নেওয়ার কোনো

প্রয়োজন নেই। আমাদের বদলা তো আমাদের রব্বে কারীম দান করবেন এবং বেশী থেকে বেশী দান করবেন। আমরা তো বদলা উদ্ধার করব আখেরাতে। আখেরাতেই আমরা বিনিময় নেব। আমরা নিজেরা যদি আজ বিপদ-মসিবতের বদলা নিতে যাই, জুলুমের শিকার হয়ে তার প্রতিশোধ নিতে যাই, তাহলে আমরা কী প্রতিশোধ নেব? কতটুকু নেব? আমাদের তো আমাদের রব প্রতিশোধ নিয়ে দেবেন। আর আমাদের রব যে প্রতিশোধ নিয়ে দেবেন, তার কথা এ জগতে কল্পনাও করা যায় না। তিনি কীভাবে কোন পদ্ধতিতে কী বদলা ও প্রতিশোধ নিয়ে দেবেন! আমাদের রব যখন আমাদের বদলা নিয়ে দেবেন, তখন সারা জাহান শুধু দেখবে। দেখেই থাকবে এবং বিস্মিত ও হতভম্ব হবে। আমাদের রব যেমন বড় তার বদলা আদায় করাও হবে তেমন বড়।

পিচ্ছিল পথে এ কোন দৌড় প্রতিযোগিতা!

আমাদের সামনের পথটি তো বড়ই পিচ্ছিল। বড়ই ক্লেদাক্ত। এই ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল পথে কেন আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা দিতে যাচ্ছি? আজ আমাদের জীবন এমন যে, আমরা অন্যের কাছ থেকে প্রতিশোধ আদায়ের জন্য অনেকে সারাটা জীবন ব্যয় করে দেয়। বংশের পর বংশ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম এ কাজে মগ্ন থাকে, ব্যস্ত থাকে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। আমাদের অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, বাবা-মা ছেলে-সন্তানকে একটু বুঝ হলেই বলতে থাকে, ওই যে লোকটা; তার থেকে তুমি বড় হয়ে আমাদের অমুক ক্ষতির প্রতিশোধ নিয়ো। এভাবে আমরা জাহেলী যুগে, জাহালাতের ঘোর আঁধারে ডুবে আছি।

পেরেশানি দূর করার সহজ পথ

আমার এই আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের নারীরা অবলা ও সরলমনা। তারা যে তাবিজ-কবচের জন্যে কবিরাজদের কাছে ছোটাছুটি করে, জাদুটোনাকারী, কুফরী কালামকারীদের কাছে যায়, তাদের হাতে যে প্রতারিত হয় এবং এসব কবিরাজ নামক ভণ্ডদের হাতে যে আমাদের মা-বোনরা লাঞ্ছিত হয় এর থেকে সতর্ক করা। বরং ওইসব দৌড়ঝাপ ও ছোটাছুটি থেকেও অধিক উত্তম ও সঙ্গত কাজ হচ্ছে, যখনই কোনো বিপদাপদ আসবে, তখন নিজের রবের দিকে ফিরবে। আল্লাহর অভিমুখী হবে। আল্লাহর দিকে তাকাবে। আল্লাহকে সব কিছুর ভরসা বানাবে। নফল

নামায পড়বে। সালাতুল হাজাত পড়বে। সালাতুল ইস্তেগফার পড়বে। রব্বে কারীমের সামনে সিজদায় অবনত হবে। সিজদায় পড়ে থেকে আল্লাহর নিকট দু'আ-মুনাজাত করবে। আল্লাহর কাছে মুক্তি ও সাহায্য চাইবে। আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাবে, আপনি আল্লাহর কাছে প্রাণ খুলে হৃদয় উজাড় করে প্রার্থনা করুন। আল্লাহ অবশ্যই দান করবেন। তিনি তো মহান দাতা প্রভু। আপনি কি দেখেন না, ছোট একটি শিশু যখন তার মায়ের কাছে কোনো জিনিস চায়, তখন তার মা কেমন ব্যকুল হয়ে সন্তানকে জিনিসটি দেয়? একবার, দুবার, বারবার। মা বারবার দেন। মায়ের কাছে সন্তান প্রতিদিনই বেশী-বেশী পয়সা চাইলে মা বলেন, তুমি প্রতিদিনই টাকা চাও। তোমাকে টাকা দেওয়া যাবে না; যাও। সরে যাও এখান থেকে।

এবার সন্তান জিদ ধরে। আবারো চায়, মা আমাকে দুটি টাকা দাও। আবারো চায়। বারবার চায়। মা তার সামনে থেকে সরে যান। ঘুরে আবার বাচ্চা মায়ের কাছে টাকা চায়। এভাবে এক সময় মা গলে যান। তিনি বাচ্চাকে বুকে টেনে নেন, আদর করেন। চুমু খান এবং কিছু টাকা বাচ্চাকে দিয়ে দেন। বাচ্চার এমন চাওয়ার কারণে মা নিজেকে শক্ত রাখতে পারেন না। বাচ্চা বারবার বিরক্ত করা সত্ত্বেও তাকে কিছু দিয়ে দেন। কখনো বেশী বিরক্ত করলে মা ছেলেকে চড়-থাপ্পর মারেন। বাচ্চা কাঁদে। এবার তো মা নিজেই কেঁদে ফেলেন। চুপে-চুপে শাড়ীর আঁচলে মুখ লুকিয়ে মা ক্রন্দন করেন। মা বাচ্চাটাকে দেখেন; আমি তো ওর উপর রাগ করলাম। মারলাম, কাঁদল সে। তারপরও আমার পিছে ঘুরঘুর করছে। আমার বুক জড়িয়ে আছে। এবার মায়ের রাগ থেমে যায়। মা এবার বাচ্চাটা যা চেয়েছে, তার চেয়ে অধিক দিয়ে দেন। আরে ভাই! আমাদের রবও তো এমনই। আল্লাহও তো এমনই।

যদি তিনি কখনও বান্দার উপর বিপদ ও মসিবতের পরীক্ষা চাপিয়ে দেনও, তারপর তিনি আপন রহমতে বান্দাকে ধন্য করেন। মসিবতে পড়ে বান্দা যদি আবারো রবকে ডাকে, তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে দু'আ করতে থাকে, আল্লাহর কাছে চাইতে থাকে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকে, ফরিয়াদ করতে থাকে, তাহলে তখন আমাদের রব্বে কারীম বলেন, এই বান্দা সুখের সময়ও আমার শুকরিয়া আদায় করে, দুঃখের সময়ও আমার শুকরিয়া আদায় করে। আমি তাকে বিপদ-মসিবত দিয়েছিলাম; কিন্তু তবুও সে আমার দরবারে পড়ে ছিল, আমার সিজদায় অবনত ছিল, আমার চৌকাঠ ধরে পড়ে ছিল, আমার সামনে আঁচল পেতে দাঁড়িয়ে ছিল, হাঁটু গেড়ে বসে

ছিল, সে আমার সাথে বন্ধন সৃষ্টি করে রেখেছিল। সে যে মুসিবতে আছে, তা কাউকে বলে বেড়ায়নি। তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরেছে। কিন্তুসেই অশ্রু কাউকে দেখায়নি। একা-একা সে নির্জনে আমার দরবারে অশ্রু ফেলেছে। সে যেহেতু কাউকে তার মুসিবতের কথা বলেনি, শুধু আমার কাছেই তার মনের ইচ্ছে ব্যক্ত করেছে, তো শুনে রাখো তোমরা আমি আল্লাহ বড় মেহেরবান। আমি বড়ই শানওয়ালা। তাই আমি তার দু'আগুলো কবুল করে নিচ্ছি। তার ইচ্ছেগুলোকে পূর্ণ করে দিচ্ছি। তার মাকসাদকে পুরা করে দিচ্ছি। তার মসিবতকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। তাকে আমি সুখী করে দিচ্ছি। তাকে আমি সমৃদ্ধ করে দিচ্ছি।

তো আমার প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! তাই তো সবরকারীর আগত প্রত্যেকটি দিন বিগত দিনগুলো থেকে ভালো হয়, সুখের হয়, সুন্দর হয়। আর অধৈর্য ও বেসবর বান্দার প্রত্যেক আগত দিন অতীতের দিনটি থেকেও খারাপ কাটে। এজন্যই বলছি, প্রত্যেক সময়ে প্রত্যেক মসিবতে সবর করা চাই, ধৈর্য ধারণ করা চাই।

সবর আল্লাহপ্রাপ্তির মাধ্যম

এটি পাকা কথা। এটি বাস্তব ও সত্য কথা। আপনারা হৃদয়ের খাতায় লিখে নিন। আল্লাহ রব্বুল ইযযাত সবরকারীকে ভালোবাসেন। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ রব্বুল ইযযাত ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন।[১]

তো দেখুন, সবরকারীকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন। আল্লাহ তা'আলা ওই বান্দাকে সঙ্গ দিয়েছেন। তো আল্লাহ তা'আলা যার সঙ্গী হয়ে যান, দুনিয়াতে কে আছে তার ক্ষতি করতে পারবে? কেউ তার ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। যদি সত্য ও সঠিক কথাটি বলতেই হয়, তো বলব, যদি আপনার মনের কথাটি বলতেই হয়, তাহলে আপনি আল্লাহকে বলুন। আপনার যা কিছু বলার তা আল্লাহকে বলুন। আপনার সকল অভিযোগ আল্লাহর দরবারে পেশ করুন। যে আল্লাহ আপনার উপর মসিবত দিয়েছেন, সে আল্লাহই তা ফিরিয়ে নিয়ে নিবেন। আজ আমরা নিজেদের বিষয়গুলো আল্লাহর সমীপে পেশ না করে আমরা মানুষের কাছে বলে বেড়াই। মানুষের

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত- ১৫৩

দ্বারে-দ্বারে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা মাগি। এভাবে তো আমরা আমাদের পেরেশানিকে আরো বাড়িয়ে দেই। আল্লাহ তা'আলা সবরকারীদের গুনাহ মাফ করে দেন। তাদেরকে বড়-বড় প্রতিদান দেন। তাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।

মাফ করার এক আজব বাহানা

এক ব্যক্তির ব্যাপারে লিখিত আছে, তার স্ত্রী কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিল। বারবার ভুল করত। মাঝে-মাঝেই ক্ষতি করে ফেলত। বিভিন্ন জিনিস নষ্ট করে ফেলত। লোকটির বড় রাগ হতো। ক্রোধ তার ভেতরটা পুড়িয়ে দিত। কিন্তু কখনও বউকে তালাক দিত না। কারণ, সে চিন্তা করত, আমি যদি তাকে তালাক দিয়ে দেই, তাহলে তো সে মুসিবতে পড়ে যাবে। পরে তাকে আর কে বিয়ে করবে? থাক, যেভাবে আছে চলুক। তার জীবনও তো অতীত হয়ে যাবে, আমারও এ জীবন শেষ হয়ে যাবে। তাই স্বামী তার বোকা স্ত্রীর সব ভুল মাফ করে দিত। ভাবত মহান আল্লাহরই তো বান্দী সে। আমিও তো আল্লাহরই বান্দা। এভাবে লোকটি সেই বোকা স্ত্রীর সাথে তার জীবন কাটিয়ে দিল।

একদিন লোকটি মারা গেল। মৃত্যুর পর কেউ একজন স্বপ্নে দেখল, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, বলো তো তোমার সাথে কবরে কেমন আচরণ করা হয়েছে? লোকটি বলল, আমাকে আল্লাহর সামনে পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দা! তুমি আমার বান্দী তোমার স্ত্রীকে আমারই সৃষ্টি মনে করতে। আমারই বান্দী মনে করতে। সে বারবার ভুল করত আর তুমি তাকে মাফ করে দিতে। আজ আমিও তোমাকে মাফ করে দিলাম। তোমাকে আমি আজ আমার বান্দা বলেই মাফ করে দিলাম।

দেখুন, আল্লাহ রব্বুল ইযযাত মাফ করার কত বাহানা খোঁজেন। কত উসিলা তিনি তালাশ করেন, কেমন করে তিনি তাঁর বান্দাদের উপর মেহেরবানি করবেন। তাই বলছি, মুসিবতের কারণে পেরেশানি না হওয়া উচিত। এটিই জীবন। মসিবত তো জীভনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুখ যেমন সর্বদা থাকে না, দুঃখও তেমন সর্বদা থাকে না। এক সময় না এক সময় সব কিছুরই সমাপ্তি ঘটে।

এক মুসিবতের পর আসবে দুই কল্যাণ

আল্লাহ রব্বুল ইযযাত ইরশাদ করেছেন-

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

'প্রত্যেক মুসিবতের পরই কল্যাণ হয়। প্রত্যেক মুসিবতের পরই কল্যাণ হয়।'[১]

আল্লাহ কথাটি দুবার বলেছেন। অথচ একবার বললেই তো যথেষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল ইযযাত হাকীম। তিনি যে কথাটি দুবার বলেছেন, তারও কিছু হেকমত আছে। মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, এর কারণ এই যে, যখন মুসিবতের উপর বান্দা সবর করে, তখন রব্বুল ইযযাত একটি মুসিবতের কারণে তার বদলায় দুটি কল্যাণ দান করেন। সংকট, অকল্যাণ ও মসিবত আসে একটা আর কল্যাণ ও প্রশস্ততা আসে দুটি। খুশী ও প্রশান্তি আসে দুটি। তাই সবর করুন। নিজের মধ্যে ধৈর্যের গুণ সৃষ্টি করুন। আর মুসিবতের বিনিময় দ্বিগুণ গ্রহণ করুন।

সুখে-দুঃখে কেমন থাকতেন আল্লাহওয়ালাগণ

কোনো পেরেশানি বা মুসিবতে পড়ে গেলে আল্লাহওয়ালাগণ আরো খুশী হয়ে যেতেন। তাঁরা বলতেন-

تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے

তোমার দেওয়া মসিবতও আমার কাছে বড় প্রিয়। কারণ তাও তো তোমারই দেওয়া বিষয়।

তাঁরা দেখতেন না, পেরেশানি এসেছে। তাঁরা বরং দেখতেন, এই মসিবত ও পেরেশানি কে পাঠিয়েছেন। তাঁরা ভাবতেন, মসিবত তো আমার আল্লাহ পাঠিয়েছেন। দাউদ তাঈকে আল্লাহ তা'আলা ইলহাম করেছেন, হে দাউদ! যদি তোমার খাদ্য হিসেবে কখনও সিদ্ধ সবজিও মিলে যায়, তাহলে তোমার উচিত হৃদয়কে ছেদ না করা। বরং একথা চিন্তা করো যে, যখন আমি রিযিক বণ্টন করেছিলাম, তখন আমি তোমার কথাও স্মরণ করেছিলাম। তোমার কথাও আমার মনে ছিল। আমিই তো তোমার কাছে রিযিক পাঠিয়েছি। যখন আমিই সে রিযিক পাঠালাম, তখন তোমার উচিত এর উপরই সন্তুষ্ট থাকা। এতে আমি তোমাকে উত্তম বিনিময় ও সাওয়াব দান করব। তাই এমনসব মুসিবতে পেরেশান না হওয়া চাই।

---

১. সূরা আলাম নাশরাহ, আয়াত- ৪,৫

আল্লাহওয়ালাগণ বরং এমন ছিলেন যে, তাঁদের উপর যদি কোনো সময় মসিবত আসা বন্ধ হয়ে যেত, তখন তাঁরা পেরেশান হয়ে যেতেন। তাঁরা খুব চিন্তিত হয়ে ভাবতেন, তাহলে কি বড় ধরনের কোনো পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল! তারা প্রকম্পিত হতেন। তাঁরা আতঙ্কিত হতেন পরীক্ষার কথা ভেবে। তাঁদের তো বরং এই অবস্থা ছিল যে, যদি তাদের আশার থেকেও বেশী সুখ কখনো এসে যেত, তখন তাঁরা কাঁদতে শুরু করতেন। ভাবতেন আর চিন্তিত হতেন যে, তাহলে কি নেক কাজের বিনিময় আমাকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে?

একবার হযরত উমর (রাযি.) পানি চাইলেন। তাঁকে শরবত পরিবেশন করা হলো। তাঁর চোখে পানি চলে এল। তিনি বলতে লাগলেন, উমরের নেক কাজের বদলা কি তাহলে এই দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে? কিয়ামতের দিন একথা তো বলা হবে না আবার-

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا.

'তোমরা নিজেদের অংশের উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহ পার্থিব জীবনে ভোগ করে নিঃশেষ করে ফেলেছ।'[১]

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) একবার তাঁর গোলামকে বললেন, ময়লা পরিষ্কার করার জন্য একটা ন্যাকড়া নাও। গোলাম একটা দামী কাপড় নিল। হযরত আবু হুরায়রা এটি দেখে কেঁদে ফেললেন। বললেন, হায় আমার আমলের প্রতিদান কি তাহলে আমাকে শোধ করে দেওয়া হচ্ছে। আমাকে কি তাহলে দুনিয়াতেই সব দিয়ে দেওয়া হচ্ছে?

তো বোঝা গেল, আল্লাহওয়ালাগণ দুনিয়ায় সামান্য সুখের দেখা পেলেই বড় পেরেশানি হয়ে যেতেন। ভাবতেন, আমাদের উপর পরীক্ষা চলে এল না তো আবার? তারা যদি কখনও মুসিবতের শিকার হতেন, তাহলে তাঁরা খুশী হয়ে যেতেন। ভাবতেন, আল্লাহ তো ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন যে আমার যে বান্দাকে আমি দুনিয়ায় মসিবত দান করব, তাকে আমি আখেরাতে নাজাত দিব। যাকে দুনিয়াতে দুঃখ দান করব, আখেরাতে তাকে আমি সুখ দান করব। দুনিয়ায় যাকে সুখ দিব, আখেরাতে তাকে আমি দুঃখ দেব। আখেরাতে সে মুসিবতে পড়বে।

---

১. সূরা আহকাফ, আয়াত- ২০

গুনাহের কাফফারা

বর্ণিত আছে, সুখ ও দুঃখকে কখনও একত্র করা হবে না। এমনটি কোনোভাবেই হবে না যে, দুনিয়ায় যে কষ্ট-দুঃখ পেয়েছে, আখেরাতেও সে কষ্ট-দুঃখ পাবে। আবার এমনও হবে না যে, দুনিয়াতেও কোনো বান্দা সুখী হবে আবার আখেরাতেও সুখী হবে।

কখনও এমন হবে না। এমন করে সুখ-দুঃখ কখনও একত্রিত হয় না। এক জগতে সুখ পেলে অপর জগতে দুঃখ পেতে হয়। আর এক জগতে দুঃখ পেলে অপর জগতে সুখ পাওয়া যায় এটিই মূলনীতি। তাই বলছি, যদি দুনিয়ায় দুঃখ-কষ্ট আসেও, তবে এটিই উত্তম। কারণ দুনিয়ার এ দুঃখ-কষ্ট সীমিত সময়ের জন্য। আর আখেরাতে দুঃখ-কষ্ট না আসাই ভালো। কারণ, তখনকার দুঃখ-কষ্টের কোনো সীমানা নেই। তাই যা মসিবত আসার দুনিয়ায়ই এসে যাক। আখেরাত শান্তিময় হোক। এটি আমাদের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। তাই মসিবত এলেই বুঝবে, আমার ভুলগুলো শুধরে দেওয়া হচ্ছে। আমার গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হচ্ছে। আমার গুনাহের শাস্তি আমাকে দুনিয়ায়ই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আখেরাতে আমার উপর আমার আল্লাহ রহম করবেন। আমাকে সেদিন মাফ করে দেবেন। আমাকে সেদিন নাজাত দান করবেন।

এক নারী সাহাবীর শিক্ষণীয় ঘটনা

এক সাহাবীর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা কিতাবে পাওয়া যায়। ওই নারী সাহাবীর বিবাহ হয়েছে। সাহাবীকে আল্লাহ সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্যও দিয়েছিলেন। বিবাহও হয়েছে বড় সম্মানিত ও জলিলুল কদর এক সাহাবীর সাথে, যার রিযিকের কোনো কমতি ছিল না। আয়েশ-আরামের সকল প্রকার উপায়-উপকরণ তার নিকট বিদ্যমান ছিল। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসার মাত্রাও ছিল অনেক বেশী। তারা বড় সুখে জীবন যাপন করছিলেন। স্ত্রী প্রাণভরে তার স্বামীর খেদমত করে। স্বামী বড় আনন্দ মনে কামাই-উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে। স্ত্রীকে আদর-সোহাগ করেন। উভয়ের জীবন বড় সুখের মধ্য দিয়ে অতিক্রম হচ্ছে।

এত রাতে কর্মব্যস্ত স্বামী কাজ করে এসে শুয়ে পড়লেন। তার প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছে। স্ত্রীকে বললেন, প্রিয়তমা! আমাকে একটু পানি দাও। স্ত্রী পানি আনতে গেলেন। পানি নিয়ে এসে দেখলেন, ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত স্বামীকে ঘুম

আচ্ছন্ন করে নিয়েছে। প্রিয়তমা স্ত্রী তার প্রিয় স্বামীর জন্য পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। রাত গভীর হয়ে এল। স্বামী ঘটনাক্রমে আবার জেগে গেলেন। দেখলেন, তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী পানি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বামী তো আত্মহারা হয়ে গেলেন। আমার স্ত্রী আমার জন্য এত নিবেদিতপ্রাণ? ভেবে বিস্মিত হয়ে গেলেন। উঠে পানি পান করলেন। প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি প্রেমভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। তাঁর চোখে মুখে চুমু খেয়ে বললেন, আমার মাহবুবা! আমার জান! আমার হৃদয়ের কথা তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। আমার অন্তরে তোমার প্রেম-ভালোবাসার উচ্ছ্বাস কেমন করে তরঙ্গায়িত হচ্ছে তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমার প্রিয়তমা! তুমি আমার অপেক্ষায় এমন করে পানি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলে। এই ভালোবাসার মূল্য আমি কী দিয়ে শোধ করব বলো। আজ তুমি যা বলবে, যে অনুরোধ করবে, যা চাইবে আমি তা পূর্ণ করার চেষ্টা করব। বলো, তোমার কী চাওয়ার আছে। কী তোমার পাওয়া আছে বলো।

প্রিয় স্বামীর মুখে এমন কথা শুনে স্ত্রী বলতে লাগলেন, আপনি কি সত্যিই বলছেন? সত্যিই আমি যা চাইব, তা আমাকে দিবেন? আমার ইচ্ছে কি সত্যিই আপনি পূর্ণ করবেন?

স্বামী বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই! অবশ্যই! অবশ্যই আজ তুমি যা চাইবে তা তোমাকে আমি শত কষ্ট করে হলেও প্রদান করব।

স্ত্রী এবার বললেন, আচ্ছা দাও। তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দাও। আমি তালাক চাই। তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দাও। আমাকে অবসর করে দাও। এবার যখন স্ত্রী তালাকই চেয়ে বসলেন, স্বামী তো মুসিবতে পড়ে গেলেন। পেরেশান হয়ে গেলেন। এমন গুণী, জ্ঞানী, সুদর্শনা স্ত্রী; কেমন করে তালাক দিব তাকে। এত ভালো স্ত্রী কোথায় আর পাব আমি। স্বামী বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

স্ত্রী তাড়া দিতে থাকলেন। আপনি ওয়াদা পূর্ণ করুন। আপনি তো বলেছেন, আমি যা চাইব তা-ই আমাকে দিবেন। আমাকে তালাক দিন। আমি তালাক চাচ্ছি। স্বামী বলতে লাগলেন, আমার স্ত্রী! আমার মাহবুবা! প্রিয় জান আমার! আমি কি তোমাকে কখনও কষ্ট দিয়েছি? স্ত্রী বললেন, না; আপনি আমাকে কোনোদিন কোনোভাবে কষ্ট দেননি। স্বামী বললেন, আমি কি কখনও তোমার অবমূল্যায়ন করেছি? স্ত্রী বললেন, কক্ষণও করেননি। স্বামী বললেন, আমি কি কখনও তোমার আগ্রহ-ইচ্ছা বা কামনা ও চাহিদাকে

নষ্ট করেছি? কখনও কি তোমার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছি? তোমার কোনো কথা কি আমি অমান্য করেছি? তুমি কি আমার কারণে কখনও কোনো মুসিবতে পড়েছ? কেন এভাবে তালাক চাচ্ছ? বলো, আমি কি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি? স্ত্রী বললেন, প্রাণের স্বামী আমার! আপনি আমাকে কখনও কষ্ট দেননি। মুসিবতে ফেলেননি। আমার কোনো ইচ্ছে বা স্বপ্ন আপনি অপূর্ণ রাখেননি।

স্বামী বললেন, আমাকে কি তুমি ভয় পাও? আমাকে কি তুমি অপছন্দ কর? আমাকে কি তোমার ভালো লাগে না? আমাকে কি তুমি ভালোবাসতে পারনি? স্ত্রী বললেন, ওসব কিছুই না। এগুলো কোনো কারণ নয়। আমি তো বরং আপনাকে অধিক পছন্দ করি। আমি আপনাকে প্রাণ উজাড় করে ভালোবাসি। তাই তো আপনার খেদমতে সর্বদা নিবেদিতা থাকি। আপনিই তো বলেছেন, আপনি আমার আজকের চাওয়া পূর্ণ করবেন। তাই বলছি, আপনি আমাকে তালাক দিয়ে অবসর করে দিন। সাহাবী বড় পেরেশান হয়ে গেলেন। চিন্তিত হয়ে গেলেন। কথাও তো দিয়ে বসলাম। আবার এখন তা পূর্ণও করতে পারছি না। কারণ, এই চাওয়া যদি পূর্ণ করি, তাহলে তো এই প্রিয় স্ত্রী আর স্ত্রী থাকবে না। তাহলে তো সমস্ত সুখই মাটি হয়ে যাবে।

দুশ্চিন্তায় স্বামীর রাত যেন কাটছে না। বললেন, শোনো প্রিয়া, আমরা সকালে এ বিষয়টি নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাব। তাঁর কাছে আমরা আমাদের এ সমস্যার সমাধান চাইব। স্ত্রী বললেন, ঠিক আছে। এ কথার উপর রাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শুয়ে পড়লেন।

সকাল হলো। স্ত্রী বলতে লাগলেন, তবে চলুন। দ্রুত চলুন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে চলুন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে ঘর হতে বের হলেন। তাঁরা ইচ্ছে করলেন, নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে হাজির হবেন। এই সমস্যার সমাধান তাঁরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করবেন। এখনো তাঁরা উভয়ে পথের মধ্যে রয়ে গেছেন। হঠাৎ স্বামী হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। পাথরে আঘাত লেগে তার শরীর জখম হয়ে গেল। স্বামীর শরীর থেকে রক্ত বের হতে লাগল। সাথে-সাথে স্ত্রী তার কাপড় ছিঁড়ে স্বামীর জখমে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। স্বামীর মাথা নিজের কোলে তুলে নিলেন। কিছুক্ষণ সেবা-শুশ্রুষা করলেন। বলতে লাগলেন, চলুন; আমরা ঘরে ফিরে যাই। আমি আপনার থেকে তালাক চাচ্ছি না। আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না। আমাকে আর তালাক দিতে হবে না।

এবার আবার বিস্ময়ের পালা! স্বামী আরো বেশী অবাক হয়ে গেলেন স্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের জন্য। বললেন, বুঝলাম না স্ত্রী! তুমি তালাক চেয়েছ কেন

তাও বুঝলাম না। আবার এখন তোমার সিদ্ধান্ত তুমিই পরিবর্তন করে ফেলেছ এর কারণও বুঝলাম না। এসবের রহস্যটা কী? চলো; আগে ঘরে যাই তারপর তুমি রহস্যটা বলো।

স্ত্রী স্বামীকে ধরে ঘরে নিয়ে এলেন। বিছানায় শুইয়ে দিলেন। মাথায় পানি দিলেন। ব্যান্ডেজ-ওষুধ দিলেন। শিয়রের পাশে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। সেবা-যত্ন করতে লাগলেন। স্বামী বললেন, বলো তো প্রিয়া! রহস্যটা কী? স্ত্রী বলতে লাগলেন, আপনিই তো কিছুদিন আগে আমাকে নবীজির হাদীছ শিখিয়েছেন, যে বান্দাকে আল্লাহ রব্বুল ইযযাত মহব্বত করেন, তার উপর বিপদ-মসিবত ও পেরেশানি চাপিয়ে দেন। তার উপর মসিবত এমনভাবে আসে, যেমনি উপর থেকে পানি নিচে পড়ে। আমি নবীজির এই হাদীছ শুনে চিন্তা করলাম, আমি তো আপনার সংসারে কোনো বিপদ-মসিবত দেখতে পাচ্ছি না। আপনার ঘরে সুখ আর সুখ, আনন্দ আর আনন্দ। দুঃখ বলে কিছু আপনার সংসারে নেই। মসিবত বলে কিছু আপনার উপর নেই। তাই আমি দিলে-দিলে খেয়াল করলাম, আমার নবীজির কথা তো অবশ্যই সত্য। ভাবলাম, আমার স্বামীর ঈমানে ত্রুটি আছে নাকি আমার। আমার স্বামীর আমলে কি কমতি আছে! আমার স্বামীকে কি আমার আল্লাহ মহব্বত করেন না? যদি এমনটিই হয়, তাহলে এই স্বামীর সংসারে আমি কেন থাকব? কীভাবে থাকব। তাই যখন আপনি বললেন, আপনি আমার ইচ্ছে ও চাহিদা পূর্ণ করবেন, তখন আমি ভাবলাম, যাকে আল্লাহ মসিবত দেন না, তাকে আল্লাহ ভালোবাসেন না। আর যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন না, তাকে আমি স্বামীরূপে মেনে নেব না। তালাকের মাধ্যমে আমি পৃথক হয়ে যাব। ভাবলাম, এই সমস্যার সমাধান আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাসিল করব। আমরা তো সেই উদ্দেশ্যেই রওনা হয়েছিলাম। এটি ছিল ইল্‌মের পথ, আল্লাহর পথ। এ পথে চলতে গিয়ে আপনি আঘাতপ্রাপ্ত হলেন। আপনি মুসিবতের শিকার হলেন। আপনার শরীর থেকে খুন প্রবাহিত হলো। আমি তখন বুঝে গেলাম, বিপদ মসিবত আপনারও আসে। আপনিও মুসিবতের শিকার হন। আল্লাহর রাস্তায় এসে আপনি মসিবতে পড়েছেন। কষ্টে পড়েছেন। ব্যথা পেয়েছেন, তাহলে সত্যিই আল্লাহর সাথে আপনার মহব্বত আছে। আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন। আর আপনাকে ভালোবাসেন দেখেই তিনি আপনাকে বিপদে ফেলে দিয়েছেন। এখন বুঝলাম, আমি আর আপনার কাছ থেকে তালাক

নিতে হবে না। এখন আর তালাক নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি সারাটা জীবন আপনারই সাথে থাকব ইনশাআল্লাহ। আপনার খেদমতে আমার জীবন কাটিয়ে দেব। আপনার সাথেই সংসার করব আর ভালোবাসা দিয়ে আপনাকে সুখী রাখব। আমার আঁচল দিয়ে আপনার ঘাম মুছে দিব।

দেখুন, চিন্তা করুন। এসব ভাবলে তো অবাক হতে হয়। সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল। আছে কি কোনো নারী এ যুগে যার দৃষ্টিভঙ্গি এমন? আছ কি কোনো পুরুষ. যার দৃষ্টিভঙ্গি এমন? না নেই। এ যুগে এমন কোনো মানুষ নেই।

তো যা একটু মসিবত এ যুগে আসে, সহীস আক্বীদাসম্পন্ন আল্লাহওয়ালা বুজুর্গদের উপর আসে। বেদআতী, বদ আকীদার লোকদের উপর তো কোনো মসিবতই আসে না। ওইসব লোক তো বরং বলে, মোরগ জবাই করে তার রক্ত দিয়ে তাবিজ লেখো; বিপদ কেটে যাবে। কেউ বলে, ছাগল জবাই করো। তার খুন দ্বারা তাবিজ লেখো; বিপদ কেটে যাবে। এসব মানুষ জাহেল ও বদদীন। এরা নিজেদের ঈমান তো ধ্বংস করেছেই, সাথে-সাথে সাধারণ মানুষের ইমানও দাফন কাফন করে দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ঈমানকে হেফাজত করুন। আমাদেরকে এই মুসিবতের দুনিয়ায় সবর ও ধৈর্য ধারণ করার আর সুখ-শান্তির অবস্থায় শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও নব-নব আবিষ্কারের পথে আজ সমগ্র দুনিয়া যেন দৌড়প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। কে কার চেয়ে শক্তিশালী বোমা আর উন্নত প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে পারে সে কাজেই প্রত্যেক দেশের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে শেষ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বকে পথনির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছে যে মহাশক্তি, সেটি হচ্ছে আল-কুরআন বা ইসলাম। যত নব উদ্ভাবিত সামগ্রীই আসছে, সব যেন সেই ঘোষণাকেই সত্য প্রমাণিত করছে যে, ইসলাম চির সত্য। সকল সভ্যতা-মতাদর্শই এসেই মাথা নত করতে বাধ্য হচ্ছে ইসলামী রীতি-নীতি ও আদর্শের সামনে। তাই সব ছেড়ে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিতে হয় ইসলামেরই সুশীতল ছায়ায়।'

ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامَ. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْناً. سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

আমেরিকা সফর

আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমেরিকার ২২টি রাজ্যে সফর কার তাওফীক দান করেছেন। এমনও হয়েছে যে, সকালের প্রোগ্রাম এক রাজ্যে হয়েছে আবার রাতের প্রোগ্রাম হয়েছে অন্য রাজ্যে। তো সফর তো শেষ হলো। দ্বীনের বহু প্রোগ্রাম করার সুযোগ হলো। আসার পর এই ফয়সালাবাদের বন্ধুরা বারবার আবেদন জানাল, সেখানকার কার্যক্রম ও কারগুজারি পেশ করুন। সেখানকার সমাজ-সভ্যতার রূপরেখার বিবরণ দিন, যেন আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহও অবগত হতে পারি। আমি তাদের বলেছিলাম, ইনশাআল্লাহ কোনো এক মাহফিলে এ বিষয়ে কথা বলব। তো এখানকার বন্ধুরা এ বিষয়ের আলোচনার জন্য এ মসজিদে মাহফিলের আয়োজন করেছে। তাই আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার নানা দিক নিয়ে কিছু আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

নতুন টেকনোলজি

প্রযুক্তি এ যুগের সারাটা পৃথিবীতেই আধিপত্য বিস্তার করে চলছে। সারা দুনিয়ার সুপার পাওয়ার আজ এই নতুন-নতুন আধুনিক প্রযুক্তি ও আবিস্কৃত সামগ্রী-ই। বরং বলা যায়, আজ আবিষ্কারকরা এসব আধুনিক জিনিসগুলোর কারণে নিজেকে সুপার পাওয়ার বলে দাবি করছে। পাশ্চাত্যের লোকেরা এতটা উন্নতি সাধন করেছে যে, টেকনোলজিতে তারা তাদের মাটিকে সোনার দামে বিক্রি করছে। কারণ, তারা চিনা মাটি ও এ জাতীয় ধাতব বস্তু দ্বারা এমনসব জিনিস তৈরী করছে, যার মূল্য সোনার চেয়েও বেশী।

চাঁদের দেশের সন্ধান

আজ পাশ্চাত্যের লোকেরা দাবি করছে, তারা চাঁদের দেশ আবিষ্কার করেছে। তারা দাবি করছে, তারা এই দুনিয়ায় বসে সেই চাঁদে কী হচ্ছে জানতে পারে। অবশ্য দাবিটা সঠিকই। কারণ, আমি তাদের ঘর-বাড়ির অবস্থা এবং তাদের সমাজ-সভ্যতাকে কাছ থেকে দেখেছি। সেগুলো দেখে বোঝা-ই যায়, তাদের টেকনোলজির এমন পজিশন অর্জিত হয়েছে যে, এসব আধুনিক বিষয়গুলো তাদের জন্য সহজ হয়ে গেছে। কারণ, চন্দ্রের গতি, তার কক্ষপথ, তার চলার পথ সবকিছু এখন মানুষের নখদর্পণে। সব কিছু সম্পর্কেই তারা অবগত। এমনসব যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যার দ্বারা চাঁদের সর্ব প্রকার অবস্থা ও অবস্থান অত্যন্ত সহজেই অবগত হওয়া যায়। পাশ্চাত্যের লোকেরা সেসব যন্ত্র ও প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে।

রুশ ও আমেরিকার মাঝে সন্ধিচুক্তি

রুশ ও আমেরিকার মাঝে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। তারা উভয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এই চুক্তির উপর অটল থাকবে। তারা তাদের প্রযুক্তিগত উন্নতি যাচাইয়ে নেমে একবার উভয়ে দুটি যান শূন্যে ছেড়ে দিল। যানগুলো রিমোট কন্ট্রোলের ছিল। রুশের যানটা হঠাৎ থেমে গেল। আমেরিকারটা রুশেরটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিল এবং তাকে টেনে আমেরিকার সীমানায় নিয়ে গেল। তারপর আবার রুশরা তাদের যন্ত্র শূন্যে ছাড়ল। এবার রুশদের যানটা চালু থাকল আর আমেরিকারটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। শূন্য থেকেই রুশদের যান আমেরিকার যানটা নিয়ন্ত্রণে রুশদের সীমানায় নিয়ে নিল। এখনো ওই দুটি যান সংযুক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

দেখুন, যমিনে বসে তারা শূন্যে ভাসমান দুটা যানকে কেমন নিপুণভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করল। এমন বহু আধুনিক প্রযুক্তি তাদের রয়েছে। দেখুন, তারা তাদের বিষয়ে কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করেছে। তারা হাওয়ায় জাহাজ উড়াচ্ছে। একটি গাড়িকে, একটি মেশিনকে রিমোটের মাধ্যমে অন্যটির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছে। একটিকে অন্যটির অধীন করে দিচ্ছে। একটি আরেকটিকে কোথা থেকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যারা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন, তারা বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারবেন।

এক ইউনিভার্সিটির কম্পিউটারের সংখ্যা

আমি ওই দেশে এক ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছি। নতুন অনেক কিছু আমি তাতে দেখেছি। নব-নব পরিবর্তন লক্ষ করেছি। অবশ্যই এই বিপ্লবটা শুরু হয়েছে ১৯৬০ সাল থেকে। এই কম্পিউটার এক সময় অনেক বিশাল ছিল। ১৯৬০ সালের দিকে তো ওই ভার্সিটিতে একটি বড় কম্পিউটার ছিল। ১৯৭০ সনের দিকে ওই ভার্সিটির মধ্যে ৭০ হাজার p-c Terminals ছিল। চিন্তা করুন, এত মানুষ যেখানে দিন-রাত কর্মব্যস্ত, সেখানে তাদের উন্নতি হবে না কেন? তাদের মেধার বিকাশ তো এজন্যই ঘটছে। তাই তো তারা নব-নব বিষয়ের উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে।

জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নতুন জিজ্ঞাসা

জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মধ্যে এমন এমন বিষয় সামনে আসছে যে, মানুষের চোখ বিস্ফোরিত থেকে যায়। সুইডেনে একটি গাছ আবিষ্কার করা হয়েছে যে, তার তিন শাখায় তিন রকম ফল ধরবে। কেমন বিস্ময়ের কথা! মূলত যখনই কোনো বিষয় সঠিক পরিচর্যা পায়, তখনই তাতে এক প্রকার D.N.A মূলনীতি দেখা দেয় D.N.A এর ভেতর R.C.G.T থাকে। তাতে এর বেড়ে ওঠা এবং উৎপন্ন হওয়ার বিষয়টির সন্ধান থাকে। উদাহরণস্বরূপ মানুষের দিকেই লক্ষ করুন। সকল মানুষের চোখ দুটি হয়। কারো তো তিনটি বা চারটি চক্ষু থাকে না। একই রকম স্থানেই সকলের নাক কান স্থাপিত থাকে। কারো কান বা নাক তো অন্যত্র থাকে না। সকলের চেহারা সামনে থাকে। কারো চেহারা পেছনের দিকে ঘুরানো থাকে না। তো এই যে প্রত্যেকটি বিষয় ও প্রত্যেকটি অঙ্গ সঠিক-সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাকভাবে সৃষ্টি হচ্ছে, তাকে ওই মূলনীতি পেছন থেকে কন্ট্রোল করে। সেই কথাটিই আজ মানুষ মাত্র বুঝতে শুরু করেছে। তো এই জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এসে বড় আশ্চর্য সব বিপ্লব ঘটিয়েছে।

সৃষ্টিজীবকে অধীন করার প্রতি ইঙ্গিত

১৪ শত বছর পূর্বে আমাদের রব্বে কারীমই বলে দিয়েছেন–

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

'আমি তোমাদের অধীন করে দিয়েছি সকল জিনিসকে, যা কিছু আছে আসমান ও যমীনে।'[১]

---

১. সূরা জাছিয়াহ, আয়াত- ১৩

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অধীন করে দেওয়া হয়েছে তামাম পৃথিবীর সকল কিছুকে। এর দ্বারা বোঝা যায়, মানুষের মাঝে অধীন করার ক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে। তাঁরা আল্লাহর খলীফা। তাদের ভিতর থেকেই আল্লাহর সিফাতগুলো প্রকাশিত হবে। মানুষের কাজ হলো মানুষ তার অভ্যন্তরীণ যোগ্যতাকে কাজে লাগাবে। তাহলে এসব বিষয় বোঝা তার জন্য কঠিন থাকবে না।

পেট কাটা ছাড়াই অপারেশন

আজ সব লাইনেই উন্নতি সাধিত হয়েছে। মেডিকেল লাইনে উন্নতিও অনেক হয়েছে। অপারেশনের ক্ষেত্রে নিত্যনতুন বিষয় সংযুক্ত হচ্ছে। আজ তো আলসার ইত্যাদির জন্য মানুষের পেট কাটতে হয় না। বরং পেটের একপ্রান্তে ইঞ্জেকশনের সুইয়ের মতো একটি সুই প্রবেশ করানো হয়। তাতে একটি ক্যামেরা ফিট করা থাকে। এর অপর প্রান্ত কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে। পেটের সবকিছু তাতে দেখা যায়। এবার পেটের অন্য পাশে আরেকটি সিরিঞ্জ দিয়ে অপারেশন করে সবকিছু বের করে আনা হয়। তো এতে অতি সহজেই অপারেশন হয়ে যায়। অপারেশনের কয়েক মিনিট পরেই রোগী ঘরে চলে যায়। আগের যুগে যে অপারেশন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে করতে হতো, তা এ যুগে মিনিটেই হয়ে যায়। আবার সুস্থতাও এতে অতি দ্রুত হয়ে যায়।

হাসপাতালে পড়ে থাকার বদলে এখন অপারেশন হয়ে গেলে তারপরেই রোগী বাড়িতে চলে যায়।

অপারেশন ছাড়াই পাথর গলিয়ে ফেলা

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতে এটিও যুক্ত হয়েছে যে, পাথর এখন পানি করে ফেলা হয় পেটের মধ্যেই। এক প্রকার ঔষধের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করা হয়।

অপারেশন ছাড়াই গুলি বের করা

সাউদী আরবের ঘটনা। এক যুবক তার বন্ধুদের সাথে জঙ্গলে শিকার করতে গেছে। তাদের কাছে এয়ারগান ছিল। ছেলেটি ভুলে একটি গুলি মুখে রাখল। ছোট গুলিটি তার মুখের ভেতর দিয়ে শ্বাসনালীতে চলে গেল এবং সেখান থেকে ফুসফুসে চলে গেল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো।

জিদ্দায় এক ডাক্তারের কাছে নেওয়া হলো। ওই ডাক্তার একটি চিকন তার নিলেন এবং তা মুখ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। ওই তারের মাথায় ছোট একটি ক্যামেরা ফিট করা ছিল। কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত ছিল তারের অপর প্রান্ত। ডাক্তার সাহেব নাক দিয়ে আরেকটি তার প্রবেশ করালেন। তারটি ফুসফুসে গিয়ে পৌঁছল। এদিকে কম্পিউটারের স্ক্রিণে তা দেখা যাচ্ছিল। তারটি গুলিটার কাছে পৌঁছল। ২য় তারটির সাহায্যে ডাক্তার সাহেব গুলিটি ভেতর থেকে বের করে নিয়ে এলেন। এতে অপারেশন ছাড়াই গুলিটি বের করে আনা সম্ভব হলো। তো দেখুন, আজ চিকিৎসা বিজ্ঞান কতখানি উন্নত করেছে।

ইউরোপিয়ান লোকদের দাবি

আমি তো আপনাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিচয় প্রদান করছি। যারা সেই দেশে যাননি তারা এ বিবরণ শুনে মনে করবেন, আমি কোনো সোসাইটির কথা বলছি। সেখানকার প্রতিটি নিয়ম বড়ই কঠোর। কেউ তা লঙ্ঘন করতে পারে না। তারা তাদের দেশ সম্পর্কে দাবি করে, আমাদের দেশ হচ্ছে Country of justice এবং Country of Freedom আর বাস্তবেও তারা তাদের দেশের নিয়ম-নীতির ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান। তাই তারা তাদের প্রত্যেকটি বিষয়কে সুন্দর ও সুবিন্যস্তভাবে পরিচালনা করে। তারা সঠিক সময়ে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায় আর সঠিক সময়ে ফিরে আসে।

যৌনপুজা

আপনি যদি ইউরোপ গিয়ে দেখেন, তাহলে চারিত্রিক দিক থেকে যিনা-ব্যভিচার আর বেঈমানী ছাড়া কোনো প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখবেন না। তো তারা তাদের নফসের খাহেশাতে মত্ত। তারা ব্যাপকভাবে যিনা-ব্যভিচারকে কিছুই মনে করে না। তারা মনে করে, যৌনতার ব্যাপারে আমরা কারো কাছে দায়বদ্ধ নই। আমরা স্বাধীন। তাই পর্দার তো কোনো কথাই নেই; বরং গায়ে একটুখানি কাপড় থাকে মাত্র। ফলে নারী আর মদ পানে তারা অভ্যস্ত। ব্যভিচার তাদের কাছে স্বাভাবিক বিষয়। এ ব্যাপারে তাদের রাষ্ট্রীয় আইনই এমন যে, যে যেভাবে ইচ্ছে যাকে যখন যেভাবে ইচ্ছে ব্যবহার করতে পারবে। যখন যার সাথে ইচ্ছে তার সাথে যে কোনো আচরণ করতে পারে। এ ব্যাপারে তাদের রাষ্ট্রনীতি এটিই। আর অন্য বিষয়গুলোতে তাদের নিয়মনীতি বড়ই সুশৃঙ্খল।

পশ্চিমাদের সুন্দর দিক

প্রিয় সুধী! উল্লিখিত খারাপ বিষয়গুলো ছাড়া তাদের ঐক্যবদ্ধ জীবনের মধ্যে আপনি যে শৃঙ্খলা দেখতে পাবেন, তাতে আপনি বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। আপনি দেখবেন, কিছু বিষয় ছাড়া তাদের দেশের প্রায় সব নীতিই ইসলাম-সমর্থিত। এমনকি তাদের নিয়মগুলো ইসলামের মূলনীতি ও উসূলের আলোকেই প্রণীত। যেমনটি ইনসাফের ব্যাপারে বলা হয়েছে, হযরত আলী (রাযি.)-এর ফরমান, তোমরা কুফুরের সাথে তো রাজত্ব চালাতে পার; তবে জুলুমের সাথে রাজত্ব চালাতে পারবে না। তারা তাদের নিজস্ব ব্যাপারে বড় ইনসাফগার। নিজেদের ব্যাপারে তারা খুব ইনসাফ রক্ষা করে চলে।

তারা প্রত্যেকেই ইনসাফের প্রতি খুব লক্ষ রাখে। কোনো মামলার বাদী কেউ না থাকলে তার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। কারো তত্ত্বাবধায়ক না থাকলে রাষ্ট্র তার তত্ত্বাবধান করে। এভাবে তারা তাদের রাষ্ট্র চালায়। অথচ এটি ছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বভাব। এসব তো আমাদের খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই ছিল।

সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর কথা

একবার সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী বললেন, দেখো, এখন আমার বয়স বেশী হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারছি এবং গভীরভাবে অনুভব করতে পারছি, আমার এখন আর সমাজ ও জাতির নেতৃত্ব দেওয়ার সমর্থ্য নেই। আমি জাতির সকল ইচ্ছে মনে হয় পূরণ করতে পারছি না। আমি অতটা মেহনত করতে পারছি না। যতটুকু আমাকে করতে হবে আমি তা করতে পারছি না। তাই আমি সামনের বছর ইস্তফা দিয়ে অব্যাহতি নিতে চাচ্ছি। এবার গোটা জাতি বলতে লাগল, আপনি অব্যাহতি নিবেন না। মন্ত্রী বললেন। না-না, আমি বুঝতে পারছি, আমি যে দায়িত্বে মসনদে আছি তার সাথে আমি ইনসাফ করছি না। পুরো বছর লোকেরা বলতে থাকল, আপনি ইস্তফা নিবেন না, আপনি অব্যাহতি নিবেন না। কিন্তু বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ঠিকই তিনি অব্যাহতি নিয়ে নিলেন।

রাষ্ট্রপতির অযোগ্যতার প্রমাণ

প্রধানমন্ত্রী যখন তার দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করলেন, তখন নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিল। সে সময় দেশটির রাষ্ট্রপতি ছিলেন একজন নারী। তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য সর্বদিক দিয়ে যোগ্য

ছিলেন। সকলেই তাকে প্রধানমন্ত্রী বানাবে বলে স্থির করেছিল। তো তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগের দিন রাষ্ট্রীয় কাজে একবার বাইরে গেলেন। তার সাথে তার ছেলেও ছিল। বাইরে যাওয়ার সময় তার পদমর্যাদার যে কার্ড আছে, সেটি নিতে ভুলে গেলেন। প্রয়োজন শেষে ফেরার পথে তার ছেলে বায়না ধরল, মা আমাকে ওই জিনিসটি কিনে দাও। এতে তিনি মুসিবতে পড়ে গেলেন। বের হয়েছেন রাষ্ট্রীয় কাজে রাষ্ট্রীয় খরচে। এখন ছেলেকে জিনিসটি কিনে দেবেন কীভাবে। তারপর তিনি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ৩০০ শত মার্কিন ডলার খরচ করলেন। ছেলেকে জিনিসটি কিনে দিলেন। বিষয়টি লক্ষ করেছে তার সাথে একজন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা। এ রাষ্ট্রপতি মহিলা বাসায় এসে সাথে-সাথে নিজের একাউন্ট থেকে রাষ্ট্রীয় একাউন্টে আবার ৩০০ মার্কিন ডলার পাঠিয়ে দিলেন। পরের দিন যখন তাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করার জন্য পরামর্শ সভা বসল, তখন ৩০০ মার্কিন ডলার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে খরচ করার কারণে তাকে অপরাধী প্রমাণ করা হলো। অথচ অন্য কর্মকর্তারা তো আর জানে না এই মহিলা রাষ্ট্রপতি তার একাউন্ট থেকে রাষ্ট্রীয় একাউন্টে ৩০০ ডলার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তো এই সামান্য একটু অনিয়মের কারণে বলা হলো, এই রাষ্ট্রপতি আমাদের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য নন। অথচ মহিলা বুঝতেই পারল না, এই কাজটা তার অন্যায় হয়ে গেছে। এভাবেই তাদের দেশ চলছে। তাদের দেশের নিয়ম-কানুন এভাবেই চলছে।

পার্লামেন্টের সদস্যের উত্তর প্রকাশ

যখন এই মহিলা রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করার ব্যাপারে অযোগ্য বলা হলো, তখন আর কেউই নিজেকে নিজে এই পদের জন্য পেশ করতে প্রস্তুত হলো না। আপনি শুনে অবাক হবেন, ওই সুইডেনে দীর্ঘ এক বছর পর্যন্ত প্রত্যেককে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছিল প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করল না। একজন বলে, ভাই আপনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করুন। সাথে-সাথে এই ব্যক্তি বলে, ভাই আমি এর উপযুক্ত নই। এভাবে তারা চলছে। এ ঘটনা শুনে সাথে-সাথে আমার মনে হয়ে গেল, আমাদের পূর্ববর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের কথা। আমাদের মুসলিম শাসকদের কথা। তারাও এমন ছিলেন। যখন তাদেরকে যিম্মাদারী গ্রহণ করতে বলা হতো, তাঁরা বলতেন, ভাই আমি তো এত বড় জিম্মাদারী বহন করতে সক্ষম নই।

ইউরোপে সামাজিক জীবনের অধিকারগুলোর প্রতি যত্ন প্রদান

ইউরোপে গিয়ে আপনি আমাদের ইসলামের সমাজনীতি ও আদর্শগুলোকেই বড় সুন্দরভাবে মানবের জীবনে বিদ্যমান দেখতে পাবেন। তারা ইসলাম হিসেবে পালন ও মান্য করছে না। তারা আধুনিকতা বলে মান্য করছে। তারা তো ওসব জিনিস ইসলাম থেকেই গ্রহণ করেছে। কারণ, ওসব তো ইসলামে বলে দেওয়া হয়েছে সেই ১৪ শত বছর পূর্বে। তাই তো দেখা যায়, আপনি সেই দেশে গেলে দেখতে পাবেন, তারা তাদের পাড়া-পড়শীর সাথে এমন আচার-আচরণ করছে, যা কুরআন ও সুন্নাহে ইসলামী শিষ্টাচার হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তারা প্রতিবেশীদের ওইভাবেই অধিকার ও হক আদায় করে যেভাবে ইসলামী আদর্শ মোতাবেক একজন মুসলমানের শিষ্টাচার হওয়া উচিত। তো আপনি ইসলামে বর্ণিত শিষ্টাচারগুলোই তাদের মাঝে বিদ্যমান দেখতে পাবেন। তাই তো আমাদের এসব উশৃঙ্খলতার দেশ থেকে সেসব দেশে কোনো মানুষ গেলে তার কাছে ওইসব দেশের নীতি-আদর্শ বড় সুন্দর লাগে। এমনকি আমার কিছু বন্ধু-বান্ধব ওখানে আমাকে প্রশ্ন করেছে, কুরআনে যে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, তা এখানকার কথা-ই নাকি? বড় আশ্চর্যের ব্যাপার! আমি বলি, আপনারা জান্নাতকে কি মনে করেছেন? জান্নাত তো জান্নাতই। শুধু সুশৃঙ্খলও নীতিবদ্ধ জীবনের নাম তো জান্নাত নয়। আর এই নীতিগুলো তোমাদের দেশে এগুলোতো আমাদের কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত নীতিই। তোমাদের নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত কোন ভালো নীতি তো আমি দেখি না। তোমাদের মাঝে ভালো যা দেখি, সেগুলোতো দেখছি, ইসলামে বিবৃত হয়ে আছে সেই ১৪ শত বছর আগে থেকে!

আপনি যদি কোনো মুসিবতে পড়ে যান পশ্চিমা দেশগুলোতে, আপনি কোনো মাধ্যম পাচ্ছেন না, কেন্দ্রীয় কোনো কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হচ্ছে বা ফোন করতে হচ্ছে, অথচ আপনি কোনো মাধ্যম পাচ্ছেন না; তখন সেসব দেশে দেখবেন, আপনার আশপাশের পরিচিত-অপরিচিত সকলেই আপনাকে বলছে- Can I help you? আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি? সেখানে অফিসিয়াল কোনো কাজ করাতে, ফাইল নাড়াতে বা যে কোনো ব্যাপারে আবেদন মঞ্জুর করাতে একটি পয়সাও খরচ হবে না। বরং দেখবেন, প্রত্যেকটা কাজ আপন গতিতে সম্পাদিত হয়ে চলছে।

সেখানকার সরকারি কার্যালয়গুলোতে লোকেরা এমন যত্নের সাথে কাজ করে, যেমন আমাদের দেশগুলোতে প্রাইভেট কার্যালয়গুলোতে কাজ চলে। কোনো মানুষ কার্যালয়ে বসে নিজের ব্যক্তিগত কাজে কার্যালয়ের ফোন দিয়ে

একটি মিনিটও কথা বলে না। কোনো মানুষ অফিসের কাগজে নিজের কোনো লেখা পর্যন্ত লেখে না! সেখানে কাজ মানে কাজই। কাজ মানে ধান্দাবাজি আর ফাঁকিবাজি নয়। তারা কাজ কাজের মতই করে। অনিয়ম করে না। যদি সাংগঠনিক জীবনে মানুষের কোনো জরুরত দেখা দেয়, তাহলে রাষ্ট্রপক্ষ সহায়তা করে। কোনো মানুষ কঠিন বিপদে পতিত হলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে রাষ্ট্র তাকে সাহায্য করে। সেখানে মানবের অধিকারসমূহ বড় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। কোনো মানুষের মানবিক অধিকার লুণ্ঠিত হতে দেওয়া হয় না। এই যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সহায়তা করার ব্যবস্থা এটি তো ইসলামেরই ব্যবস্থাপনা। এই যে বাইতুল মালের ব্যবস্থা এটি তো মানবজাতিকে ইসলামই শিক্ষা দিয়েছে। অথচ আজ মুসলিম দেশসমূহ এই শিক্ষাকে ভুলে গেছে। নিজেদের শিক্ষা ছেড়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। অশান্তিতে নিজেদের দেশ ছেড়ে তাদের দেশে পাড়ি জমাচ্ছে। অথচ তারা যে এই ব্যবস্থাপনাগুলো নিয়েছে, তা তো আমাদের ইসলাম থেকে নিয়েছে। আমাদের কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নিয়েছে। তারা আমাদের কুরআন ও সুন্নাহর রাজনীতি ও সমাজনীতিকে কার্যকর করে কেমন সুখী-সমৃদ্ধ জীবন যাপন করছে। অথচ আজ আমরা আমাদের এই শিক্ষাকে কার্যকর করতে পারছি না। আমরা আমাদের নীতি ও আদর্শগুলো বাস্তবায়ন করতে পারছি না। ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় এবং বিচারব্যবস্থায় তারা এমন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যে পদ্ধতি ইসলামে বিবৃত হয়েছে। আমি সেসব দেশে ইসলামী আইন যতটা দেখেছি, আমাদের মুসলিম দেশেও ইসলামী আইন ততটা বাস্তবায়িত নেই। আজ আমরা মুসলমান বা আমাদের অর্থনীতি আমাদের রাষ্ট্রনীতি আমাদের সমাজনীতি এমনকি আমরা আমাদের মানবিক মূল্যবোধটুকুও ভুলে গেছি। আমরা আমাদের মানবিক চাহিদা ও দাবিটুকুও আজ ভুলে গেছি।

আজ মুসলমান আছে ইসলাম নেই। আবার যে দেশে মুসলমান নেই তবে ইসলামের বহু নীতি সেখানে বাস্তবায়িত আছে। তাই তো ওইসব দেশের লোকেরা বড় সুখ-সমৃদ্ধ জীবন যাপন করছে। তারা মেহনত করে সে মেহনতের ফল প্রাপ্ত হয়। তারা শ্রম দেয় সে শ্রম তাদেরকে সমৃদ্ধ করে। তাই তো তারাই আজ সারা পৃথিবীকে দিক নির্দেশনা দেয়। আজ সারা দুনিয়া তাদের কথায় উঠে বসে। তাদের আজ মানুষ রেফারেন্স বানায়। সারা দুনিয়া তাদের আদর্শ দিয়ে নিজেদের ওজন করে। অথচ কী হওয়ার কথা ছিল। হায় আমাদের দেশের শাসকবর্গ! হায় আমাদের দেশের রাষ্ট্রপ্রধান!

রাজনৈতিক পার্থক্য

রাজনৈতিক অবস্থা তাদের এমন যে, বহির্বিশ্বের সাথে, অন্যসব দেশের সাথে তারা তাদের জুলুমকে ইনসাফ বলে গলা ফাটায়। এটি তাদের এক বড় কুট-কৌশল। তাদের রাজনৈতিক অবস্থান হলো, বহির্বিশ্বের সামনে নিজের সামান্য অধিকার তো নষ্ট হতে দেই না; বরং নিজের যা অধিকার নেই তাও তারা করে। তাদের রাজনীতিবিদরা সারা দুনিয়ায় এবং নিজেদের দেশের মধ্যে যা করে সেসবের মাঝে অনেক পার্থক্য আছে। তারা প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে নিজের দেশের লোকদের শান্ত রাখতে। নিজের দেশের লোকদের সুখী ও সমৃদ্ধ রাখতে। তাই মানুষ কাজও করে আবার নিজের দেশের ভাইদের প্রতি খেয়ালও রাখে।

নিজের দেশের লোকদের খুব যত্ন নেয়। আবার এরাই অন্য দেশের উপর জুলুমের মিশন নিয়ে হামলে পড়ে। নিজেদের দেশের সাথের আচরণ এবং অন্য দেশের সাথের আচরণে তাদের মাঝে অনেক-অনেক এবং অনেক পার্থক্য আছে।

শিক্ষাব্যবস্থা

পশ্চিমা দেশগুলোর আরেকটি বিশেষ গুণ হচ্ছে পড়াশোনা। তাদের দেশের ৯৯.৯% লোকেরা পড়াশোনা করে। তাদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অনেক মোটা অংকের বাজেট খরচ করা হয়। আরে ভাই! ওসব দেশের প্রাইমারি, কিন্ডারগার্ডেন ও সাধারণ স্কুলের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় এবং যে সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবস্থাপনা প্রদান করা হয়, তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটি থেকে বেশী অগ্রসর। আমি বরং এভাবে বলব যে, সেসব দেশের যে বিষয়টির প্রতিই আপনি লক্ষ করবেন, দেখুন উত্তরোত্তর তা উন্নত হচ্ছে। সমৃদ্ধ হচ্ছে। সারা দেশের মাঝে আপনি অন্যরকম একটি পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা দেখতে পাবেন।

রুশদের একটি আশ্চর্য অভিযোগ

এটি এডুকেশনের ওই কেন্দ্র যেখান থেকে শিক্ষানবিদরা বের হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। রাষ্ট্রের উন্নয়নে তারা কাজ করে। রুশরা ৮/৯ বছর পূর্বেই এই অভিযোগই তুলে ছিলো– আমি আমেরিকা থেকে তো বিস্মিত হয়েছি তাদের অবস্থা দৃষ্টে! তবে তাদের ইউনিভার্সিটি কলেজের অবস্থা থেকে বড় হতাশ হয়েছি। প্রতিটি দিনই আমি নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় অভিভূত হচ্ছি! তাদের

লাখো লাখো যোগ্য উপযুক্ত এবং দক্ষ কর্মী বাহিনী গবেষণা করছে! অবিরত শ্রম দিচ্ছে! তাদের এসব সাইন্সিকেল ফিকেশন এবং গবেষণাধর্মি থিসিস পড়ে পড়ে তো যেন আমাকে ঝাঁড় ফুক করা হচ্ছে! তাদের উন্নতি অগ্রগতির কমতি তো নেই। সেই রুশদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা রাষ্ট্রের উন্নয়নে কাজ করছেই! তবুও তাদের অস্থিরতার শেষ নেই কেন?

শিশু শিক্ষাব্যবস্থা

তারা নিজেদের শিশুদের শিক্ষা প্রদানে যথেষ্ট যত্নবান। আমি একবার নিউইয়র্কে যাচ্ছিলাম প্যারিস থেকে। আমি বিমানে বসলাম। একটু পর আমার সাথে সিটে এসে একজন তরুণী নারী এসে বসল। সে এসেই নিজের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি মোতাবেক হ্যালো বলে সম্বোধন করল। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি বললাম, পাকিস্তান থেকে। সে বলল, আমি আমার জীবনসঙ্গীর কাছে নিউইয়র্ক যাচ্ছি। তো আমার কাছে কিতাব ছিল। আমি কিতাবটি পড়তে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর বিমানবালা খাবার নিয়ে এল। আমি খাবার খাব না বলে জানিয়ে দিলাম। কারণ, আমি জানি এই খাবার প্যারিসে তৈরি করা হয়। আর তাদের তো দীন-শরীয়ত বা হালাল-হারামের কোনো খেয়াল নেই। তাই আমি তা খেতে অক্ষমতা প্রকাশ করলাম। তো আমার সাথের ওই মেয়েটি সামনের টেবিলেই খাবার খেতে লাগল। মেয়েটি তো আমার একেবারেই পাশে। তাই তার নড়াচড়া কাজকর্ম আমার চোখে পড়ছিল। মেয়েটা তার সন্তানকে কোলে বসাল। চামুচে খাবার নিয়ে নিজের মুখে দিল। ছোট বাচ্চাটি আওয়াজ করে উঠল mom! অর্থাৎ বাচ্চাটি বোঝাতে চাইল, আমাকেও দাও। বাচ্চাটি এই আওয়াজ দেওয়ার পর এই মেয়েটি তার এই বাচ্চাটির মুখেও সামান্য খাবার তুলে দিল। বাচ্চাটি যখন খাবারটুক খেয়ে নিল, তখন মা বলল, Say, thank you. (আমরা যেমন বলি- শুকরিয়া)। এই ছোট বাচ্চাটাও ফের মাকে বলল, mom! thank you. এবার মা আবার খাবার খেতে লাগলেন। সামান্য কিছুক্ষণ পরে বাচ্চাটা আবার ইশারা করল। এবার মা আবার চামুচ দিয়ে সামান্য খাবার বাচ্চার মুখে তুলে দিল। বাচ্চাটা ওটা খেয়ে নিলে মা বলল Say, thank you. বলো, তোমাকে ধন্যবাদ! তো ওই মা তার সন্তানকে এক চামুচ এক চামুচ খাবার দেয় আর সন্তান থেকে thank you বলিয়ে নেয়। খাবার সময় সামান্য কিছু খাবার মায়ের কাপড়ে পড়ে গেল। বাচ্চাটা তা দেখতে পেল। সে ইশারা করে বলতে লাগল

Mom! মা তা দেখে টিস্যু দিয়ে সে কাপড় পরিষ্কার করে নিল। পরিষ্কার করার পর মা ওই বাচ্চাকে বলল, thank you! লক্ষ করলাম, খাবারের মাঝে এই মেয়ে মা তার বাচ্চাকে ৩৬ বার thank you! বলিয়েছে। বলুন, ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অভ্যাস ওই বাচ্চার মধ্যে তৈরি হবে কি, হবে না? আরে এটি তো তার মুখের বুলি হয়ে যাবে। আমরা কি আমাদের বাচ্চাদের এমন করে শুকরিয়া আদায়ের অভ্যাস করাতে পেরেছি?

আমরা বন্ধুগণ! এই শিক্ষা তো ইসলামই প্রথম দিয়েছে। হাদীছে পাকে বর্ণিত হয়েছে-

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ

যে মানবের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না। তো আজ আছে কি আমাদের কোনো মা, যে তার সন্তানকে শুকরিয়া আদায়ের শিক্ষা হাতে-কলমে প্রদান করবে? তাই তো বাচ্চারা বড় হয়ে আর শুকরিয়া আদায়ে অভ্যস্ত হয় না। মা বাচ্চার জন্য কত কষ্ট করেন। বড় হয়ে সন্তান তার শুকরিয়া আদায় করে না। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের জন্যে কত কষ্ট করে; অথচ ছোট ভাই বড় ভাইয়ের শুকরিয়া আদায় করে না। আমাদের শিক্ষা ও আদর্শকেই কাজে লাগিয়ে পশ্চিমারা আজ সভ্য জাতি হয়ে গেছে। আর আমাদের শিক্ষা আমরা ভুলে গেছি!

নিয়ম-নীতি

আমি ওয়াশিংটনে একটি বহুতল ভবনে কিছুদিন ছিলাম। সেই ভবনের কাছেই ছিল একটি গ্রাউন্ড। সেখানে একেবারে ঠিক ৬ : ৪৫ মিনিটে একটি স্কুলগাড়ি আসে। বাচ্চারা সকলে ৬ : ৩০ এর ভেতরে ওই গ্রাউন্ডে চলে আসে। বাচ্চারা তো ছেলেমি করবেই, দুষ্টুমি করবেই। তারা দৌড়ঝাপ হই-হুল্লোড় করতে থাকে। এ ওকে দৌড়ায় ও একে দৌড়ায়। এভাবে তারা সময় কাটাতে থাকে। তবে তারা ১৫ মিনিট পূর্বেই সব সময় এখানে উপস্থিত হয়ে যায়। ঠিক যখন ৬ : ৪৫ বাজে, তখন দেখলাম, একটি গাড়ি এসে ব্রেক করল। হর্ণ বাজাল। হর্ণ শুনে আমিও ঘড়ি দেখলাম। ঠিক ৬ : ৪৫ বাজছে। আমি জানালা দিয়ে বাচ্চাদের কাণ্ড-কীর্তি দেখছি। হর্ণের আওয়াজ শুনে যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সব ছেড়ে আপন-আপন ব্যাগ নিয়ে নিল এবং একেবারে গাড়ির পাশে এসে সোজা হয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। কন্ডাক্টর নেই। শিক্ষক নেই। এমনকি তাদের বাবা-মা কেউ নেই। ছোট-ছোট এই

বাচ্চারা সকলেই সুন্দর করে সোজা লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। যে বাচ্চারা সবচেয়ে ছোট তারা সবার সামনে দাঁড়াল। এরপর যারা তাদের চেয়ে বড় তারা দাঁড়াল। এরপর যারা তাদের চেয়ে বড় তারা দাঁড়াল। এভাবে ধারাবাহিকভাবে ছোট থেকে বড় সকলে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। একেবারে যারা বড়, যাদের দাঁড়ি-মোচ গজিয়েছে, যারা যুবক, তারা সবার শেষে দাঁড়াল। ড্রাইভার যখন দেখল, লাইন হয়ে গেছে, তখন বলল First অর্থাৎ প্রথমজন উঠো! শুনে প্রথমজন উঠল। তারপর ড্রাইভার বলল Next পরেরজন উঠো। এতে পরের জন উঠল। আপনমনে পছন্দ মত সিট নিয়ে বসে গেল! এবার ড্রাইভার বলতে থাকল Next! Next! Next প্রত্যেকবার Next বলে সাথে-সাথে পরেরজন উঠে যায়। প্রত্যেকেই আপন পছন্দমত স্থান নিয়ে বসে যায়। সিট বাই সিট সকলে যখন বসে যায়, তখন ড্রাইভার দরজা বন্ধ করে গাড়ি চালিয়ে দেয়।

আমি এ ঘটনা দেখার পর দীর্ঘ সময় ধরে শুধু চিন্তার জগতে বিচরণ করেছি। ভেবেছি, এত নীতিপরায়ণ এরা! এতটা সভ্য এরা! এগুলো কত কষ্ট করে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমাদের মাঝে তো মধ্যবয়সী মানুষই বিমানে বেশী সফর করে। বিমানে তো ছোটরা নেই! সেখানে বিমানের টিকেট থাকে। প্রত্যেকের সিট নম্বর থাকে। মাইকে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। আরো কত রকম তত্ত্বাবধান করা হয়। তারপরও আমরা উচ্ছৃঙ্খলতা করি। অথচ এই ছোট-ছোট বাচ্চারা দিব্বি সব কিছু নিয়ম মত সঠিকভাবে চলছে। কেউ তাদের গাইড দিতে হচ্ছে না। আবার আমাদেরকে ফ্লাইটের আগে যে বিশ্রামাগারে রাখা হয়, সেখানে বিমানের লোকেরা আসে। সময় হলেই এলান করে। প্রত্যেককে বিমানে চড়তে বলে। টয়লেটে পর্যন্ত খুঁজে আসে কেউ রয়ে গেল কিনা। আমাদের বড়রা কত উল্টো-পাল্টা করে। আমাদের মহিলারা তো পিছনেই পড়ে থাকে। ওঠে ওঠে না এমন করতে থাকে। আমাদের অনুভূতিই যেন ভোতা হয়ে গেছে। আমাদের তো উচিত নারীদের আগে আরোহণ করতে দেওয়া। সকলে সুশৃঙ্খলভাবে লাইন ধরে বিমানে ওঠা! আমাদের উচিত নিজে লাইনে পিছনে দাঁড়ানো। মুসলিম ভাইকে আগে উঠতে দেওয়া। আমরা আমাদের এই ইসলামের শিক্ষাটুকু মান্য করি না। অথচ তারা আমাদের ইসলামের এই নীতি, ইকরামুল মুসলিমীনের এই আদর্শ নিজেদের মধ্যে স্থাপন করে রেখেছে।

মোটকথা, এসব নিয়মতান্ত্রিকতা ও শৃঙ্খলা ইউরোপ-আমেরিকার মানুষের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো অবশ্যই তাদের ভালো দিক। যেকোনো বড় শত্রুই ভালো একটি কাজ করুক না কেন সেটি যে ভালো তাতো বলতেই হবে। কাজটি একজন দুশমন করে থাকলেও ভালো; তাকে সমর্থন দিতেই হয়। তবে মনে রাখা চাই, তারা বাহ্যিক কাজকর্মে বেশ সুশৃঙ্খল হলেও তাদের মাঝে যথেষ্ট মন্দ স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে। তাদের মাঝে অনেক খারাবী ও বদ আখলাকী রয়েছে। চারিত্রিক দিক থেকে তারা কিন্তু চূড়ান্ত অধঃপতনের শিকার। এখন আমরা তাদের অধঃপতন নিয়ে আলোচনা করব।

পশ্চিমাদের অধ:পতিত সভ্যতা

মাতা-পিতাকে নিঃসঙ্গ রেখে যাওয়া

ওইসব দেশের নিয়ম-নীতি বড় কঠিন। জীবন পরিচালনার রীতি-নীতি ওইসব দেশে বড় সুন্দর। কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে তাদের কোনো নিয়ম নীতি নেই বা যে নিয়ম নীতি আছে, তা অত্যন্ত অধঃপতিত। এমনকি চরম অমানবিক। ফলে তাদের রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা সুন্দর থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনে তাদের কোনো শান্তি নেই, সুখ নেই। নিদ্রা পর্যন্ত নেই। কারণ, সে দেশে ১৮ বছর বয়সে সন্তানরা মা-বাবা থেকে পৃথক হয়ে যায়। অন্যত্র চলে যায়। গার্লফ্রেন্ড নিয়ে জীবন কাটানো শুরু করে। প্রত্যেকটা ছেলেমেয়ে ১৮ বছরের অপেক্ষা করতে থাকে। ১৮ বছর হলেই তারা মা-বাবাকে আল-বিদা জানিয়ে দেয়।

বাবা মা ও সন্তানের মাঝে নিবিড় বাঁধন সৃষ্টির জন্য এবং মাতা-পিতা ও সন্তানের বন্ধন অটুট রাখার জন্যে সেসব দেশে কোনো উন্নত ব্যবস্থা জানা নেই। এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত কোনো নিয়ম-কানুন নেই। সারা বছরে শুধু Mother Day তে এসে মাকে কিছু ফুল প্রদান, কিছু উপহার দান ছাড়া মায়ের অধিকার আর কিছু আছে কিনা তা তারা জানেই না। তারা ওই দিবসে সামান্য শ্রদ্ধা নিবেদনকেই মনে করে মায়ের অধিকার ও হক আদায়। বাবার তো ঠিকানা তাদের জানা নেই-ই! তাদের অনেকেই জানে না তাদের বাবা কে! তারা তাদের মাকেই চিনে শুধু! মায়ের পরিচয়েই তারা বড় হয়! তারা পিতৃপরিচয়হীন! তাদের বাবার পরিচয় নেই!

একটি মেয়ে ওয়াশিংটনে থাকত। তার মা-বাবাও ওয়াশিংটনেই থাকে। কিন্তু সেই মেয়ে বলে, পেছনের সাত বছর থেকে আমি আমার মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করার কোনো সুযোগই পাইনি। কারণ, ১৮ বছর বয়সে সন্তানদের মাঝে যৌবনের জোয়ার আসে। যৌনঝড়ে তারা উন্মাদ থাকে। ফলে তারা যৌনচারিতায় এতই উন্মাদ ও উন্মত্ত থাকে যে, তারা দুনিয়ার আর কোনো কিছুর পরওয়া করে না। অথচ বৃদ্ধ মা বা বৃদ্ধ বাবার তখন খেদমতের প্রয়োজন হয়। তাদের সভ্যতার সবচেয়ে নিচু, হীন ও অমানবিক অধ্যায় এটা। ঘরে হাজারো উপকরণ থাকুক তাতে কী হবে। মানুষ তো গোস্তে-রক্তে গড়া জীব। মানুষের মাঝে তো আবেগ-উচ্ছ্বাস আছে। ফলে মাতাপিতা সন্তানের দ্বারা যে প্রশান্তি প্রাপ্ত হবে, হাজারো ধাতব পদার্থের রোবট আর সুখসামগ্রী দিয়ে কি সেই প্রশান্তি কখনও পাওয়া যাবে? সোনায় নির্মিত খাট-পালংক আর সামগ্রী দিয়ে কী হবে তখন? লাগামহীন চলতে থাকে সন্তানরা। মাতা-পিতা পড়ে থাকে অসহায়ভাবে। এবার রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ওইসব বেওয়ারিশ বুড়া-বুড়ীদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম তৈরী করে দিয়েছে। সেখানে লোক ও সুইপার রাখা আছে। সুন্দর ব্যবস্থাপনাও আছে। সেখানে সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের খানচার মধ্যে রাখা হয়। পোষা প্রাণীর মত প্রতিপালন করা হয়। তাদের হৃদয়টাকে প্রশান্ত রাখার মত, অন্তর ঠাণ্ডা রাখার মত কেউ সেখানে নেই। সেখানে বড় অশান্তিতে ও অস্থিরতায় কাটে বুড়া-বুড়ীদের জীবন। একসময় বিরক্ত হয়ে তারা কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। বিষের ইঞ্জেকশন নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। আর কেউ এমনিতেই মরে যায়। ছেলে সন্তান শেষবারের মত এসে দেখেও যায় না। টাকা পাঠিয়ে দেয়। লাশ প্যাকিং করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। ব্যস এই তাদের পারিবারিক জীবন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপা তো বড়ই উন্নত! কিন্তু পারিবারিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ তাদের দেশে।

সুইডেনে তালাকের অবস্থা

সুইডেন একটি উন্নত রাষ্ট্র। এর ব্যবস্থাপনা বড়ই উন্নত। তাদের অবস্থা এমন যে, আমাদের দেশে বাজেট ঘোষণা হলে আমরা বলি এত অর্থ-কড়ি কোথা থেকে আসবে। আর তারা বাজেট ঘোষণা করে চিন্তা করে, টাকাগুলো কোথায় লাগাব। তাদের দেশে ভাঙাচোরা কিছুই নেই। সবই উন্নত। রাস্তা-ঘাট, গাড়ি-বাড়ি সব উন্নত। অঢেল তাদের অর্থ-সম্পদ।

সুইডেনের এক কোম্পানির ডাইরেক্টর আমাকে বলেছেন, যদি গোটা জাতি কাজকর্ম ছেড়ে দেয় আর যেভাবে আয়েশ-আরামে মানুষ সময় পার

করছে, সেভাবেই জীবনটা যাপন করে, তাহলে রাষ্ট্রের কোষাগারে এত পরিমাণ অর্থ মজুদ আছে যে, তাতে ৬ বছর মানুষদের বসিয়ে-বসিয়ে খাওয়ানো যাবে।

তাদের দেশে যাদের চাকরি নেই, তাদের সরকার ভাতা দেয়। আবার সরকারের ভাতার দিকে তাকিয়ে তাদের কেউ বসে থাকে না। তারা বরং কাজ করে, কাজ খোঁজে। নতুন-নতুন কর্মক্ষেত্র আবিষ্কার করে। তাদের মধ্যে যাদের বাড়ি নেই, সরকারি ব্যবস্থাপনায় ওদেরকে বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়। যারা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাদের সরকারিভাবে সুচিকিৎসা দেওয়া হয়। ফলে তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা সাধারণত হয়েই যায়। এরপরও মানুষের চাহিদা তো রয়েই যায়।

আবার মানুষের জৈবিক চাহিদা আছে। সে ব্যাপারে রাষ্ট্রপক্ষের কোনো ব্যবস্থাপনা নেই। জৈবিক চাহিদার ব্যাপারে তারা কোনো আইন প্রণয়ন করেনি। ফলে একটি প্রচণ্ড রকম উন্মাদনা, স্বেচ্ছাচারিতা ও উন্মুক্ত যৌনতা তাদের মাঝে বিদ্যমান। তাদের এই ব্যবস্থাপনাটাই শুধু নিকৃষ্ট। অবশ্য এই একটি নিকৃষ্ট ব্যবস্থাপনার কারণে তাদের সর্বপ্রকার উন্নতি-অগ্রগতি আজও কলঙ্কিত। আজো তারা শেষ পর্যন্ত ঘৃণিত হিসেবেই আলোচিত হয়। তো তাদের রাষ্ট্রপক্ষ থেকে এই বিষয়ের হিসাব নেয়া হয় না যে, কে কখন কার সাথে থাকছে। কার সাথে মিলিত হচ্ছে, কার সাথে গোপন অভিসারে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপক্ষ এ ব্যাপারে কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ বা আইন প্রয়োগ করে না।

ফলে তারা অত্যন্ত অমানবিক এই যৌনচারিতার উন্মাদনায় প্রচণ্ডভাবে লিপ্ত হয়ে পড়ে একেবারে ছোট বয়স থেকেই। ফলে ৭/৮ বছরের মাঝেই তারা যৌনক্ষয়ের শিকার হয়ে যায় এবং সাংসারিক জীবনের ব্যাপারে হয়ে পড়ে আগ্রহহীন। এভাবে পারিবারিক বন্ধন আর গড়ে ওঠে না। যে যেভাবে পারে সেভাবেই নিজের জৈবিক চাহিদা পূরণ করে যায়।

তো সব কিছু মিলিয়ে তাদের অবস্থা এমন যে, বাহ্যিক ভোগ-বিলাসের উপায়-উপকরণের কোনো অভাব তাদের নেই। তবে একথা সত্য যে, সাংসারিক রূপরেখা তাদের জীবনে অনুপস্থিত। কখনও সাংসারিক অবস্থা সৃষ্টি হলেও তাদেরও প্রায় ৭০% নারী শেষ পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যায়। সবাই নিজের মত করে সব করে বেড়ায়। এটি কেন হচ্ছে? কারণ, তারা এই সাংসারিক রূপরেখাকে বড় বোঝা মনে করে।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম নেই

ওই দেশগুলোতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম-ভালোবাসা নেই। ৩৪ বছরের সংসারজীবন; তবুও স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসতে পারেনি, স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসতে পারেনি। তাদের মাঝে একে অন্যকে বিশ্বাসই করতে পারে না। একে অন্যের অধিকার রক্ষা করার মানসিকতাই তাদের মাঝে গড়ে ওঠে না। সামান্য বিষয়েই তাদের মাঝে ঝগড়া বেঁধে যায়। অতি সাধারণ কোনো কারণেই স্বামী স্ত্রীকে বলে দেয় I dont care. আবার পাল্টা স্ত্রী তার স্বামীকে বলে দেয় I dont care. ফলে স্বামী ব্যাগ গুছিয়ে এক পথ ধরে আর স্ত্রীও ব্যাগ গুছিয়ে অন্য পথ ধরে। দুজন চলে যায় দুদিকে। ৩৫ বছর সংসার করে। তবুও স্ত্রী তার নিজের কামাই দিয়ে নিজে চলে। আবার স্বামী তার নিজের কামাই দিয়ে নিজে চলে। কখনও বাবুর্চি রাখতে হলে তার খরচও দুজনে ভাগাভাগি করে প্রদান করে। এর চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হলো, স্বামী-স্ত্রী দুজন একসাথে রাস্তায় বের হলে যার যার ভাড়া সে নিজে দেয়। আবার স্বামীর কাছে টাকা না থাকলে স্ত্রী থেকে ঋণ নিয়ে ভাড়া দিতে হয় এবং পরে এ ঋণ শোধ করতে হয়। সেসব দেশে অন্যকে প্রাধান্যদান এবং আপন ভাইয়ের ইকরাম করার কোনো কাল্পনিক রূপও নেই। যে যার মত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত সবাই। তারা স্বামী-স্ত্রী ঋণ আদান-প্রদান করে। নিজের খরচ নিজে বহন করে। স্বামী স্ত্রীকে ফ্রি সহায়তা করে না। স্ত্রীও স্বামীকে ফ্রি সহায়তা করে না। তো ভোগ-বিলাসের হাজারও উপকরণ থাকলেও, আয়েশ-আরামের শত ব্যবস্থা থাকলেও এবং উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক জ্ঞান এবং টেকনোলজির অগ্রগতি থাকলেও তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম-ভালোবাসা নেই। বিশ্বাস নেই। সহায়তার মানসিকতা নেই। একে অন্যের দায়িত্ব গ্রহণের দায়বোধ নেই। অথচ হাজারো অপকর্ম সত্ত্বেও আমাদের দেশে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কত মহবত থাকে। কত প্রেম-ভালোবাসা ও মমতা থাকে। স্বামী স্ত্রীকে সহায়তা করে। আবার স্ত্রী স্বামীকে সহায়তা করে।

ইসলামের বরকত

আমাদের পারিবারিক এই প্রশান্তি, আমাদের সাংসারিক এই মধুর বন্ধন এটি আমাদের ইসলামের বরকতে হয়েছে। আল্লাহ রবুল ইযযাত ইরশাদ করেছেন-

لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

'দুনিয়ায় যা কিছু আছে, তাও আপনি খরচ করে দেন তবুও তাদের মাঝে প্রেম ভালোবাসা সৃষ্টি করতে পারবেন না।' [১]

...وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ

'তবে আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম ও মমতা সৃষ্টি করে দেন।'[২]

তো এটি দ্বীনে ইসলামের বরকত। আজ আমাদের এত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, আমাদের মাঝে এত সব অপ্রাপ্তি থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার চতুর্মুখী শত প্রকার ঝামেলা থাকা সত্ত্বেও, শত রকম ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মাঝে কত ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি বিদ্যমান। সবার মাঝে মহবতের বন্ধন কত মজবুত। মা-বাবা ও সন্তানের মাঝে মধুর ভালোবাসা বিদ্যমান। ছেলে প্রবাসে গেলে বুড়া মা-বাবা প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে থাকে কখন আসবে ছেলে। দু'আ করতে থাকে, আল্লাহ! আমার ছেলেকে সহীহ সালালমতে রাখো। বিপদাপদ থেকে হেফাযত করো। রাত নেই, দিন নেই শুধু ছেলের চিন্তায় বিভোর থাকে। আল্লাহ রবুল ইযযাত ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তাদের মাঝে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করবেন।[৩]

আরে ভাই! আমরা পারিবারিক যে সুখের মধ্যে আছি, যে জান্নাতে আমরা বাস করছি, তা পশ্চিমা দেশের মানুষগুলোর জন্য শুধুই স্বপ্ন। তারা এই নেয়ামতগুলো পায় না, পাবেও না।

সন্তান গ্রহণের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি

আমার এক বন্ধু একবার তার সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা শোনাল। তিনি বলেন, একবার আমি বিমানে সফর করছিলাম। আমার পাশের সিটেই দুজন স্বামী-স্ত্রী বসেছেন। তারা প্রথমে স্ব-স্ব কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অনেকক্ষণ পর তাদের কাজ শেষ হলো। তারা আমাকে সম্বোধন করে কিছু বলল। আমি তাদের সাথে বিস্তারিত কথাবার্তা বললাম। একপর্যায়ে আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, How many kids have you? তোমাদের সন্তান-

---

১. সূরা আনফাল, আয়াত : ৬৩
২. সূরা আনফাল, আয়াত : ৬৩
৩. সূরা মারয়াম, আয়াত- ৯৬

সন্ততি কজন? একথা শুনে তারা উভয়ে উত্তর দিল, We would to have a dog. আমরা সন্তান গ্রহণের পরিবর্তে কুকুর পালন করাকেই উত্তম মনে করি।

আমার বন্ধু বলেন, আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম তাদের কথা শুনে। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তোমরা কুকুর পালন করাকে বেশী পছন্দ কর কেন? তারা বলল, কারণ, কুকুর সন্তান থেকেও বেশী বিশ্বাসযোগ্য ও আমাদের ব্যাপারে যত্নবান। তো মাতা-পিতার দৃষ্টিভঙ্গি সন্তানের ব্যাপারে যেখানে এমন, তাহলে মাতা-পিতার ব্যাপারে সন্তানদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে? তাই তো মাতা-পিতা সামান্য বৃদ্ধ হলেই সন্তান তাদের মুখের উপর বলে দেয়- You enjoyed your life and now let me enjoy my life. আপনারা তো আপনাদের জীবনটাকে উপভোগ করেছেন। এখন আমাকেও আমার জীবনটা উপভোগ করতে দিন। এমন অমানবিকতা তাদের মাঝে বিদ্যমান! মনে হয় তাদের রক্ত একেবারে সাদা হয়ে গেছে। কেমন প্রাণহীন প্রাণী তারা! কেমন নির্লজ্জ তারা! কেমন নিষ্ঠুর তাদের জীবনব্যবস্থা!

এক বৃদ্ধা মহিলার কথা

আমার এক দোস্ত বলল, আমি রেলপথে সফর করছিলাম। ৯০ বছরেরও অধিক বয়সী এক মহিলা আমাকে বলতে লাগল, তুমি তো মুসলমান। বলো তো আমাকে মুসলমানরা নাকি ওয়াদা দিয়ে সে ওয়াদা রক্ষা করে খুব গুরুত্বের সাথে? আমি বললাম, হ্যাঁ। মহিলা এবার বলল, তুমি কি আমার একটি ওয়াদা পূর্ণ করতে পারবে? আমি বললাম, হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ পারব! মহিলা বলল, দাও; আমাকে ওয়াদা দাও; বলো, আমি ওয়াদা দিচ্ছি। আগে এটুকু বলো, তারপর আমি ওয়াদার বিষয়বস্তু বলছি। আমি বললাম, আমাকে আগে বলে দাও ওয়াদাটা কী? মহিলা বলল, শোনো- তুমি আমাকে দৈনিক পাঁচ মিনিটের জন্য একটিবার হলেও ফোন দিবে। আমাকে Collect call করবে। একটিবার শুধু আমার সাথে কথা বলবে এবং আমার খোঁজখবর নিবে। আমি বললাম, কেন? আপনার সন্তান-সন্ততিরা কোথায়? তারা খোঁজখবর নেয় না? মহিলা বলল, আছে, আছে। আমার ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু আমার খবর নেওয়ার মত সময় তাদের হাতে নেই। আমার অনেক বড় বাড়ি আছে। আমার বহু পেনশন আসে প্রতি মাসে। খরচের কোনো টেনশন আমার নেই। কিন্তু আমি সর্বদা আমার সন্তানদের চিন্তায় বিভোর থাকি। এত বড় বাড়িতে সারাটা দিন একলা বসে থাকি। ফলে আমার শরীরটাও এখন

ভালো যাচ্ছে না। তারা তো আমার খবর নেয়ই না। এখন তুমি আমাকে কল করবে বলে ওয়াদা দাও; তাহলে আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই অপেক্ষায় থাকব যে, কখনও না কখনও আমাকে একজন মানুষ ফোন দিবে। কখনো না কখনো আমার ফোনটা বেজে উঠবে। আমি ভাবব, আমেরিকায় কোনো একজন মানুষ আমাকে স্মরণ করবার মত আছে। এভাবে তোমার ফোনের অপেক্ষা করে করে সারাটা দিন কাটিয়ে দেওয়ার মত একটা শক্তি আমার মধ্যে আসবে।

তো বন্ধুগণ! বলুন, যে মায়ের সন্তান আছে, ওই মা মাত্র পাঁচটি মিনিট কথা বলার জন্য কারও সামনে ধরণা দিচ্ছে। এসব দিক হচ্ছে ওসব দেশের নিকৃষ্ট অধ্যায়।

মা থেকেও কুকুর প্রিয়

আমেরিকার একটি রাজ্যের এক মা একবার আদালতে তার সন্তানের বিরুদ্ধে মামলা করল। ওই মামলা খবরের কাগজেও শিরোনাম হয়েছে, টিভিতেও এটি সম্প্রচারিত হয়েছে। মা মামলা করে বললেন, আমার ছেলে ঘরে কুকুর পালন করে। সে ওই কুকুরের পেছনে প্রতিদিন তিন-চার ঘণ্টা ব্যয় করে। কুকুরকে গোসল করায়, কুকুরের জরুরত পুরা করে, ওর সাথে যৌনাচার করে। একে নিয়ে হাঁটতে যায়। আমি একই ঘরের অপর রুমে পড়ে থাকি; কিন্তু সে পাঁচ মিনিট সময়ও আমাকে দেয় না। পাঁচটা মিনিটও আমার সাথে থাকে না। তাই আদালত যেন তাকে বাধ্য করে প্রতিদিন অন্তত একটিবারও সে যেন আমাকে দেখে যায়।

মা মোকদ্দমা পেশ করার পর সন্তানও সেই মোকদ্দমার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য প্রস্তুত হলো। মাও উকিল ধরল, ছেলেও উকিল ঠিক করল। উভয় উকিল যখন জজের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করল, তখন জজ সাহেব সমস্ত কথা শুনে ফয়সালা দিলেন, আদালত আপনার সন্তানকে পাঁচ মিনিটের জন্যেও আপনার সাথে থাকার ও কথা বলার ব্যাপারে বাধ্য করার অধিকার রাখে না। কারণ, দেশের নিয়ম আছে, যখন সন্তান ১৮ বছর বয়সে উপনীত হবে, তখন সকল কাজের দায় দায়িত্ব সন্তানের নিজের। তার নিজস্ব অধিকার এটা যে, সে মা-বাবাকে ইচ্ছে করলে সময় দিতেও পারে, আর ইচ্ছে করলে সময় নাও দিতে পারে। এসব তার নিজের ব্যাপার। সে ইচ্ছে করলে একেবারে পৃথকভাবেও জীবন যাপন করতে পারবে। আর এই যে কুকুরের ব্যাপার; কুকুরের কিছু হক ও অধিকার ওই ছেলের উপর রয়েছে।

হকগুলোকে আদায় করা বাধ্যতামূলক। কুকুরকে গোসল ইত্যাদি করিয়ে দিয়ে কুকুরের যত্ন নেওয়া যে কুকুর পালন করবে তার উপরই বর্তায়।

তো দেখুন, এই মা মোকদ্দমা পেশ করেও কোনো লাভ হলো না। কারণ, মা-বাবার হক আদায়ের কোনো আইন ও রূপরেখা তাদের সংবিধানে নেই। তো মা রাষ্ট্রপক্ষ থেকেও কোনো সাহায্য পেল না। যে দেশে মা-বাবার মাঝে সম্পর্ক এমন, যে দেশে সন্তান ও পিতামাতার আচরণ এমন সে দেশের অভ্যন্তরীণ সুখ কী করে আসবে বলুন।

জার্মানে কন্যার সাথে পিতার আচরণ

আমার এক শিক্ষক আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াতে গিয়ে বলেছেন, আমি জার্মানে একটি বিশেষ কোর্স করেছি। আমি যে অফিসে তখন কাজ করতাম, সেই অফিসের কাউন্টারে এক মেয়ে বসত। একদিন সে একটু দেরীতে অফিসে এল। আমি দেখলাম, মেয়েটি অত্যন্ত পেরেশান। তার মাঝে অস্থিরতা বিরাজ করছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি কোনো বিপদে পড়েছ? মেয়েটি বলতে লাগল, আমি আমার পিতার ঘরে থাকতাম। তিনি আমার থেকে অনেক টাকা ভাড়া নিতেন। কিছুদিন পর অন্য এক লোক তাকে আরো বেশী ভাড়া দিবে বলে অফার করল। আমার বাবা আমাকে বললেন, আমি ওই লোককে ভাড়া দিয়ে দেব অথবা সে আমাকে যত ভাড়া দিবে তুমিও তত দাও। তা নাহলে আমার বাড়ি ছেড়ে দাও; আমি ওই লোকের সাথে চুক্তি করে নেব। আমি বললাম, আমার বার্ষিক প্রমোশন হবে কিছুদিন পর। প্রমোশন পেলে আমি আপনাকে ভাড়া বাড়িয়ে দিতে শুরু করব। কিন্তু বাবা দুদিন আগে এসে আমাকে চাপ সৃষ্টি করে বললেন, আমি ওই লোকের সাথে কথা ফাইনাল করে ফেলেছি। তুমি তোমার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করো। ফলে আজ আমি আমার সামানাপত্র স্থানান্তর করতে সময় লেগে গেছে। আজ আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই এ ক্লান্ত অবস্থায়ই অফিসে রওনা দিয়েছি। দেরী হয়ে গেল আজ।

ইসলামে কন্যার মূল্যায়ন

পশ্চিমা রাষ্ট্রে পিতা-কন্যার সম্পর্কটা দেখুন। আর অন্য প্রান্তে ইসলামের দিকে লক্ষ্য করুন। ইসলামের বরকতের দিকে লক্ষ্য করুন। আমাদের অযোগ্যতা সত্ত্বেও, আমাদের বদআমলী সত্ত্বেও ইসলামকে অমান্য করা সত্ত্বেও আমাদের মাঝে আজও পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততির মাঝে এত

ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ বিদ্যমান যে, বাবা তার মেয়ের জন্যে নিজের প্রাণটা বুক থেকে বের করে রেখে দিতে প্রস্তুত থাকেন। নিজের জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকেন নিজের সন্তানের জন্যে। আমার প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আমি বহুবার দেখেছি। আমাদের দেশের কন্যাদের বিবাহের সময় কন্যা যখন বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে শশুর বাড়িতে চলে যাবে, তখন পিতা নিজের সমস্ত উপার্জন মেয়েকে উজাড় করে দেয়। তারপরও কত কান্নাকাটি করেন বাবা। কত অশ্রু ঝরান তিনি। মাও কান্নাকাটি করেন। ভাই-বোনেরা পর্যন্ত কান্নাকাটি করে। এ দৃশ্য আমাদের এসব দেশের ছবি। আমাদের দেশের অবস্থা। এ দৃশ্য প্রমাণ করে, আমাদের অন্তরগুলোতে মহবত আজো আছে। ইসলাম ছাড়া এমন প্রেম-ভালোবাসা দুনিয়ার কোথায় আর কে পাবে। এই প্রেম এই ভলোবাসা ইসলামের বরকতে আজো আমাদের মাঝে বিদ্যমান। এই প্রেম-ভালোবাসা হৃদয় উজাড় করে মা-বাবাকে সন্তানরা উপহার দিচ্ছে। ভাই বোনকে উপহার দিচ্ছে। এখানে পিতা ও কন্যার মাঝে আল্লাহ এমন মহবত দিয়েছেন, যে বাবা তার সর্বস্ব নিবেদন করে কন্যাকে। আর ইউরোপ, আমেরিকা ও জার্মানদের মধ্যেকার মহবতের অবস্থা তো দেখলেনই। ইসলাম ও তাদের জীবনের মাঝে পার্থক্যটা এবার আপনারাই মূল্যায়ন করুন।

আরে ভাই! এই যে মহবত, এই যে প্রেম, এ দিয়েই তো দুনিয়াটা চলছে। তা না হলে তো ওই দেশগুলোর মত হয়ে যেত আমাদের দেশও। ইসলামের সৌন্দর্য দেখুন এবার। অথচ আজ আমরা ইসলাম ছেড়ে ওই পশ্চিমাদের অনুকরণপ্রিয় হয়ে উঠেছি। আমরা তো তাদেরকে নির্দেশনা দিব। তাদেরকে শিখাব আমরা মানবতা। অথচ তা না করে আমরা তাদের পাচাটা গোলামে পরিণত হচ্ছি। সারা দুনিয়াকে আলো দেখিয়েছি আমরা। সারা দুনিয়াকে মানবতার সবক দিয়েছি আমরা। কিন্তু আজ আমরাই হয়ে গেছি নিস্প্রভ। আমরাই হয়ে গেছি আলোহীন! আজ তো তাদের জীবন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। সেই অন্ধকার এসে আমাদেরও স্পর্শ করছে। শুনুন ভাইয়েরা! ভালো করে শুনুন! ইসলামকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন। দেখবেন, কী অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির সন্ধান আপনি লাভ করেন।

মায়ের আযমত : মায়ের গুরুত্ব

আপনি নিজেই চিন্তা করুন, যে মা তার পুত্রকে জন্ম দিয়েছে। যে মা কোলে পিঠে করে আপন সন্তানকে লালন-পালন করলেন, যে মা বাচ্চার জন্য

রাতে সজাগ থাকতেন, যে মা শত রকম ত্যাগ ও কুরবানী করে বাচ্চাকে লালন-পালন করে বড় করলেন, সেই মায়ের মমতা ও ভালোবাসা সন্তানের মনে কতটা নিবিড় ও প্রগাঢ় হবে তা একটু চিন্তা করুন। বাচ্চার জন্যে মায়ের দিলে কেমন মহবত থাকে? একে পরিমাপ করার কোনো যন্ত্র আজো আবিষ্কৃত হয়নি। মায়ের মমতা এমন সমুদ্রের মত অতল ও গভীর, যার পরিমাপ আজো কেউ করতে পারেনি। মায়ের মমতা হিমালয় পর্বতের মত এত সুউচ্চ, যার শিখরে কেউ আরোহণ করতে পারেনি। এই মা-ই জানেন, সন্তানের জন্যে তার দিলটা কেমন করে তড়পায়। কেমন করে তার হৃদয়টা সন্তানের জন্য ব্যাকুল থাকে।

অথচ এই মা যখন বার্ধক্যে উপনীত হন, তখন ওইসব দেশের ছেলেমেয়েরা মা-বাবার আর কোনো খবরই নেয় না। অথচ তখন তারা খেদমতের মোহতাজ থাকেন বেশী। ওইসব দেশের জীবনব্যবস্থায় সন্তানের জন্যে এতটুকু সময় থাকে না যে, তারা মা-বাবার সেবা করবে। এমনকি মায়ের কথার জবাব দেওয়ার সময়ও তাদের থাকে না। তখন মায়ের সাথে কথা বলা না বলা মা-বাবাকে সামান্য সামান্য সময় দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারে সন্তানের অধিকার সৃষ্টি হয়ে যায়। সন্তানের অভিরুচি; সে চাইলে মা-বাবার দিকে তাকাবে, চাইলে নাও তাকাতে পারে।

একটু চিন্তা করুন

হে অনুগ্রহপ্রাপ্ত সন্তান! তুমি আজ তোমার মায়ের সাথে এমন আচরণ করছ, যে মা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন। যে মা তোমাকে লালন-পালন করেছেন। যে মা তোমার সাথে ছায়ার মত লেগে থেকে তোমার জীবনকে সুন্দর করেছেন। আজ তোমার সেই দুঃখিনী মা তোমার সাথে কথা বলতে চান আর তুমি বলছ তোমার হাতে সময় নেই। তোমার এই উন্মত্ত যৌবনের উপর করুণা হয় আমাদের। বড় আফসোস লাগে আমাদের কাছে। তোমার এই জীবনের উপর অভিসম্পাত। তুমি তোমার মায়ের তরে তোমার হৃদয়ে সামান্য মহবত বাকী রাখনি। আরে বেটা! তোমার মা তো ওই মা, যে মা তোমাকে আপন হাতে জুতা পরিয়ে দিয়েছেন। আর আজ তুমি তোমার মায়ের জুতাটা সোজাও করে দিতে পার না। আরে বেটা! বাচ্চা বয়স ছিল যখন তোমার, তখন তোমার এই দুঃখিনী মা তোমাকে খাইয়েছেন আগে। তারপর নিজে পেয়েছেন তো খেয়েছেন। আর না পেয়েছেন তো সবর করেছেন। তোমাকে তিনি তখন আগে পান করাতেন। তারপর নিজে পেলে

পান করেছেন আর না পেলে তৃষিত থেকেছেন। প্রথমে তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। তারপর নিজে ঘুমুতেন। কখনো ঘুমুতেন। কখনো শুয়ে শুয়ে তোমাকে পাহারা দিতেন। তোমাকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনতেন। আজ তুমি তোমার মায়ের সেই ঋণ কতটুকু আদায় করছ? তার এক ফোটা দুধের দামই তো তুমি পরিশোধ করতে পারবে না। আজ তুমি তোমার উন্মত্ত যৌবনের তাড়নায় তোমার মাকে পাঁচটি মিনিট প্রদান করার সময় পাও না। অথচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছ গার্ল ফ্রেন্ডের সাথে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি তার মা অথবা বাবার চেহারার দিকে একবার মহবতের দৃষ্টিতে তাকাল, আল্লাহ রবুল আলামীন তাকে একটি হজ্ব বা উমরার সওয়াব দান করেন। দেখুন, একদিকে হলো এই সাওয়াব ও আজরের কথা আর অন্যদিকে ওইসব দেশের নীতি হলো ১৮ বছরের পর সন্তানের আর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। সে নিজের ব্যাপারে নিজে স্বেচ্ছাচারী। যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে। তাকে মা-বাবা কিছু বলতে পারবে না। মা-বাবার কোনো হকও তার উপর নেই। এই পার্থক্যটার প্রতি লক্ষ করলেই তো ইসলামের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।

ফিরিঙ্গিদের কাছে একটি প্রশ্ন

আমি ওই দেশে অনেক মাহফিলে বয়ান করেছি। বড় বড় মাহফিলে আমি বলেছি, হে শিক্ষিত সমাজ! আমাকে তোমরা একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। একটি মেয়ে যে অন্য ঘরের, অন্য পরিবারের ছিল, আজ তার মাঝে যৌবন এসেছে তো সে অন্য একটি ছেলের সাথে থাকতে শুরু করল। এখানকার আইন এই মিলনকে সমর্থন করে এবং নারীটিকে এই অধিকার প্রদানও করেছে। আর ওই যে মা একে পেটে ধারণ করেছেন, তার জন্যে কষ্টের জিন্দেগী কাটিয়েছেন, ৯টি মাস নিজের পছন্দমত খাননি, পান করেননি। অনেক ভালো জিনিসও তখন খারাপ মনে হতো। নিজের রক্ত দিয়ে এই মা তোমাকে লালন-পালন করেছেন। এই মা তোমাকে কোলে তুলে দারুন ভালোবাসার দৃষ্টিতে তোমার দিকে নির্বাক তাকিয়ে থেকেছেন। আজ এই দেশের আইন এই বাচ্চার উপর ১৮ বছর বয়সের পর ওই দুঃখিনী মায়ের কোনো হক ও অধিকার সমর্থন করছে না। বলো, কেমন মানবিক এই আইন? কতটুকু যুক্তিনির্ভর এই নীতি। আর কতটুকু দলিলসমৃদ্ধ এই সংবিধান।

আমি বহু মাহফিলে এই একই প্রশ্ন করেছি। কিন্তু তাদের কাছে এই অকাট্য প্রশ্নে কোনো উত্তর ছিল না। তারা কেউ এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়াল

না, কেউ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল না। আমি বলেছি, আমাদের ধর্মের দিকে তাকিয়ে দেখো, স্ত্রীকে তার নিজস্ব অধিকার প্রদান করা হয়েছে। মাকে মায়ের মত করে তার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। ছেলেকে স্ত্রীর হকও আদায় করতে বলেছে স্ত্রীর মত করে। আবার মাকে মায়ের হক আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে মায়ের মত করে। প্রত্যেকেরই হক আদায় করতে বলা হয়েছে ইসলামে। মাকে মায়ের অধিকার দিতে হবে। আবার স্ত্রীকে স্ত্রীর অধিকার দিতে হবে। ইসলাম কত সুন্দর করে প্রত্যেকের অধিকার, প্রত্যেকের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে। এসব বিধান এমন সত্য ও অকাট্য যে, এগুলো একদিন না একদিন ওই পশ্চিমা রাষ্ট্রের মানুষেরা মেনে নিতেই হবে।

ফিরিঙ্গিদের ইসলাম গ্রহণ

আজকের পজিশন এমন হয়েছে যে, তারা ইসলামিক বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করে, ইসলামকে শিখে-জানে তারপর তারা সেচ্ছায় খুশি মনে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। বহু মানুষ তো এমনও আছে, যারা মুসলমানদের বিবাহ দেখে মুসলমান হয়ে গেছে। কতক মুসলমানদের দাম্পত্যজীবনের সুখ-শান্তি দেখে মুসলমান হয়ে গেছে। এই সুখসমৃদ্ধ জীবন তো শুধু আমাদের কাছেই বিদ্যমান, যে সুখকে, যে অনাবিল শান্তিকে একদিন সমগ্র পৃথিবীর মানুষেরা খুঁজে বেড়াবে। আর তখন তারা মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুয়ারে এসে দাঁড়াতে হবে। মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুয়ার ছাড়া কোথায় পাওয়া যাবে সেই সুখ, সেই সমৃদ্ধ আর সেই প্রশান্তি।

শান্তিময় জীবনের সন্ধানে

আমেরিকায় আমার সাথে একটি কোম্পানির ডাইরেক্টরের সাথে সাক্ষাত হয়েছে। লোকটি পি.এইচ.ডিসম্পন্ন। লোকটি বলল, আমি পাকিস্তান গিয়েছি। আমি বড় আশ্চর্য অবস্থা সেখানে দেখেছি। লোকটি বলল, Pakistan is a country where car and the camel share the same road. অর্থাৎ পাকিস্তান এমন একটি রাষ্ট্র, যেখানে কার ও উট এক পথে চলে। আমি বললাম, তুমি ঠিকই বলেছ। সে বলল, আমি সেখানে অনেক দরিদ্র মানুষকে দেখেছি। তাদের কাপড় ছেঁড়া। তাদের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তারা অভুক্ত, ক্ষুধার্ত। তাদের গোসল ইত্যাদির সামগ্রীও বেশী ভালো নেই। তাদের ঘরের অবস্থাও ততটা ভালো নয়। কিন্তু আমি এ

বিষয়টি দেখে অবাক হলাম, তারা বেশ প্রশান্ত। তাদের মাঝে সুখের ছাপ বিদ্যমান। তারা একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ঠাণ্ডা মাথায় অবস্থান করে। তাদের মাঝে কোনো অস্থিরতা নেই, হা-হুতাশ নেই। আমি অনেককে নিদ্রার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তারা সবাই বলেছে, রাতে তারা মধুর নিদ্রা যান। আরামে ঘুমান। কিন্তু এর কারণটা কী? কেন এত প্রশান্তি সেখানের মানুষের মাঝে? আমি বললাম, এটি ইসলামের বরকত। এটি ইসলামের সুউচ্চ সৌন্দর্য।

نہ دینا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے
تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

'দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী আর ধন-দৌলত এবং শত প্রকার আসবাবপত্র দিয়ে হৃদয়ে প্রশান্তি অর্জিত হয় না। হৃদয়ে প্রশান্তি আসে আল্লাহ তা'আলার স্মরণের মাধ্যমে।'

আলহামদুলিল্লাহ। এটি আমাদের দ্বীনের বরকত। আমাদের ইসলামের বরকত। আমাদের দরিদ্ররাও বড় শান্তিতে ঘুমায় আপন নীড়ে। ওইসব দেশের বড়-বড় নেতারা পর্যন্ত সামান্য শান্তির ঘুম ঘুমুতে পারেন না। আমাদের শান্তির আসল রহস্য কোথায় চিন্তা করে দেখুন। আমাদের শান্তি-সুখের মূল রহস্য হচ্ছে ইসলাম। ইসলামই আমাদের এমন অনাবিল সুখ ও শান্তি দান করেছে।

ভালোবাসা রক্ষা করো

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! প্রেমকে জীবন্ত রাখুন। ভালোবাসাকে রক্ষা করুন। মায়ের প্রেম মাকে দান করুন, স্ত্রীর প্রেম স্ত্রীকে দান করুন। ভাই-বোন ও বাবার প্রেম তাদের দান করুন। মাকে মায়ের মত ভালোবাসুন। স্ত্রীকে স্ত্রীর মত ভালোবাসুন। আর ভাই-বোন ও বাবাকে তাদের মত করে ভালোবাসুন। এই মহবত, এই প্রেম-ভালোবাসাকে রক্ষা করুন। ইসলাম যেসব হক ও অধিকার আমাদের উপর আরোপ করেছে, তা সঠিকভাবে সঠিক ক্ষেত্রে আদায় করুন।

এটি আল্লাহর রহমত। এই নিয়মনীতিগুলো আল্লাহর দান। এর কদর করুন, মূল্যায়ন করুন। এই নিয়মনীতি মোতাবেক জীবন পরিচালনা করুন। ইসলামের বলে দেওয়া নিয়মমত যদি চলা যায়, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অসীম সুখ থাকবে। মহবত ও প্রেম-ভালোবাসা থাকবে। সন্তান-সন্ততি ও মা-বাবার মধ্যে মমতা, স্নেহ, প্রেম-প্রীতি, শ্রদ্ধাবোধ-দায়িত্ববোধও বিদ্যমান

থাকবে। পাড়া-পড়শীদের মধ্যেও মহবত থাকবে। অধিকার আদায়ের মানসিকতা থাকবে। আল্লাহ তখন আমাদেরকে এমন এক জীবন দান করবেন, যেখানে থাকবে সুখ আর সুখ, শান্তি আর শান্তি। যেখানে থাকবে প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকের প্রেম আর প্রেম, ভালোবাসা আর ভলোবাসা। চারদিকে বিরাজ করবে মায়া, মমতা আর মহবত।

ইসলামে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার মহান শিক্ষা

ইসলাম তার ইতিহাসে ইসার ও প্রাধান্যদান এবং মহবত ও সম্প্রীতির এমনসব ঘটনা ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে, যেগুলোর চিন্তাও আজকের এই আধুনিক বিশ্ব করতে পারবে না। ইয়ারমুকের তুমুল যুদ্ধের কথা কি আপনাদের স্মরণ আসছে না? সেই জিহাদের তপ্ত ময়দানে এক সাহসী লোক শাহাদাতের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন। শহীদী গালিচায় ছটফট করছেন। পানি দাও পানি দাও বলে চিৎকার করছেন। এমনি সময় তাঁর চাচাত ভাই তার জন্যে পানি নিয়ে এলেন। তিনি পানির পেয়ালা মুখে দেবেন; ঠিক এমনি সময় অন্য দিক থেকে একই আর্তনাদ শোনা গেল। পানি দাও, পানি দাও। সাথে-সাথে শাহাদাতের তপ্ত যমিনে লুটিয়ে থাকা এই মুজাহিদ নিজের ঠোঁট বন্ধ করে নিলেন। ইঙ্গিতে বলেন দিলেন, ওদিকে পানি নিয়ে যাও, দ্রুত যাও। বলে দিলেন, আমার ভাইকে আগে পানি পান করাও। ২য় ব্যক্তির কাছে পানি নিয়ে যাওয়া হলো। ২য় ব্যক্তি পানির পেয়ালায় চুমুক দেবেন; ঠিক এমন সময় আরেক দিকে শোনা গেল পানি-পানি আর্তনাদ। ২য় ব্যক্তি ঠোঁট বন্ধ করে বলে দিলেন, আমার ওই ভাইকে আগে পান করাও। পানি পাঠিয়ে দিলেন তৃতীয়জনের দিকে।

তৃতীয় ব্যক্তির কাছে পৌঁছতেই দেখা গেল, তিনি চলে গেছেন এই স্বার্থপর দুনিয়া ছেড়ে। স্বার্থ ত্যাগের ওই চিত্রগুলো তখন প্রাণময় ভঙ্গিতে যেন নড়ে উঠল। পানি বহনকারী সাহাবী মুজাহিদ ফিরে এলেন ২য় জনের কাছে। দেখলেন, ত্যাগের এক সুমধুর ছবি পৃথিবীকে উপহার দিয়ে ইনিও চলে গেছেন স্বার্থপর এই দুনিয়ার ছেড়ে। পানি বহনকারী বীর ছুটলেন প্রথম জনের কাছে। গিয়ে দেখলেন, ইসার ও ইকরাম, ত্যাগ ও প্রাধান্য দান এবং অন্যের সাহায্য ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সর্বোচ্চ মহিমাময় দৃষ্টান্ত পৃথিবীবাসীর সামনে পেশ করে তিনিও চুমুক দিয়েছেন শাহাদাতের পেয়ালায়। শহীদী মিছিলে শামিল হয়ে গেছেন তিনজন।

নিজের জীবনের শেষ প্রহরে অসহায় অবস্থায়ও যারা এভাবে ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তাঁরা কারা? কী তাঁদের পরিচয়? তাঁরা নবীজির সাহাবা। মুসলিম তাঁদের পরিচয়। ইসলাম তাদেরকে এই সুমহান শিক্ষা প্রদান করেছে। আজ সারা দুনিয়া নিজেদের হাজারো টেকনোলোজি, উন্নত প্রযুক্তিসমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই উপমাহীন দৃষ্টান্ত কখনও পেশ করতে পারবে না। আমাদের উচিত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক জিন্দেগী অতিবাহিত করা, যেন এই কুফরী বিশ্বের সামনে ইসলামের পরিচয় ও শিক্ষা এবং ইসলামের নীতি ও আদর্শ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে যায়। ইসলামের সত্যতা তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। আর সারা পৃথিবীর সকল মানুষ ইসলামের আঁচলতলে এসে যায়। আজ আমাদের মুসলমানদের বে-আমলীর কারণেই কাফেররা ইসলামে প্রবেশ করতে ভয় পাচ্ছে।

এক নির্বোধ মুসলমান

আমি একবার ওয়াশিংটনে বয়ান করেছি। সেখানে আধুনিক উচ্চশিক্ষিত বহু মানুষের সমাগম হয়েছিল। বয়ানের পর এক ব্যক্তি আমার কাছে এল। সে একটি মুসলিম দেশের দূতাবাসে থাকে। আমার সামনে এসেই বড় করুণভাবে কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম। দীর্ঘ সময়ের পর লোকটির মাঝে স্থিরতা এল। এবার বলতে লাগল, আমি একটি মুসলমান দেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে এদেশে থাকছি। কিন্তু আমার জীবন ইসলাম থেকে বহু দূরে। ইসলামী শিক্ষা বঞ্চিত আমার পরিবার পারিবারিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ। আমার দুটি ছেলে আছে তারা উভয়েই অমুসলিম নারী বিয়ে করে নিয়েছে। আবার আমার একটি মেয়েও অমুসলিম এক ছেলেকে বিয়ে করে নিয়েছে। এই বলে সে হাহাকার করতে লাগল।

ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করা

আরে ভাই! আমাদের মুসলমানদের বিবেকের এত অধঃপতন হয়েছে যে, তারা এদেশ থেকে ওইসব দেশে গেলে নিজের নামটাও পরিবর্তন করে ফেলে! মুহাম্মদ হয়ে যায় মুহাম্মাট। এমন বহু ছেলে আছে নাম তাদের আহমদ বা মুহাম্মদ আর বিয়ে করে নিয়েছে অমুসলিম নারীকে। তাদের থেকে জন্ম নেয়া সন্তানদের একজনের নাম রেখেছে Bill আরেকজনের নাম রেখেছে Bob আরেকজনের নাম রেখেছে Bush

মসজিদের মিনার, নাকি রকেটলাঞ্চার

লাহোরের এক ব্যক্তি আমেরিকায় গেল। সেখান থেকে কয়েক বছর পর ফিরে এল। তার সন্তানরা সেখানেই বড় হয়েছে। বাচ্চাগুলোকে লোকটি লাহোর নিয়ে যাচ্ছিল গাড়িতে চড়ে। যখন তাদের গাড়ি হযরত আলী হাজভীরী (রহ.)-এর মাজারের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা সেখানকার মসজিদের বড় বড় মিনার দেখতে পেল। সন্তানগুলো ইসলাম থেকে এত দূরে যে, তারা ওই মিনারগুলো দেখে বলতে লাগল-

Dad, why these Rocket Lanchers have been fin.ted Right in the center of the cin.y?

আবু! শহরের একেবারে মধ্যভাগে এভাবে রকেটলাঞ্চার কেন ফিট করে রাখা হয়েছে? এ হলো মুসলমানের সন্তানের অবস্থা!

নামাযীদের জন্য পেরেশানি

১৯৬০ সনের আগ পর্যন্ত তো সেসব দেশের মুসলমানদের পক্ষে নিজেদের বৈশিষ্ট্য ঠিক রাখাই মুশকিল ছিল। এমনকি কোনো দাওয়াত বা আপ্যায়নে গেলে সেখানে ব্যাপকভাবে মদ পান করতে হতো। কেউ যদি নামায পড়তে চাইত, তার সুযোগ সেখানে ছিল না। ফলে খুব সন্তর্পণে টয়লেটে যাওয়ার বাহানায় উযু করত এবং খুব গোপনে নির্জন রুমে গিয়ে নামায আদায় করতে হতো। তারপর আবার টাই ও পোশাক পরে বের হতে হতো। পাছে আবার লোকেরা যেন ধরে না ফেলে, লোকটি কোনো কাজ করে এসেছে। মুসলমানদের দ্বীনের অবস্থা সেখানে এমন ছিল।

মুসলিম তরুণদের অবস্থা

১৯৯০ সনে এসে ওসব দেশের চালচিত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। অনেক শহরে তো মুসলমানরা নিজেদের মত করে কলেজও তৈরি করেছে। এমনকি দুটি ভার্সিটিও তারা প্রতিষ্ঠা করেছে। আমি একবার সেখানে যোহরের নামায আদায় করেছি। সেখানে ভার্সিটির ছাত্রদের উদ্দেশে আমি 'বিজ্ঞান ও সুন্নাতে নববী' শিরোনামে বয়ানও করেছি। আলহামদুলিল্লাহ সেখানকার কিছু ছাত্র আমার হাতে বাই'আতও হয়েছে। তাদের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনও এসেছে। আমি তাদের ত্যাগের নিদর্শন দেখেছি। আমি একটি মসজিদে গিয়েছি। সেখানে যোহরের নামাযে প্রায় ১৫০ জন নামাযী উপস্থিত ছিল। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কোনো বিশেষ

কারণে কি এত মানুষ? লোকটি বলল, না; এখানকার স্কুল-কলেজগুলো মুসলমানদের। আমাদের সন্তানরা মুসলমান ওস্তাদের কাছেই শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষকরাও তাদের মুসলমানের শিক্ষা-ই প্রদান করেন। তাই তো এখানকার তরুণদের চেহারায় আপনি নূর দেখতে পাচ্ছেন। তাদের এখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে উপস্থিত দেখতে পাবেন!

আমি দেখলাম, এমন ভরযৌবনের দীপ্ত সময়েও তারা দাড়ি রেখেছে! সুন্নাতের উপর আমল করছে। অনেকে পাগড়ি বাঁধে। তারা কয়েকজন মিলে একটি গ্রুপ হয়েছে। সকলে মিলে কুরআনের দরস গ্রহণ করে। তাদের এই নিবেদন ও ইসলামের ব্যাপারে এই প্রেরণা দেখে আমার আত্মা বড় খুশী হয়ে গেল। মনটা আনন্দে বাগবাগ হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ।

ইনশাআল্লাহ! এই যুবকরা যখন বড় হবে, সেখানে তারা তাদের অস্তিত্বের শেকড় গেড়ে নেবে। তারা শুধু ওই অঞ্চলটিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং আটলান্টায়ও স্কুল-ভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করবে। ওয়াশিংটনেও একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে অনাগত মুসলমান সন্তানেরা মুসলিম হিসেবে বসবাস করতে সক্ষম হবে।

আলহামদুলিল্লাহ! এতটুকু পরিবর্তন এসেছে যে, এখন ওখানকার স্থানীয়রা পরস্পর ইসলামের কথা বলতে পারে। এক-একটি যুবক সেখানে ৮/১০টি যুবককে মুসলমান বানিয়ে ফেলছে। তাই বোঝা যাচ্ছে, সেখানকার অবস্থার মোড় একদিন ঘুরে যাবে।

এক ইংরেজ যুবকের ইসলাম গ্রহণ

আমি এক যুবককে দেখলাম। ও বলল, আমি কাল আপনার কাছে এক লোককে নিয়ে আসব সে কাফের বাবার সন্তান। কয়েকটা দিন থেকে আমি তাকে ইসলাম শেখাচ্ছি। এখন সে কালিমা পড়তে প্রস্তুত। এখন আমাকে বলে দিন, আপনি আমাকে কখন সময় দিতে পারবেন, যেন লোকটা আপনার হাতে হাত রেখে মুসলমান হতে পারে। আমার চোখে পানি চলে এল। আমি বললাম, বৎস! লোকটা দিনে আসুক আর রাতে আসুক যদি সে ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, তাহলে আমি তাকে যেকোনো সময়েই সময় দিতে প্রস্তুত। আমি তো আনন্দিত তোমরা আজ দ্বীন ইসলামের সেবক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ।

আমার দৃষ্টিতে মসজিদ বানানোর চেয়ে ওসব দেশে ওই রকম স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা বেশী জরুরি। যেসব স্কুলের সন্তানেরা দ্বীনের

সেবক হবে। কারণ, নামায তো স্কুল-কলেজের কোনো এক রুমেও আদায় করা যাবে, আগে তো নামাযী বানাতে হবে। তারপরই তো দরকার হবে মসজিদের।

তাই বললাম, এমন স্কুল-কলেজের প্রয়োজনীয়তা বেশী, যার থেকে শিক্ষা গ্রহণকারীরা দীন নিয়ে বাঁচতে চাইবে। আলহামদুলিল্লাহ সেসব দেশের কিছু এলাকায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে এবং দ্বীনের বাতাস প্রবাহিত হয়েছে।

একটি সুবর্ণ মূলনীতি

একটি মূলনীতি স্মরণ রাখুন। ওস্তাদ যদি কাফের হয়, তাহলে ওই ওস্তাদ তার ছাত্রদের কুরআন পড়িয়েও কাফের বানিয়ে দেবে। ওস্তাদ যদি মুসলিম হয়, তাহলে বাইবেল পড়িয়েও ছাত্রদের ওই ওস্তাদ মুসলমান বানিয়ে নিবে।

এক যুবকের ইসলাম গ্রহণ

আমার এক বন্ধু হাসপাতালের ডাক্তার। তার একজন মেধাবী ছেলে ছিল। ছেলেটা বড় ইবাদাতগোজার। প্রত্যেক বছর সে উমরা করতে যায়। মাকেও উমরায় নিয়ে যায়। ফ্যামিলির অন্যান্য সদস্যদেরও নিয়ে যায়। ইসলামের নানান বিষয় নিয়ে সে পড়াশোনা করে। কিন্তু কয়েক বছর পর হঠাৎ সে বদলে গেল। সে এখন নাস্তিক হয়ে গেছে। পিতা ছেলেকে নিয়ে আমার কাছে এসে বলল, হযরত! আমার ছেলেটাকে নিয়ে আমি চিন্তিত। একেবারে আধুনিক হয়ে গেছে। এখন আর দ্বীন ইসলাম মান্য করে না। আমি ছেলেটাকে বসালাম। জিজ্ঞেস করলাম, কী হলো ভাই? ছেলেটা বলল, হযরত! আমি আপনাকে সহজ-সরল কথাটা বলে দিচ্ছি- আমার টিচার অমুসলিম ছিলেন। স্যার আমাকে প্রথমে ইহুদী ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু আমি ভ্রূক্ষেপ করিনি। কিন্তু সে যখন দেখল, আমি ইহুদী হব না। বরং আমি পাক্কা মুসলমান। ফলে ওই স্যার আমাকে ডারউইনের থিউরি পড়াতে শুরু করলেন। তো ডারউইনের থিউরির আড়ালে সে আমাকে এত পেরেশান ও অস্থির করে ফেলেছে যে, আমি এখন অতি আধুনিক হয়ে গেছি। আমি এখন নাস্তিকতাকে গ্রহণ করে নিয়েছি। আমি এখন নাস্তিক হয়ে গেছি।

আমি বললাম, আচ্ছা, ইসলামের ব্যাপারে তোমার যে প্রশ্নগুলোর কারণে তুমি নাস্তিকতাকে গ্রহণ করেছ, সেই প্রশ্নগুলো আমার সামনে উপস্থাপন

করো। আমার হাতে তিন ঘণ্টা সময় আছে। সে ডারউইনের সেই পুরোনো ভ্রান্ত ও মিথ্যা থিউরিগুলো বর্ণনা করতে লাগল এবং একেকটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করতে শুরু করল। আর আমি তার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিতে থাকলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আমি তার প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম হলাম। সাথে-সাথে তার জন্য দু'আও করছিলাম আর তাওয়াজ্জুহ দিতে থাকলাম। আমি তাকে পাক্কা তিন ঘণ্টা সময় দিতে প্রস্তুত ছিলাম। আল্লাহ্ রবুল ইযযাত এমন মেহেরবানি করলেন যে, তিন ঘণ্টা সময় দিতে হলো না। ৫০ মিনিট পরেই ছেলেটি বলতে লাগল, আমাকে কালিমা পড়িয়ে দিন। আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিন।

আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। রুম থেকে বের হয়ে ছেলেটি ওযু করল এবং পিতার সামনেই দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগল। তখন তার পিতার চোখ থেকে কী পরিমাণ অশ্রু ঝরেছে, তা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না এবং তার অবস্থা তখন যা হয়েছিল, তা আমি ভুলতে পারব না। লোকটি তো যেন একজন নতুন পুত্র পেয়েছেন। দারুণ এক নতুন আনন্দ যেন তার বুকটা ভরে দিল। তারপর তার দিল থেকে যে দু'আ উচ্চারিত হচ্ছিল, সেই দু'আর দৃষ্টান্ত ও উপমা কোনো মানুষ মনে হয় পেশ করতে পারবে না।

তিনটি হৃদয়কাড়া প্রশ্ন

একবার আমি এক ইসলামিক সেন্টারে গেলাম। সেখানে ছেলেদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল আমার। সেখানের সব স্টুডেন্ট ছিল সাইন্সে গ্র্যাজুয়েট। আমি প্রত্যেক ছাত্রকে মাত্র তিনটি প্রশ্ন করতে থাকলাম। এক ছাত্রের সাথে তার ছোট ভাইও এসেছিল। তার বয়স ৮/৯ বছর ছিল। বাচ্চাটি আমার সামনে এলে আমি চিন্তা করলাম, এত ছোট বাচ্চাকে কী প্রশ্ন করব?

আমার কাছে-ধারেই একটা টেবিল ছিল। আমি ছেলেটিকে প্রশ্ন করলাম, Ok, please tell me. who mode this table? বলো তো দেখি, এই টেবিলটি কে বানিয়েছে? ছেলেটি বলল-

Sir, Allah gove man brain and man used that brain and he made that table.

স্যার, আল্লাহ মানুষকে ব্রেন দিয়েছে। মানুষ তা কাজে লাগিয়েছে এবং এই টেবিল সে বানিয়েছে।

তার এই উত্তর শুনে তো আমি নিজেই ক্ষণিকের তরে থমকে গেলাম! আমি তাকে ফের প্রশ্ন করলাম-

You tell me, Why do you read quran do you feel in. is mandin.ory as in. is interesting.

বলো তো শুনি, তুমি কেন কুরআন পাঠ করো। তুমি এটি জরুরি মনে করো নাকি তোমার কাছে বড় হৃদয়কাড়া মনে হয়?

আমি বুঝতে ও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলাম, ছেলেটি কি চাপের মুখে কুরআন পড়ে, না নিজের অনুপ্রেরণায়ই পড়ে? আমার এই প্রশ্ন শুনে ছেলেটি বলতে শুরু করল-

Sir, I feel in. is both, in. is mandin.ory as well as in. is very interesting.

আমি উভয়টাই মনে করি। তেলাওয়াত তো জরুরিও। সাথে-সাথে এই তিলাওয়াত বড় মধুর ও হৃদয়কাড়া।

আমি তো ভাবতেও পারিনি এই ছোট্ট বাচ্চা এত সুন্দর করে জবাব দিবে।

এবার আমি ছেলেটির দিকে তৃতীয় প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম-

Ok, you tell me, what do you want to be in you life?

বলো তো তুমি জীবনে কী হতে চাও?

ছেলেটি উত্তর দিল-

Sir, I want to be the president of America.

আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চাই স্যার!

আমি তার এই উত্তর শুনে আচানকভাবে বললাম- Why? কেন?

Sir, I will be the first muslim president of America.

স্যার! আমি চাই, আমি আমেরিকার প্রথম মুসলিম প্রেসিডেন্ট হব।

আমি বাচ্চাটির এই সুন্দর-সুন্দর উত্তর শুনে বড় খুশী হয়ে গেলাম। সাথে-সাথে অবাকও হলাম, যদি আজকের মুসলিম তরুণদের মাঝে আল্লাহ এই অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে দেন, তাহলে এটি বেশী দূরের বিষয় নয় যে, এমন একটি সময় আসবে, যখন বিশ্বের সুপারপাওয়ারের সিংহাসনে আসীন হবে মুসলমান আর তারা প্রতিষ্ঠিত করবে ইসলামী আইন।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! সেখানকার তরুণদের এই প্রেরণা প্রশংসনীয়। সেখানের মুসলমানদের ত্যাগ ও কুরবানী প্রশংসনীয়। সেখানে নিজেদের তাহযীব-তামাদ্দুন, নীতি-সংস্কৃতি রক্ষা করে জীবন যাপন করা এবং দ্বীন

মোতাবেক চলা আমাদের আশার আলো দেখাচ্ছে। এটি আনন্দের সংবাদ বহন করছে। হতে পারে, এই লোকেরাই ওখানকার নাগরিকদের জন্য ইসলাম গ্রহণের মাধ্যম হবে। আল্লাহ তা'আলাও তাদের দ্বীন কবুলের তাওফীক দিবেন। এদের হাতেই নির্মাণ হতে পারে একটি সুসভ্য আমেরিকা। হতে পারে একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম দেশের সূচনা।

কারাগারে ইসলাম

সেখানে এখন আরেকটি বিপ্লব সৃষ্টি হচ্ছে। সেখানের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকার মুসলিম উলামায়ে কেরামকে জেলে গিয়ে তাবলীগ করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। এই অনুমতি আগে ছিল না। এখন এই অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কারণ হলো, সেখানকার অবাধ্য ও অপরাধীদের সংশোধন তো রাষ্ট্রপক্ষ করতে পারে না। তাই রাষ্ট্রপক্ষ চিন্তা করেছে, যদি এই লোকগুলো মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে এরা ভালো হয়ে যাবে। অপরাধে আর জড়াবে না। কারণ, মুসলমানরা বড় নম্র ও ভদ্র হয়ে থাকে। তারা অন্যায় করে না। তাই রাষ্ট্রপক্ষ কয়েদীদের কাছে তাবলীগে দ্বীন করার জন্য উলামায়ে কেরাম ও মুবাল্লিগদের অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। এতে বহু কয়েদী তো মুসলমান হয়ে গেছে।

ইসলামের প্রভাব

আমার এক আলেম বন্ধু আমেরিকা থাকে। আমি আমেরিকা সফরে তার ঘরে খাবার খাচ্ছিলাম। এমন সময় এই বন্ধু বলল, আমি রবিবারে এখানকার জেলে তাবলীগের জন্য গমন করি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সেখানকার অবস্থা কেমন? বন্ধু বলতে লাগল, যে মুসলমান হয়ে যায়, সেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। তার জীবন বদলে যায়। নম্র, ভদ্র ও সুসভ্য হয়ে যায়। অন্যায় অপরাধের পথ ছেড়ে দেয়। বন্ধু বলল, ওইদিন এক অপরাধী জেলে এসেছে। সে ১ বছরের জেল পেয়েছে। ৬ মাস কাটিয়েছে আর ৬ মাস বাকি আছে। সেদিন সে মুসলমান হয়েছে। আর এই তো গত কিছুদিন আগে আমি তাকে নামায শিখিয়ে দিয়েছি। একদিন আমরা দুজনে বসে আছি। আমাকে সে বলতে লাগল, আমি তোমার উপর অনেক ভরসা রাখি। তোমাকে অনেক বিশ্বাস করি। শোনো, আমি ইসলাম গ্রহণের পর আমার জীবন বদলে গেছে। অন্যরকম ভালোলাগা এখন আমার মাঝে বিরাজ করছে। আমি বললাম, এটা তো সবারই হয়। সে বলতে লাগল, কিন্তু আমার মাঝে যতটা পরিবর্তন এসেছে, এতটা পরিবর্তন মনে হয় অন্যদের হয় না। আমি বললাম, কেন বলো তো শুনি?

সে বলল, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তো আমি একেবারে পশু ছিলাম। এখন মানুষ হয়েছি। মানুষের জীবন যাপন করতে শুরু করেছি এখন।

আমি বললাম, ভাই বিষয়টা আমাকে একটু খুলে বলো। সে বলতে লাগল, আমি আসলে একটা ছোট অপরাধের কারণে জেলে এসেছি। তার কারণে এক বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে আমাকে। তার মধ্যে ৬টি মাস চলেও গেছে। আর ৬ মাস পর আবার বাড়িতে চলে যাব। কিন্তু আমার হৃদয়ের কথাটা আপনাকে বলি, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মানুষ হত্যা করতে পারলে আমার কাছে মজা লাগত, আনন্দ লাগত! কোনো মানুষকে রক্তের উপর লুটোপুটি খেতে দেখলে, রক্তধারায় স্নাত হতে দেখলে আমার দারুণ আনন্দ লাগত। আমি বহু মানুষকে আমার এ হাতে হত্যা করেছি। কেমন যেন ওটা আমার কাজই ছিল। ইসলাম কবুল করার পর আমার হৃদয়ের অবস্থা এমন হয়েছে যে, এখন আমি যদি পায়ে হেঁটে চলতে থাকি আর আমার পদতলে যদি সামান্য একটা পিঁপড়াও কবলিত হয়, তাহলেও তার জন্য আমার আফসোস লাগে। তার জন্যও আমি অনুতপ্ত হয়ে যাই।

আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! এভাবে জীবনের গতি বদলে যাচ্ছে। হে আল্লাহ! এসব দেশ থেকে ইসলামের ঝান্ডা বুলন্দ হতে দেখার তাওফীক তুমি আমাদের দান করো।

সুইডেনে মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা

আজ পশ্চিমা দেশগুলো ইসলামপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তবে তারা আমাদের সাধারণ মুসলমানদের জীবন দেখে বলে, আমরা এমন মুসলমান হতে চাই না। আজ কিছু মুসলমান তো তাদের উন্নতি ও ঈমানী তারাক্কির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি ১৯৯২ সনে সুইডেন সফর করেছি। তখন দেখলাম, তারা একটি জরিপ চালাল। তারা দশজন মহান ব্যক্তির নামের একটি তালিকা তৈরি করল। সেই তালিকায় ডারউইন, নিউটন, আইনস্টাইন, হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ছাড়া আরো কয়েকজনের নাম ছিল। তারা বলল, আমরা জরিপ করে নির্ণয় করতে চাই, এখানে সুইডেনের মানুষের কাছে কে বেশী প্রিয়?

তো পত্রিকায় সংবাদ আসতে থাকল। আমি নিজে ওসব খবর পড়তে থাকলাম। সেদিন কম্পিউটারে তারা রেজাল্ট বের করল এবং সুইডেনের

লোকদের মতামত প্রকাশ করল। সে দিনের সংবাদ আমি নিজেই পড়েছি। দেখে তো বিস্মিত হয়ে গেছি। খবরে প্রকাশ হলো, ৬৭% লোক ভোট দিয়েছে, তারা মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে।

এক সত্যপ্রেমিকের কাহিনী

সুইডেনের একটি ঘটনা। সেখানকার অসভ্যতা ও বর্বরতার পরিবেশেও এক লোককে আল্লাহ তা'আলা ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দান করেছেন। সে প্রতিটি কাজ সুন্নাত মোতাবেক সম্পাদন করবে বলে দৃঢ় প্রত্যয়ী হলো। যখনই সে নতুন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন সে উলামায়ে কেরামের সাথে যোগাযোগ করে সেই কাজের সুন্নাত নিয়ম জেনে নেয়। সেখানে সেই পরিবেশেই খদ্দরের পোশাক পরিধান করে এবং পাজামা টাখনুর উপরে রাখে। সে একবার একটি মজলিসের আয়োজন করল। আমাকেসেখানে দাওয়াত করেছে। পাকিস্তানের আরেকজন আলেমও ছিলেন। ওই আলেম বললেন, আচ্ছা ভাই! তুমি চাইলে তো পাজামা আরেকটু নিচে পরতে পার। তোমার জন্য তো সুযোগ আছে। সুন্নাতের এই আশেক একথা শুনে খুবই রাগ হয়ে গেল। তার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারি। রাগত স্বরেই লোকটি বলল-

You are muslim by chance. but I am muslim by choice.

তুমি তো ঘটনাক্রমে মুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া মুসলমান। কিন্তু আমি বুঝে-শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছি। যে মানুষটি নিজ ইচ্ছায় দেখে-শুনে, খুঁজে-খুঁজে ইসলামকে গ্রহণ করেছে, তার মাঝে দ্বীনি জযবা ও সাহস বেশী থাকে, ইশ্‌ক-মহবত বেশী থাকে।

এক সুইডিশ যুবকের ইসলাম গ্রহণ

একবার আমি লাহোরে ছিলাম। সেখান থেকে আমার প্রবাসে যাওয়ার প্ল্যান ছিল। সফরের একদিন পূর্বেই কোনো এক ব্যক্তি টেলিফোনে বলল, হযরত আমি আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চাচ্ছি। আমি বললাম, আমি তো কাল সফরে চলে যাব; তাই একটু প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। লোকটি বলল, হযরত! আমি তো বিদেশ থেকে আপনার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি। এবার আমি বললাম, ঠিক আছে আপনি আসুন। সামান্য কিছুক্ষণ পরেই লোকটি

ট্যাক্সিযোগে চলে এল। তার গাড়ি থেকে বের হওয়া, আমার সাথে সাক্ষাত করা, উঠা, বসা, কথাবার্তা এমনকি তার প্রত্যেকটা কাজ দেখে আমি বড় বিস্মিত হলাম।

সে এতটা সুন্দর ও মধুর স্বভাবের যে, আমি মনে হয় এমন মানুষ আর দেখিনি। পরিচয় হলো। বলল, আমি সুইডেনে থাকি। আমি কিছুদিন আগে চিন্তা করলাম, আমার কোনো ধর্ম থাকা উচিত। তাই আমি ১২০টি ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি। ১২০টি ধর্মের মধ্যে দীর্ঘ অধ্যয়নের পর আমি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম, ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করতে হবে। কারণ, ইসলামই সত্য ধর্ম। ফলে আমি ইসলামই কবুল করে নিলাম।

তারপর আমার হৃদয়ে ইচ্ছে জাগ্রত হলো, আমি সারা দুনিয়ার বড় বড় আলেমদের সাথে সাক্ষাত করব, যেন আমি সঠিক দিকনির্দেশনা পাই। সে কারণেই আমি আপনার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি। দু'আ চাই হযরত!

অষ্ট্রেলিয়ায় এক নারীর সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা

আমি একবার অষ্ট্রেলিয়া সফরে ছিলাম। এক খৃষ্টান মেয়ে আমার কাছে সময় চাইল। বলল, আমি ইসলাম নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাই। আমার কিছু প্রশ্ন আছে; সেগুলো জিজ্ঞেস করতে চাই। আমি তাকে এক ঘণ্টা সময় দিলাম। সে প্রথম এক ঘণ্টায় desis crist তথা হযরত ইসা (আ.) কে উঠিয়ে নেওয়া এবং ফের অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকল। তারপর সে কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে প্রশ্ন করল। তারপর জান্নাত নিয়ে কথা বলল। তারপর জাহান্নাম নিয়ে কথা বলল। এমনকি ইসলামের ব্যাপারে সে দীর্ঘ আলোচনা ও প্রশ্ন আমার সাথে করল।

তার যখন মনোবাসনা পূর্ণ হলো এবং সে শান্ত হলো, তখন তাকে বললাম, আর কোনো কিছু কি আপনার জিজ্ঞেস করার আছে? মেয়েটি বলল, আমার হৃদয়ে এখন আর ইসলামের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই! আমি বুঝতে পেরেছি, ইসলাম খুবই চমৎকার একটি ধর্ম।

সে যখন বলল, চমৎকার ধর্ম ইসলাম, তখন আমি বুঝলাম, হতে পারে এখন সে মুসলমান হয়ে যাবে। তাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ইসলাম কবুল করার ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছেন। সে বলতে লাগল, আপনি বলুন তো এই কুরআনে কি পুরো ইসলাম বিদ্যমান রয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। কুরআন তো আমার মূল ভিত্তি। মেয়েটি বলতে লাগ, আপনার নিকট কি কুরআন আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ আমার কাছ কুরআন আছে। যখন

আমি কুরআন দেখালাম, তাকে তখন সে বলতে লাগল, আপনি একটি কাজ করুন। কুরআনের কিছু কপি বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রেরণ করে তাদের বলুন তারা যেন কুরআনের এত জীবন যাপন করে। তারা যেন কুরআনের মত তাদের জীবনকে পরিবর্তন করে নেয়। কুরআনের মত যেন তারা জীবন গঠন করে।

প্রিয় বন্ধুরা আমার! আপনারাই বলুন, এই মেয়ে এমন আবেদনের কী উত্তর আমি দেব। আমার ভাইয়েরা! যদি আমরা পরিপূর্ণ মুসলমান হয়ে যাই, যদি আমরা পাক্কা মুসলমান হয়ে যাই এবং ইসলামকে ওই লোকদের সামনে পেশ করি, তাহলে অবশ্যই সম্ভবত তারা ইসলাম কবুল করে নিবে। তাতে সারা দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলা ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার তাওফীক দিবেন। আসুন ইসলামকেই আজ আমরা যিন্দেগীর মাকসাদ বানিয়ে নেই। আজ অন্তরে অন্তরে এই প্রত্যয় গ্রহণ করুন যে, আমরা আজ থেকে পুরো দেহে ইসলামকে ফিট করে নেব। ইসলামী আইনে চলব। যদি আমরাই আমাদেরকে পরিবর্তিত করতে শুরু করে দেই, তাহলে আমাদের আমলের বরকতে দুনিয়ার অন্যসব ইনসানকেও আল্লাহ তা'আলা বদলে দেবেন।

কবির ভাষায়-

وقت عشق سے ہر پست کو بالا کردے

دہر میں اسم محمد سے اجالا کردے

প্রেমের বাঁধনে বেঁধে আজ তোলো জাগরণ। মুহাম্মাদের নামে আজ গোটা বিশ্বে জাগাও আলোড়ন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'আজ আমাদের তাহাজ্জুদর পড়ার সময় হয় না। অথচ ইসলামের শুরু যুগে তাহাজ্জুদ ছুটে গেলে মুসলমান কান্নাকাটি শুরু করে দিত। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছুটে যাওয়া তো দূরের কথা। তারপরের অবস্থা এমন দেখা যেতো যে, তাকবীরে উলা ছুটে গেলে মুসলমান কেঁদে দিত। আর আজ আমরা এমন সময়ে এসে উপনীত হয়েছি, যখন ফরজ নামাযের জামাতই আমরা ধরতে পারি না। নামায কাজা হয়ে যায়, নামায ছুটেও যায়। তারপরও আজ মুসলমানের মন কাঁদে না। মুসলমান সামান্যও চিন্তিতও হয় না। আজকের যুগ ফেতনার যুগ। দ্রুতগামী বাহনে চড়ে আজ ফেতনা আমাদের দিকে অগ্রসরমান। আর আমাদের অবস্থা এতো করুণ যে, প্রথম ধাক্কাতেই আমরা ফেতনার হাতে পরাস্ত হয়ে যাব। সতর্ক হওয়া উচিত আমাদের!'

তাহাজ্জুদের প্রতি যত্নবান হোন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ. سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

ইনসানিয়্যাত

মানবজাতি দুনিয়াতে আল্লাহ রবুল ইজ্জাতের প্রতিনিধি এবং আল্লাহর সিফাতের পূর্ণ প্রকাশ মাধ্যম। মানুষ যদি তাদের অভীষ্ঠ লক্ষ অর্জনে প্রচেষ্টা চালায়, আল্লাহ মানুষের এই প্রচেষ্টার পথ সহজ করে দেন। কিন্তু মানুষ যদি তার আপন লক্ষ্যে পৌঁছার প্রচেষ্টাই না করে, তবে সে পথ হতেই ছিটকে পড়ে। কবির ভাষায়-

زندگی آمد برائے بندگی

زندگی بے بندگی شرمندگی

এ জীবনটা তো দেওয়াই হয়েছে বন্দেগী করার তরে। যদি বন্দেগীই না করা হয়, তবে শরমের মুখোমুখি হতে হবে।

বেআমলীর মূল কারণ

আশ্চর্য কথা তো এই যে, অনেক নেকের কথা তো বড়দের থেকেই শোনা হয়। কিন্তু আমরা সেকথার প্রতি কতটা ভ্রূক্ষেপ করি, কতটা গুরুত্ব দেই। আমলের জযবা নিয়ে আমরা নেকের কথা, দ্বীনের কথা শুনি না। ফলে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, মনে হয় যেন অনেকের কথা আমরা শুনিইনি। আমরা আজ শুনেও শুনি না।

وَلَوْ اَرَادَ اللّٰهُ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ

'যদি আল্লাহ কল্যাণের ফয়সালা করেন, তবেই তিনি তাদের শোনাবেন।'

আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের ফয়সালা করলেই তো শোনার তাওফীক দান করবেন। আমরা তো এখন দ্বীনের কথা শুনিই না। আর যেটুকুও শুনি বুঝি না, তার কিছুই।

فَمَالِ هٰٓؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا

'তাদের কী হলো যে, তারা কথাই বুঝতে সক্ষম হয় না?'

কিছু তো এমন আছে যে, শোনেই না। আর যাও শোনে তা বুঝতে পারে না। ফল কী দাড়ায়? ফল এই দাঁড়ায় যে, আমলই করা যায় না।[১]

দিন বদলাল না

প্রত্যেক বছর প্রায় পঁচিশ লক্ষ মানুষ হজ্বে গমন করেন। তারাও যদি নিজেকে পুরো বদলে ফেলতে পারতেন, তারাও যদি পরিবর্তিত হয়ে আসতেন, তাহলে সারা দুনিয়ায় বদলের বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যেত। হজ্বের সফরে লোকেরা যাওয়ার সময় বলতে থাকে-

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

উঠতে বসতে বলতেই থাকে

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

ঘুমুতে গেলে, জেগে উঠলে বলতে থাকে

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ

হজ্বের সফরে লোকেরা আল্লাহর ঘরের দীদারে যায়। হজ্ব করে আসার সময় গুনাহ মাফ করিয়ে আসে। তাদের তো এই পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে যে, তারা বাড়িতে ফেরার পরও চল্লিশ দিন পর্যন্ত ঘরে বসে দু'আ করলেও সেই দু'আ কবুল হয়। তারা তো এমন মানুষ, যাদের ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে আল্লাহ! তুমি হাজীদের মাফ করে দাও। হাজীরা যাদের মাফ করে দেওয়ার দু'আ করবে, তাদেরও মাফ করে দাও। অথচ এই হাজীদের কজন আছেন, যারা নিজেকে বদলে ফেলতে সক্ষম হন? কজন হাজী নিজেকে পরিবর্তন করে দেশে ফেরে। কত আফসোসের কথা। কেমন লজ্জার কথা। আল্লাহ রবুল ইজ্জাতের ঘরের

---

১. সূরা নিসা, আয়াত- ৭৮

দিদার করে আসছেন। অথচ হৃদয়ের ভাব পরিবর্তন করতে পারেননি। দিল বদলাতে পারেননি। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারেননি। হৃদয়কে পবিত্র করতে পরেননি। আমাদের পূর্বসূরীগণ যখন হজ্বের সফরে গমন করতেন, তখন তাদের একেকটি সফরে হাজার-হাজার মানুষ মুসলমান হয়ে যেতেন। আর আমরা হজ্বে যাই হজ্ব থেকে ফিরে আসি; অথচ নিজেকেই পরিশুদ্ধ-পবিত্র করতে পারি না। পূর্ণ মুসলমান হয়ে হজ্ব থেকে আসতে পারি না।

আমাদের অসহায়ত্ব

আমাদের অসহায়ত্বের অবস্থা তো এমন যে, ইবাদাত থেকে আমাদের মনই যেন উঠে যাচ্ছে। আমাদের হৃদয় থেকে যেন ইবাদাতের আকর্ষণ চলে যাচ্ছে। সামান্য কয়েক মিনিট মুসল্লায় বসে থাকলে আমরা যেন কঠিন মুসিবতেই পড়ে যাই। এমনকি আমরা যদি এমন স্থানে গিয়ে পড়ি, যেখানে কুরআন তেলাওয়াত চলছে, সেখানে আমরা চিন্তা করিতে শুরু করি, আবার কুরআন তেলাওয়াত করতে হয় নাকি! কেউ আবার বলে দেয় কিনা, ভাই! চলো কিছুক্ষণ তেলাওয়াত করো, দু-এক পারা তেলাওয়াত করো। চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়, যেন তার উপর অজানা কোনো মসিবত এসে পড়েছে। তাই বলছি, ইবাদাতের স্পৃহা আমাদের মধ্যে নেই। ইবাদাতের আগ্রহ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। দুনিয়ার স্বাদের পিছনে পাগলের মত ছুটছি। রূহানী স্বাদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছি না। আজ আমরা আমলের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গেছি। এটি বড় অধঃপতন আমাদের!

আগের অবস্থা ও বর্তমান যুগ

পূর্ব যুগের কথা বলছি। ইসলামের শুরু যুগের কথা বলছি। তখন তাহাজ্জুদ ছুটে গেলেই মুসলমান কান্নাকাটি শুরু করে দিত। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায ছুটে যাওয়া তো দূরের কথা। তারপরের যুগে এমন ছিল যে, যখন তাকবীরে উলা ছুটে গেলে মুসলমান কেঁদে ফেলত। আর আজ আমরা এমন সময়ের সম্মুখীন, যখন ফরজের জামাতটাও পাই না। এমনকি নামায কাজাও হয়ে যায়। নামায ছুটে যায়। তবুও মুসলমানের মন কাঁদে না। মুসলমান সামান্য চিন্তিতও হয় না। আজকের এ যুগ তো ফেতনার যুগ। দ্রুতগামী বাহনে চড়ে ফেতনা আমাদের দিকে অগ্রসরমান। আর আমাদের অবস্থা এমন করুণ যে, সেই ফেতনার প্রথম আঘাতেই আমরা ডুবে যাব অসত্য ও অন্যায় অপরাধের ঘোর অমানিশায়।

তাহাজ্জুদ থেকে মাহরুম হওয়ার কারণ

কিছু লোক বলে, শারীরিক দুর্বলতা বা ব্যস্ততার কারণেই আজ তাহাজ্জুদে উঠা যাচ্ছে না। এটি ওসব ভ্রান্ত লোকদের মুখের বুলি। কিন্তু আসল কারণ তো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার চেহারা-ই দেখতে চান না। তাই তোমাকে তাহাজ্জুদে উঠার তাওফীক প্রদান করেন না। ব্যস্ততা বা শারীরিক দুর্বলতা তাহাজ্জুদ ছেড়ে দেওয়ার কোনো কারণই হতে পারে না। কত শত বৃদ্ধ খোদাভীরু তাহাজ্জুদ পড়ছে খবর নিয়ে দেখো। আর একজন নেককার পরহেযগার আলেম থেকে তোমার ব্যস্ততা কি বেশী। কক্ষনো হতে পারে না। আলেম ও নেককারদের ব্যস্ততা বরং আরো বেশী। তারা তো ঠিকই তাহাজ্জুদ পড়েন। তুমি পড় না কেন?

তাহাজ্জুদের সময় ফেরেশতাদের তিনটি জামাত

যখন রাত শেষ প্রহরে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের তিনটি দলে বিভক্ত করে দেন।

১. আদুরে চাপড় দিয়ে ঘুম পাড়ানোর ফেরেশতা

আল্লাহ্ তা'আলা একদল ফেরেশতাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, এখন আমার নৈকট্যপ্রাপ্ত প্রিয় বান্দাদের জেগে ওঠার সময়। এখন তাহাজ্জুদের সময়। এখন তারা আমার খাযানা থেকে চেয়ে-চেয়ে নেবে। তোমরা দুনিয়ায় যাও। অমুক-অমুক বান্দা আমার নাফরমানি করে। তারা আমাকে নারাজ করেছে। তোমরা তাদের শিথানের কাছে যাও। তাদের আদুরে চাপড় দিতে থাকো। আরো গভীর ঘুমে বিভোর করে দাও। তারা যেন শুয়েই থাকে। তারা যেন জাগতে না পারে। আমি চাই না, ওরা এই সুবর্ণ সুযোগে আমার সামনে দাঁড়াক। আমার কাছে প্রার্থনা করুক আর মাফ পেয়ে যাক। আমি এটা চাই না। তো ফেরেশতারা আসে এবং ওদের আদুরে চাপড় মারতে থাকে। ফলে মধুর ঘুমে তারা বিভোর হয়ে যায়। তাই তো দেখা যায় এশার পরে কিছু মানুষ গল্প-গুজবে লেগে যায়। হাসি-ঠাট্টা করতে-করতে যখন তাহাজ্জুদের সময় হয়ে আসে, তখনই তারা ঘুমিয়ে যায়। বরং এভাবে বলতে হয় যে, তারা উপুড় হয়ে পড়ে যায়। বিবাহ-শাদীর অনুষ্ঠানে এই চিত্রটা আপনারা বেশী দেখবেন। ইশার পর খুব হই-হুল্লোড় হয়। বলা হয়, সারা রাত আজ জেগে থাকব। কিন্তু রাতের শেষ প্রহরে দেখবেন, ওই উন্মাদরাই উপুড় হয়ে

ঘুমের ঘোরে ডুবে আছে। কারণটা কী? কারণ, এটি আল্লাহর নেককার বান্দাদের ওঠার সময়। তাদের ইবাদাতের সময়। আল্লাহ তা'আলা ওই সময়টাকে তাদের জাগতে দেন না। আমরা মনে করি লোকগুলো নিজেরাই জাগে না। বরং বাস্তবতা হলো, লোকগুলোকে আল্লাহ তা'আলা জাগার তাওফীক দেন না।

কারণ, তখনকার সময়টা এমন বরকতময় যে, আমাদের মাশায়েখে কেরাম লিখেছেন, যদি কোনো নারীর অভ্যাস এরকম হয় যে, সে শেষ রাতে উঠে ঘর ঝাড়ু থেকে নিয়ে সাংসারিক কাজকর্ম শুরু করে দেয় (সাধারণত আমাদের মা চাচীরা যেমন করে) তাহলে সে বাড়িতে জেগে থাকার কারণে আল্লাহর রহমতের ভাগিদার হয়ে যায়। রহমত থেকে সেও মাহরুম হয় না। তো রহমতের যেহেতু এই অবস্থা তাই এই সময়টাতে যেই জেগে থাকবে, সেই রহমতে ভাগ পেয়ে যাবে। তাই ওসব অবাধ্য ও নাফরমানদের আল্লাহ তা'আলা জাগার তাওফীকই দেন না। বরং ফেরেশতাদের এই নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, তাকে আরামের ঘুম ঘুমানোর বন্দোবস্ত করে দাও। তাকে আদর দিতে থাকো। তার পিঠে-মাথায় আদরের হাত বুলাতে থাকো। ও ঘুমিয়ে থাকুক। আর আমার প্রিয় বান্দারা উঠে বরকত কুড়িয়ে নিক।

২. পেখমের পরশে জাগানোর ফেরেশতা

তারপর ফেরেশতাদের ২য় দলটিকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে বলেন, যাও অমুক-অমুক বান্দা আমার বড় পছন্দের। আমি তাদেরকে ভালোবাসি। যাও তাদেরকে পেখমের পরশে জাগিয়ে তোলো। যেন তারা আমার সামনে তাহাজ্জুদে দাঁড়াতে পারে। আমার ইবাদাতে মগ্ন হয়ে যেতে পারে। আমার সাথে গোপন অভিসারে নিজের হৃদয়ের সুপ্ত কথাগুলো বলে নিতে পারে। সে আমার কাছে প্রার্থনা করবে। দু'আ করবে। আমি তার ঝুলি ভরে দেব। ফলে কত মানুষ তখন জেগে যায়। অথচ তারা দুর্বল, বৃদ্ধ ও ক্লান্ত। তবুও তারা তাহাজ্জুদ আদায়ে সক্ষম হয়। তাহাজ্জুদের সময় হলেই বড় আচানকভাবে তাদের দুচোখ খুলে যায়। তারা জেগে যায়। যেন কেউ তাদের ডেকে তোলে। তাদের ভেতর একটা ঘড়ি কাজ করে। যেন সে ঘড়ি তাদের ভেতরে অদৃশ্য থেকেই অবচেতনভাবে ডেকে যায়। এলার্ম দিয়ে যায়। আমাদের পেটে ক্ষুধা লাগলে যেমন আমরা অনুভব করতে পারি ক্ষুধা লেগেছে, তেমনি তাদের ভেতরে এই সময় নিয়ন্ত্রক ঘড়ি আড়াল থেকে এমন করে সে সময় হলেই অবচেতনভাবে তারা বুঝতে পারেন তাহাজ্জুদের সময়

হয়েছে। এখন জাগতে হবে। যতই ক্লান্তই হোন না কেন, আল্লাহর ওই নেক বান্দা তখন তাহাজ্জুদের জন্য কুদরতীভাবেই জেগে যান। রবের দরবারে দাঁড়িয়ে যান। রবের ইবাদতে মশগুল হয়ে যান।

তিন ঘণ্টার ঘুম তিন মিনিটে

আমাদের হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) বলতেন, একবার আমি বড়ই ক্লান্ত ছিলাম। কয়েকদিন যাবত বিরতিহীন কাজ করছিলাম। তখন মাগরিবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমার ক্লান্তি এত বেশি ছিল যে, আমি দুর্বল হয়ে পড়লাম। আমি আমার বন্ধুদের বললাম, তোমরা সকলে এখান থেকে চলে যাও। তারা বলতে লাগল, হযরত! নামাযের তো আর মাত্র দশ-পনেরো মিনিট বাকী। নামাযের পরই ঘুমিয়ে পড়বেন। হযরত বলেন, আমি বললাম, তোমরা চলে যাও। আমি তাদের কামরা থেকে বের করে দিলাম। হযরত বলেন, আমি দরজা বন্ধ করে এসে শুয়ে পড়লাম। আমি ঘুমালাম এবং আমার গুম পূর্ণও হয়ে গেল। আমি স্বপ্নে দেখছিলাম, কেউ একজন বলছে, আমিই ঘুম পাড়াই এবং আমিই জাগিয়ে দেই। একথা শুনেই আমি জেগে গেলাম। হযরত বলেন, আমার শরীর নব প্রাণ পেল। উদ্দম ফিরে এল। আমি উঠলাম। উযু করব, নামায পড়ব এ খেয়ালে বের হলাম। দরজা খুলে দেখি, যাদের বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করেছিলাম, তারা এখনো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারা আমাকে দরজা খুলে বের হতে দেখে প্রশ্ন করল, হযরত আপনি তো ঘুমের ইচ্ছে করেছিলেন। সেই ইচ্ছে কি বাদ দিয়ে দিয়েছেন? আমি বললাম, না তো, আমি তো ঘুমিয়েছি এবং ঘুম পুরাও হয়ে গেছে। এমন সময় তারা ঘড়ি দেখল এবং বলতে লাগল, আমরা কামরা থেকে বের হয়েছি মাত্র তিন মিনিট হলো।

তো দেখুন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের এমন প্রশান্তি দিয়ে দেন যে, যেন তারা তিন মিনিটে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়েছেন। অথচ আমরা সারা রাত ঘুমিয়েও তাজা হই না। উদ্দম পাই না।

৩. নেক বান্দাদের পার্শ্ব পরিবর্তনের ফেরেশতা

ফেরেশতাদের তৃতীয় আরেকটি দল থাকে; আল্লাহ তা'আলা তাদের বলেন, যাও; আমার প্রিয় বান্দা যারা আছে, তাদের কাছে গিয়ে তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়ে দাও। তারা চাইলে উঠে নামায পড়বে, তিলাওয়াত করবে। আমার কাছে দু'আ মোনাজাত করবে আর চাইলে শুয়ে থাকবে।

আমি তাদের ইবাদাতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট, তেমনিভাবে তাদের নিদ্রা যাওয়ার ব্যাপারেও সন্তুষ্ট।

نَوْمُ الْعُلَمَاءِ عِبَادَةٌ

'উলামাদের ঘুমও ইবাদাত।'

এরা ওই সকল উলামা, যাঁরা মারেফতসম্পন্ন। তাঁদের ঘুমিয়ে থাকাও আল্লাহর দৃষ্টিতে ইবাদাত।

একটি উদাহরণ

আপনি কাঠমিস্ত্রির কাজ করে এমন একজনকে ঘরে নিন। তাকে দিয়ে কাজ করান। দেখবেন, কিছুক্ষণ পর তার যন্ত্রগুলো ভোঁতা হয়ে যায়। ফলে সে কিছুক্ষণ এগুলোতে ধার দিয়ে নেয়। তো সে যে সময়টাতে তার যন্ত্রপাতিগুলো ধার দেয় এই সময়টাকে কেউ মূল্যহীন মনে করে না। কেউ একথা বলে না, তুমি আধা ঘণ্টা তোমার যন্ত্র ধারানোর কাজে ব্যয় করেছ। নাও আধা ঘণ্টার বিল কম নাও। এমন বললে লোকটি বলবে, আরে ভাই! যন্ত্র ধারানো তো তোমার কাজেরই অন্তর্ভুক্ত। তেমনিভাবে ওইসব আল্লাহওয়ালা, যারা আল্লাহর স্মরণে আল্লাহর ইবাদাতেই মগ্ন থাকে, সর্বদা আল্লাহর কাজেই লেগে থাকে, যখন তাঁরা ঘুমান, তখন এ নিয়তে ঘুমান যে, শরীরে আরামবোধ হবে, উদ্যম ফিরে আসবে। আবার কাজ করা যাবে, আবার ইবাদাত করা যাবে। এটি কাঠমিস্ত্রির যন্ত্র ধারানোরই এত। ঘুমকেও এখানে ইবাদাত মনে করা হবে।

নওজোয়ানদের অবস্থা

যারা তরুণ-নওজোয়ান, তাদের মাঝে ইবাদাতের প্রতি আগ্রহ ও কম দেখা যায়। যার হৃদয়ের তড়প এমন যে, আমি জাগ্রত থাকব, শেষ রাতে জাগব, আমার রবকে ডাকব, তার তাহাজ্জুদ পড়া নসীব হয়ে যাবে। আজ এমন হয়েছে যে, দু'আও করে না। এখন দু'আর জন্য এসে মানুষ কোন দু'আ চায়? চাকরির জন্য, বিবাদের জন্য, ব্যবসায় উন্নতির জন্য, অসুস্থতার জন্যে দু'আ করায়। এসে বলে না, হযরত! দু'আ করুন আল্লাহ যেন আমাকে তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হওয়ার তাওফীক দান করেন।

একটি ভ্রান্ত ধারণা ও তার জবাব

আম জনতা তো আম জনতাই। বর্তমানে তো উলামায়ে কেরামও ভ্রান্তির সম্মুখীন হয়ে পড়েন। অনেকে তো গল্পের ছলে বলেনও, আমি তো

মাদরাসায়ই থাকি। তাই অনেক কবিরা গুনাহ থেকেও আমি বেঁচে যাই। আবার অনেকে বলে, আরে আমি তো সারাদিন পড়ি আর পড়াই। ফলে রাত জেগে ইবাদাত করার সাওয়াব তো আমি পেয়েই যাই। আরে ভাই! বলো তো শুনি সাহাবায়ে কেরাম কি সারাদিন দোকানদারী করতেন যে তার কারণে তাঁদের তাহাজ্জুদ পড়ার জরুরত দেখা দিত? মুহাদ্দিছীন ও ফুকাহায়ে কেরাম কি সারাদিন ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন, যার কারণে ইশার ওযু দিয়ে তারা ফজরের নামায পড়তে হতো? তোমরাই কি পড় আর পড়াও? বড় গলায় বলছ, আমরা তো পড়া-পড়ানোর মাধ্যমেই রাতে ইবাদাতের সাওয়াব অর্জন করে ফেলি। কত বড় সুন্দর ধোঁকা-প্রতারণা এটি! কত বড় শয়তানী এটি!

রাতে তাহাজ্জুদের জন্য ওঠার সামান্য তড়পও তো নেই দেখছি। এর কারণেই তো তাহাজ্জুদ তো যায়ই, ফজর নামাযের তাকবীরে উলাও ছুটে যায়। আবার কিছু বন্ধু বলেন, অনেক সময় আমাদের ফজরের নামাজও কাজা হয়ে যায়! বলুন, যারা সারাদিনের ইল্‌ম বহন করছে, যারা ওয়ারিশে নবী। যারা নবীর ইরশের ভাগিদার হতে চায়, এই যামানায় তাদের অবস্থা এমন হলে আম জনতার অবস্থা কেমন হবে? তাই তো আজকাল মসজিদে ফজর নামাযের উপস্থিতি অত্যন্ত কম!

রাজ্য হারানোর আলামত

একটা সময় এমন ছিলো, যখন মুসলমানগণ দল বেঁধে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন। তাদের ঘর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ এমনভাবে আসত, যেমনভাবে মৌচাক থেকে মৌমাছির গুণগুণ আওয়াজ ধনিত হয়। একটা সময়ে এমন হতো, বাগদাদের খলীফার মা এসে ছেলেকে বলতেন, বৎস! তোমার রাজত্ব হারিয়ে যাবে। ছেলে জিজ্ঞেস করত, কীভাবে বুঝলে তুমি মা? মা বলতেন, আগে তো মহল্লার সব নারী তাহাজ্জুদ পড়ছে দেখতাম। আজ মাত্র ৭০ জন তাহাজ্জুদ পড়েছে। বুঝতে পারলাম, তুমি সুলতান হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছ। অচিরেই তোমার রাজত্ব খতম হয়ে যাবে; তুমি রাজ্যহারা হয়ে যাবে।

নূরাণী ভোর

আজকাল যাদেরকে আমরা নেককার ভাবি তাদের অবস্থা এমন যে তারা আমাদের অনেকের অবস্থা এমন যে, অনেক কষ্টে ফজরের জন্য ওঠে আর ফজর পড়েই শুয়ে পড়ে। অথচ আমাদের পূর্বসূরীরা ফজরের পরের ওয়াজীফা

আদায়ে এত যত্ন নিতেন যে, আমাদের মাশায়েখে কেরাম সকালের প্রভাত বেলাকে নাম দিয়েছেন 'নূরানী ভোর'। আমাদের মাশায়েখে কেরাম ফজরের পরের সময়টা তিলাওয়াত-যিকির এবং এরপর নামাযের মাধ্যমে কাটাতেন। আর আমরা ফজরের পরের সময়টা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেই। এই তো আমাদের দীনদারীর অবস্থা।

আমলের অভাব

আমলের ময়দানে আজ বড় দুর্ভিক্ষ চলছে। খানকাগুলোও আজ আমল শূন্য হয়ে পড়েছে। যারা মানুষকে রাতে জাগরণকারী বানানোর কথা ছিল তারাই আজ ঘুমিয়ে কাটায় রাত। যারা মানুষকে আল্লাহ রবুল ইজ্জাতের ভালোবাসায় ভরে দেবার কথা ছিল তারাই হয়ে গেছে আল্লাহর মহবত শূন্য। যারা মানুষকে দুনিয়া বিমুখ করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়িয়ে দেওয়ার কথা ছিল তারাই আজ হয়ে গেছে দুনিয়ামুখী। তারাই হয়ে গেছে আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন। দোকানদারী ঠিকঠাক চলছে। মুরীদানও আসছে। হাদিয়া আদান-প্রদানও সুন্দরভাবে চলছে। হাজারো, লাখো মুরীদানের জটলাও তৈরি হয়েছে। সবই ঠিকমত চলছে; কিন্তু আমল আজ ঠিকমত চলছে না। রাজপথ তো কাঁপানো হচ্ছে অনেক; কিন্তু আমলের হালত কি উন্নত হয়েছে? খানকাগুলোরই যখন আজ এই অবস্থা, তাহলে যারা শুধু কালিমা পড়া মুসলমান, তাদের হালত কী হবে? আজ তো দেখছি, আমলের ময়দানে বড়ই দুর্ভিক্ষ চলছে!

দুর্লভ লাল ঘোড়ার চেয়েও দামী

শয়তান আমাদের চার পাশে অন্ধকার ছড়িয়ে দিয়েছে। খাহেশাতে নফসানীর প্রভাব এখন এতই প্রকট যে, বাহিরও অন্ধকার হয়ে গেছে, অভ্যন্তরও অন্ধকার হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে যদি এমন কোনো শায়খের সন্ধান পাওয়া যায়, যিনি আপনাকে সুলুক তথা আত্মশুদ্ধির পথে মেহনত শিক্ষা দিবেন, ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে যিনি সুলুকের পথে আপনাকে পরিচালিত করবেন, তাহলে তাকে আপনি গনিমতের লাল ঘোড়ার চেয়ে কম মনে করবেন না। কারণ, যে যুগে নেক মানুষের সংখ্যা কম হবে সেই যুগে আল্লাহ ওই কম মানুষের মূল্যই বাড়িয়ে দিবেন হাজারো গুণ।

তিন রাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ

বাবুজী আব্দুল্লাহ (রহ.)-এর কবরে আল্লাহ তা'আলা কোটি-কোটি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি এমন বুজুর্গদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা দু'আ করলে কবুল

করা হয়। এমন বড় বুজুর্গ ছিলেন যে, যে মানুষের জন্যই তিনি দু'আ করে দিতেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজের পেয়ারা হাবীবের দিদার নসীব করে দিতেন। তিন-তিন রাত ওই লোকের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারাত নসীব হয়ে যেত। আমি আমার জীবনে বহুবার এটি নিরীক্ষা করে দেখেছি। আমার বহু বন্ধুর জন্য দু'আ করিয়ে নিয়েছি এবং আলহামদুলিল্লাহ তাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ রবুল ইযযাত নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত নসীব করেছেন। তিন-তিনটি রাত তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

আল্লাহর যিকিরের ফায়দা

হযরত বাবুজী আব্দুল্লাহ (রহ.) বলতেন, যে ব্যক্তি যিকিরকারী বান্দা, মৃত্যুর সময় তার সামান্য পিপাসাও লাগবে না। সাথে-সাথে আল্লাহ রবুল ইযযাত ওই বান্দার কবরের আযাব মাফ করে দেবেন। এমন বড় দুটি নেয়ামত যিকিরকারী বান্দা লাভ করবে। যদি ভালোভাবে সুন্দর মৃত্যু কামনা করে থাকেন এবং কবরের আযাব থেকে নিজেকে হেফাযতে রাখতে চান, তবে আল্লাহর যিকির করুন। বেশী-বেশী আল্লাহর যিকির করুন। যিকিরের দ্বারা আল্লাহ বান্দার গুনাহ মাফ করে দেন। তার ভেতরে এক অন্য রকম মনোবল দান করেন। এর কারণেই আত্মশক্তি দ্বারা বান্দা আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকতে সক্ষম হয়।

স্বামী-স্ত্রীর সময়

আমাদের পূর্বসূরী মহান ব্যক্তিরা এমন ছিলেন যে, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। প্রত্যেকেই অন্যের চেয়ে বেশী ইবাদাত করতে চাইতেন। স্বামী চাইতেন স্ত্রীর চেয়ে বেশী ইবাদাত করতে আর স্ত্রী চাইতেন স্বামীর চেয়ে বেশী ইবাদাত করতে। এমনকি এক ভাই অন্য ভাইয়ের চেয়ে বেশী ইবাদাত করতে চাইতেন। স্বামী-স্ত্রী তাদের সময়টাকে সূচীবদ্ধ করে বণ্টন করে নিতেন। স্বামী চাইতেন আমি রাতে শুরুর ভাগে শুয়ে পড়ব। শেষ প্রহরে জেগে উঠে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়ে যাব। আবার স্ত্রী বলতেন, আচ্ছা ঠিক আছে; তাহলে আমি রাতের প্রথম প্রহরের ইবাদাত করতে থাকব। বাকী সময় ঘুমোব। ফলে একটি সংসারে দেখা যেত, চবিশ ঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্তে স্বামী বা স্ত্রী কেউ একজন ইবাদাতে মশগুল আছেন। তারা সুন্দর সূচী তৈরি করে, স্বামী স্ত্রীকে ইবাদাতে সাহায্য করতেন আবার স্ত্রী স্বামীকে ইবাদাতে সাহায্য করতেন।

ওযুর সাথে থাকতে চেষ্টা করতেন সর্বদা

তাঁরা বলতেন, সর্বদা পাক-পবিত্র অবস্থায় থাকব। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর একজন সন্তানের ঘরে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর সন্তান ঘরের গ্রাউন্ড রুমে খেলাধুলা করছিল। এলাকাটা নতুন জনবসতি ছিল। মসজিদ খুব কাছে ছিল না। তাই তারা ঘরেই জামাতে নামায আদায় করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। আমরা খেয়াল করলাম, যখন আমরা মাগরিবের আযান দিয়ে সফ তৈরি করতে শুরু করলাম, তখন খেলাধুলারত ওই সন্তান দৌড়ে এসে নামাযের কাতারে দাঁড়িয়ে গেল। আমি ঘরের এক সদস্যকে বললাম, ছেলেটা কি উযু করবে না? এতক্ষণ তো সে খেলাধুলা করছিল।

উত্তর দেওয়া হলো, উযু করা আছে তার। আমি চিন্তা করলাম, ছেলেটা হয়ত চিন্তা করেছে আজ তো মেহমান আসবে; তাই নামায পড়তে হবে। এজন্য আগেই উযু করে রাখি। উযু করেই খেলাধুলা করতে থাকি। তাই সে আগে থেকেই উযু করে রেখেছে। নামাযের পর ঘরের ওই সদস্য বললেন, আমাদের খান্দানের পূর্বপুরুষ থেকে এই আমল ধারাক্রমে চলে আসছে যে, যেকোনো বাচ্চাই যখন চার পাঁচ বছর বয়সী হয়ে যেত, তখন থেকেই আমরা ওই বাচ্চাকে সর্বদায় উযু অবস্থায় থাকতে উদ্বুদ্ধ করি। আমাদের ঘরের বুঝমান কাউকেই আপনি উযুহীন পাবেন না।

দেখুন, আজকের যুগেও এমন মানুষ আছে, যারা উযুর সাথে জীবন যাপনের জন্যে ব্যাকুল থাকে, যারা সর্বদা উযু অবস্থায় থাকতে অভ্যস্ত।

كَمَا تَعِيْشُوْنَ تَمُوْتُوْنَ

'তুমি যেভাবে তোমার জীবন কাটাবে, সেভাবে সে অবস্থায়ই তোমার মৃত্যু আসবে।'

তাই উযুর সাথে জীবন যাপনকারীদের আল্লাহ তা'আলা উযু অবস্থায়ই মৃত্যু দান করবেন।

এক বাদীর ইবাদাতের আগ্রহ

এক ব্যক্তি বলল, আমি একটি দাসী ক্রয় করলাম। সে বড় দুর্বল ছিল। অসুস্থ ও রুগ্ন ছিল। সারাদিন সে ঘরের কাজ করত। ইশার পর আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমার যিম্মায় কি আর কোনো কাজ আছে? আমি বললাম, যাও বিশ্রাম নাও। সে উযু করল, মুসল্লা বিছাল এবং নামাযে মশগুল হয়ে

গেল। আমি শুয়ে গেলাম। তাহাজ্জুদের সময় যখন আমার চোখ খুলল, তখন দেখলাম, বাদী আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছে, মুনাজাত করছে, হে আল্লাহ! আমার সাথে তোমার ভালোবাসার সম্পর্কের কসম তুমি আমার অমুক ইচ্ছেটা পূর্ণ করে দাও। আমি যখন একথা শুনলাম যে, সে বলছে 'হে আল্লাহ! তুমি যে আমায় ভালোবাসো তার কসম।' তখন আমি বললাম, এই মেয়ে! এভাবে বলো না! বরং বলো, আমি যে তোমাকে ভালোবাসি হে আল্লাহ! তার কসম। মেয়েটা একথা শুনে খুব রাগ হয়ে গেল। বলতে লাগল, আমার মালিক! যদি আল্লাহ আমাকে ভালো না বাসতেন, তাহলে আমাকে মুসল্লায় বসিয়ে রাখতেন না আর আপনাকে আরামের ঘুমে বিভোর রাখতেন না। আপনাকে আল্লাহ ঘুমে ফেলে রেখেছেন আর আমাকে জাগিয়ে মশগুল রেখেছেন তাঁর ইবাদাতে। এটা কেন? নিশ্চয় আমার সাথে আল্লাহর কোনো প্রেমের সম্পর্ক আছে।

সুবহানাল্লাহ! এমন যুগও ছিল। তাহাজ্জুদের সময়ে বলা হতো, আমার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক আছে বিধায় আল্লাহ আমাকে সারারাত জাগিয়ে রেখেছেন। হে আল্লাহ! আপনি যে আমাকে ভালোবাসেন তার কসম! এভাবে বলা কখন সম্ভব হয়? অবশ্যই আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন! বাদীটির সাথে আল্লাহর সম্পর্ক আছে! ওই যুগের মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক থাকত।

প্রত্যহ সত্তরটি তাওয়াফকারী বুজুর্গ

এক বুজুর্গের জীবনচরিতের মধ্যে লিখিত হয়েছে, তাঁর ৭০ বছর বয়স ছিল। তখনও তিনি প্রতিদিন সত্তরটি তাওয়াফ করতেন বাইতুল্লাহর শরীফের। দেখুন, কাবা ঘরটিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করলে তাকে বলে এক তাওয়াফ। তাহলে সত্তর তাওয়াফ সম্পন্ন করতে ৪৯০ বার কা'বা ঘরকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। আবার প্রত্যেক তাওয়াফ শেষে দুরাকাত নামায পড়া ওয়াজিব। সত্তর তাওয়াফে ১৪০ রাকাত নামায আদায় করতে হয়। আমরা তো ৪০ রাকাত নফল নামাযই পড়তে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। আর ১৪০ রাকাত পড়লে তো মরেই যাব। বুজুর্গানে দ্বীনের আমল এমনই ছিল। তো ওই বুজুর্গের অগণিত আমলের মধ্যে এটি একটি আমল। ৪৯০ বার কা'বার ঘর প্রদক্ষিণ করে ৭০টি তাওয়াফ করা। সাথে ১৪০ রাকাত নামায সম্পন্ন করা। জীবনের একটি আমল এমন। তাহলে বাকী আমলগুলো কেমন। আমরা তো প্রতিদিন মাগরিবের পরে ৬ রাকাত নফল নামায পড়তেই কত গাফলতি করি।

ইবাদাতের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.)

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইরশাদ করেছেন, আমি মক্কা মোকাররমা থেকে মদিনা তাইয়্যেবার গমন করলাম। সাওয়ারীতে চড়ে মদিনায় যেতে ১৬ দিন সময় লেগেছে। এই সময়ে ১৬ বার কুরআন খতম করেছি। ইবাদাতের প্রতি এত আকর্ষণ, এত ভালোবাসা, এত প্রেম এবং এত অনুরাগ তাদের কেন সৃষ্টি হতো? আপনি তো ফল খেতে চান। জুস পান করতে চান। আইসক্রিম খেতে চান। আর আমাদের পূর্বসূরী আইম্মায়ে কেরাম ও উলামায়ে ইজামের ইবাদাত করতে মন চাইত। অবিরত ইবাদাতে ডুবে থাকতে ভালোবাসতেন তারা। আপনি নানা রকম খাবার খেয়ে মজা পান আর তারা নানা ধরনের ইবাদাত করে-করে মজা পেতেন।

একটি দুর্লভ তামান্না

এক বুজুর্গকে মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার জীবনের কোনো চাওয়া-পাওয়া আছে কি? থাকলে বলুন। ওই বুজুর্গ বললেন, আমি এমন একটি লম্বা শীতল রজনী চাই, যে রজনী আমি আমার রবের ইবাদাতে কাটিয়ে দেব।

ইবাদাতের গভীর অনুরাগ সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাযি.)-এর

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাযি.)কে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ শহীদ করতে তেড়ে এল। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার শেষ চাওয়া কী? হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাযি.) বললেন, আমি দু রাকাত নফল নামায পড়তে চাই। তো তিনি দ্রুত দু রাকাত নফল পড়ে নিলেন। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করল, এত দ্রুত কেন শেষ করে ফেলেছ নামায? হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাযি.) বললেন, আমি তো দীর্ঘ কিরাত ও রুকু সিজদা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু চিন্তা করলাম, তুমি এতে মনে-মনে ভাববে, মৃত্যুর ভয়ে আমি নামায লম্বা করছি। তাই দ্রুতই নামায পড়ে নিলাম।

চিন্তা করুন, এক পাশে জল্লাদ তার মস্তক খণ্ডিত করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিকে অন্তর চাচ্ছে দু'রাকাত নামায পড়ে রবের সামনে নিজেকে সমর্পণ করতে। তারা চাইতেন নামায একটু লম্বা করতে! কিন্তু একটু পরে তো শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিতে হবে। তো এমন মুহূর্তও তাদের হৃদয়ের অবস্থা এমন কেন হতো? তাঁদের আল্লাহ তা'আলা নামাযের স্বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তাই রাত্র জাগরণ করা একেবারে সহজ হয়ে যেত।

তাহাজ্জুদের নামায এবং শত টাকা

রাত্রি জাগরণ করা একেবারে সহজ হয়ে যাবে তখন, যখন বান্দা জানতে পারে, আমাকে এর বিনিময় দেওয়া হবে। বাজারের চৌকিদার,, যে বাজার পাহারা দেয়, সে তো সারাটা রাত্র জেগে থাকে। কারণ, সে মাস শেষে বেতন পায়। তাকে যদি বলা হয়, তোমাকে প্রতি রাতে ২০০০ টাকা দেওয়া হবে, তাহলে তো ওই লোক সামান্যের জন্যেও বসবে না। চারদিকে দৌড়ের উপর থাকবে। জেগে থাকবে। তো আমার বন্ধুরা! আজ আমরা তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য জাগতে পারি না। কারণ এর বিনিময়ের কথা আমাদের জানা নেই। তাহাজ্জুদের বিনিময়ে তো জান্নাত আসবে। ১০০/২০০ টাকা তো জান্নাতে সামনে ধূলিও নয়।

আমাদের জানার কমতি আছে। আমরা তাহাজ্জুদের ফযিলত জানি না। আগে এর ফযিলত জানা দরকার। তাহাজ্জুদের ফযীলতের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, এটি আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করেছেন। যুগে-যুগে সকল ওলি-বুযুর্গ এই নামায আদায় করেছেন।

তাহাজ্জুদ থেকে মাহরুমীর চিকিৎসা

হাসান বসরী (রহ.)-এর নিকট একলোক এল। বলল, হযরত! আমার রাত জাগার তাওফীক হয় না। তিনি বললেন, হে দোস্ত! তুমি দিনের বেলায় নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখো। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রাতের বেলায় আমল করার তাওফীক দান করবেন। তো যদি আমরা দিনের বেলায় গুনাহ থেকে বাঁচতে পারি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফীক দান করবেন।

সন্দেহযুক্ত খাবারের অশুভ পরিণতি

হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী (রহ.) বলেছেন, একবার কোথাও দাওয়াতে গেলাম। কিছু সন্দেহযুক্ত খাবার আমার পেটে চলে গেল। আমার সন্দেহ হলো, এ খাবার হালাল নাকি হারাম! একেবারে হারাম খাবার নয়! সন্দেহযুক্ত খাবার! হারাম খাবার তো চিনে ফেলতে পারি সহজেই! তো ওই খাবার আমার ভেতর চলে গেছে। ৪০ দিনের তরে আমার অবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। আমার রূপ, রং ও মারেফাতের অবস্থান বদলে গেছে।

তাহাজ্জুদ থেকে মাহরুম হয়ে যাওয়ার এক আশ্চর্য কারণ

একজন মুফতি সাহেব নিজেই বলেছেন, তিনি হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ বাহলুভী (রহ.)-এর হাতে বাইআত ছিলেন। তিনি অনেক বড় আলেম ও বুজুর্গ ছিলেন। মুফতি সাহেব বলেন, আমি যখন বাইআত ছিলাম, কয়েকবারই হযরতের খেদমতে আসা যাওয়া করেছি। তাহাজ্জুদ কাজা হওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতিই তখন আমার আসত না। একবার আমি ফিরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে হযরতের কাছে গেলাম। হযরত চাচ্ছিলেন, আমি আরো এক/দুদিন থেকে যাই। কারণ, হযরত আর বেশী দিন বাঁচবেন না, কয়েকদিনের মধ্যেই হযরতের ইন্তেকাল হয়ে যাবে সেকথা তো আর আগে জানা ছিল না। মৃত্যুর পর বুঝতে পারলাম, কেন হযরত দু-চার দিন পরে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন আমার ব্যাপারে।

তো শায়খ তো আমার প্রতি লক্ষ করেই বলেছেন দু-একদিন বেশী সময় দিতে যেন কিছু নিয়ে যেতে পারি। এটি তো আমার জন্য বড় নেয়ামত! কিন্তু আমি বললাম, হযরত আমার তো দরস-তাদরীসের কাজ রয়েছে। তো আমি চলেই এলাম। কয়েক দিন পরেই হযরতের ইন্তেকাল হয়ে গেল। তাঁর ওফাতের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার তাহাজ্জুদ নসীব হচ্ছে না নিয়মিতভাবে।

৪২ বছর পর্যন্ত তিলাওয়াতে কুরআন

এই নেয়ামত ঘরে বসে পাওয়া যায় না। বরং এটি তো মাশায়েখে কেরামের সোহবতের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আজো, এ যুগেও তেমন মানুষ বিদ্যমান রয়েছেন। এমন এক আলেমের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে। তাঁর সম্পর্ক ছিল হযরত মাওলানা খাজা আবদুল মালেক সিদ্দীকী (রহ.)-এর সাথে, যিনি আমার দাদা পীর। আমি নিজে ওই কথা শুনেছি। হযরত এর সাথে বাইআত হওয়ার পর আজ ৪২ বছর কুরআন পাকের তিলাওয়াত একদিনও ছোটেনি। দেখুন, শায়খের সংশ্রবের বরকতে কী হওয়া যায়। কী পাওয়া যায়।

২৭ বছর যাবত আওয়াবীনের নামায ছোটেনি

কিছু কাল পূর্বে এক দোস্ত আমাকে চিঠি লিখল, দোস্তটি বয়সে একেবারে টগবগে যুবক। দাঁড়িগুলো কুচকুচে কালো। কোনো সাদা দাড়ি তার চেহারায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন যুবক মানুষটি চিঠিতে লিখল, হযরত!

আলহামদুলিল্লাহ! ২৭ বছর ধরে আওয়াবীন নামায পড়ছি। কখনও কাজা হয়নি। বন্ধুগণ! আজকের যুগেও আমলকারীরা ভেতরে-ভেতরে ঠিকই আমল করে যাচ্ছে। আমি-আপনি বুঝতে পারছি না আর কি। এমন লোকের কথাও আমি জানি, ১১ বছর ধরে যার তাহাজ্জুদের নামাযটা ছোটেনি। অথচ আমরা পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাযটা পড়তে কত রকম গড়িমসি করি।

ইবাদাতের গভীর অনুরাগে একজন নারী

কিছুদিন পূর্বে আমার এক বন্ধুর মায়ের ইন্তেকাল হয়েছে। তার ইসলাহী সম্পর্ক ছিল আমার পীর ও মুরবিদের সাথে। আমার পীরের ইন্তেকালের পর তিনি ইসলাহী সম্পর্ক গড়লেন আমার সাথে। ইন্তেকালের পূর্বে তিনি তার ঘরের সবাইকে ডাকলেন। বললেন, দেখো, আমার যখন বিবাহ হয়েছে, তখন আমার বয়স ছিল ২০ বছর আর আজ আমার বয়স ৮০ বছর। এই ৬০ বছরের বৈবাহিক জীবনে কখনও আমার এক ওয়াক্ত নামায কাজা হয়নি!

বর্তমানের অবস্থা

বর্তমানেও যদি এমন মহীয়সী নারী বিদ্যমান থাকেন, তাহলে বলুন ওই মহিলারা, যারা বাহানা করে-করে নামায পড়ে না, বাচ্চার বাহানা দিয়ে, ছোট সন্তানের বাহানা দিয়ে যারা নামায ছেড়ে দেয়, তাদের অবস্থাটা কি হবে? এরা এমন বাহানা দেয় যে, মনে হয় যারা আমল করে গেছে ওই নারীদের সন্তান ছিল না। অথচ হিসাব করলে দেখা যাবে, আজকের নারীদের চেয়েও ওই নেককার নারীদের সন্তান বেশী ছিল। তবুও তারা আমলের প্রতি ব্যাকুল ছিলেন। ভাবসাব এমন দেখায় যে, মনে হয় সন্তান শুধু তাদেরই হয় আর নারীদের সন্তান হয়না। কত রকম বাহানা আজকের নারীরা দেখায়?

বলে কি, আজ তো মেহমান এসেছিল তাই নামায কাজা হয়ে গেছে। আশ্চর্য কথা! মেহমানের যত্নের দিকে লক্ষ রেখে তুমি নামায পড়তে পারলে না। অথচ রাহমানুর রাহীম, আল্লাহর প্রেম ভালোবাসার দিকে লক্ষ্য রেখো তো নামাযটা আদায় করে নেওয়া উচিত ছিল । আসল কথা হলো, আজ ইবাদাতের আগ্রহই আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে। আজ আমাদের নারীরাও বড় উদাসীন হয়ে গেছে। আমাদের অধঃপতন কত হয়েছে দেখুন।

ইবাদাতের আগ্রহ জন্ম নেয় কীভাবে?

ইবাদাতের এই যে তীব্র আগ্রহ-উদ্দীপনা এটি কীভাবে সৃষ্টি হবে? শুনুন। খরবুজা খরবুজাকে দেখে-দেখে রং গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি কাপড় ব্যবসায়ীর

সাথে থাকবে, তার কাপড় ব্যবসার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে। যে কম্পিউটারম্যানের সাথে চলবে, তার আগ্রহ সৃষ্টি হবে কম্পিউটারের প্রতি। যে ব্যক্তি কোনো বিজনেসম্যানের সাথে থাকবে, তার মন ওই বিজনেসের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে। যে আতর ব্যবসায়ীর সাথে থাকবে, সামান্য আতরের ঘ্রাণ তার গায়ে চলে আসবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতে জাগরণকারী, গভীর রাতে উঠে ইবাদাতকারী আল্লাহওয়ালা বুজুর্গের সাথে ওঠাবসা করবে, তাঁর মাহফিলে যাবে, তার হৃদয়ে ইবাদাত করার প্রতি তীব্র আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে।

রাত জেগে থাকার বরকত

আমাদের এখানে মাসিক ইজতেমা হয়। কেন হয়? কারণ, অন্তত একটিবার যেন আমরা সকলে একসাথে বসতে পারি, আল্লাহর ইবাদাতে সময়টা কাটাতে পারি, মাসে কমপক্ষে একটি রাত যেন এমন কাটে যেমন করে আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ প্রতিটা রাত কাটাতেন। দেখবেন, এই যে বুজুর্গদের মতো করে একটি রাত আমরা কাটাই এর বরকত এত বেশী যে, তার প্রভাব আপনি আপনার জীবনের প্রতিটি পদে-পদে টের পাবেন। যে সকল শহরে আমাদের বন্ধুরা এই মাসিক ইজতেমার প্রোগ্রাম চালু করেছে, তারা তাদের শহরে এর বরকত অনুভব করতে পারছে। অনেকে তো এসে বলছে, ওই একটি রাতের বরকতে সারা মাসের বহু রাতেই আল্লাহ তাদের তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফীক দান করেছেন।

রাত জেগে ইবাদাতকারীদের একাউন্ট

একটি কথা হৃদয়ে ধারণ করে রাখুন। উদাহরণের মাধ্যমে বুঝে নিন। মনে করুন, একটি ব্যাংক, যেখানে নানা রকম অর্থ-কড়ির মালিকেরা একাউন্ট খুলেছে। এক ব্যক্তি একাউন্ট খুলে এক হাজার টাকা জমা রাখল। তো যখন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কাদের একাউন্ট এই ব্যাংকের আছে, তাদের লিস্ট তৈরি করবে, তখন ওই বিশাল-বিশাল অর্থ কড়ির মালিকদের নামের তালিকার সাথে এই এক হাজার টাকা জমাকারীর নামও তো আসবে। তেমনিভাবে আমাদের পূর্বসূরী বুজুর্গানে দ্বীনের একাউন্ট হচ্ছে রাত জেগে ইবাদাত! কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিবেন, আমার রাত জেগে ইবাদাতকারী বান্দারা কোথায়? তখন ফেরেশতারা একটি লিস্ট দিবে। সেই লিস্টে বুজুর্গানে দ্বীনের নাম তো আগে থাকবেই, মাসে একটি রাতও

যদি আমরা রাত জেগে ইবাদাত করি, তাহলে তো এ লিস্টে অন্তত শেষ দিকে হলেও আমাদের নাম চলে আসবে। আরে ভাই! একাউন্টে টাকা কম জমা থাকতে পারে; কিন্তু একাউন্ট তো খোলা হয়েছে। তেমনি ইবাদাত কম হতে পারে; কিন্তু রাত তো জাগ্রত থাকা হয়েছে। তাই আজ আমাদের উচিত ইবাদাতের একাউন্ট খোলা। তাই আমরা রাত্রে জাগরণ করব। আগেকার দিনের বুজুর্গানে দ্বীনের মতো ইবাদাতে মগ্ন থাকব। ইনশাআল্লাহ আল্লাহর ইবাদাতের জন্য নিজেকে জাগ্রত রাখার বিনিময় আমরা পাব।

বিনিময় ছাড়া রাত জাগে যারা

এই মানুষ জানে না, দুনিয়ার জন্য কত রাত তারা জেগে ছিল। একটা দুটা রাত তো আল্লাহর জন্য জাগ্রত হওয়া উচিত! সামান্য লক্ষ্য করুন। এয়ারপোর্ট, রেলস্টেশন, বাসস্টেশন, কারখানা, মিল-ফ্যাক্টরী ইত্যাদির কর্মকর্তা, কর্মচারী ও লোকজনের দিকে একটু লক্ষ্য করুন। সেখানকার লোকেরা সারাটা রাত জেগে থাকে। দুনিয়ার উপার্জনের জন্য সেখানে মানুষ বিনিদ্র রাত কাটায়। তো তাহলে কি সারাটা জীবনে একটি রাতও কি আমরা আল্লাহর জন্য ইবাদাতের নিয়তে জেগে থাকতে পারি না? তারা শুধু জাগ্রত থাকলেই তো বিনিময় পাবে না। অথচ আমরা শুধু ইবাদাতের নিয়তে জাগ্রত থাকলেই আল্লাহর দরবারে বিনিময় প্রাপ্ত হব!

রাত জেগে কোন আমল করা হবে

মাসিক ইজতেমার দিন আমরা খুব আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে আসব। কখনো ইবাদাতে আমরা আমাদের সারাটা রাত কাটিয়ে দেব। নামায পড়ব। সালাতুত তাসবীহ আদায় করব। আমাদের সারা জীবনের যেসব নামায কাজা হয়ে গেছে, সেসব নামাযের উমরী কাজা আদায় করব। কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করব। দীর্ঘ মুরাকাবা ও ধ্যান করব! আল্লাহর দরবারে দু'আ মুনাজাত করব। আল্লাহ যেন অন্তত একটি রাত স্থির চিত্তে প্রশান্তভাবে তার ইবাদাতে কাটানোর তাওফীক দান করেন সেজন্য দু'আ করব। আল্লাহ তা'আলা বুজুর্গানে দ্বীনের জীবনের কর্মসূচীর সাথে আমাদের আমলের যে একটি সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়ে যায় এর প্রতি যত্নবান হব। আল্লাহর দরবারে যেন আমরা কবুল হয়ে যাই। আল্লাহ যেন আমাদের ব্যাপারে একথা বলেন যে, আমার ওই বান্দা আমার যিকিরে, আমার স্মরণে, আমার ইবাদাতে রাত জেগে থাকে। আল্লাহ যেন আমাদের কবুল করে নেন।

আল্লাহর ভয় কাকে বলে

আল্লাহ যখন কোনো মানুষকে খাশিয়াত তথা ভয় দান করেন, তখন সেটা এভাবে চেনা যায় যে,ওই মানুষটি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, শুনুন প্রত্যেক কাজ কর্মের ও প্রত্যেক বিষয়েরই দলিল থাকে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, অমুকের মাঝে কি আল্লাহর ভয় আছে? তাহলে তার কাজ-কর্মের দিকে তাকাতে হবে! দেখতে হবে, লোকটি গুনাহের কাজ ছেড়ে দিয়েছে কিনা? যদি গুনাহ ছেড়ে দিয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, হ্যাঁ; তার মাঝে আল্লাহর ভয় আছে। গুনাহমুক্ত থাকা, গুনাহ থেকে বিরত থাকা মুমিন বান্দার যিন্দেগীর মাকসাদে হায়াত, মূল লক্ষ। গুনাহের স্বাদ শুরুতে মধুর মতো মনে হয়; কিন্তু তার পরিণাম বড় কঠিন, কষ্টদায়ক ও বিষের মতো তিক্ত হয়।

আযাযীল থেকে শয়তান : পাঁচটি কারণ

শয়তান তো ছিল আযাযীল। আযাযীলের ইবাদাত এত ছিল যে, প্রতি ইঞ্চি যমিনে তার সিজদা পড়েছে। শেষ পর্যন্ত সে শয়তানে পরিণত হলো। ইবলিস হয়ে গেল। কোন জিনিস তাকে ইবলিসে পরিণত করল? দারুণ চমৎকার কথা; মন দিয়ে শুনুন। উলামায়ে কেরাম কিতাবে লিখেছেন, পাঁচটি কারণে ফেরেশতাদের সরদার আযাযীল ইবলিসে পরিণত হয়েছে। বিতাড়িত শয়তানে পরিণত করেছে।

প্রথমত গুনাহ করেছে; অথচ গুনাহ বলে স্বীকার করেনি। এটা শয়তানের আলামত!

দ্বিতীয়ত গুনাহ করে তার উপর অনুতপ্ত হয়নি, লজ্জিত হয়নি। বরং উল্টো নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য বলল, আমি আদম থেকেও উত্তম।

তৃতীয়ত গুনাহ করে নিজেকে ধিক্কার দেয়নি। বলেনি, এই তুই কিন্তু খারাপ করেছিস।

চতুর্থত গুনাহ থেকে তাওবা করেনি। অথচ গুনাহ হয়ে গেলে তাওবা করে নিতে হয়।

পঞ্চমত সে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল।

এই পাঁচটি কারণে ফেরেশতাদের সরদার ইবলিসে পরিণত হয়েছে।

তাওবা কবুলের পাঁচটি দিক

শয়তানের বিপরীতে সাইয়্যেদুনা আদম (আ.)কে দেখুন। হযরত আদম (আ.)-এর মাঝে পাঁচটি অভ্যাস বিদ্যমান ছিল।

(১) সাথে-সাথে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا

'হে আমাদের পালন কর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি।'[১]

(২) নিজের ভুল স্বীকার করে নিলেন এবং এর কারণে নিজে-নিজে লজ্জিত হলেন। ভাবলেন, আমার ভুল হয়ে গেছে।

(৩) নিজেকে নিজে ধিক্কার দিলেন, আহ্, আমি কেন এমনটা করলাম!

(৪) তারপর তিনি তাওবা করে নিলেন। আল্লাহর দরবারে সত্য তাওবা করলেন। দু'আ-মুনাজাত করলেন।

(৫) আল্লাহ রবুল ইযযাতের রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে অবিরত দু'আ করে গেলেন।

তাই তো আল্লাহ তা'আলা তাঁর তওবা কবুল করে নিয়েছেন।

আমাদের যিম্মাদারী

আমাদের উচিত হযরত আদম (আ.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা! প্রথমত গুনাহের কথা স্বীকার করব। এর কারণে লজ্জিত হব, আমরা নিজেকে নিজে ধিক্কার দিব, আল্লাহর দরবারে তাওবাও করব এবং আল্লাহর রহমতের আশা করব, তাঁর রহমতের উপর ভরসা রাখব। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিবেন। আমাদের উচিত আমরা গুনাহ থেকে তাওবা করার সত্য নিয়ত করে নেব। তারপর বলব, হে আমাদের রবে কারীম! আজ পর্যন্ত যত গুনাহ করেছি, আমাদের সবগুলো গুনাহ মাফ করে দিন। তারপর হৃদয়ে নেক কাজ করার এক বুক উদ্দীপনা নিয়ে বসবে এবং বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে সারা জীবন ইবাদাত-বন্দেগী করার তাওফীক দান করুন। আমাদের ইবাদাতের স্বাদ দান করুন। আমাদেরকে ইবাদাতে মগ্ন থাকার তাওফীক নসীব করুন।

ইবাদাতের মজা কেমন

যে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা ইবাদাতের তীব্র আগ্রহ-উদ্দীপনা দান করবেন, তাকে আল্লাহ তাঁর মহবতের সামান্য এক ফোঁটা শরাব পান করিয়ে দেন। ফলে ওই বান্দা নিজেই ইবাদাতে মগ্ন হয়ে যায়। নিজেই ইবাদাতে প্রশান্তি খুঁজে পায়।

---

১. সূরা আরাফ, আয়াত- ২৩

دوعالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو ◆ عجب چیز ہے لذت اشنائی

ইবাদতের স্বাদ এমন যে তা দুনিয়াকে অপরিচিত করেদেয়। ইবাদতের এই মজা বড় আজীব বিষয়।

এই নেয়ামত বড় আজীব এক নেয়ামত। এই যেসকল বুজুর্গ মুসল্লায় বসে সারাটা রাত কাটিয়ে দেন, তাঁরা কেন এমন করেন! কেউ তো তাঁদের মারপিট করে এ কাজ করতে বাধ্য করেন না। বরং তারা একটি অমীয় স্বাদ ও সুমধুর সুধা এই ইবাদাতে খুঁজে পান, যার কারণে সেই সুধা পানের জন্যে তাঁরা তীব্রভাবে ব্যাকুল থাকেন। তাই রাত জেগে-জেগে তাঁরা স্বাদ পান। এই স্বাদে, এই মজায় তারা এতটা বিভোর থাকেন যে, কোন ফাঁকে রাত শেষ হয়ে যায়, তা তাঁরা বুঝতেই পারেন না। ফজরের আযানধনি শুনে তাঁরা আফসোস করেন, হায় শেষ হয়ে গেল রাত! শেষ হয়ে গেল অভিসার!

একটি উদাহরণ

দেখুন, সংসারে মা কত কাজ করেন। অধিক কাজ করতে করতে মা ক্লান্ত হয়ে যান। তাই তিনি বলে দেন, এই আমি আজ অনেক ক্লান্ত! তোমরা আমাকে কেউ ডিস্টার্ব করো না। আমি শুয়ে পড়ব! দ্রুত শুয়ে পড়ব! আমি দিনে ঘুমুতে পারিনি। আমি এখন শুয়ে যাব। তো মনে করুন, মা ক্লান্ত শরীর নিয়ে শুয়ে পড়লেন। ঠিক এমন সময় দরজায় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। তার প্রবাসে অবস্থানকারী সন্তান হঠাৎ বহুদিন পর এসে উপস্থিত। বলুন, এই সন্তানকে দেখে আর কি মায়ের চোখে ঘুম থাকবে?

বরং মা ওই ছেলের সাথে দু-তিন ঘণ্টা ধরে কথা বলতে থাকবে। তাকে যত্ন করে খাওয়াবে। নানা রকম মজার গল্প করবে, শুনবে। বিদেশে কীভাবে কি করেছে তা শুনবে। দেশে মা কীভাবে ছিলেন তা বলবে। যদি ঘরের সকলে মিলে বলে, মা! তোমার ঘুম কোথায় গেল? তোমার ক্লান্তি অবসাদ কোথায় গেল! মা তখন আহলাদ করে বলবে, আরে আমার আদরের পুত্র এসেছে, আমার ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে।

এই ক্লান্ত মা তার প্রিয় পুত্রকে দেখে যেমন করে সব ভুলে যায়, সন্তানের দিকে তাকিয়ে ঘুম ভুলে যায়, ক্লান্তি ভুলে যায় তেমনিভাবে আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দীনও যখন রাতে মুসল্লা পেতে বসতেন, আল্লাহর ইবাদাত শুরু করতেন, আল্লাহর নূর যখন তাঁরা দেখতেন ও অনুভব করতেন, তখন তাদের সকল ক্লান্তি অবসাদ দূরীভূত হয়ে যেত। তাঁরা পুরো উদ্দমে ইবাদাতে মশগুল হয়ে যেতেন। আমরা ইবাদাত করে ক্লান্ত হয়ে যাই

আর তাঁরা ইবাদাত করে-করে নব উদ্যমে তেজি হয়ে যেতেন। তারা কুরআন পড়ে নব শক্তি লাভ করতেন, নফল নামায পড়ে নব শক্তি লাভ করতেন। لا اله الا الله এর যিকির করে করে নতুনভাবে প্রাণ পেতেন। তারা ইবাদাতের মাধ্যমে নব প্রাণের সঞ্চার করতেন।

আমাদের ওষুধ তাদের আহার

যদি তীব্র ক্ষুধা লাগে, তখন পোলাও-কোরমা কেমন লাগে? কারণ, এতে তার ক্ষুধা নিবারণ হয়। আবার দেখুন, ওষুধ সেবন করা কত মুশকিলের বিষয়! কত মহিলা এবং কত বাচ্চা তো অসুস্থই থাকতে চায়; তবুও ওষুধ সেবন করতে চায় না। আমরাও তেমন ইবাদাত সহজে করতে চাই না! তাই চিন্তা করলাম, একটি রাত অন্তত ওষুধ সেবনের মতোই তিক্ত হলেও ইবাদাতে কাটানো হোক।

মসজিদে গাধা

এক লোকের গাধা মসজিদে ঢুকে পড়েছে। ইমাম সাহেব দেখে ওই লোককে খুব ধমকাল! গাধাটিকে বেত্রাঘাত করে তাড়াতে চাইলেন! গ্রাম্য লোকটি বলল, হুজুর! আপনি গাধাটাকে খামোখা কেন প্রহার করছেন? হুজুর বললেন, আরে মিয়া! এটা মসজিদে ঢুকে পড়েছে! লোকটা বলল, হুজুর ওটা তো একটা পশু; কিছু বোঝে না। এজন্য মসজিদে চলে গেছে। আমাকে কি আপনি কোনো দিন মসজিদে দেখেছেন? আমি তো বুঝি; তাই আমি মসজিদে ঢুকি না। আজকের মানুষের অবস্থা দেখুন। এটিই আমাদের হালত! আজ আমরা মসজিদে আসি না। নামায পড়ি না।

ইবাদাতে খুশি হোন

দেখবেন, নারীরা চুড়ি পেলে খুশি হয়ে যায়। তাই তারা চুড়ি পরে। আনন্দ করে। আমাদের এই ইবাদাতে খুশি হওয়া উচিত। যে ইবাদাত করে খুশি হবে, ইবাদাতের মধ্যে ফায়দা খুঁজে পাবে, সে আসবে, ইবাদাত করবে। আর যে ঘুমুতে পারলেই খুশি, যে ঘুমের মধ্যে ফায়দা পাবে, সে আরাম করতে থাকুক। আপনারা আজ এখানে এই মাসিক ইজতেমায় কিছু নিতেই তো এসেছেন।

বাইআত করানোর সময় হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রহ.)-এর অবস্থা

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রহ.) বলেছেন, যখন কোনো মানুষ আমার কাছ বাইআত হতে আসত, তখন আমার অবস্থা এমন হয়ে যেত, যেমন হয়ে যায় বাঘের সামনে পড়লে মানুষের অবস্থা। কারণ, লোকটা

যখন আমার কাছে বাইআত হবে, তখন তার আমলের ব্যাপারে তাকেও জিজ্ঞেস করা হবে, আমাকেও জিজ্ঞেস করা হবে। আমাকে প্রশ্ন করা হবে, শায়খ হিসেবে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ কিনা? তুমি তাকে সত্য ও সুন্দরের দিকে আহান করেছ কিনা?

জান রক্ষা করা

আমার দোস্তরা! আমি মাসে আমার জান রক্ষার্থে একটি করে প্রোগ্রাম করেছি। কারণ, আমার আমলের ব্যাপারে তো আমাকে জিজ্ঞেস করা হবেই। সাথে-সাথে আমার হাতে যারা হাত রেখেছে, তাদের আমলের কথাও আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে। এটি বড় এক মসিবত। আমি এই মুসিবতে পড়েছি। আমার বোঝা তো আমার মাথায় আছেই; সাথে আমার হাতে যারা হাত রেখেছে, যারা আমার কাছে বাইআত হয়েছে, তাদের বোঝাও আমার টানতে হচ্ছে।

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ.

'অতএব নিশ্চয় আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের নিকট রাসূল প্রেরীত হয়েছে এবং রাসূলগণকেও।'[১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মাশায়েখে কেরাম লিখেছেন, কিয়ামতের দিন শায়খকে আল্লাহ তা'আলা জিঞ্জির বেঁধে দাঁড় করাবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত ওই জিঞ্জির খুলে দেবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত শায়খ এই কথা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত না করতে পারবে যে, তার সাথে যারা ইসলাহের জন্যে সম্পর্ক গড়েছে, তাদের ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব পূর্ণভাবে আদায় করেছে। তাই আমি যে মাসিক ইজতেমার আয়োজন করেছি, এটি আমার জান বাঁচানোর জন্য করছি। এখন আমি আমার যিম্মাদারী পুরা করে দিলাম। কেউ একথা বলতে পারবে না, আমার শায়খ আমাকে সময়ই দেননি। আমার শায়খ অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন; তিনি আমাকে সময় দিতে পারেননি। কেউ যেন কিয়ামতের দিন একথা বলতে না পারে।

রুহানিয়াতের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্যের অবস্থান

তো আজ মাসিক ইজতেমায় একটি রাত ইবাদাতে কাটিয়ে দিন। দেখবেন, দূরে বসেও আপনারা তাওয়াজ্জুহ পাবেন! বাতেনি তাওয়াজ্জুহের জন্যে বাহ্যিক অবস্থা ও অবস্থানের কোনো মূল্য নেই। উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু পূর্ব আর পশ্চিমের ব্যবধানের কোনো গুরুত্ব নেই।

---

১. সূরা আরাফ, আয়াত- ৬

যদি ইসলাহের নিয়তে আপনারা এখানে এসে থাকেন, তাহলে আমি যাদের দায়িত্ব দিয়েছি, তারা আপনাদের মুরাকাবাও করাবেন। রাতের আমলেও আপনাদের জুড়িয়ে দেবেন। ইনশাআল্লাহ ঝুলি পূর্ণ করেই আপনারা ফিরতে পারবেন।

ইজতেমায়ী কাজের ফযীলত

একটি মাসআলা শুনুন। একা-একা বান্দা যদি নামায পড়ে, তাহলে আল্লাহর মর্জি; আল্লাহ চাইলে কবুল করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। কিন্তু ফিকহের একটি মাআলা হচ্ছে, যদি কোনো বান্দা জামাতে নামায আদায় করে, তাহলে পুরো জামাতের কোনো একজনের নামায যদি আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নেন, তাহলে আল্লাহ সকলের নামাযই কবুল করবেন। ওই লোকের নামাযও কবুল করে নিবেন।

ঠিক তেমনিভাবে এত বান্দা মিলে যখন রাতের আমলে মশগুল হবেন, তখন সকলের মধ্যে থেকে কোনো একজনের আমল কবুল হলেই তার বিনিময়ে সকলের আমল আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নেবেন। জামাতবদ্ধ হওয়ার কারণে সকলের জেগে থাকাকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নেবেন।

গত রমযানের ক্লান্তি মনে নেই

দেখুন, গত রমযানে তারাবীহ ও রোযার ক্লান্তির কথা আজ আমার মনে নেই। অথচ রমযানে তো শরীর প্রচণ্ড ক্লান্ত ছিল। যদিও সেই রোযার ক্লান্তি ও কষ্টের কথা আজ মনে নেই; কিন্তু তার সাওয়াব তো অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তেমনিভাবে আজ যদি রাত জাগা হয়, তাহলে কষ্ট ও ক্লান্তি হবে! কিন্তু আগামী দিনের সন্ধ্যার আগেই তা ভুলে যাবেন। তবে সাওয়াব ও বিনিময় তো আমল নামায় রয়েই যাবে।

নফসের উপর চাপ সৃষ্টি করুন

আমাদের নফস রাত জেগে আমাদের দিয়ে গুনাহ করায়। আমরা কেন পারব না নফসকে জাগিয়ে রেখে ইবাদাত করাতে? আজ যদি এমন হয় যে, অনিদ্রায় আমাদের চোখ লাল হয়ে গেছে, তাহলে মনে রাখুন সাহাবায়ে কেরামের চোখও এমন অনিদ্রায় লাল হয়ে যেত। চোখ ঘুম-ঘুম করত। কিন্তু কার জন্য? আল্লাহর ইবাদাতের জন্য এমনটা হচ্ছে। ইবাদাত যেমন করে করা উচিত, আমরা তো তেমন করে করতে পারছি না। কিন্তু নিয়ত তো করতে পারি। একটু চেষ্টা তো করে দেখতে পারি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই চেষ্টাটাই কবুল করে নিবেন। এর বরকতে ইবাদাতের মজা দান করবেন। এর ফল নিজেই বুঝতে পারবেন।

রাত জেগে ইবাদাত করার এই আয়োজন কেন?

রাত জাগার এই যে আয়োজন এটি শুধু এজন্য যে, আমরা চাই মাসে একটি রাত সকল সালেক একত্র হই। চাই সকলে মিলে একটি রাত ইবাদাত করি এবং আল্লাহকে ডাকি।

আমার হৃদয় তো চাইছিল ইজতেমাটি দিনের বেলায় হোক। কিন্তু তাতে আপনাদের অনেকের উপস্থিত থাকতে সমস্যা হবে। আপনাদেরও তো কাজ-কারবার আছে। আপনারা বলেন, সপ্তাহে একটা দিন ছুটি তাই সে দিনটাতে আবার পীর সাহেবের কাছে চলে যেতে হয়। ঘরের কাজ কাম কে করবে! কখন করা হবে? তো অনেক কিছু চিন্তা-ভাবনা করেই রাতের সময়টা নির্ধারণ করা হয়েছে। যেন রাতটা আমরা জেগে-জেগে আল্লাহর স্মরণে কাটিয়ে দিতে পারি। সারাটা রাত যেন আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকতে পারি। এতে সারা বছর তো আমরা রাতে জেগে থাকতে পারি না। অন্তত বারো মাসে বারোটি রাত যেন আল্লাহর জন্য জাগ্রত থাকতে পারি।

হাদীছের একটি ঘটনা

হাদীছ শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা দুই প্রকার বান্দাকে কবুল করে নেন এবং খুশি হয়ে তাদের কথা ফেরেশতাদের কাছে আলোচনা করেন।

এক. যখন কোনো জিহাদী কাফেলা ক্লান্ত-ক্লিষ্ট থাকে। চলতে-চলতে রাতের শেষ প্রহরে এসে ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের মধ্য থেকেই একজন ওঠল, উযু করল এবং নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা মুচকি-মুচকি হাসেন আর ফেরেশতাদের বলেন, দেখো! দেখো! অন্যরাও তো ক্লান্ত-ক্লিষ্ট! এ লোকটাও ক্লান্ত-ক্লিষ্ট! কিন্তু আমার মহবত ও প্রেম-ভালোবাসা তাকে জাগিয়ে রেখেছে। সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়ছে। এমন বান্দা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়!

দুই. ইরশাদ হয়েছে, সে হচ্ছে এই নওজোয়ান। তাহাজ্জুদের সময় যে জেগে ওঠে উযু করে নামায পড়া শুরু করে। তার সুন্দরী স্ত্রীও তখন ঘরে উপস্থিত। সে ইচ্ছে করলে তার স্ত্রীর সাথেই সময়টা পার করে দিতে পারত। কিন্তু সে আল্লাহর ইবাদাতকেই প্রাধান্য দিয়েছে। আল্লাহ তখন খুশি হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং ফেরেশতাদের সাথে তার আলোচনা করতে থাকেন। জানা গেল, যে ব্যক্তি নিজের নিদ্রাকে, নিজের ইচ্ছা ও চাহিদাকে কুরবান করবে, ত্যাগ করবে এবং আল্লাহর ইবাদাতে নিজেকে মশগুল রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার ইবাদাত তো কবুল করে নেবেনই, মুচকি-মুচকি হাসবেনও তার দিকে তাকিয়ে। আবার তার আলোচনাও করতে থাকবেন ফেরেশতাদের মাঝে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তার রাত জাগা বুজুর্গানে দ্বীনের কাফেলায় শামিল করে নিন এবং আর আমাদের গুনাহগুলোকে নেক দ্বারা পরিবর্তন করে দিন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'আমাদের জন্য আমাদের রব্বে কারীম দারুণ সুন্দর কারে তৈরি করেছেন এ পৃথিবী। সাজিয়েছেন এই ফুল বাগান। কোথাও সবুজের বিস্তৃত প্রান্তর, কোথাও পাহাড়, ঝরনাধারা, নদী-সাগর। কোথাও আছে ধু-ধু বালুকাময় ঊষর প্রান্তর। সব মিলিয়েই আমাদের এই পৃথিবী। এই পৃথিবীর পরিচালনায় আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত দু-রকম বাহিনী নিযুক্ত করে রেখেছেন। ১. কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে, যারা দুনিয়ার সকল গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে। ২. আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু মানুষকেও নির্ধারণ করে রেখেছেন।

একটি সুবিন্যস্ত ধারায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরিচালনা করেন এই পৃথিবী।

আমাদেরই কর্মগুণে দুনিয়ায় কখনও দুর্ভিক্ষ আসে। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন আসে। আমাদেরই কারণে আমাদের উপর আযাব আসে। তাই আযাব না আসার জন্য আগে নিজে ঠিক হতে হবে।'

আল্লাহর প্রেমে মুগ্ধ যেজন এবং এই রঙিন দুনিয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا. سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

রঙিন দুনিয়ার শত উপকরণ

দুনিয়াকে বলা হয় دار الاسباب অর্থাৎ দুনিয়া চলে উসীলার মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা উপকরণের মাধ্যমে করে থাকেন। প্রত্যেক জিনিসের তরীকা এবং প্রত্যেক কর্মের মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হ্যাঁ আল্লাহ তা'আলা চাইলে রুটি ছাড়াই ক্ষুধা নিবারণ করতে পারেন। তবে তিনি নিয়ম করে দিয়েছেন যে, রুটি খাও; তাহলে তোমার ক্ষুধা নিবারিত হয়ে যাবে। পানি পান করলে পিপাসা মিটে যাবে। বিবাহ করার পরেই সন্তান হবে। মেহনত ও পরিশ্রম করলেই তুমি রিযিক প্রাপ্ত হবে।

উহুদের জিহাদে যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হলেন, তখন হযরত ফাতেমাতুয যাহরা (রাযি.) আগুন জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে দ্রুত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জখমে লাগিয়ে দিয়েছেন। শেফা দানকারী তো আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু জখমের উপর ব্যান্ডেজ তো বাঁধতে হবে। কঠিন ক্ষুধা! নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে খাদ্য বলতে কিছু নেই। কঠর জ্বালায় কাবু হয়ে গেলেন মানবতার দিশারী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যার কারণে পেটে পাথর বাঁধতে হয়েছে। দেখুন, আল্লাহর নিয়ম হলো লোহা শক্ত হবে। তো আপনি যখন যেখানে যে প্রান্তে গিয়ে লোহা ধরবেন, চোখ বন্ধ করে ধরেও বলতে পারবেন, এটি লোহা। এমন তো কখনও হবে না যে, লোহা এক দিকে প্লাষ্টিকের মতো নরম হবে আর অন্যদিকে তা হবে শক্ত। বা তরবারী বানালে লোহা শক্ত হবে আর বল্লম বানালে সেই লোহা নরম হবে।

লোহা তো সব সময়ই লোহা। তাই তো ইঞ্জিনিয়ররা লোহার অবস্থা দেখে বলে দেয়, কত তলা ফাউন্ডেশনের বিল্ডিংয়ে কত মোটা রড লাগবে। পুল বানাতে হলে কোন পুলে কত মোটা রড লাগবে। তেমনিভাবে পৃথিবীর প্রতিটি ধাতু প্রতিটি পদার্থ এবং প্রতিটি জিনিসেরই একেকটি নীতি ও মূলনীতি আছে, যে নীতি-মূলনীতির মধ্য দিয়ে জিনিসটির গতি বহমান আছে।

কুদরতে ইলাহীর প্রকাশ

সাধারণ নিয়মে এমনটি কোনোভাবে হবে না যে, মানুষ রাতে ঘুমিয়েছে তো সে ফাসেক হয়ে যাবে আর সকালে উঠবে তো সে কামেল ও পুত-পবিত্র হবে। তবে এমনটি যদি আল্লাহ তা'আলা বলে দিতেন, তাহলে তা তিনি করতে পারতেন। তিনি ইচ্ছে করলে হযরত মারইয়াম (আ.) ব্যতীত অন্য অনেককেই স্বামী ছাড়া সন্তান দিতে পারতেন। অনেক নবীকে আল্লাহ তা'আলা এমন বয়সে সন্তান দিয়েছেন, যখন তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা বয়সে চলে গেছেন। আল্লাহ ইচ্ছে করলে তা করতে পারেন। তবে তারপরও তিনি যে নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন, পৃথিবী তার আলোকেই চলে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রীকে যখন সুসংবাদ দেওয়া হলো, তখন তার অবস্থা এমন হয়েছিল যে-

فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

তিনি চেহারায় হাত মারতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, আহ! আমি তো বুড়ী হয়ে গেছি;[১] এখন আমি মা হব? কিন্তু এসব তো রবের কুদরতী বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ। এসব তো একান্ত খাস বিষয়। কিন্তু সাধারণ নিয়ম তো এমন নয়। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, দুনিয়াটা চলবে উপকরণের মাধ্যমে। তবে কখনও মহান আল্লাহ তাঁর কুদরতকে মানুষের সামনে প্রকাশিত করে দিতে পারেন। মাধ্যম ও উপকরণ ছাড়াই কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারেন, যেন লোকেরা ঈমান সুরক্ষিত রাখতে পারে। সহজ কথায় বলতে গেলে এভাবে বলতে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা জগদ্বাসীকে একথা বুঝিয়ে দিলেন যে, আমি নিয়ম ও মূলনীতি বানিয়েছি, উপকরণের মাধ্যমেই সব ঘটবে, তবে আমি নিজে সেই নিয়মের আওতায় চলে আসিনি। বরং ইচ্ছে করলেই আমি নিয়ম বহির্ভূতভাবে সবকিছু করতে পারি। সবকিছু এখনো আমারই ইচ্ছাধীন রয়ে গেছে।

---

১. সূরা যারিয়াত, আয়াত- ২৯

রূহানী উপকরণ

যেমনিভাবে বাহ্যিক সব কিছুর পরিচালনার জন্যে বাহ্যিক নিয়ম ও উপায়-উপকরণ রয়েছে, তেমনি রুহানী বিষয়গুলোর পরিচালনার জন্যেও রয়েছে নিয়ম-কানুন ও উপায়-উপকরণ। যেমনিভাবে মানুষ দুনিয়াবী বাহ্যিক জ্ঞান শিক্ষা করে, তেমনিভাবে এই মানুষ রুহানী জ্ঞানও শিক্ষা করতে হয়! শায়খের কাছে বাইআত হতে হয় তো শায়খ থেকে যিকির ও মুরাকাবা শিক্ষা করাই এখানে উপকরণ! রহমত তো আল্লাহই করবেন। তবে মুরাকাবা হচ্ছে রহমত প্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যম ও উপকরণ।

ব্যবস্থাপনা দু'প্রকার

দুনিয়ার এই বাগিচার কাজ কারবার চালানোর জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দু'প্রকারের ব্যবস্থাপনা রয়েছে।

১. ফেরেশতার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা

কিছু ফেরেশতা নির্ধারিত রয়েছে, যারা দুনিয়ার সকল গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে। যেমন– আসমান থেকে বর্ষিত প্রতি ফোঁটা পানির দায়িত্বে নিয়োজিত আছে এক-একজন ফেরেশতা। যতক্ষণ পর্যন্ত পানির এই ফোঁটা তার নির্ধারিত স্থানে না পৌঁছবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে হেফাযত করে তার জন্য নিয়োজিত ফেরেশতা। অনুরূপ বাতাসের দায়িত্ব ফেরেশতাদের হাতে। পাহাড়ের দায়িত্ব ফেরেশতাদের হাতে। কিতাবে লিখিত আছে, প্রত্যেকটি মানুষের সাথে দুজন করে ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। যদি এই ফেরেশতারা না থাকত, তাহলে জিনরা মানুষের নাম-নিশানা মিটিয়ে দিত। মানুষের আমল লিখার দায়িত্ব ফেরেশতাদের হাতে।

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ . كِرَامًا كَاتِبِيْنَ . يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ

অর্থ : অথচ তোমাদের জন্য কিছু লিপিবদ্ধকারী সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে। তারা জানে, তোমরা যা কর।[১]

যখন মানুষের মৃত্যুর সময় হয়, তখন রূহ কবজ করার দায়িত্বে থাকে একজন ফেরেশতা।

---

১. সূরা ইনফিতার, আয়াত- ১০-১২

তাই বলছি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে পরিচালনা করার জন্য কিছু পরিচালক ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন।

২. মানুষের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া পরিচালনার খেদমতে কিছু মানুষকেও নির্ধারণ করে রেখেছেন। কোনো শাসক যখন রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তখন সাধারণত তিন স্তরে বিন্যস্ত বাহিনী থাকে।

(১) একটি সাধারণ জনসাধারণের বাহিনী

এরা একটি নির্ধারিত নীতি মেনে তাদের জীবন যাপন করতে হয়। তারা কাজ-কারবার করুক, চাকরি করুক অথবা যা ইচ্ছে করুক না কেন সর্বাবস্থায় সেই একটি নির্ধারিত নীতির আলোকে চলতে হবে।

(২) একটি এমন বাহিনী থাকে যারা বাদশাহর কাজে নিয়োজিত

রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা বাদশাহকে সহায়তা করে। তারা লোকদের বাদশাহর নীতি ও সংবিধানমতো পরিচালনা করে।

(৩) তৃতীয় দলটি থাকে এমন যারা বাদশাহর সরাসরি পুলিশ বা সেনাবাহিনী

এদেরকে রাষ্ট্রের একেবারে খাস-খাস কাজের জন্য রিজার্ভ রাখা হয়। রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য এদের রাখা হয়। পুলিশকে রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা ঠিক রাখার কাজে বানানো হয়।

আল্লাহর নীতি ও পরিচালনা

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে পরিচালনা করার জন্য তিনটি স্তরে সৃষ্টিজীবকে বিভক্ত করেছেন।

১. সাধারণ লোক

এদের মধ্য থেকে কেউ হবে হতভাগা আবার কেউ হবে সৌভাগ্যবান। তাদের কাজ দুনিয়ায় জীবন যাপন করে আখেরাতের সফরে রওনা হওয়া। এরা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা আরো দুটি দল বানিয়েছেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অন্য কাজের নির্দেশ দিয়ে কর্মে নিয়োজিত রেখেছেন।

কুতুবে এরশাদের দায়িত্ব

একটি দলের নেতৃত্বস্থানীয়দের বলা হয় কুতুবে ইরশাদ। দাওয়াত, তাবলীগ ও ইহয়ায়ে সুন্নাত তথা সুন্নাত যিন্দা করা এবং ইহয়ায়ে দীন তথা দীন যিন্দা করাকে বলা হয় ইরশাদ। আর কুতুবে ইরশাদ হয়ে থাকে আল্লাহর ওই সকল বান্দা, যাঁরা রূহানীভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনির্বাচিত ওয়ারিশ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত ও তাবলীগের যে কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, তাঁরা ওই কাজের ওকালাত করে, নবীজির দায়িত্ব নিয়ে, নবীজির ওয়ারিশ হয়ে নবীজির সকল কর্মসূচী পালন করে যাবেন। কেমন যেন কুতুবে ইরশাদ মানুষের হৃদয়কে আল্লাহর মহবতে পূর্ণ করে রাখবে। আর শরীয়তের সকল বিধিবিধান পূর্ণভাবে মান্য করানোর জন্য প্রবল প্রচেষ্টা চালাবে। কুতুবে ইরশাদের আওতায় থাকে কয়েকজন আওলিয়ায়ে কেরাম, যারা কুতুবে ইরশাদ থেকে ফয়েয ও বরকত প্রাপ্ত হয়ে থাকেন এবং সেসব কর্মসূচী চালিয়ে নেন। তাদের দাওয়াতে ইরশাদের বাহিনী বলা হবে।

কুতুবে মাদারের দায়িত্ব

আরেকটি বাহিনী এমন, যারা সেনাবাহিনীর মতো। সেনাবাহিনী যেমন দেশ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত, তারাও তেমন। তাদের কুতুবে মাদার বলা হয়। তাদেরও আওতায় কিছু আউলিয়ায়ে কেরাম থাকেন। তাদের দায়িত্বে নানা কাজের নিয়ন্ত্রণভার থাকে। তাদের সম্পর্ক থাকে সৃষ্টিজীবের পরিচালনার সাথে। যেমনটি ফেরেশতাদের একটি দলের দায়িত্বে থাকে। এসব বান্দাও নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করে থাকেন।

যখন কাউকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হয়, তখন সে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পবিধান করতে বাধ্য থাকে। যেন সাধারণ পাবলিক এবং তাদের মাঝে পার্থক্য ফুটে ওঠে। তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে সৃষ্টিজীবের কোনো ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত করেন, তখন বাহ্যিকভাবে তার মাঝে দিশাহীন ইত্যাদি অবস্থা তৈরি হয়, যার কারণে তাকে আর দুনিয়াবাসী কারো সাথে কথাবার্তা বলার উপযুক্ত বলা যায় না। সে আপন কাজে বড় নিবিড়ভাবে মগ্ন থাকে। কেউ আর তাকে বাধা প্রদান করে না, করতে পারে না।

কুতুবে ইরশাদের ফযীলত

এখানে একটি বিষয় চিন্তা করার মতো। দাওয়াত ও পথপ্রদর্শনের পথ তো বড়ই উত্তম পথ। তাই তো কুতুবে মাদার সর্বদা কুতুবে ইরশাদের আওতায় থেকে কাজ করে। একই সময় কুতুবে ইরশাদও বিদ্যমান থাকেন। আবার কুতুবে মাদারও বিদ্যমান থাকেন। তবে কুতুবে মাদার কুতুবে ইরশাদের অধীন থাকেন। কুতুবে মাদার তার সকল কার্যক্রমের রিপোর্ট কুতুবে ইরশাদকে প্রদান করে। তো কুতুবে ইরশাদ যেহেতু দাওয়াত, তাবলীগ, এশাআতে দীন, শরীয়তের কাজ, মাদরাসা, মক্তব, মসজিদ, খানকা এবং রূহানী সকল কাজের ব্যবস্থাপনা করেন, তাই কুতুবে ইরশাদকে সর্বদিক থেকে সর্বোন্নত ফযীলত দেওয়া হয়েছে।

কাকে বলে মাজনূন আর কাকে বলে মাজযূব

যে মানুষকে সাধারণ ও বাহ্যিকভাবে জ্ঞানবান মনে হয় না বরং মনে হয় লোকটি অন্যরকম অবস্থায় আছে, তাকে বলা হয় মাজনূন অথবা মাজযূবও বলা হয়। তবে দুয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। মাজনূনকে দেখা যাবে সে আশ্চর্য রকমের কাণ্ড-কীর্তি করছে। না খাবার-দাবার চলাফেরায় কোনো মিল আছে বা অন্য কোনো কাজের তার ঠিক-ঠিকানা আছে। বরং সে তখন অন্য রকম অবস্থায় থাকে। আর মাজযূব (مجذوب) আরবি جذبه শব্দ থেকে নির্গত। তাই মাজযূবের মধ্যে অন্য রকম এক জযবা থাকে। তবে বাহ্যিকভাবে এ লোকও মাজনূনের মতোই আজীব ধরণের কাণ্ড-কীর্তি করে। মাজনূন ও মাজযূব উভয়ের জীবনেই সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। তবে মাজনূন হচ্ছে মানসিক ভারসাম্যহীন অসুস্থ আর মাজযূব হচ্ছে আল্লাহর ওলি। উভয়ের মাঝে বাহ্যিকভাবে সামঞ্জস্য থাকার কারণে সালেকীন ও আত্মশুদ্ধি করতে আগ্রহীরা বড় পেরেশান হয়ে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে পড়ে যায়। আবার কিছু মানুষ তো মাজনূনকেও মাজযূব মনে করে ফেলে, পাগল বা উন্মাদ মনে করে ফেলে। যেকোনো পাগল, উন্মাদ ও মানসিক ভারসাম্যহীন লোক দেখলেই তাকে আল্লাহর ওলি মনে করে ফেলে। আবার কিছু মানুষ এমন হয়, যারা মাজযূবকেও পাগল ও মানসিক অসুস্থ মনে করতে শুরু করে। তাই বাড়াবাড়িও করা যাবে না, ছাড়াছাড়িও করা যাবে না। মধ্যম পন্থা অবলম্বনের তরে কিছু সূক্ষ্ম বিষয় উপস্থাপন করতে হয়, যেন সকলের আমল-আকীদা সালফে সালেহীন ও নেককার বুজুর্গানে দ্বীনের আমল-আকীদার মতো হয়ে যায়।

তাদের সবচেয়ে বড় নিদর্শন তো এই যে, মাজনূনকে সর্বদা দিশাহীন দেখা যাবে, অস্থির দেখা যাবে আর মাজযূবকে সর্বদা প্রশান্ত ও স্থির দেখা যাবে। অর্থাৎ মাজনূন কখনো স্থির হতে পারে না। তার দিল-দেমাগ, মেধা-মস্তিষ্ক বিকৃত থাকে, যার কারণে সে সর্বদা পাগলামী করে বেড়ায়। অস্থিরতার কারণে সে একবার এটা করে, আবার ওটা করে। একেকবার একেক কাণ্ড-কারখানা ঘটায়।

আর বাহ্যিকভাবে মাজযূবকেও তেমনই মনে হয়। কিন্তু সে কাণ্ডকীর্তিতে অস্থির থাকে না। তাকে আপনারা অস্থির দেখবেন না। সহজ কথা, মাজনূনের মাঝে অস্থিরতা ও ভারসাম্যহীনতা প্রবল থাকে। আর মাজযূবের মাঝে ইতমিনান, প্রশান্তি ও স্থিরতা বিদ্যমান থাকে।

মাজযূব হওয়ার জন্য হাত তুলুন

যদি কোনো মানুষ মাজযূবের কাছে যায়, তার খেদমত করে এবং মাজযূব যদি তার উপর মেহেরবান হয়ে যায়, তাহলে মাজযূব তাকে ওই স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, যে স্তরে মাজযূব নিজে অবস্থিত। অর্থাৎ যে মাজযূবের জন্য বেশী কিছু করবে, মাজযূব তাকেও মাজযূব বানিয়ে দেবে।

এখন বলুন ভাইয়েরা! যারা মাজযূব হতে চান, তারা হাত তুলুন। অথচ আমাদের মধ্যে থেকে কেউ তো এমন জিন্দেগী চায়-ই না। প্রত্যেকে চায় শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ করে যেতে, যেন কিয়ামতের দিন শরীয়তের উপর আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে।

মাজযূবের প্রকারভেদ

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, মাজযূব আবার কীভাবে হওয়া যায়? এর উত্তর হচ্ছে মাজযূব দুভাবে হতে হয়।

এক. ওহাবী মাজযূব। অর্থাৎ খোদাপ্রদত্ত মাজযূব।

দুই. কাসবী মাজযূব। অর্থাৎ মেহনত করে অর্জিত গুণে গুণান্বিত মাজযূব।

১. ওহাবী মাজযূব

আল্লাহ রব্বুল আলামীন যখন বলেছেন اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের রব নই? একক বলে নিজের জামাল ও সৌন্দর্যের জালওয়া ও ঝলক দেখিয়ে দিলেন, তখন কিছু ইশকওয়ালা তো এমন ছিল, যারা বেহুশ হয়ে গিয়েছিল।

তারা ইলাহী নূরের ঝলক দেখে তার মাঝে এমনভাবে ডুবে গেল যে, তার প্রভাবে এবং ইলাহী নূরের তাজাল্লীতে তাদের দেমাগ ও জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল। তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে গেল। এরাই হচ্ছে ওহাবী মাজযুব বা খোদাপ্রদত্ত মাজযূব। খোদাপ্রদত্ত ইলাহী প্রেমে দেওয়ানা।

তারা মায়ের পেটেও মাজযূব, বাচ্চা বয়সেও মাজযূব, তরুণ বয়সেও মাজযূব। তারা বার্ধক্যেও মাজযূব। এমনকি এই মাজযূব অবস্থায়ই বিদায় নেয় তারা।

২. কাসবী তথা নিজের চেষ্টায় যে মাজযূবের স্তরে উন্নীত হয়

কাসবী মাজযূব সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে।

এক. ওই মাজযূব, যে শুরুতে দাওয়াত ও ইরশাদের সঠিক পথে চলে এবং তরিকতের সম্পর্ক হয় হয়; তবে সুলতানুল আযকারের সবকের সামনে এসে আটকে যায়। তার রগ-রেশায় যে আল্লাহ আল্লাহ নাম প্রবাহিত ছিল, তা এখানে এসে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

দুই. এমন মাজযূব, যে অন্য কোনো মাজযূবের কাছে গমন করে তার সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে বা তার খেদমতে নিবেদিতপ্রাণ থাকার কারণে তার প্রতি কোনোভাবে তাওয়াজ্জুহ দিয়েছেন, যার ফলে সেও মাজযূব হয়ে যায়।

হযরত বাবুজী আব্দুল্লাহ (রহ.)-এর উপর এক মাজযূবের প্রভাব

হযরত বাবুজী আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেছেন, এক মাজযূব আমার উপর অনেক মেহেরবানি করতেন। একদিন তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়ো। আমি পড়লাম لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ সে বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগল, যেন আমি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়ি। কিন্তু আমি প্রত্যেকবার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ পড়ছিলাম। তিনি বললেন, আমি তো বিষয়টি জানি! ওটা পড়লে কী হবে তা আমি যদি না জানতাম। আর তাঁর মতো করে শুধু لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়ে নিতাম, তাহলে আমি সাথে-সাথে মাজযূব হয়ে যেতাম।

এম.বি.বি.এস ডাক্তার আবদাল হলো যেভাবে

হযরত সাইয়্যেদ যিওয়ার হুসাইন শাহ-এর নিকট আমি নিজেই একটি ঘটনা শুনেছি। তার এলাকায় এক এম.বি.বি.এস ডাক্তার এক মাজযূবের সাথে

উঠাবসা করত। ওই মাজযূব ইন্তেকালের সময় তাকে কিছু খাওয়ার জন্য দিয়ে গেল। সে জিনিসটি ওই ডাক্তার খেয়ে নিল। ফলে সে মাজযূব হয়ে গেল। এবার ওই ডাক্তার মাজযূব ইযার ছাড়া শুধু একটি পাজামা পরিধান করতে শুরু করল। হালত এমন ছিল যে, পাজামা হাতে নিয়েই চলতে-ফিরতে লাগল। ওই ডাক্তার এক হাকিম সাহেবের নিকট আসা-যাওয়া করত। হযরতজি বলেন, আমিও একবার ওই হাকীম সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম। তখন উপরের তলা থেকে ডাক্তার সাহেবও এলেন। হাকীম সাহেব ডাক্তার সাহেবকে দেখে বললেন, লোকেরা আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসছে তো। আমি একটু ব্যস্ত আছি। সামান্য কিছু সময় অপেক্ষা করুন। ডাক্তার মাজযূব ইঙ্গিতে বোঝাল, আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর ওই ডাক্তার মাজযূব আমার পাশেই বসে গেল। আমি বড় আশ্চর্য হলাম তার কাণ্ড কারখানা দেখে। আমি যখন ওর দিকে তাকাই, তখন ও এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। কিন্তু আমি যখন অন্যদিকে তাকাই ও সাথে-সাথে আমার চেহারার দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে। সামান্য কিছুক্ষণ পর ও হাকীম সাহেবের কাগজের স্তূপ থেকে একটি কাগজ আর কলম তুলে নিয়ে গুণগুণ করতে থাকল এবং কিছু লিখতে থাকল। যখন আমি তার গুণগুণানির প্রতি একটু ভালো করে মনোযোগী হলাম, তখন বুঝলাম ও আরবী কিছু আশ্চর্য কবিতা আবৃত্তি করছে। বুঝতে তো পারছিলাম না কী পড়ছে; কিন্তু তার অবস্থা দেখে এতটুকু বুঝতে পারছিলাম যে, সে মহবতে ইলাহীর কবিতা গুণগুণিয়ে আবৃত্তি করছে। অথচ এম.বি.বি.এস ডাক্তারের সাথে আরবীর কোনো সম্পর্ক থাকে না।

সামান্য কিছুক্ষণ পর ডাক্তার সাহেব উঠে বললেন, এখন আমি যাব। হাকীম সাহেব বললেন, ডাক্তার সাহেব! কী হলো? কেন এতদিন আপনি আমার নিকট এলেন না? ডাক্তার সাহেব বলতে লাগলেন, আমি এখন 'দাল' হয়ে গেছি। একথা বলে ডাক্তার সাহেব চলে গেলেন।

তো একটু পর ওই হাকীম সাইয়্যেদ যিওয়ার শাহ-এর নিকট আরজ করলেন, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন এ লোক কী বলে গিয়েছে? হযরত বললেন, না; আমি তো বুঝিনি ও কী বলেছে। হাকীম সাহেব বলতে লাগলেন, ও বলে গেল আমি এখন দাল হয়ে গেছি। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এখন আমি আবদাল হয়ে গেছি। সহীহভাবে না বলে ওভাবে বলেছে আর কি। হযরতজী বলেন, আমিও বড় বিস্মিত হলাম যে, ও তো তা-ই করে গেছে। কিন্তু হাকীম সাহেব ওই ইঙ্গিতপূর্ণ কথাটা বুঝে নিয়েছেন।

তারপর হাকীম সাহেব হরফ বড় করে দেখা যায় এমন একটি পাওয়ারী আয়না আনলেন। তারপর তার সাহায্যে ওই ডাক্তার কাগজে যা লিখে গিয়েছে, তা দেখলাম। দেখে বড় বিস্মিত হলাম। আশ্চর্য ব্যাপার! হিজিবিজি করে সে যা লিখেছে, তা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আরবী কবিতা এমন সুন্দর করে কোনো কাতেবও লিখতে পারে না।

মাজযূবের একটি বিশেষ অবস্থা

মাজযূব লোকেরা কুদরতের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দায়-দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত খাস-খাস কাজে নিয়োজিত থাকেন। তবে সাধারণভাবে তাদের থেকে শরীয়তের খেলাফ কোনো কাজ সংঘটিত হয় না। তাদের থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়। তাদের মাঝে এতটুকু হুশ তো অবশ্যই থাকে যে, কখনো-কখনো কথাবার্তাও বলেন। যেমন প্রাণীকুলের মধ্যে আকল তো নেই; কিন্তু নিজ মালিকের পরিচয় তার কাছে বড় চমৎকারভাবে থাকে। কী খেতে হবে, কী খাওয়া যাবে না সে তা ভালো করেই জানে! তো সাধারণভাবে তার হুঁশ থাকে না ঠিক; কিন্তু এক প্রকারের হুঁশ তো থাকেই।

কামেল মাজযূবের পরিচয়

সাইয়্যেদ গাউস আলী (রহ.) দুজন মাজযূবকে দেখেছেন। কোনো এক জালেম তাঁদের ধরে, তাদের রানের উপর জ্বলন্ত কয়লা রেখে দিয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে যে কামেল ছিল, সে তার রান থেকে আগুনের কয়লাটা সরাল না। তার শরীর জ্বলতে থাকলই। আর যে কামেল ছিল না, ও সাথে-সাথে আগুনের কয়লাটা ঝাড়া মেরে রান থেকে ফেলে দিল। বোঝা গেল, মাজযূবদের মধ্যে যে যত কামেল সে ততটা বেহুঁশ হয়ে থাকে। বেহুঁশ মানে দুনিয়ার কোনো বিষয়ের প্রতি তাদের আর কোনো হুঁশ থাকে না। একটি খাস হালতে তাকে আপন সত্তায় মগ্ন থাকতে দেখা যায়।

মাজনূন লোকদের জান্নাতে প্রবেশ

যারা পাগল-মাজনূন, তাদের ব্যাপারে শরীয়তের কোনো বিধান নেই। পাগলের কাজ-কর্মের হিসাব কিয়ামতের দিন নেওয়া হবে না। কিয়ামতের দিন পাগল ও উন্মাদ লোকদের আপন রহমতে জান্নাত দিয়ে দিবেন। উলামায়ে কেরাম এর কারণ এই লিখেছেন যে, যেহেতু তার আকৃতি ও গঠন

মানুষের তাই মানবীয় মর্যাদার কারণে আল্লাহ তা'আলা পাগলকে জাহান্নামে দিবেন না, জান্নাত দিয়ে দিবেন। আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ তা'আলা কিছু মানুষকে শুধু মানবসুলভ সম্মানের কারণে পাগল ও উন্মাদ হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নাম না দিয়ে জান্নাত দিয়ে দিবেন। তাহলে যে ব্যক্তি শরীয়তের উপর, সুন্নাতের উপর চলবে, দীন মেনে চলবে, আল্লাহর হুকুম মেনে চলবে, তাকে মেহেরবানি করে মেহেরবান মাওলা কেন জান্নাত দিবেন না আপনারা আমাকে বলুন। বরং এদেরও তো জান্নাত দিবেন।

মাজযূবদের আশ্চর্য সব ঘটনা

মাজযূবদের ঘটনা তো বড়ই আশ্চর্যজনক ও দুর্লভ। তাদের ঘটনা পড়ে ও শুনে মানুষ খুবই অবাক হয়।

মাজযূবের দু'আর ফল

হাকীম সানায়ী (রহ.)-এর পিতা মাখদুম সাহেবকে এক মাজযূব বললেন, আল্লাহ তোমাকে একজন ছেলে সন্তান দিবেন। কিছুদিন পরই হাকীম সানায়ী (রহ.)-এর জন্ম হলো। হাকীম সানায়ী ছেলেবেলায় তার বন্ধু উসমান খায়রাবাদী (রহ.) সাথে খেলছিলেন। একদিন তাদের উভয়কে এক মাজযূব বলল, রুটি আর ঝোল আনো। উভয়ে বলল, ঠিক আছে। তাদের কাছে তো টাকা ছিল না। একজন তার নিজের কিছু জিনিস বিক্রি করে রুটি ক্রয় করলেন। অপরজন নিজের কিছু জিনিস বিক্রি করে ঝোল ক্রয় করলেন। উভয়ে তা মাজযুবের নিকট নিয়ে এলেন। তা খেয়ে মাজযূব দুজনকে দু'আ করে চলে গেলেন।

এক সময় উভয়ে তাদের যুগের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হয়ে গেলেন। উসমান খায়রাবাদীর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা রূহানী কাজ নিলেন আর হাকীম সানায়ী (রহ.)-এর দ্বারা আল্লাহ এ জগতের হাকীমী কাজ নিলেন। তিনি তার যুগের বড় হাকীমও ছিলেন আবার কবিও ছিলেন। এমনকি আল্লামা ইকবাল (রহ.)ও তার কবিতার প্রশংসা করেছেন।

এক মাজযূবের সাথে ইবনে আরাবীর সাক্ষাত

আল্লামা ইবনে আরাবী (রহ.) এক মাজযূবকে দেখলেন। লোকটি নামায পড়ছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই মিয়া কী করছ? মাজযূব বলতে

লাগল, আমি জানি না আমি কী করছি। তিনি (আল্লাহ) আমাকে ওঠান আবার তিনিই আমাকে বসান। ইবনে আরাবী (রহ.) তাঁর কিতাবে এ ঘটনা লিখেছেন।

খাজা নিজামুদ্দিন আওলিয়ার সাথে এক মাজযূবের সাক্ষাত

হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আওলিয়া (রহ.) যখন খেলাফত প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি হযরত খাজা রামান (রহ.)-এর মাজারে কদিন ই'তিকাফ করলেন। তিনি তখন একটি ফুলের বাগান দেখতে পেলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই বাগানের বৃক্ষগুলো বড় হয়ে গেল। একদিন দেখা গেল ফুলও এসে গেছে। তিনি দু'আ করলেন, হে রবে কারীম! এ কয়েকটা দিনেই তুমি এখানে ফুল দিয়ে দিলে? আমি তোমার ইবাদাতে এখানেই বসে থাকব। হে আল্লাহ! আমার ভেতরও তাক্ওয়ার ফুল দিয়ে দাও। তার দু'আ এমনভাবে কবুল হলো যে, ৪০ দিন পূর্ণ করে যখন তিনি বের হলেন, তখন রাস্তায় এক মাজযূবের সাথে সাক্ষাত হলো। সেই মাজযূব হযরতকে তাওয়াজ্জুহ দিলেন। ফলে হযরতের অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেল।

বংশধারায় বাদশাহী

গযনীর বাদশাহ সুলতান মাহমুদ গজনভীর বাবা ছিলেন সবুক্তগীন। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন সাধারণ কর্মকর্তা। তাঁর ঘরে একজন আল্লাহওয়ালা এলেন। তিনি ওই আল্লাহওয়ালার মেহমান দাবি করতে থাকলেন। মসজিদে যাওয়ার সময় সবুক্তগীন ওই বুজুর্গের আদব রক্ষার্থে কয়েক কদম পিছনে চলতেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা এমন করলেন যে, তিনি সাধারণ সিপাহী থেকে জেনারেল এবং শেষে সে যুগের বাদশাহ হলেন। ওই বুজুর্গের সম্মানে তিনি যত কদম পিছনে ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বংশধারায় তত স্তর পর্যন্ত বাদশাহী দান করেছেন।

মাজযূব হাতিকে ফেলে দিয়েছেন

একবার সবুক্তগীনের হাতি কোনো এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এক মাজযূব হাতিটার পাশ দিয়ে যেতে লাগল। রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে ওই মাজযূব রাস্তার দেওয়াল ও হাতির মধ্যখানে পড়ে গেলেন। মাজযূব শুধু হাতিটার গায়ে হাত লাগিয়ে বলল, হাতি! পেছনে সর। সাথে-সাথে এত বড় হাতিটা ধপাস করে পড়ে গেল।

চাঁদকে লুকিয়ে নিলেন পেয়ালায়

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর বাবা শাহ আব্দুর রহীম নকশবন্দী (রহ.) নেসবতওয়ালা মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন। একবার তিনি চিন্তা করলেন, কেন আমি বাহ্যিকভাবে মুজাহিদদের পোশাক পরিধান করব না? ফলে তিনি মুজাহিদদের পোশাক পরিধান করে চলাফেরা করতে লাগলেন। একবার এক মাজযূবা তার বিষয়টি দেখে ফেললেন। তিনি বলতে লাগলেন, দেখো এ লোক তো চাঁদকে পেয়ালায় লুকিয়ে ফিরছে!

এক মাজযূবার পর্দা রক্ষার ঘটনা

খাজা আবদুল খালেক গাজদাওয়ানী (রহ.) ইমাম মালেক (রহ.)-এর বংশধর ছিলেন। আমাদের সিলযিলায়ে আলিয়া নকশবন্দিয়া তরীকার বুজুর্গ ছিলেন। তাঁর বাড়ি বোখারা থেকে ১৭ কিঃ মিঃ দূরে ছিল। এলাকার নাম ছিল গাজদাওয়ান। একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। তাঁকে এক মাজযূবা দেখে ফেললেন। তাঁর শরীরে পুরো কাপড়ও ছিল না। তাঁকে দেখেই মাজযূবা দ্রুত একটি বড় চুলার ভেতর ঢুকে গেল। অথচ ওই চুলা তখন উত্তপ্ত ছিল। তাতে আগুনের কয়লা ছিল। হযরত আব্দুল খালেক গাযদাওয়ানী চলে যাওয়ার পর ওই মাজযূবা ওখান থেকে বের হলো। লোকেরা বলল, তুমি এমন করে ঘুরে বেড়াও। এই বুজুর্গকে দেখে কেন চুলায় ঢুকে পড়লে? মাজযূবা বলতে লাগল, বহুদিন পর একজন প্রকৃত পুরুষ দেখতে পেলাম তো তাই। আর পুরুষের সাথে পর্দা করতে হবে বলে শরীয়তে হুকুম রয়েছে। বনে-জঙ্গলে মানবহীন, পুরুষহীন স্থানে তো আর পর্দা করতে হয় না।

বকরী রক্ষক বাঘ

একবার হযরত থানভী (রহ.)-এর নানা এক মাজযূবাকে দেখলেন, একটা বাঘকে তার বকরী পাহারার কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাঘ তো বকরী খেয়ে ফেলে। তোমার বকরী খাচ্ছে না কেন? মাজযূবা বলল, আমি আমার মাওলার কাজে মশগুল থাকি আর বাঘ আমার বকরী রক্ষার কাজে মশগুল থাকে।

খাজা বাকী বিল্লাহকে এক মাজযূবের নসীহত

হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.) এক মাজযূবকে দেখতে পেলেন। তার পাশ দিয়ে যখন মাজযূব যাচ্ছিল, তখন সে একটি কবিতা পড়ল। বলতে লাগল

در کنز و ہدایہ نتواں یافت خدارا

سیپارۂ دل بیں کہ کتاب بہ ازیں نیست

তুমি কানযুদ্দাকায়েক আর হেদায়া পড়ে আল্লাহকে পাবে না। হৃদয়ের পাঠ পড়ে নাও। হৃদয়ের পাঠ ব্যতীত উত্তম কোনো পড়া নেই।

অথচ ওই মাজযূব নিজেই জানে না, সে কে।

হৃদয়ের তাফসীর

হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) বলেছেন, একবার দরসে কুরআনে কুরআনের তাফসীর করার কথা ছিল। কোনো-কোনো আলেম এসে হযরত সিদ্দীকী (রহ.)কে জিজ্ঞেস করত, হাফেয গোলাম হাবীব সাহেব কোন তাফসীর অধ্যয়ন করেন। হযরত সিদ্দীকী (রহ.) বলতেন, উনি তো হৃদয়ের তাফসীর পড়েন। এর কারণেই তো আল্লাহ তা'আলা তার উপর উলূম ও মারেফতের বারিধারা বর্ষণ করছেন।

বাদশাহ আলমগীরের বাদশাহী লাভের ঘটনা

যদি হযরত থানভী (রহ.)-এর মতো মুহাক্কিক, গুণী ও বুজুর্গ আলেম কোনো ঘটনা লেখেন, তাহলে তো সেটা আমাদের জন্য দলিল হয়ে যায়। তিনি তাঁর কিতাবে একটি ঘটনা লিখেছেন। বাদশাহ আলমগীর ও তাঁর ভাই উভয়েই চাইছিল বাদশাহ হতে। বাদশাহ আলমগীর ছিল মাশায়েখে কেরামের সোহবতপ্রাপ্ত। তিনি বললেন, আমি বাদশাহ হলে সমস্ত বিদআতকে দূর করে দিব। কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে দেশ চালাব।

বাদশাহ আলমগীরের ভাইকে কেউ একজন পরামর্শ দিল, অমুক জায়গায় একজন বুজুর্গ আছেন। তিনি কারো জন্য দু'আ করলে সেই দু'আ কবুল হয়। তুমি গিয়ে দু'আ নিয়ে এসো।

ভাই দু'আ আনতে বুজুর্গের দরবারে গেলেন। বুজুর্গ তার সম্মানে দাঁড়িয়ে তার সাথে মুসাফাহা করলেন। তাকে জায়নামায বিছিয়ে দিয়ে তাতে বসতে বললেন। কিন্তু ভাই বললেন, হযরত! আমি কি আপনার জায়নামাযে বসার উপযুক্ত? একথা বলে তিনি আর জায়নামাযে বসলেন না। তিনি উলামায়ে কেরামের সোহবতপ্রাপ্ত ছিলেন না। তাই 'আদব পালন থেকেও আদেশ মানা উত্তম' একথা তিনি বুঝতে পারেননি। দুবার তিনবার বুজুর্গ তার জায়নামাযে ভাইকে বসতে বলেছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই ভাই বলল, হযরত! আমি এর

উপযুক্ত নই। বরং ভাই সামনে বসে পড়লেন। কথাবার্তা শেষে বিদায়ের সময় ভাই বললেন, হযরত আমি যেন বাদশাহীর আসনে বসতে পারি সে জন্য দু'আ করবেন। এবার বুজুর্গ বললেন, আরে আমি তো তোমার জন্য জায়নামায বিছিয়ে দিয়েছিলাম। তুমি তো নিজেই তাতে বসনি। আমার কী করার আছে। এখন তো সময় চলে গেছে।

একথা শুনে বাদশাহ আলমগীরের ভাই খুব আফসোস করলেন। ভাই চিন্তা করলেন, আলমগীর যেন এ বিষয়টা জানতে না পারে। তাই তিনি বিষয়টা গোপন রাখলেন।

কেউ একজন কিছুদিন পর আলমগীরকে বলে দিল, অমুক স্থানে এক বুজুর্গ আছেন, যিনি দু'আ করলেই কবুল হয়ে যায়। তুমি গিয়ে তার থেকে দু'আ নিয়ে এসো। আলমগীর তো আল্লাহওয়ালাদের সোহবতপ্রাপ্ত ছিলেন। আলমগীর সেখানে ওই বুজুর্গের কাছে গেলেন। আগের মতোই বুজুর্গ দাঁড়িয়ে মুসাফাহা করলেন এবং জায়নামায পেতে দিয়ে বললেন, এখানে বসুন। হযরত প্রথমে আদবের দিকে তাকিয়ে বললেন, হযরত আমি তো এর উপযুক্ত নই। বুজুর্গ বললেন, বসুন। আলমগীর বাদশাহ সাথে-সাথে জায়নামাযে বসে গেলেন। কারণ, তার জানা ছিল, আদেশ পালন করা আদব রক্ষার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কথাবার্তা চলতে থাকল। বিদায়ের সময় আলমগীর বললেন, হযরত! আমি শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। বিদআত দূর করতে চাই। তাই দু'আ করুন যেন আমি বাদশাহী রাজমুকুট পাই। এবার বুজুর্গ বলতে লাগলেন, আরে আমি তো তোমাকে বাদশাহী আগেই দিয়ে দিয়েছি। যখন বুজুর্গ বাদশাহীর নাম নিলেন, তখন আলমগীর বুঝে ফেললেন, বুজুর্গানে দ্বীনের যবান থেকে নির্গত কথা যথার্থই হয়। হযরত আলমগীর বললেন, হযরত! বাদশাহী তো পেলাম; কিন্তু মুকুট কি পাব না? এবার বুজুর্গ বলে দিলেন, মুকুট তো তাঁর হাতে যে তোমাকে উযু করিয়েছে। আলমগীরের মনে পড়ল, আমি শাহজাদা হওয়ায় আমার এক খাদেম আছে। সে বড় নেককার। আমাকে তো সে-ই ওযু করায়। আলমগীর দৌড়ে গেল তার খাদেমের কাছে। উযু করিয়ে দিতে বলল আবার। নিজের হাত জেনে-বুঝেই একটু ব্যস্ত করে নিয়ে খাদেমকে বলল, আমার মাথায় পাগড়ীটা তুলে দাও না দয়া করে। খাদেম অস্বীকার করল। বলল, আমি তো আপনার মাথায় হাত দেওয়ার উপযুক্ত নই। কিন্তু আলমগীর পীড়াপীড়ি করলেন। খাদেম অনেকবার তা মান্য করতে অস্বীকার করল। শেষমেষ শাহজাদা আলমগীরের

পীড়াপীড়িতে আলমগীরের মাথায় খাদেম পাগড়ী পরিয়ে দিল। খাদেম ঐ বুজুর্গকে লক্ষ করে বলতে লাগল, ওই বুজুর্গ আমার গোপন তথ্য ফাঁস করে দিলেন। তো এভাবে বাদশাহ আলমগীর বাদশাহ হয়ে গেলেন। অথচ বুজুর্গদের চেনা-ই যায় না। খুব কম লোকই প্রকৃত বুজুর্গ চেনে।

এখানে একটি বিষয় আছে মনে রাখার মতো। আর তা হচ্ছে তাদেরকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, আবদাল ও কুতুবদের নিয়ন্ত্রণের যে ভার দেওয়া হয়েছে, তা তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নির্দেশে। আল্লাহ যা বলে দেন, তাঁরা তা-ই করেন। সামান্যও এদিক-সেদিক করেন না। তিলপরিমাণ উল্টা করেন না। নিজের মর্জিমতো তাঁরা কিছুই করতে পারেন না। তাঁরা শুধু হুকুমে ইলাহীকে বাস্তবায়ন করেন। তাই তাঁদের পেছনে আমরা ছুটলেও হবে না কিছুই। তাদের রাজী করতে চাইলেও বা করলেও এতে কিছুই লাভ করা যাবে না বরং রবে কারীমের ইচ্ছেই এখানে কার্যকর হয়ে থাকে। আল্লাহ থেকেই যা নেওয়ার তা নিতে হবে। অন্য কারো থেকে নেওয়া যায় না। তাঁরা বরং একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আল্লাহর হুকুমই পালন করেন।

তো ওই মাজযূব-আবদাল-কুতুব এরা তো দূরের কথা, খোদ সারা জাহানের সরদার তাজেদারে মাদীনা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে রেখেছেন-

مَا أَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰى إِلَىَّ

'আমি তো জানিই না তোমাদের সাথে এবং আমার সাথে আল্লাহ তা'আলা কী আচরণ করবেন। আমি তো আমার উপর যে ওহী নাযিল হয় সে মোতাবেকই আমল করি।'[১]

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী (রহ.)

কেউ একজন হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী (রহ.)কে বললেন, হযরত! ইংরেজরা তো হিন্দুস্তানে মজবুতভাবে দখল বসিয়ে নিচ্ছে। আওলিয়া কেরাম কিছু করতে পারছেন না কেন? মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী (রহ.) বললেন, এটা হটিয়ে দেওয়া তো তাদের এক তাসবীহের কাজ। কিন্তু তাদের কী করার আছে? উপরওয়ালা যে এমনই চাইছেন। তার উল্টো করার অনুমতি যে আল্লাহ তাদের দেননি।

---

১. সূরা আহকাফ, আয়াত- ৯

খাজা ফরীদুদ্দিন আত্তার (রহ.)

৭ম হিজরী শতকে যখন তাতারীদের ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, সে সময় তাযকিরাতুল আওলিয়ার মুয়াল্লিফ খাজা ফরীদুদ্দীন আক্তার (রহ.) জীবিত ছিলেন। তিনি খবর পেলেন, তাতারী বাহিনী তার দেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যে সময় এ খবর জানতে পারলেন, যে সময় তিনি পেয়ালা থেকে কিছু পান করছিলেন। তিনি পেয়ালাটি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। যখন পেয়ালা ঘুরিয়ে দিলেন, তখন বাহিনী রাস্তা ভুলে গেল। পুরো সৈন্যবাহিনী অন্যদিকে চলে গেল। বছরটা এভাবেই কেটে গেল।

২য় বছর আবার সংবাদ এল, তাতারীরা এই শহরের দিকে আসছে। তিনি আবার ইচ্ছে করলেন, আমি কিছু করতে চাই। কিন্তু এসময় তাকে ইলহামের মাধ্যমে জানানো হলো, প্রিয় বান্দা! সব তো আমার ইচ্ছেই চলে। এখনকার ফয়সালা কুদরতের ফয়সালা। এই ফয়সালা তুমি মেনে নিতে হবে। ফলে তিনি চুপ করে বসে গেলেন। ভাবলেন, হে আল্লাহ! তোমার ফয়সালা যখন এমনই এবং আমি কিছু করি তা যেহেতু তুমি চাইছ না তো আমি তাতারীদের হাতেই টুকরো-টুকরো হয়ে যাব। তবুও তোমার ফয়সালার অমান্য করব না। পরে ফল এই দাঁড়ালো যে, তাতারীরা এসে সারা শহর দখল করে নিল। মানুষকে ব্যাপকভাবে হত্যা করতে লাগল। তাতারীরা যাদের শহীদ করেছে খাজা ফরিদুদ্দীন আক্তারও তাদের একজন।

মাওলানা তাজ মাহমুদ আমরুটী

তখন রেশমী রুমাল আন্দোলন চলছিল ভারতবর্ষ জুড়ে। সে সময় উলামায়ে কেরাম ও আওলিয়ায়ে কেরাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বড় কঠোর ছিলেন। মাওলানা তাজ মাহমুদ আমরুটী কথা বলতে-বলতে একবার জালালী হালতে চলে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, অন্তর তো চায় এডওয়ার্ডের মহলে ঢুকে নিজের হাতে ওদের চিহ্ন মুছে দেই। কিন্তু এমন করতে অনুমতি তো আমাকে রবে কারীম দেননি; কীভাবে করি!

খাজা আব্দুল মালেক সিদ্দীকী (রহ.)

হযরত খাজা আবদুল মালেক সিদ্দীকী (রহ.) এক মাহফিলে বলতে লাগলেন, যদি আমি একটিবার তাওয়াজ্জুহ দেই, তাহলে পুরো মজমাকে তড়পানোর ভেতর রেখে দিতে পারি। কিন্তু কী করব উপরওয়ালা তো এমন করার এজাযত আমাকে দেননি।

খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার (রহ.)

একবার খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার (রহ.)-এর সামনে বলা হলো, বাদশাহ তো অত্যন্ত নাফরমান হয়ে গেছে। তিনি বলতে শুরু করলেন, যদি কিছু করি, তাহলে তো বাদশাহ খালি পায়ে দৌড়াতে-দৌড়াতে এখানে ছুটে আসবেন। কিন্তু কী করব? উপরওয়ালা তো আমাকে এমন করার এজাযত দেননি।

মূল কর্তা

আমার বন্ধুগণ! আমাদের উচিত আল্লাহর মর্জির পেছনে ছুটতে থাকা, আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখা। যখন আমরা আমাদের রবে কারীমকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করব, তখন আল্লাহ তা'আলা তার কাছ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে আমাদের ফয়েয পৌঁছানোর তরে নিয়োজিত করে দেবেন। বাহ্যিকভাবে তো দেখা যায়, তার কর্মী বাহিনীরা কাজ করছে। কিন্তু মূল কর্তা তো আল্লাহ তা'আলা। সব কিছু তার মর্জিতেই চলে।

حسن کا انتظام ہوتا ہے

عشق کا یونہی نام ہوتا ہے

আসল কাজ তো প্রেমের তরে সৌন্দর্যই করে। কিন্তু ইশকের নাম হয় এমনিতেই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার সৌন্দর্যের ঝলক ও জামাল প্রত্যক্ষ করার তাওফীক দান করুন। রোজ কিয়ামতের দিন আপন প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

একটি সুন্দর সুবিন্যস্ত জীবন ধারার নাম ইসলাম। এখানে সর্ব বিষয়ের সমাধান আছে। প্রতিটি মানুষ ব্যক্তি জীবন থেকে পারিবারিক ও রাষ্ট্র জীবন পর্যন্ত সর্বমহলে কী কী উপকরণ অবলম্বন করলে মানব জীবন সর্বাঙ্গীন সুন্দর হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে ইসলামে। জীবন গঠনের সেসব উপকরণের অন্যতম একটির নাম হায়া তথা লজ্জা। মানুষ পবিত্র ও সুন্দর জীবন যাপন করুক এ বিষয়টিকে ইসলাম খুবই গুরুত্ব দেয়। শরীয়ত চায় মানুষ আখলাকী ইনহিতাত তথা চারিত্রিক অধপতন থেকে বেঁচে থাকুক। ইসলাম পুত-পবিত্র জীবন বোধের এমন সবক ও শিক্ষা পৃথিবীবাসীকে উপহার দিয়েছে, যার উপমা দুনিয়ার আর কোনো ধর্ম বা মতাদর্শ উপস্থাপন করতে পারেনি।

ইসলাম ঘোষণা করেছে الحياء شعبة من الايمان লজ্জা ঈমানের বৃহত্তম একটি শাখা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের মাঝে লজ্জাও বিনম্রতার এমন জীবন গড়ে গেছেন যে তাঁদের দৃষ্টি বেগানা নারীদের দিকে সামান্যও উত্থিত হতোনা।

লজ্জা জীবনের সবচেয়ে বড় অলংকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ.

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত

রবিউল আউয়াল বড় বরকতের মাস। এ মাসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের মাহফিল হয়ে থাকে অনেক জায়গায়। কোনো-কোনো মাহফিলে বরকতময় জন্মের আলোচনা হয়। কোনো মাহফিলে আবার রাসূলের মহবত নিয়ে আলোচনা হয়। কোনো-কোনো মাহফিলে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের শিরোনামে আলোচনা হয়। কোনো-কোনো মাহফিলে আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসায় আকেবিরীনে উম্মাহ শিরোনামেও আলোচনা হয়ে থাকে। মোটকথা, সীরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নানা শিরোনামে নানা স্থানে নানা রকম আলোচনা হয়ে থাকে। কবির ভাষায়-

عِبَارَاتُنَا شَتّٰى وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ

وَكُلُّ شَىْءٍ اِلٰى ذَاتِ الْجَمَالِ يُشِيْرُ

'আমাদের বাচনভঙ্গি অনেক প্রকার; কিন্তু তোমার সৌন্দর্য তো সেই একই হে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পৃথিবীর সকল জিনিস সেই সৌন্দর্যমণ্ডিত সত্তার দিকেই ইঙ্গিত করে।'

লজ্জা ঈমানের একটি শাখা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীছে মুবারাক তিলাওয়াত করা হয়েছে। হাদীছটিতে ইরশাদ হয়েছে-

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ

'লজ্জা ঈমানের একটি বড় শাখা।'

মুমিন বান্দা লজ্জাসম্পন্ন হয়ে থাকে। মুমিনের জীবন বড় সুন্দর ও পুত-পবিত্র হয়, পরিচ্ছন্ন জীবন হয়। তার জীবনে কোনো পঙ্কিলতা থাকে না। তাই তো তারা আল্লাহ রবুল ইজ্জাতের বিশেষ রহমত প্রাপ্ত হয়। দেখুন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লজ্জা-শরমের ব্যাপারে এত তালীম ও এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, একে ঈমানের বড় একটি শাখা বলে সাব্যস্ত করেছেন।

নবীজির লজ্জাবোধ

হযরত সাইয়্যেদাহ আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) ইরশাদ করেছেন, আমি যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ মোবারক দেখেছি তখন তাঁর চোখে আমি ওই লজ্জাবোধ প্রত্যক্ষ করেছি, যে লজ্জাবোধ মদীনার কুমারী নারীদের চোখেও হয় না।

আত্মমর্যাদাবোধের অবস্থান

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا غَيْرَةَ لَهُ

'যার আত্মমর্যাদাবোধ নেই, তার ঈমানই নেই।'

বোঝা গেল, মুমিন বান্দা আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হয়ে থাকে। আত্মমর্যাদাবোধ-এর অর্থ হচ্ছে, নির্লজ্জ কাজ থেকে, অনর্থক কাজ থেকে, সম্মান নষ্ট হয় এমন কাজ থেকে আত্মরক্ষা করে চলা। তো এমন মানুষ এমনভাবে গুনাহমুক্ত পবিত্র জীবন যাপন করে যে, আত্মমর্যাদাবোধ তার শরীরের পোশাকের মতো হয়ে যায়। আত্মমর্যাদাবোধ তার ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। হাদীছে পাকে ইরশাদ হয়েছে-

اَلْغَيْرَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ

'আত্মমর্যাদাবোধ ঈমানের অংশ।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন-

اَنَا اَغْيَرُ وَلَدِ آدَمَ

'আদম-এর যত সন্তান আছে, সকলের থেকে আমি সবচেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন।'

وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنِّىْ

'আর আল্লাহ আমার চেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন।'

তাই আল্লাহ তা'আলা আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন যিন্দেগীকে পছন্দ করেন।

শরীয়তে ইসলামীর সৌন্দর্য

মানুষ পবিত্র সুন্দর জীবন যাপন করুক এ বিষয়টিকে শরীয়ত খুবই পছন্দ করে। শরীয়ত চায় মানুষ চারিত্রিক অধঃপতন ও আখলাকী গুনাহ থেকে বেঁচে থাকুক। ইসলাম পুত-পবিত্র জীবনবোধের এমন সবক ও শিক্ষা উপহার দিয়েছে যে, দুনিয়ার আর কোনো ধর্মাদর্শ জাতির সামনে এমন শিক্ষার উপমা উপস্থাপন করতে পারেনি।

আল্লাহ রবুল ইযযাত ইরশাদ করেছেন-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

'ঈমানদারদের বলে দিন, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে।'[১]

ইসলামী জীবনধারার এ এক মহা সৌন্দর্য যে, পুরুষকে পুরুষের অবস্থানে রেখে শিক্ষা দিয়েছে আবার নারীকে নারীর অবস্থানে রেখে শিক্ষা দিয়েছে। যেন উভয়েই গুনাহ থেকে বেঁচে যায়।

ইসলাম নারীকে বলেছে, তোমরা কোনো অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যেও না। যদি যেতেই হয়, তাহলে নিজেকে পর্দায় আবৃত করে বের হও। আবার বলেছে, নারী! তোমরা পথ বেয়ে চলার সময় পথে মাঝখান দিয়ে না চলে পাশ দিয়ে চলবে। তোমাদের চলাচলও যেন এমন হয় যে, লোকেরা তোমাদের বয়স কেমন তা যেন টেরও না পায়। আবার কারো কাছে যেতে হলে এমন খুশবু ব্যবহার করো না, যার ঘ্রাণ আশপাশকে মোহিত করে ফেলে।

হাদীছে পাকে বর্ণিত হয়েছে যে, নারীর জন্য এমন খুশবু বেশী ভলো, যার সুঘ্রাণটা চারপাশে ছড়ায় কম; তবে রংটা বড় চমৎকার হয়।

আবার ইসলাম নারীকে বলেছে, এমন পোশাক পরিধান করে রাস্তায় বের হবে না, যার দিকে গায়রে মাহরাম মানুষের দৃষ্টি আটকে যায়।

পুরুষকে বলেছে, হে পুরুষ! তোমার দৃষ্টিকে সংযত রাখো। চোখকে হেফাযত করো। বেগানা নারীর দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না। অন্যায় ও

---

১. সূরা নূর, আয়াত- ৩০

সীমালঙ্ঘন থেকে দূরে থাকো। নারী তোমার মা, তোমার বোন, তোমার স্বজন। নারীর ক্ষতি করো না। নারীকে সাহায্য করো। নারীর অপমান করো না। নারীকে সম্মান করো।

বেপর্দা নারীর পরিণাম

পর্দাহীনভাবে বাইরে বের হওয়া থেকে নারীকে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। পোশাকের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

قَاسِيَةً عَارِيَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যেসব নারীরা পর্দাহীনভাবে নির্লজ্জ পোশাকে রাস্তায় বের হবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ওই নারীদের উলঙ্গ করে জাহান্নামে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে নির্দেশ দেবেন। কেন? কারণ, তারা নির্লজ্জ। লজ্জার পোশাককে তারা নিজেরাই ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।

ইয়ামান থেকে মদীনা : লজ্জার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের মাঝে লজ্জা-শরম ও হায়াওয়ালা জীবন এমনভাবে গড়ে গেছেন যে, তাদের দৃষ্টি বেগানা নারীদের দিকে উঠত না। যেমন- হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.)-এর খেলাফতকালে এক নারী ইয়ামান থেকে রওনা হয়েছেন এবং পাহাড় ও মরু প্রান্তর আর বন্ধুর গিরিপথ পাড়ি দিয়ে একাকি মদীনা তায়্যেবায় পৌঁছেছেন। দীর্ঘ এক মাসের সফর তিনি করেছেন। রাতে কোনো এক ভূমিতে অবস্থান করতেন। সাথে মাল-সম্পদ ছিল। দিনে আবার চলতেন। তার জীবনের ভয় ছিল, ইজ্জতের ভয় ছিল। তার সংবাদ শুনে হযরত উমর (রাযি.) তাকে ডেকে পাঠালেন। প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি এ দীর্ঘ পথ একা পাড়ি দিয়েছ? নারী গ্রহণযোগ্য উযর পেশ করলেন। তারপর হযরত উমর (রাযি.) তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি একজন যুবতী নারী হয়েও একাকি সফর করেছ। জনপদ, বিরানভূমি, পাহাড়-উপত্যকা অতিক্রম করে এসেছ। জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর ভয় ছিল তোমার। বলো তো, ইয়ামান থেকে মদীনা পর্যন্ত লোকদের তুমি কোন অবস্থায় পেয়েছ? তাদের তুমি কী রকম পেয়েছ? মহিলা জবাব দিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি ইয়ামান থেকে রওনা হয়েছি আর মদীনা পর্যন্ত পৌঁছেছি। এপথে আমি লোকদেরকে এমন পেয়েছি যে, আমার কাছে মনে হয়েছে, আমরা সকলে একজন মাত্র মায়ের সন্তান। সকলের দৃষ্টি এত পবিত্র যে, আমার মতো একজন যুবতী নারী এত মাইল

সফর করল অথচ একজন পুরুষও আমার দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। (বরং সকলে এমন ছিল যে, আমাকে ইকরাম করতে চেষ্টা করেছে।) আমার ইজ্জত-আবরু ও জান-মালের কোনো ক্ষতি হয়নি।

আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

তাযকিয়া মানে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি। ইসলামের এক অমর সৌন্দর্য হচ্ছে, ইসলাম মানুষ থেকে শাহওয়াত, খাহেশাত ও শয়তানিয়াত তথা শয়তানের প্ররোচনা, কামনা ও রিপুর তাড়নাকে দূর করে দেয়, মানুষকে এসব থেকে পবিত্র রাখে। যখন কোনো বান্দা নিজের মাঝে অনুভব করে, আমার দৃষ্টি পাক নয়, আমার অন্তর পবিত্র নয়, আমার ভেতর গুনাহের কামনা তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে, আমার হৃদয়ে গুনাহের আগ্রহ জাগে, আমাকে ভুল ও ভ্রষ্ট খেয়ালসমূহ পেরেশান করে রাখে, তাহলে তার বোঝা উচিত, আমার আত্মা অশুদ্ধ। আমার বাতেনে ময়লা জমেছে। আমার আমল খারাপ। আমি মুসলমান হতে পারিনি। তাই আমার বাতেন নিয়ে মেহনত করতে হবে। আমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। আমার আত্মশুদ্ধি জরুরি। আমার তাযিকয়া জরুরি। এই মেহনত ও তাযকিয়ার সাধনার দ্বারাই আল্লাহ মানুষের আত্মাকে শুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করে দেন। মানুষকে পবিত্র জীবন দান করেন।

নফসের অবস্থা

আজকালকার নওজোয়ানদের অবস্থা বড়ই করুণ। যুবক-যুবতীরা অনেক হীন ও নিকৃষ্ট অভ্যাসে অভ্যস্ত। এর কারণ দুটি। (১) পর্দাহীনতা বেড়ে যাচ্ছে। (২) তারা নিজেরা আত্মশুদ্ধির মেহনত করছে না। তাই আজ পরিবেশ আগুনের মতো তপ্ত। নারী লুণ্ঠিতা হচ্ছে। অপমানিতা হচ্ছে। পুরুষরা নিকৃষ্ট আচরণ করছে। নারী নিজেদের সম্ভ্রম নিজেরাই নষ্ট করে দিচ্ছে।

হযরত থানভী (রহ.) লিখেছেন, সাধারণ মানুষদের নফস দেয়াশলাইয়ের মতো। এর ভেতরই বারুদ ও অগ্নি প্রজ্বলনের বস্তু বিদ্যমান থাকে। ফলে সামান্যতেই আগুন জ্বলে ওঠে। আজকালের অবস্থা তেমনিই। সামান্য ঘর্ষণেই আজ চারিত্রিক বাগানে জলে ওঠে আগুন। অজ্ঞতা, মূর্খতা ও কু-অভ্যাস আগে থেকেই যেন পূর্ণ থাকে। ফলে সুযোগ পাওয়া গেলেই সাধারণ মানুষ লিপ্ত হয়ে যায় গুনাহে, জঘন্য অপরাধে। সামান্যতেই শয়তানী প্রকাশ পেয়ে যায়। আমাদের জন্য এটি অত্যন্ত বিপদের কথা! তাই আমাদের উচিত আত্মশুদ্ধির মেহনত করা, যেন আমাদের দৃষ্টি থেকে মুসলমানী দূর না

হয়ে যায়। সত্য কথা বলছি, আমাদের দৃষ্টি আজ প্রশিক্ষিত শিকারী কুকুরের মতো অন্যের পেছনে লেগেই থাকে। সব দিকেই কামনার লুলোপ দৃষ্টি বিরাজ করছে।

আধ্যাত্মিক রোগের নিদর্শন

আজ পবিত্র দৃষ্টি লাখের মাঝে একজনের হয়ে থাকে। কুদৃষ্টির ক্ষেত্রে বুড়ো-জোয়ানের কোনো প্রভেদ নেই। আজ যুবকদের দৃষ্টি যেমন খারাপ, বুড়োদের দৃষ্টিও তেমন খারাপ হয়ে গেছে। সকলে কুদৃষ্টি দিচ্ছে। মূর্খের দৃষ্টি যেমন, শিক্ষিতদের দৃষ্টিও তেমনি। আত্মশুদ্ধির মেহনত না করলে নামায পড়ে বের হবেন তো দু-কদম না চলতেই চার দিকে কুদৃষ্টি দিতে শুরু করবেন। চারদিকে কামনার সেই জিনিস খুঁজতে থাকবেন। নারী খুঁজতে থাকবে পুরুষ, পুরুষ খুঁজতে থাকবে নারী।

এই যে শুধু নারীকে দেখতে চায় মন, এটিই বাতেনী ও অভ্যন্তরীণ রোগ তথা আধ্যাত্মিক রোগের নিদর্শন। এর চিকিৎসার জন্য মাশায়েখে কেরামের সংস্পর্শে আসতে হয়। যেমন– মানুষের যদি টিবি রোগ দেখা দেয় বা হার্টের রোগ দেখা দেয়, তাহলে তাকে হাসপাতালে যেতে হয়, তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক রোগ দেখা দিলে মাশায়েখদের কাছে যেতে হয়। তারা হচ্ছেন আত্মার রোগের রূহানী ডাক্তার। আজ আমাদের এই রূহানী রোগ অনেক বেড়ে গেছে। তাই আজ রূহানী ডাক্তারের কাছে আসা অত্যন্ত জরুরি। যখন মানুষ মাশায়েখের কাছে এসে নিজের আত্মার রোগের চিকিৎসা করায়, তখন আল্লাহ রবুল ইযযাত শায়খের সোহবতে আসার বরকতে সহজে মানুষটিকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে দেন। তার দৃষ্টিকে মুসলমানের দৃষ্টি বানিয়ে দেন। ফলে সে আর কুদৃষ্টি দেয় না। নারীর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় না। বেগানা নারীর দিকে তাকায় না। গুনাহের কাছে যায় না।

আত্মশুদ্ধি না করলে কী হবে?

কবির ভাষায়-

زبان سے کہہ بھی دیا لاالہ تو کیا حاصل
دل ونگاہ مسلماں نہیں تو کچھ نہیں

শুনে মুখে তো লা ইলাহা বলে দিয়েছ। বলো শুধু এতে কী অর্জিত হবে? তোমার আত্মা ও দৃষ্টি যদি পবিত্র, সুন্দর আর মুসলমান না হয়, তাহলে কিছুই লাভ হবে না।

মুমিন বান্দার উপমা

একটু চিন্তা করুন। আদালত কোনো একজন মানুষের ব্যাপারে ফাঁসির আদেশ দিল আর তাকে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখা হলো। কাল তার ফাঁসি। আজ তাকে একটি নির্জন কক্ষে রেখে দেওয়া হয়েছে। তখন কি এ নির্জনতার মাঝে লোকটি গুনাহ করার কোনো চিন্তা করবে? যদি কেউ নিশ্চিতভাবে জানে, কাল তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে, তাহলে সে শত রকমের নির্জনতা সত্ত্বেও গুনাহের কথা চিন্তাও করতে পারবে না। বরং তার অন্তর ভয়ার্ত থাকবে। সে মৃত্যুর কল্পনায় মগ্ন থাকবে। ভাবতে থাকবে আজ তো আমার মৃত্যু হয়ে যাবে। মুমিন বান্দার উপমা এমনই। সে তো জানে তার মৃত্যু হবে, হাশর হবে। তার কর্মের হিসাব হবে। তবে সে নিশ্চিত করে জানে না মৃত্যু কখন হবে। মৃত্যু যে হবে এটা তো জানে। তাই তার দৃষ্টান্ত আগামীকাল যাকে ফাঁসি দেওয়া হবে তারই মতো। তাই তো ইরশাদ হয়েছে-

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ

'দুনিয়া মুমিনের জন্য বন্দীখানা।'

তার জানা নেই কখন তার মৃত্যু আসবে। কখন তার দুয়ারে মৃত্যু এসে হাজির হবে। হতে তো পারে, আমরা এখানে এই মাহফিলে বসে আছি আর মৃত্যু চলতে-চলতে আমাদের ঘরের আঙিনায় পৌঁছে গেছে। একটু পর বা এখনই হয়তো আসতে পারে চলে যাওয়ার ডাক।

মৃত্যু আসবে কবে?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয়তম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, মৃত্যুর ব্যাপারে তোমরা কী জান? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা নিশ্চিত জানি না, এ রাতটাও আসবে কি-না আমাদের জীবনে। আরেকজন বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি চার রাকাত নামায পড়ার নিয়ত বাঁধলাম। তবে আমার এই নিশ্চয়তা নেই যে, আমি এ চার রাকাত নামায পূর্ণ করতে পারব। এর আগেই আমার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আরে আমার তো অবস্থা এই মনে করো যে, নামাযী নামায পড়ছে। সে একদিকে সালামও ফিরিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এমনও হতে পারে, সে আর ২য় দিকে সালাম ফিরাতে পারবে না। অর্থাৎ জীবনের ব্যাপারে এতটুকু নিশ্চয়তাও নেই। যাদের হৃদয়ের ভাবনা এমন হয়ে যাবে, আল্লাহ রবুল ইযযাত তাদের যিন্দেগী সুন্নাত ও শরীয়ত মোতাবেক বানিয়ে দেবেন।

ইমাম আযম আবু হানিফার (রহ.) লজ্জা

আমাদের উচিত আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামের জীবনের দিকে তাকানো। কতটা গভীর ও প্রগাঢ় ছিল তাঁদের দৃষ্টি। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে গোসলখানা থেকে গোসল করে বের হয়েছে। তার পরিধানে পোশাকটা হাঁটুর উপরে। তার সতরের কিছু অংশ খোলা ছিল। সাথে-সাথে ইমাম সাহেব তার চোখ দুটি বন্ধ করে নিলেন। ওই লোকটা নিকটে এল এবং বলল, আবু হানীফা! তুমি কখন থেকে অন্ধ হয়ে গেছ? হযরত ইমাম সাহেব বললেন, তোমার থেকে লজ্জা-শরম যখন উঠে গেছে, আমি তখন থেকে অন্ধ হয়ে গেছি।

এক নারীর পবিত্র জীবনধারার বরকতে দুর্ভিক্ষ চলে গেল

হযরত শায়খ আবদুল হক দেহলভী (রহ.) এক আশ্চর্য ঘটনা লিখেছেন। যে মানুষের যিন্দেগী পবিত্র ও গুনাহমুক্ত হবে, সে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা কখনও সেই দু'আ ফিরিয়ে দেন না। একথা বলার পরই তিনি ঘটনাটি উপস্থাপন করলেন। তিনি বলেন, দিল্লিতে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বৃষ্টি হচ্ছিল না। লোকেরা বড় পেরেশান হয়ে গেল। পশু-পাখি হয়রান হয়ে গেল। চারদিকে হাহাকার শুরু হলো। সবুজ-শ্যামল ভূমি পুড়ে গেল। না ফসল থাকল, না পানি থাকল। ওই অবস্থায় লোকেরা ছুটে এল উলামায়ে কেরামের কাছে। বলল, আপনারা আমাদের জন্য দু'আ করুন। তারা শহরের সকল মানুষকে ইস্তিসকার নামায তথা বৃষ্টি বর্ষণের নামাযের জন্যে সমবেত করলেন। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক সকলেই একত্র হলো একটি ময়দানে। উলামায়ে কেরাম নামায পড়িয়ে দিলেন। আল্লাহর দরবারে কেঁদে-কেঁদে দু'আ করতে থাকলেন। কিন্তু বৃষ্টি নামছে না। দু'আ কবুলের কোনো নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না।

আসরের সময় নিকটে চলে এসেছে। সকলে ব্যাকুল মনে প্রার্থনা করছে। এমন সময় দূরে দেখা গেল, একটি সাওয়ারী আসছে। সাওয়ারীতে একজন নারী। তার লাগাম টেনে-টেনে চলছিল এক নওজোয়ান পুরুষ। কান্নারত জনতার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সাওয়ারী। সাওয়ারীর ওই নারী থমকে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেন এখানে এত লোক সমবেত হয়েছে? কীসের জন্য দু'আ করছে? তাকে বলা হলো, এরা আল্লাহর দরবারে রহমতের দু'আ করছে, যেন বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তাদের দুর্ভিক্ষ কেটে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে যুবক হাত তুললেন। কী বললেন কেউ জানে না। সাথে-সাথে শুরু হলো মুষলধারে

বৃষ্টি। সকলে বিস্মিত হলো। বড় হয়রান হয়ে গেল। উলামায়ে কেরাম ছুটলেন। সাওয়ারীর কাছে গিয়ে যুবককে প্রশ্ন করলেন, বলো তো এর রহস্যটা কী? কেন এভাবে এ নারীর দু'আয় বৃষ্টি বর্ষিত হলো। অথচ আমরা তো সেই কখন থেকে দু'আয় মগ্ন। যুবক বলতে লাগল, ওই সাওয়ারীর আরোহী নারী আমার মা। তিনি বড় পবিত্র জীবন যাপন করছেন। কোনো দিন গুনাহ করেননি। পর্দাহীন চলেননি। কোনো দিন কোনো অন্যায়-অপরাধ করেননি। তিনি একজন পবিত্র নারী। আমি যখন জানতে পারলাম, এখানে আপনারা দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য দু'আ চাচ্ছেন, তখন আমি সাওয়ারীর কাছে এসে মায়ের চাদরের কোণ ধরে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বললাম, হে আল্লাহ! আমি এই পবিত্র মায়ের সন্তান, যিনি কোনোদিন গুনাহের কাছেও যাননি। হে আল্লাহ! আমার মায়ের এই আমল যদি তোমার দরবারে কবুল হয়ে থাকে, তবে এর উসীলায় তুমি রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করো।

দু'আ অবস্থায়ই বৃষ্টি নেমে এল। এটি আল্লাহর কত বড় রহমত। একজন পবিত্র নারীর উসিলায় দু'আ কবুল হলো।

লজ্জা দ্বারা জীবনের পেরেশানি দূর হয়ে যায়

আজকাল অধিকাংশ লোকের রিযিকের পেরেশানি থাকে। সকলে মনে করে জিনের আছর হয়েছে। কেউ আমাকে তাবিজ করেছে মনে হয়। আশ্চর্য ব্যাপার! মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও অধঃপতন ঘটেছে। মানুষ এটা দেখে না যে, তার আমল শরীয়ত ও সুন্নাত মোতাবেক হচ্ছে না বলেই আল্লাহ তাকে পেরেশানিতে ফেলে দিয়েছেন। বাস্তব কথা, আমাদের বদ আমলীর কারণেই আজ আমাদের রিযিকে সংকীর্ণতা চলে এসেছে। আল্লাহ মানুষকে পেরেশানিতে ফেলে দিয়েছেন। তাই নিজেদের আমলকে পরিশুদ্ধ করে পবিত্র জীবন যাপনের আপ্রাণ চেষ্টা চালানো জরুরি, যেন আল্লাহ আমাদের উপর রহমত নাযিল করেন, আমাদের জীবন বরকতে পূর্ণ করে দেন, ধন-ঐশ্বর্যে ভরে দেন। তো আমাদের জীবনে যখন লজ্জা-শরম আসবে, তখনই আমরা গুনাহ ছাড়তে পারব। লজ্জা নেই দেখেই তো আজ আমরা গুনাহে লিপ্ত।

ঈমানের স্বাদ কীভাবে অর্জন করা হবে

আমাদের উচিত আমরা যখন রাস্তায় চলব, তখন দৃষ্টিকে নিচের দিকে রাখব। দৃষ্টিকে সংযত রাখব ও হেফাজত করব। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যে বান্দা নিজের দৃষ্টিকে গায়রে মাহরাম থেকে সংযত রাখতে পারবে, বিনিময়ে

আল্লাহ তাকে ঈমানের স্বাদ দান করবেন। হাদীছে আরো এসেছে, আল্লাহ এর বিনিময়ে বান্দাকে আমলের অমৃত সুধার স্বাদ দান করবেন। আজ আমরা নামাযের মধুর স্বাদ কেন পাই না? সেজদার মাঝে মজা কেন পাই না? তেলাওয়াতে কুরআনের মাঝে মজা কেন পাই না? কারণ, আমরা আমাদের দৃষ্টিকে পরপুরুষ বা পরনারী থেকে হেফাজত করি না। আমরা আমাদের দৃষ্টিকে পবিত্র রাখি না।

দু'আ কবুলের সময়

একটি কিতাবে বড় আশ্চর্য কথা লিখিত আছে। যখন মানুষ কোনো গুনাহ করতে ক্ষমতা পেয়ে যায়; কিন্তু ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে সে গুনাহ করে না, সেই সময়টিতে এ বান্দা যে দু'আ-ই করে, সেই দু'আ-ই কবুল হয়ে যায়। এটি অভিজ্ঞতার কথা। আপনারাও পরীক্ষা করে দেখুন। মনে করুন, আপনি কোথাও যাচ্ছেন। অন্তর চাচ্ছে চোখ তুলে মহিলাদের দিকে দেখি। চার পাশে রাস্তায় কত সুন্দর-সুন্দর নারী হাঁটছে। অন্তর চাচ্ছে একটু দেখি। কে আমার সামনে দেখি। কিন্তু নফসের এই চাহিদার বিপরীত কাজ করে আপনি আপনার দৃষ্টিকে সংযত রাখলেন। সেই সময়টিতে আপনি আল্লাহর নিকট যে দু'আ-ই করবেন, সেই দু'আ-ই কবুল হয়ে যাবে। আপনি আপনার যিন্দেগীতে সেই দু'আ পূর্ণ হতে দেখতে পাবেন স্বচক্ষে।

ব্যভিচার ও অবৈধ সম্পর্কের কাছে ধারেও যাবে না

ইসলাম আমাদের যিনা ও অবৈধ সম্পর্ক গড়তে নিষেধই করেনি; বরং যিনার ভূমিকা ও যিনার সাথে সংযুক্ত যত কর্ম আছে, সবই নিষেধ করেছে কঠিনভাবে। মানুষকে যিনার দিকে নিয়ে যায় এমন বিষয়ও হারাম করে দিয়েছে ইসলাম। ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا

'ব্যভিচার ও অবৈধ সম্পর্কের কাছেও যেও না।'[১]

কারণ, আল্লাহ এর কারণে অত্যন্ত রাগ করেন। কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন এই অপরাধের বিনিময়ে।

---

১. সূরা ইসরায়িল, আয়াত- ৩২

বদ-আমলের কারণে হায়াত কমে যায়

হাদীছে আছে, যে বান্দা বদ আমলে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তার হায়াত কমিয়ে দেন। হায়াত কমিয়ে দেওয়ার অর্থ কী? এর দুটি অর্থ হতে পারে। (১) লোকটির হায়াত ষাট বছর ছিল। কিন্তু এমন এক রোগ আল্লাহ তাকে দিয়ে দিলেন যে, সে ৫০ বছরেই মারা গেল। এভাবে হায়াত কমিয়ে দেওয়া হবে। (২) মুহাদ্দিছীনে কেরাম লিখেছেন, লোকটি ৬০ বছর ঠিকই বাঁচবে। কিন্তু তাতে বরকত হবে না। এমন রোগ তাকে দিবেন যে, সে কিছুই করতে পারবে না। অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকবেন বা এমন পেরেশানির ভেতর তাকে রাখবেন যে, সে ৬০ বছরের জীবন কোন ফাঁক দিয়ে শেষ হয়ে গেল টেরই পাবে না। আজকাল এমনটি সাধারণতই দেখা যায়। দেখবেন, ৪০ বছরের লোকটিকে বড়ই বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। ৪০ বছরও হয়নি এমন মানুষকেও এখন বৃদ্ধ মনে হয়। মারাত্মক অসুস্থ কত মানুষ। দাঁড়ালেই চোখ অন্ধকার হয়ে আসে। কোনো কাজ করতে পারে না। আজ নিজে অসুস্থ। কাল বাবা অসুস্থ। পরের দিন ভাই অসুস্থ। অন্যদিন মা অসুস্থ। আজ এই কাজ, কাল ওই ঝামেলা। এভাবেই দিন চলে যায় এবং এক সময় হঠাৎ আছড়ে পড়ে মৃত্যুর বিছানায়।

সাহাবায়ে কেরামের লজ্জা

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) এক জায়গায় জিহাদের জন্য প্রস্তুত হলেন। সামনে দুশমনের বাহিনী। দুশমন চিন্তা করল, আমরা তাদেরকে দীন থেকে সরিয়ে দিব। তারা তাদের নারীদের প্রস্তুত করল। বলল পর্দা ছেড়ে খোলামেলা পোশাকে তাদের সামনে চলে যাও। তাদের দৃষ্টি যেন তোমাদের উপর পড়ে। তারা যেন কুদৃষ্টিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এতে তাদের উপর আল্লাহর যে মদদ আসার কথা তা বন্ধ হয়ে যাবে। যখন হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) এই অবস্থা লক্ষ করলেন, তখন তিনি উচ্চ আওয়াজে এলান করলেন-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

'ঈমানদারদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিচু ও সংযত রাখে।'[১]

---

১. সূরা নূর, আয়াত- ৩০

এই এলান শুনে পুরো মুজাহিদ বাহিনীর সদস্যরা তাদের দৃষ্টি এমনভাবে নীচু করে নিল, যেন কারো দৃষ্টি কোনো নারীর প্রতি না পড়ে। এমনকি যখন এই বাহিনী ময়দান থেকে ফিরে এল, তখন তাদের জিজ্ঞেস করা হলো, বলো তো ওই শহরের উচ্চতা কত ছিল? তাঁরা উত্তরে বলতেন, যখন আমীরে মুজাহিদীন দৃষ্টি অবনমিত রাখতে নির্দেশ দিলেন, তখন আমরা ওই এলাকার ভবনের উচ্চতার দিকেও চোখ তুলে তাকাইনি। সুবহানাল্লাহ!

যে দরজা বন্ধ হয়ে যায় দ্রুত

আল্লাহ রবুল আলামীন মানুষের চোখে যে পর্দা বানিয়ে দিয়েছেন, এত দ্রুত ক্রিয়াশীল বানিয়েছেন যে, আজ 'পলক পড়া' উপমাই হয়ে গেছে। চোখকে বানিয়েছেন quick acting স্বল্পসময়ে কোনো কাজ করাকে বুঝাতে চাইলে বলা হয়, পলক পড়ার আগে করে আসো কাজটি। অর্থাৎ অল্প সময়ে করো। আল্লাহ এই পথটি বা এই দরজাটি দ্রুত বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপযোগী এজন্য বানিয়েছেন যে, হে আমার বান্দারা! কাল কিয়ামতের দিন তোমরা এই অভিযোগ করতে পারবে না যে, আল্লাহ! গায়রে মাহরাম তো সামনে পড়ে গিয়েছিল। আমিও চোখ বন্ধ করে ফেলতে চেয়েছি। কিন্তু চোখ বন্ধ করতে-করতে সময় লেগে গেছে।

দুটি অঙ্গের হেফাযত করো

মানবদেহের দুটি অঙ্গ এমন আছে যে, এগুলোকে আল্লাহ রবুল ইযযাত Double protection বানিয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে মানুষের জিহা। দেখুন জিহার দু'পাশে আছে দুটি দেওয়াল। প্রথমত দাঁতের দেওয়াল। তারপর ঠোঁটের দেওয়াল। তো জিহাকে দুই আবরণের ভেতর এজন্য সুরক্ষিত রেখেছেন যে, এ জিহা নাড়ানোর সময় কথা বলতে চাইলেই একটু চিন্তা করো। এই দুই দেওয়ালের উন্মেষে তুমি যে কথাটি বলবে, তা নিয়ে ভেবে দেখো কী বলবে। এ জিহা থেকে এমনসব কথাও উচ্চারিত হতে পারে, যা কাফেরকেও মুমিন বানিয়ে দিতে পারে আবার মুমিনকেও কাফেরে পরিণত করে দিতে পারে।

দ্বিতীয় অঙ্গটি হচ্ছে মানুষের গোপনাঙ্গ। সর্বদা দুটি কাপড়ের আবরণের ভেতর এই অঙ্গটিকে রাখা হয়। বাহুতে এক কাপড় থাকে, হাতায় এক কাপড় থাকে। কিন্তু লজ্জাস্থানের আবরণে কমপক্ষে দুটি থাকেই। একটি তো শরীরের উপরের কাপড়, যা ওই স্থানের নিচের দিক পর্যন্ত গিয়ে ছোঁয়।

আবার সতর ঢাকার জন্য যে কাপড়, লুঙ্গি বা পাজামা পরিধান করা হয়, তা তো থাকেই। দুটি কাপড়ের মাধ্যমে লজ্জাস্থানকে লুকিয়ে রাখা সুন্নাত তো এ কারণেই যে, হে মুমিনগণ! কাপড়টি সরিয়ে ফেলার সময়, বিবস্ত্র হওয়ার সময় একটু চিন্তা করো, তোমার এ অঙ্গ কোথায় ব্যবহার হবে। হালাল স্থানে হলে তো হালাল। কিন্তু হারাম স্থানে ব্যবহার হলে বুঝে রাখো, তুমি অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ করছ। কবিরা গুনাহ করছ। তাই আল্লাহর আযমতকে ভয় করো। এ গুনাহ থেকে বিরত থাকো। এমন যেন না হয়, ওই অবৈধ কাজ করার কারণে তুমি দুনিয়াতেও লজ্জা-অপমানের শিকার হও আবার আখেরাতেও লজ্জা-অপমানের শিকার হও।

হযরত উসমান (রাযি.)-এর লজ্জা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাগণকে এমন হায়া ও লজ্জা শিক্ষা দিয়েছেন যে, উসমান (রাযি.)কে ফেরেশতারাও লজ্জা পেত। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন পবিত্র জীবন দান করেছেন।

লজ্জার বিনিময়ে ইলাহী নুসরত

আল্লাহর সাহায্য

আল্লাহ তা'আলা লজ্জাশীল মানুষের জীবনে বরকত দান করেন। এমন লোককে পেরেশানি থেকে হেফাযতে রাখেন। আল্লাহ তা'আলা নিজেই ওই ব্যক্তির মুহাফেয ও রক্ষক হয়ে যান। এমন মানুষের জীবনে যদি কোনো পেরেশানি আসেও, আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার পেরেশানি দূর করে দেন।

দেখুন, এই দুনিয়ায় বহু ঘটনা এমন আছে যে, অনেক সময় লোকেরা অনেক নিষ্পাপ নিরপরাধ মানুষের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়। তখন আল্লাহ তা'আলার গায়েবী সাহায্য চলে আসে। আল্লাহ তখন এ বান্দাকে সাহায্য করেন এবং ওই বান্দাকে নিষ্পাপ প্রমাণ করেন। কুদরতিভাবেই ওই বান্দাকে নিরপরাধ প্রমাণ করেন। এমন কিছু ঘটনা আমি আপনাদের শুনিয়েছি।

মারইয়ামের পবিত্রতা প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলার একজন নেক বান্দী ছিলেন মারইয়াম! তখনো তিনি জন্মগ্রহণ করেননি। মায়ের পেটে তিনি। পেটের সন্তানের জন্য মা দু'আ করলেন-

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي

হে আল্লাহ! আমার পেটে যে সন্তানই থাকুক আমি তাকে তোমার জন্যে ওয়াকফ করে দিলাম। তুমি তাকে কবুল করে নাও।[১]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন-

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

তাকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নিয়েছেন, তার জন্য ফলমূল দিয়েছেন। তার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর হাতে ন্যস্ত করেছেন।[২] হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন হযরত মারইয়াম (আ.)-এর খালু। হযরত মারইয়াম মসজিদে ইতিকাফ করতেন। সারাটা দিন যিকির ও ইবাদাতে কাটিয়ে দিতেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর উপর এমন রহমত আসত যে, তাঁর জন্য অমৌসুমের ফল পাঠাতেন। লোকদের মাঝে তাঁর ইবাদাত ও তাক্ওয়ার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা তাকে অনেক সম্মান করত।

তার সাথে এক ঘটনার শুভ উদ্বোধন হলো। কুরআনে ঘটনাটি বিন্যস্তভাবে বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হয়েছে। একটি সূরার নামও হয়েছে মারইয়াম নামে।

হযরত মারইয়াম পরিবার থেকে আলাদা হয়ে এক নির্জন স্থানে চলে গেলেন এবং নিজের আশপাশে পর্দা টেনে নিলেন। তিনি গোসল করার জন্য নির্জন স্থানে গেলেন, যেন আড়ালে পর্দার ভেতর থেকে গোসল সেরে নিতে পারেন। এমন সময় আল্লাহ তার কাছে রূহুল আমীন তথা জিব্রাইল (আ.)কে পাঠালেন। হযরত জিব্রাইল (আ.) পূর্ণ মানবাকৃতিতে আগমন করলেন। তাঁর সামনে হযরত জিব্রাইল (আ.) প্রকাশিত হলেন। এমন নির্জন স্থানে এমন একজন মানুষকে দেখে হযরত মারইয়াম (আ.) ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তো আজকে এই উন্মাদ যুগের কোনো বেপরোয়া নারী ছিলেন না। তিনি এমন ছিলেন না যে, একজন বেগানা পুরুষকে নির্জনে পেয়ে সুমধুর মুচকি হাসি দিয়ে তাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দী ছিলেন। তিনি তো জীবনে কোনো দিন পরপুরুষের সম্মুখীন হননি।

---

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ৩৫

২. সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ৩৭

ফলে তার চোখ-মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি ভয়ার্ত হয়ে গেলেন। ভয়ের চিহ্ন তার চেহারায় ফুঠে উঠল। তিনি কম্পিত হয়ে বলতে লাগলেন-

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا

আমি আল্লাহর কাছে তোমার থেকে আত্মরক্ষা চাই। হে আল্লাহ! হে রহমান! তুমি এর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। হে পুরুষ! তুমি আল্লাহকে ভয় করো।[১]

জিব্রাইল বুঝতে পারলেন, মারইয়াম ভয় পেয়েছে। সাথে-সাথে তিনি আল্লাহর সংবাদ তাঁকে প্রদান করলেন-

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ

'আমি তো তোমার রবের পক্ষ থেকে রসূল ও বার্তাবাহক।'[২]

لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

'তোমাকে একজন পবিত্র সন্তান প্রদানের জন্যে আমাকে পাঠানো হয়েছে।'[৩]

একথা শুনে হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পেরেশানি আরো বেড়ে গেল! অথচ সান্ত্বনা পাওয়ার কথা ছিল তার। হযরত মারইয়াম (আ.) বললেন,

وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

আমার কিভাবে সন্তান হবে? অথচ আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি! আর আমি তো ব্যভিচারিণীও নই![৪]

মারইয়াম জানতেন, সন্তান হতে হলে হয় বিবাহ হতে হবে, না হয় গুনাহের সাথে সম্পর্ক থাকতে হবে। আমার তো কোনোটাই নেই। আমার মাঝে তো সন্তান হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমার তাহলে সন্তান হবে কীভাবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন,

قَالَ كَذَٰلِكِ

'এভাবেই হবে।'[৫]

---

১. সূরা মারিয়াম, আয়াত- ১৮
২. সূরা মারয়াম, আয়াত- ১৯
৩. সূরা মারয়াম, আয়াত- ১৯
৪. সূরা মারয়াম, আয়াত- ২০
৫. সূরা মারয়াম, আয়াত- ২১

তোমার বিবাহও হয়নি। তুমি ব্যভিচারিণীও নও। তবে তোমার সন্তান হবে। كَذٰلِكِ শব্দ বলে আল্লাহ তার পবিত্রতা ও সতিত্বের ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করলেন। মারইয়াম! এই সন্তান তোমাকে তো আল্লাহ দান করবেন তাঁর কুদরতের নিদর্শনরূপে। তাই তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই।

তারপর হযরত মারইয়াম (আ.) নিজেকে অন্তঃসত্তা অনুভব করলেন। তিনি বড় পেরেশান হয়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, হে আল্লাহ! সারাটা জীবন আমি তোমার ইবাদাতে কাটিয়েছি। তোমার জন্য সর্বদা ই'তিকাফ করেছি। আমাকে সকলে নেককার ও তাক্ওয়াবতী মনে করে। কিন্তু আজ যা হতে যাচ্ছে, এতে তো আমি মানুষের সামনে চেহারা দেখাতে পারব না। মানুষ আমাকে ব্যভিচারিণী মনে করবে।

তখন তার অবস্থা এত করুণ হলো যে, তিনি বলতে লাগলেন–

يَا لَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا

হায়! এর আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত। লোকেরা যদি আমাকে ভুলে যেত! কেউ আমার কথা মনে না রাখত।[১]

হায়! এর আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত, তাহলে কত ভালো হতো! তিনি আল্লাহর কাছে পানাহ চাইছিলেন। তাকে বলা হলো–

لَا تَحْزَنِيْ

হে মারইয়াম! তুমি এভাবে পেরেশান হয়ো না। তুমি চিন্তিত হয়ো না![২] আল্লাহই সব ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহই তোমার পবিত্রতা, তোমার সতিত্ব, তোমার সম্মান রক্ষা করবেন। তোমার কোলে যখন সন্তান আসবে, তখন তার কপালে নবুওয়াতের চিহ্ন জ্বলজ্বল করবে। তুমি তাতে চুমু খেয়ো আর লোকেরা তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে বোলো-

اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا

'আমি আজ আল্লাহর জন্য রোযা রেখেছি। আজ আমি কারো সাথে কথা বলব না।'[৩]

---

১. সূরা মারয়াম, আয়াত- ২৩
২. সূরা মারয়াম, আয়াত- ২৪
৩. সূরা মারয়াম, আয়াত- ২৬

হযরত ইসা (আ.) জন্মগ্রহণ করলেন। মারইয়াম মা হয়ে গেলেন। তিনি যখন সন্তান নিয়ে তার গোত্রের লোকদের কাছে এলেন, তখন তারা বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল-

قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا

'হে মারইয়াম! তুমি গজব নিয়ে এসেছ। তুমি কী করলে এটা!' [১]

مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَئَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا

'তোমার বাবা-মা তো এমন খারাপ ছিল না! তারা তো ব্যভিচারী ছিল না!'[২]

তুমি এত খারাপ কাজ কী করে করলে? তার জাতি, তার গোত্র তার দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাল। তাকে নানা রকম কষ্টের কথা বলতে লাগল!

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ

হযরত মারইয়াম (আ.) নিজে কোনো কথা না বলে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তোমরা এই সন্তানের সাথে কথা বলো।[৩] তোমাদের যত প্রশ্ন একে জিজ্ঞেস করো। গোত্রের লোকেরা সন্তানের দিকে তাকাল। তারা বলল-

قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

'আরে! এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর সাথে আমরা কী কথা বলব? কীভাবে কথা বলব?' [৪]

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই পবিত্র বান্দীর পবিত্রতা প্রমাণের জন্যে কুদরতী ব্যবস্থা করে রেখেছেন! এই এক-দুই দিনের বাচ্চা কথা বলতে পারে না। আল্লাহ বললেন, হে নবজাতক ঈসা! তোমার মতো বাচ্চারা কথা বলতে পারে না। এটি আমার সাধারণ ব্যবস্থা। কিন্তু আজ তোমার মাকে মানুষ অপমান করতে চেষ্টা করছে। তোমার মাকে তারা কটু কথা বলছে। আজ আমি আমার বিশেষ ব্যবস্থার প্রকাশ ঘটাব। আজ আমি আমার কুদরত

---

১. সূরা মারয়াম, আয়াত- ২৭
২. সূরা মারয়াম, আয়াত- ২৩
৩. সূরা মারয়াম, আয়াত- ২৯
৪. সূরা মারয়াম, আয়াত- ২৯

প্রকাশ করব। আজ তোমাকেই তোমার মায়ের পক্ষে বক্তব্য দিতে হবে! আজ তুমিই তোমার মাকে নিরপরাধ বলে প্রমাণ করতে হবে। আল্লাহ হযরত ঈসা (আ.)-এর মুখ খুলে দিলেন। তাঁর ভাষা চালু হয়ে গেল। এই ছোট্ট শিশু ঈসা (আ.) বলিষ্ঠ বক্তার ভঙ্গিতে আঙুলি উঁচিয়ে বলতে শুরু করলেন-

إِنِّي عَبْدُ اللهِ

'আমি আল্লাহর বান্দা।'

آتَانِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا. وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.

'আমাকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে। আমাকে নবী বানানো হয়েছে। আমাকে বরকতময় বানানো হয়েছে আমি যেখানেই থাকি না কেন। আমাকে সালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাকে যাকাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমি যতদিন জীবিত থাকি।[১]

সুবহানাল্লাহ! দেখুন, আল্লাহ রবুল ইযযাত হযরত ঈসা (আ.)-এর যবান দ্বারা কীভাবে আপন প্রিয় বান্দী মা মারইয়ামের পবিত্রতা প্রমাণ করলেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক যমানায় আপন বান্দাকে এভাবেই নির্দোষ প্রমাণ করেন। এভাবে তিনি প্রিয় বান্দাদের রক্ষা করেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা প্রমাণিত করা

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা আপনাদের সকলেরই জানা আছে। তাঁর পবিত্রতাও ঘোষিত হয়েছে একটি নিষ্পাপ ছোট্ট শিশুর কণ্ঠে। তাই যে-ই গুনাহ থেকে বাঁচবে, পবিত্র জীবন যাপন করবে, আল্লাহ ওই বান্দাকে মসিবত থেকে হেফাজত করবেন। কখনও কোনো মসিবত এসে গেলেও আপন যিম্মাদারীতে তিনি তাকে হেফাজত করবেন। তখন তিনি তাঁর কুদরতের প্রকাশ ঘটান।

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাযি.)-এর কাহিনী

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম বিয়ে হয় হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাযি.)-এর সাথে। তিনি এমন নারী ছিলেন, যাঁকে আল্লাহ

---

১. সূরা মারয়াম, আয়াত- ৩০-৩১

রবুল ইযযাত বড় সম্মান ও শারাফাত দান করেছেন। বিবাহের আগে প্রথমে নবীজিকে তিনি ব্যবসায়িক সফরে পাঠিয়েছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ব্যবসায় চলে গেলেন। সাথে হযরত খাদীজা (রাযি.) তাঁর গোলাম মায়সারাকে গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য প্রেরণ করলেন। সেই সফরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিগুণ লাভ করলেন।

মায়সারা এসে বড় আশ্চর্য রকম সংবাদ দিলেন। খাদীজা (রাযি.) শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন। ভাবলেন, যে মানুষটির আমানত ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতা এত ভালো, তাকে জীবনসঙ্গী বানাতে হবে। তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক হাদিয়া দিলেন এবং নবীজির চাচা আবু তালেবের নিকট বিবাহের পয়গাম প্রেরণ করলেন। বললেন, আপনারা যদি আমার সাথে আত্মীয়তা করতে চান, তাহলে আমার ভাই উমরের সাথে বা আমার পিতার সাথে কথা বলুন। ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা এ ব্যাপারে চেষ্টা করলেন এবং অবশেষে বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহে বিশটি উট মোহর হিসেবে দেওয়া হয়েছে। আর ওলিমার জন্য দুটি উট যবাই করলেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী প্রাপ্ত হয়ে নিজের প্রিয়তমা স্ত্রীর নিকট দ্বীনের দাওয়াত পেশ করলেন। প্রথমে স্ত্রীকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শোনালেন। দেখুন, এই উম্মতের পুরুষদের চেয়ে এই নারীর মর্যাদা কত বেশী। সর্বপ্রথম কুরআন শ্রবণকারী এই নারী। তিনিই নবীজিকে নবীরূপে প্রথম দেখেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওহী প্রেরণ হওয়ার পর শঙ্কিত হয়ে গিয়েছিলেন, তখন হযরত খাদীজা (রাযি.)ই সান্ত্বনার বাণী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনিয়েছেন। নবীজি যখন বলেছেন,

خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ

'আমি আমার জানের ভয় করছি।'

তখন হযরত খাদীজা (রাযি.) বলেছেন كَلَّا কক্ষনো নয়! তো তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনার বাণী শোনালেন। হিজরতের তিন বছর পূর্বে ৬৫ বছর বয়সে হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর ইন্তেকাল হয়। এই তো আমার ভুবনবিজয়ী নারী। এই আমাদের মহীয়সী মুসলিম নারী।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর বিবাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে

হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাযি.)-এর ইন্তেকালের পর নবীজি অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হয়ে পড়লেন। যিনি জীবনের সঙ্গীনি ছিলেন, সহায় ছিলেন, সান্ত্বনা দিতেন; আজ তিনি বিদায় হয়ে গেলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুঃখ-বেদনা ও পেরেশানিকে ভাগ করে নেওয়ার মতো কেউ থাকল না। হাদীছ শরীফে এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে একটি ছবি দেখানো হলো। বলা হলো, হে আমার মাহবুব! আপনি তো বড় ব্যথিত থাকেন। আমি আপনার জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন করে দিচ্ছি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হলেন। একজন নারীর ব্যাপারে পয়গাম পাঠালেন। বললেন, আমি এমন-এমন এক মেয়েকে স্বপ্নে দেখেছি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সাথে বিয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এ তোমার ২য় জীবনসঙ্গিনী হবে। সেই নারী কে? সেই নারী হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর কন্যা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)। তো আল্লাহ তা'আলাই তাঁকে নবীজির স্ত্রীরূপে নির্বাচন করে দিলেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর বৈশিষ্ট্য

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুমারী স্ত্রী ছিলেন একমাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দীকী (রাযি.)। বাকী স্ত্রীরা তো ছিলেন এমন, যাদের আগে অন্যত্র বিবাহ হয়েছিল। পরে নবীজি বিবাহ করেছেন। বরং কথাটা এভাবে বললেও ভুল হবে না যে, বালেগ হওয়ার পর যে পরপুরুষের চেহারা হযরত আয়েশা প্রথম দেখেছেন, তিনি ছিলেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এমন সতী, পবিত্র ও কুমারী নারী ছিলেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)।

উম্মে আব্দুল্লাহ ... হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি তার ডাকনাম আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের নাম হিসেবে উম্মে আব্দুল্লাহ রাখলেন। হযরত আব্দুল্লাহ আসমার পুত্র। একদিন আব্দুল্লাহকে কোলে নিয়ে হযরত আয়েশা (রাযি.) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আব্দুল্লাহর জন্য দু'আ চাইলেন। আসমা তো আয়েশার বোন। বোনের ছেলেকে দু'আর জন্য নিয়ে এলেন আয়েশা (রাযি.)। নবীজি প্রাণভরে

দু'আ দিলেন, আদর দিলেন, ভালোবাসা দিলেন আর বললেন, আয়েশা! আমি তোমাকে উম্মে আব্দুল্লাহ অর্থাৎ আব্দুল্লাহর মা বলে ডাকব। অবশ্য নবীজি প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রাযি.)কে হুমায়রা বলেও ডাকতেন।

আয়েশা (রাযি.)-এর প্রতি নবীজির ভালোবাসা

একবার নবীজি আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)কে বললেন, আয়েশা, তোমাকে আমার এতে ভালো লাগে, তোমাকে আমার এত প্রিয় লাগে, যেমন স্বাদ লাগে মাখন ও খেজুর মিলিয়ে খেলে। তোমাকে আমার কাছে এত আকর্ষণীয় লাগে। হযরত আয়েশা (রাযি.) সাথে-সাথে জবাব দিলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনাকে আমার মধু ও মাখন মিশিয়ে খাবার মতো আকর্ষণীয় লাগে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে-সাথে হেসে দিলেন। আমি তো মাখন আর খেজুরকে উপমা হিসেবে এনেছি। আর তুমি তো আরো মজার বিষয়কে উপমা হিসেবে এনেছ। তুমি বড় বুদ্ধির কথা বলেছ।

হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর ইল্‌ম ও তাক্‌ওয়া

হযরত আতা ইবনে রিবাহ। তিনি ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)-এর ওস্তাদ। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইল্‌ম ও তাক্‌ওয়ায়, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায়, সৌন্দর্য ও রূপে-গুণে হযরত আয়েশা (রাযি.)কে সকল স্ত্রীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। বরং যুহরী তো এও বলেছেন যে, যদি সকল নবীপত্নীর ইল্‌মকে একত্রিত করা হয়, তাহলেও আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর ইল্‌মের ওজন বেশী হবে।

ফিকহের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর অবস্থান

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) ২২১০টি হাদীছ বর্ণনা করেচেন। তিনি ফকীহ ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন ৪০ জন ফকীহ ছিলেন, যাদেরকে সকলের বড় মনে করা হতো। এই ৪০ জনের মধ্যে ১৪ জনকে মনে করা হতো সবার বড়। সেই ১৪ জনের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর নামও ছিল।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে উম্মুহাতুল মুমিনীনকে অধিকার প্রদান

একবার এমন হলো যে, নবীজি সকল স্ত্রীকে ইখতিয়ার দিয়ে দিলেন। বললেন, তোমরা যদি চাও তো তোমাদের মতো করে জীবন যাপন করো!

তোমাদেরকে এই-এই ধন সম্পদ ও মাল দিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি চাও, তোমরা আমার সাথে থাকবে, তাহলে তাও করতে পার। সকল স্ত্রীকে এই ইখতিয়ার দিয়ে দিয়েছিলেন। আর হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকে (রাযি.) বললেন, তুমি তোমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ করো কী করবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা করলেন, আয়েশা তো কম বয়সের মেয়ে। এমন যেন না হয় যে, না বুঝে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। তাই পিতামাতার সাথে পরামর্শ করতে বলেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা করেছেন, তারা তো ভালো পরামর্শই দেবেন।

হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর পবিত্রতার সাক্ষ্য ঘোষণা এবং প্রমাণ

হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর জীবনে একটি বড় আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। একে বলা হয় 'ইফ্কের ঘটনা'। ইফ্ক মানে অপবাদ। অর্থাৎ অপবাদের ঘটনা। হযরত আয়েশার (রাযি.)-এর উপর অপবাদের ঘটনা। আল্লাহ চেয়েছেন নিজে হযরত আয়েশার (রাযি.) পবিত্রতাকে প্রমাণিত করবেন। নিজে তার মাকাম ও মরতবা উঁচু করবেন। তাই এই ঘটনা ঘটালেন।

ঘটনাটি মুস্তালিক যুদ্ধের সময়ে ঘটেছে। এ যুদ্ধে নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছেন হযরত আয়েশা (রাযি.)। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে কাফেলা এক স্থানে অবস্থান করল। বিশ্রাম নিয়ে শেষ রাতে কাফেলা রওনা দিল। এদিকে হযরত আয়েশা (রাযি.) গিয়েছিলেন জরুরত সারতে। কিন্তু জরুরত সেরে আসার পর দেখলেন, তার গলার হারটি পড়ে গেছে। তিনি আবার যেখানে জরুরত সেরেছেন, সেখানে হার খুঁজতে গেলেন। এই ফাঁকে কাফেলা রওনা হলে গেল। হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর হাওদাটি উটে তুলে দেওয়া হলো। তাঁর শরীর বড়ই পাতলা ছিল। তাই তিনি যে হাওদার ভেতর নেই, তা বোঝা গেল না। হাওদা হচ্ছে উটের উপরে রাখার ছোট ঘর। এই ধরনের পর্দাবৃত ঘরে পর্দানশীল নারীরা সফর করে। তো কাফেলা চলে গেল। হযরত আয়েশা (রাযি.) হার খুঁজতে দেরী হয়ে গেল। ফিরে এসে দেখলেন, কাফেলা চলে গেছে। সাহাবায়ে কেরাম তো মনে করেছেন, হযরত আয়েশা (রাযি.) হাওদায় বসা আছেন। তাই তারা ততটা খেয়াল করতে পারলেন না।

হযরত আয়েশার (রাযি.) বিশ্বাস ছিল, নবীজি যখন জানতে পারবেন আমি কাফেলায় নেই; তখন তিনি তো অবশ্যই আমাকে নেওয়ার জন্য লোক পাঠাবেন। তাই ছোটাছুটি না করে তিনি শান্তভাবে বসে থাকলেন। কিন্তু

সফরক্লান্ত শরীর! অল্প সময়েই তার চোখে ঘুম এসে গেল।

নবীজির সফরের একটি নিয়ম ছিল, কাফেলার পেছনে একজন লোক থাকত। বেশ দূরত্বে ধীরগতিতে সেই লোক কাফেলার পেছন-পেছন কাফেলার পথ ধরে আসত। ওই কাফেলা কোনো কিছু ফেলে গেলে তা তিনি কুড়িয়ে রাখতেন। এতে কারো কিছু হারানোর সুযোগ থাকত না। এ সফরে কাফেলার পেছনে আসার জন্য নির্ধারণ করলেন প্রিয় সাহাবী সাফওয়ান ইবনে মুআত্তালকে। তিনি বদর যুদ্ধেও অংশগহণ করেছিরেন।

এই সাহাবা সকালে কাফেলা যেখানে অবস্থান করেছিল, সেখানে এসে পৌঁছলেন এবং কাউকে শুয়ে থাকতে দেখলেন। কাছে এসে চিনে ফেললেন যে, ইনি তো নবীপত্নী হযরত আয়েশা (রাযি.)! দেখেই তিনি উচ্চ আওয়াজে পড়লেন-

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

তাঁর আওয়াজ শুনে হযরত আয়েশা (রাযি.) জেগে গেলেন। সাথে-সাথে আয়েশা (রাযি.) তাঁর চাদর দিয়ে পুরো শরীর আবৃত করে নিলেন। হযরত সাফওয়ান (রাযি.) আয়েশা (রাযি.)-এর জন্য নিজের উটটি বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রাযি.) উটে চড়ে বসলেন। হযরত সাফওয়ান লাগাম টানতে থাকলেন এবং চলতে লাগলেন। চলতে-চলতে তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকে (রাযি.) বহনকারী উট নিয়ে উপস্থিত হলেন কাফেলায়। কত কষ্ট করে সাহাবী সাফওয়ান (রাযি.) নিজে পায়ে হেঁটে টেনে উট নিয়ে গেলেন!

এই অবস্থা দেখেই মুনাফিকরা নেচে উঠল। তারা গুজব ছড়াতে লাগল, এখানে কোনো অঘটন রয়েছে। এখানে কোনো গোপন রহস্য আছে। তারা হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর উপর জঘন্য অপরাধের অপবাদ দিল। ক্লান্ত সাফওয়ান তো হতবাক। তার মুখে এর কোনো উত্তর বের হলো না। এই জঘন্য অপবাদের ধাক্কায় আহত ও বিধস্ত হয়ে গেলেন নবীপত্নী আয়েশা (রাযি.)।

জিহাদী কাফেলা মদিনায় এল। চারদিকে মুনাফিকরা ইসলাম, ইসলামের নবী ও তাঁর পরিবারের উপরে কালিমা লেপনের জন্য ওই ঘটনাকে বিকৃতভাবে অপবাদসহ বলে বেড়াতে লাগল! মদীনার পরিবেশ বিবর্ণ হয়ে গেল! মুসলমানরা বড় চিন্তিত হয়ে পড়ল। সত্য-মিথ্যা কারোই জানা নেই। মাতামাতি করছে শুধু মুনাফিকরা। ফলে কেউ সন্দেহও করতে লাগল। কেউ-কেউ মুনাফিকদের কথা বিশ্বাস করে নিলো। অধিকাংশই আসমানি ঘোষণার অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়

ব্যথিত। কিশোরী আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) প্রচণ্ডভাবে বিধস্ত। খাবার-দাবার বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। সারা মদীনায় যেন আগুন লেগে গেছে। সেই আগুনে ইন্ধন দিয়ে যাচ্ছে মুনাফিরা। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) তো প্রচণ্ড রকম অসুস্থই হয়ে পড়লেন।

নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুঃখের সীমা ছিল না তখন। কেউ জানেন না, কোন দিকে মোড় নিচ্ছে ঘটনার প্রবাহ। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) তো নিজেই বড় রুগ্ন হয়ে পড়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তার সালামের উত্তরখানা নেন। কোনো কথা বলেন না বা বলতে পারেন না।

সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এক কঠিন অবস্থা বিরাজ করছে। একদিন মসজিদে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সব সাহাবী বসা! হযরত আবুবকর নেই। মুহাদ্দিছীনে কেরাম তাঁর দৃশ্য বর্ণনা করেন এমন যে, নবীজিকেও বড় পেরেশান ও বিধস্ত দেখাচ্ছে আবার সাহাবায়ে কেরামকেও। অনেক সাহাবা তো হেঁচকি দিয়ে-দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন। একে-একে উমর, উসমান, আলী (রাযি.) কঠিন ভাষায় এই ঘটনাকে প্রত্যাখান করলেন। এই ঘটনাকে তাঁরা অস্বীকার করলেন। একই রকম বক্তব্যে উমর (রাযি.) জানালেন, এ ঘটনা সত্য হতে পারে না। উসমান (রাযি.) জানালেন, এ ঘটনা সত্য হতে পারে না। আলী (রাযি.) জানালেন, এই ঘটনা সত্য হতে পারে না। সকলেই অস্বীকার করলেন। মুনাফিকদের রটনাকে, অপবাদকে সকলে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করলেন।

উত্তর শুনে নবীজি নিশ্চুপ। হযরত উমর (রাযি.) তো প্রচণ্ড রাগ আর ক্ষোভ নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রাণভরে প্রিয়তম নবীকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে জিজ্ঞেস করলেন, ওগো আল্লাহর রাসূল! আপনার এই স্ত্রী আয়েশাকে আপনি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছেন, নাকি কেউ আপনাকে ইঙ্গিত দিয়ে বিবাহ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের দিকে ইশারা করে বললেন, আমাকে তো আয়েশাকে বিবাহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা।

হযরত উমর বললেন, তাহলে আপনি এ বিষয় নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। এই ভাবনা আপনি ছেড়ে দিন। মুনাফিকদের প্রত্যাখান করুন। আমার তলোয়ার আর মুনাফিকদের গর্দান এ দুয়ের মাঝে সর্বোত্তম ফয়সালা হয়ে যাবে। নবীজি উমরের দিকে বড় প্রেমের দৃষ্টিতে তাকালেন আর যেন বলে

দিলেন, উমর (রাযি.) আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন। তুমি আমার হৃদয়ের ব্যথাকে হালকা করে দিয়েছ।

নবীজি শান্ত হলেন।

এদিকে ঘরে কান্নায়-কান্নায় এক করুণ অবস্থা হয়ে গেছে। হযরত আবুবকর (রাযি.), তাঁর স্ত্রীর এবং তাঁর প্রিয়তম আদরের কন্যা আয়েশার (রাযি.)-এর দুঃখের রুপ ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। নবীজি অধীর প্রতীক্ষা করছেন আসমানী ঘোষণার।

কেমন ছিলেন হযরত আয়েশা (রাযি.)? নবীজিকে স্বপ্নে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন হযরত আয়েশাকে (রাযি.) বিবাহ করতে। আজ আয়েশার (রাযি.) এই করুণ দশায় আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠবে না- এ হতে পারে না। মধ্যখানে কিছু দেরী করিয়ে মুনাফিকদের মুখোশ খুলে দিলেন, আল্লাহ মুমিনদের সবরের পরীক্ষা নিয়ে নিলেন কুদরতের মালিক আল্লাহ তা'আলা। তারপরই এল আসমানী ঘোষণা-

الْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ

'অপবিত্র নারীরা অপবিত্র পুরুষদের উপযুক্ত এবং অপবিত্র পুরুষরা অপবিত্র নারীদের উপযুক্ত। পবিত্র নারীগণ পবিত্র পুরুষদের উপযুক্ত এবং পবিত্র পুরুষগণ পবিত্র নারীদের উপযুক্ত। তারা (পবিত্র নারী-পুরুষ) লোকে যার রটনা করে তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক জীবিকা।'[১]

খোদ আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর পবিত্রতা এবং তাঁর নিরপরাধ হওয়ার কথা ঘোষণা করে দিলেন। হযরত আয়েশার (রাযি.) পবিত্রতা আলোচনা করতে গিয়ে কুরআনে ১৮টি আয়াত নাযিল হয়েছে। আবার এত দিন দেরী করে এই পবিত্রতা ঘোষণার জন্য বলে দিলেন এতে তোমাদের জন্য মাগফিরাত ও বড় প্রতিদান রয়েছে।

তো দেখুন, খোদ আল্লাহ তা'আলা একজন নিরপরাধ মুমিন নারীর পবিত্রতা ঘোষণা করে দিলেন। মুনাফিকদের অপবাদকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দিলেন। মুনাফিকদের মুখোশ খুলে দিলেন। সতী-সাধী নারীর পবিত্রতা খোদ কোরআনে যুক্ত করে দিলেন কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য এবং অনন্তকালের

---

১. সূরা নূর, আয়াত- ২৬

জন্য। এ-ই তো ইসলাম। একজন নারীর সম্মান রক্ষায় ইসলাম কী না করেছে! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলাম বুঝবার এবং গুনাহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইসলামে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর ব্যাপারে এমন শিক্ষা জাতিকে প্রদান করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন-

বাবা যদি ঘরে আসে; তার পুত্রও থাকে কন্যাও থাকে, এখন সে যদি কোনো জিনিস নিয়ে আসে, তাহলে তার উচিত, সে তার কন্যাকে জিনিসটি আগে দেবে। কারণ, এ কন্যা-ই তো সব সময় ঘরে থাকে। বাবার অনুগ্রহের বেশী হকদার তো এই কন্যা।

নবীজির অভ্যাস

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, যখন তিনি সফর থেকে তাশরীফ আনতেন, তখন নিজের ঘরে যাওয়ার আগে কন্যা ফাতেমা (রাযি.)-এর ঘরে যেতেন। আবার যখন নিজের ঘরে তাশরীফ আনতেন আর হযরত ফাতেমা (রাযি.) নবীজির ঘরে আসতেন, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে যেতেন।

ইসলামে বোনের মর্যাদা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোনকে সম্মান করার শিক্ষা প্রদান করেছেন। শিমা নামে হালিমা সা'দীয়া (রাযি.)-এর এক কন্যা ছিল। বাচ্চা বয়সে সে নবীজিকে সাথে নিয়ে যেত। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে , যখন সা'দ গোত্র জয় করা হলো, তখন ওই বোনকেও গ্রেফতার করে আনা হয়েছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা আমাকে গ্রেফতার করেছ। আমি তো তোমাদের নবীর বোন। আমি তাকে কোলে নিয়ে খাইয়েছি। আমি তার জন্য পানি ভরে এনেছি। তাকে কত ভালোবেসেছি। সাহাবায়ে কেরাম এসে নবীজিকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ যুদ্ধে এমন এক নারী গ্রেফতার হয়েছে, যে বলেছে, আমি তোমাদের বোন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তার নাম কি শিমা? বলা হলো, হ্যাঁ তার নাম শিমা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চাদরখানা বিছিয়ে দিলেন এবং বোনকে সেই চাদরে বসালেন এবং বললেন, আমার বোন শিমা! আমার

ওই সময়ের কথা স্মরণ আছে, যখন আমার পিপাসা লাগত, তখন কূপ থেকে আপনি আমার জন্য পানি নিয়ে আসতেন। আপনি আমার দুধবোন, আপনাকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। আপনার গোত্রের যত লোকই গ্রেফতার হয়েছে আজ আপনার সম্মানে, আপনার কারণে তাদের সকলকে মুক্ত করে দিলাম। আপনাকে এখতিয়ার দিলাম, আপনি ইচ্ছে করলে তাদের নিয়ে চলে যেতে পারেন।

ইসলামে মায়ের মর্যাদা

যখনই হযরত হালিমা সা'দিয়া (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য নিজের চাদরটি বিছিয়ে দিতেন এবং তাতে নিজের দুধ মাকে বসাতেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের সম্মানের কথা বলেছেন, বোনের সম্মানের কথা বলেছেন, কন্যার সম্মানের কথা বলেছেন। এসব নিকটাত্মীয়দের সম্মান করার হুকুম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্যই দিয়েছেন যে, তাদের জীবন বড়ই পূত-পবিত্র ছিল! তাঁরা সতিত্ব রক্ষা করে নিজেদের পবিত্র রেখে যিন্দেগী যাপন করতেন।

চাঁদ দেখা এবং হযরত ফাতেমার (রাযি.)-এর লজ্জা

প্রথম রাতের চাঁদ দেখা সুন্নাত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদ দেখতেন এবং উম্মতকে তা করতে হুকুম দিয়েছেন। তাই আমাদের জন্য তা সুন্নাত। চাঁদ দেখলে এ দু'আ পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ.

একদিন চাঁদের প্রথম রাতে হযরত ফাতেমা (রাযি.)কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, চাঁদ দেখেছ? ফাতেমা (রাযি.) বললেন, না! নবীজি বললেন, কেন দেখনি। ফাতেমা (রাযি.) চুপ! আবার জিজ্ঞেস করলেন, কেন দেখনি? হযরত ফাতেমা (রাযি.) বললেন, আবাজান! আজ তো প্রথম রাতের চাঁদ! সকল সাহাবা পুরুষ-মহিলা সকলেই আজ চাঁদ দেখছেন! আমিও যদি দেখি, তাহলে আমার দৃষ্টি আর গায়রে মাহরাম পুরুষের দৃষ্টি একসাথে চাঁদে গিয়ে পতিত হবে। আমি তো এর থেকে লজ্জা

পাচ্ছি। এমন করাকে লজ্জার খেলাফ মনে করেছি। তাই আজ চাঁদ দেখিনি। সুবহানাল্লাহ! আজো আল্লাহ আমাদেরকে এমন লজ্জাবতী কন্যাদান করুন, যাদের মাঝে এ লজ্জার মহাগুণ বিদ্যমান থাকবে।

তিন দিন ক্ষুধার্ত

হযরত ফাতেমা (রাযি.)কে নবীজি অত্যন্ত আদর করতেন। একদিন হযরত ফাতেমা (রাযি.) কাপড়ের আঁচলের নিচে করে অর্ধেকটা রুটি নিয়ে নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এলেন। বললেন, আবাজান! এটি আপনার জন্য হাদিয়া। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোথা থেকে আনলে? হযরত ফাতেমা বললেন, আমরা আজ কয়েকদিন ক্ষুধার্ত ছিলাম! আজ আলী (রাযি.) কাজ পেয়েছেন। কাজ করে আটা এনেছেন। তা দিয়ে রুটি পাকিয়েছি। একটি হযরত আলী (রাযি.) খেয়েছেন। একটি হাসান খেয়েছে। একটি হুসাইন খেয়েছে। একটি ভিক্ষুককে দিয়েছি আর একটি রুটি আমার জন্য ছিল। আমি অর্ধেকটা খেয়েছি আর অর্ধেকটা আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। আবাজান! আমি আপনাকে এই হাদিয়া দিচ্ছি। আপনি কবুল করুন! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফাতেমা! মা আমার! ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন, আজ তিন দিন তোমার বাবার পেটে খাবারের কোনো লোকমা যায়নি।

কীভাবে দূর হবে পেরেশানি

আজকাল যুবকরা বলে, আমাদের পেরেশানি শেষ হচ্ছে না। এক পেরেশানি খতম হলে আরেক পেরেশানি আসে। এসব পেরেশানির কারণে আমাদের তাক্ওয়া কম এবং আমাদের গুনাহ বেশী। যখন জীবনে তাক্ওয়া ও পরহেযগারী এসে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বরকত চলে আসবে।

ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

'যদি এই জনপদবাসী ঈমান আনে, তাক্ওয়া অর্জন করে, তবে আমি তাদের উপর বরকতের দরজা খুলে দিব আসমান থেকেও, যমিন থেকেও।[১]

তাই গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে, তাক্ওয়া অর্জন করতে হবে।

---

১. সূরা আ'রাফ, আয়াত- ৯৬

সাহাবায়ে কেরামের রিযিকের মাঝে বরকত

সাহাবায়ে কেরামের জীবনে তাক্ওয়া ছিল। তাঁদের রিযিকে এত বরকত ছিল যে, তাঁদের যুগে যাকাত নিয়ে বের হয়ে ঘুরে-ঘুরে আবার ঘরে ফিরে আসতে হতো। কাকে যাকাত দিবেন? কাউকে পেতেন না যাকাত নেওয়ার মতো! কেউ নেওয়ার মতো নেই! হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, বাইতুল মাল থেকে আমার কাছে যে অংশ আসত, সোনার মতো বড় বড় টুকরো তাতে থাকত যে, সেগুলো কাঠ দিয়ে ভাঙতে হতো।

তাক্ওয়ার বরকত

কিয়ামতের পূর্বে যখন হযরত মাহদীর আগমন ঘটবে, তখন যমীনে কোনো গুনাহ থাকবে না। লোকদের তাক্ওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা এমন বরকত দিবেন যে, একটা গাভীর দুধ পুরো গোত্র পান করতে পারবে। আমাদেরও তাক্ওয়া যত বেশী হবে, আমাদের রিযিকে তত বেশী বরকত হবে। আজ গুনাহের কারণেই আমাদের কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, সময় ও খাবার-দাবারে বরকত হচ্ছে না। আমরা আজ উল্টো পথে চলছি। আমাদের নেক পথে চলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে গুনাহের পথ থেকে হেফাযত করে তাক্ওয়ার পথে নিয়ে আসুন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা পুরো জীবনের মধ্যে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন ইয়া রাবাল আলামীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

‘একটি সুন্দর ও সুবিন্যস্ত জীবনধারার নাম ইসলাম। এখানে সব বিষয়ের সমাধান আছে। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সর্বমহলে কী-কী উপকরণ অবলম্বন করলে মানবজীবন সর্বাঙ্গীন সুন্দর হবে, তাও বলে দেওয়া হয়েছে ইসলামে। জীবন গঠনের সেসব উপকরণের একটির নাম হায়া। মানুষ পবিত্র ও সুন্দর জীবন যাপন করুক এ বিষয়টিকে ইসলাম খুবই গুরুত্ব দেয়। শরীয়ত চায় মানুষ চারিত্রিক অধপতন থেকে বেঁচে থাকুক। ইসলাম পবিত্র জীবনবোধের এমন সবক ও শিক্ষা পৃথিবীবাসীকে উপহার দিয়েছে, যার উপমা দুনিয়ার আর কোনো ধর্ম বা মতাদর্শ উপস্থাপন করতে পারেনি।

ইসলাম ঘোষণা করেছে, লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের মাঝে লজ্জা ও বিনম্রতার এমন জীবন গড়ে গেছেন যে, তাঁদের দৃষ্টি বেগানা নারীদের প্রতি সামান্যও উত্থিত হতো না।’

আল্লাহর দেওয়া তিনটি বড় নেয়ামত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. وقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ اللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشٰهُ. وقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ. وقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ، الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوْا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাতের তরফ থেকে বেশুমার নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে।

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

'যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতরাজি গণনা কর, তবে তা শেষ করতে পারবে না।'[১]

আল্লাহর এক অকাট্য ও শ্বাশ্বত ফরমান এটি! তবে সকল নেয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও উল্লেখযোগ্য তিনটি নেয়ামত আছে। আজ আমরা তা নিয়েই আলোচনা করব।

প্রথম নেয়ামত

প্রথম বড় নেয়ামতটি হচ্ছে আমাদের আকল, আমাদের মেধা, আমাদের বিবেক, আমাদের বোধশক্তি।

আকল কাকে বলে

হাদীছে পাকে ইরশাদ হয়েছে-

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ

আল্লাহ প্রথমে আকল সৃষ্টি করেছেন। এই নেয়ামত আল্লাহ তা'আলা কোনো চাওয়া ছাড়াই আমাদের দিয়েছেন। عقل (আকল) শব্দটি عقال থেকে

---

১. সূরা ইবরাহিম, আয়াত- ৩৪

ঘটিত। উটকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উটের নাকে যে নাকিল বা রশি বাঁধা হয়, তাকে বলা হয় عقال । এই নাকিল বা রশিই উটকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। এদিক-ওদিক পালাতে দেয় না। তেমনিভাবে মানুষের আকল যখন সুস্থ থাকবে, তখন এই আকল মানুষকে শরীয়তের সীমানার বাইরে যেতে দেবে না। সীমালঙ্ঘন করতে দেবে না।

আকল অনুসারে জান্নাতের স্তর বণ্টন

হযরত আয়েশা (রাযি.) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন উচ্চমর্যাদা কী হিসেবে পাওয়া যাবে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আকল হিসেবে পাওয়া যাবে। তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, আমল হিসেবে পাওয়া যাবে না? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বান্দা তো ততটুকু আমলই করবে, যতটুকু আকল তার আছে।

আকল দুই প্রকার।

(১) عقل معاد তথা নবীদের ও নবীদের অনুসারীদের আকল।

(২) عقل معاش তথা দুনিয়া অন্বেষণের আকল।

عقل معاش দুনিয়ার বিষয়ে অন্বেষণের আকল

এই আকলের মানুষেরা সর্বক্ষেত্রে দুনিয়া তালাশ করে। এমনকি তাদের সামনে দীন পেশ করলে তাতেও তারা দুনিয়া তালাশ করে। তাদেরকে যদি এক পারা কুরআন তেলাওয়াত করতে বলা হয়, তাহলে তারা একে অসম্ভব এবং মসিবত মনে করে। আর এদেরই যদি বা হয়, তোমার ব্যবসার উন্নতির জন্য এ দু'আটা এক লক্ষবার পড়ো, তাহলে তারা অনায়াসেই সেই দু'আপাঠে মগ্ন হয়ে যায়। যদি বলা হয়, এ দু'আটা তুমি তাহাজ্জুদ নামাযের পরে পড়ো, তাহলে তোমার ব্যবসায় বরকত হবে। তাহলেও উঠে তা পড়তে রাজি হয়ে যায়। অথচ তাকে দীন পেশ করলে সে তা গ্রহণ করে না। এ-ই তো আমাদের অবস্থা।

عقل معاد নবী ও তাঁর অনুসারীদের আকল

আকলে মা'আদ আল্লাহ রবুল ইযযাত আম্বিয়া কেরামকে প্রদান করেছেন এবং তাঁদের ইত্তেবায়ের বরকতে উলামা, সুলাহা ও নেককার বান্দারা তা

প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এটি এমন আকল, যার দ্বারা মানুষ প্রত্যেক কাজের মধ্যেই আখেরাত তালাশ করে। তারা আখেরাতের কামিয়াবীকেই আসল কামিয়াবী মনে করেন। তাদের সামনে দুনিয়ার বিষয়ে কথা বলা হলেও তারা তাতে আখেরাতের কথা জুড়ে দেন। তারা আখেরাত তালাশ করেন।

তো আকলে মা'আদ দুনিয়াকেও দীন বানিয়ে দেয়। আল্লাহওয়ালাগণ এই আকল প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। তাঁরা সব সময় আল্লাহর দিকেই মুতাওয়াজ্জুহ থাকেন। প্রত্যেকটা জিনিস দেখে তাঁরা আল্লাহকে স্মরণ করেন। জুলাইখা যেমন প্রত্যেকটার নাম রেখেছিল ইউসুফ ইউসুফ, তেমনি আল্লাহর নেক বান্দারা প্রত্যেকটা জিনিসের আড়ালে দেখেন আল্লাহ আল্লাহ।

چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو ہے خدایا
کس نے تیری حقیقت کو پایا

চন্দ্র-তারায়, গ্রহ-নক্ষত্রে যেথায় তাকাই সেথায়-ই খোদা! ওগো খোদা তোমার হাকীকত কে পেয়েছে?

এক কবি বলেন-

جگ میں آکر ادھر ادھر دیکھا
تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا
جان سے ہوگئے بدن خالی
جس طرف تو نے آنکھ بھر دیکھا

ওগো খোদা! এই জগতে এসে যবে তাকিয়েছি এদিক-ওদিক! সবদিকই শুধু দেখেছি তোমায়! সবখানে দেখেছি শুধু খোদাই খোদা!

তোমায় চক্ষুভরে যে দিকেই দেখেছি, আমি বড় অবিষ্ট হয়ে গেছি। আমার দেহ আর জান যেন পৃথক হয়ে গেছে। আমার দেহ-প্রাণ যেন শূন্য হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় বড় নেয়ামত

দ্বিতীয় বড় নেয়ামত হচ্ছে ইল্‌ম। এই ইল্‌ম আল্লাহ মানুষকে প্রদান করেছেন। ইল্‌ম দুই প্রকার- (১) কিতাবি ইল্‌ম (২) সোহবত ও সংস্পর্শে অর্জিত ইল্‌ম।

কিতাবি ইল্‌ম তো কাগজের পৃষ্ঠায় লিখিত। এই ইল্‌ম কাগজ থেকে মুছেও যায়। আর সোহবতপ্রাপ্ত ইল্‌ম সীনা থেকে সীনায় ধারাক্রমে চলতেই

থাকে। কিতাবের ইল্‌ম কলম আর কাগজের মাধ্যমে চলছে। আর বাতেনী ইল্‌ম সীনা থেকে সীনায় চলছে। এ ইল্‌ম হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেয়েছেন। তাই তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَا صَبَّ اللهُ فِىْ صَدْرِىْ اِلَّا وَقَدْ صَبَبْتُهٗ فِىْ صَدْرِ اَبُوْبَكْرٍ.

'আল্লাহ আমার সীনায় যা ঢালেন, তা আবুবকর (রাযি.)-এর সীনায়ও ঢেলে দেন।'

তো এভাবে ধারাক্রমে আবুবকর (রাযি.) থেকে তার ছাত্র, তাঁর ছাত্র থেকে তাঁর ছাত্র এই ধারায় এই ইল্‌ম আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের কাছে ধারাক্রমে হযরত আবুবকর (রাযি.) পর্যন্ত সনদ আছে। কে কার থেকে, কে কার ছাত্র সেই ধারায় আমাদের পর্যন্ত এসেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারা বিদ্যমান থাকবে ইনশাআল্লাহ।

নকশবন্দী তরীকা গিয়ে মিলবে ইমাম মাহদীর জামাতে

ইমামে রবানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) মাকতুবাতে লিখেছেন, ইমাম মাহদী যখন তাশরীফ আনবেন, তখন তাঁর মিশন নকশবন্দী তরীকার সাথে সংযুক্ত থাকবে এবং এর ফলে জগত আলোকিত থাকবে। এ কথাও তিনি বলেছেন যে, আমাকে কাশফের মাধ্যমে নকশবন্দীর তরীকার আগত-অনাগত সকলকে দেখানো হয়েছে।

তালেবুল ইল্‌ম-এর এক একটি কদমের ফযীলত

আল্লাহ রবুল ইযযাতের দরবারে ইল্‌মের ফযীলত অনেক। হাদীছ শরীফে এসেছে, যখন কোনো তালেবুল ইল্‌ম তার ওস্তাদের কাছে গমন করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার এক-একটি কদমের বিনিময়ে এক বছর ইবাদতের সওয়াব দান করেন। জান্নাতে তার জন্য এক-একটি কদমের বিনিময়ে এক একটি শহর আবাদ করা হয়। যমিনের যে-যে ইঞ্চিতে তার কদম লাগে, সেই অংশটি তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করে।

ইল্‌মের ফযীলত

ইমাম গাযালী (রহ.) একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তালেবু ইল্‌ম যখন পথ চলে, তখন আল্লাহর ফেরেশতারা তার বরকত নেওয়ার জন্য তার পায়ের নীচে নিজেদের পেখম বিছিয়ে দেয়। আল্লাহ রবুল

ইযযাতের দরবারে এর অত্যন্ত কদর রয়েছে। তাই তো বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি ইল্‌ম অন্বেষণের জন্য বের হবে, তার শরীরে যে ধুলাবালি পড়বে, ওই ধুলাবালি আর জাহান্নামের আগুন একত্র হবে না। (তাই ওই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না)।

সাইয়্যেদুনা সুলাইমান (আ.)-এর ইল্‌ম

আল্লাহ রবুল ইযযাত সাইয়্যেদুনা সুলাইমান (আ.)কে এই ইখতিয়ার দিলেন যে, যদি তুমি ইল্‌ম চাও, তা হলে তোমাকে আমি ইল্‌ম দিব। আর যদি সম্পদ চাও, তা হলে সম্পদ দিব। তিনি আল্লাহর নিকট ইল্‌মই চাইলেন। আর ইল্‌মের বরকতে শেষ পর্যন্ত তিনি সম্পদও পেলেন, রাজত্বও পেলেন। ইল্‌ম তো পেলেনই।

এক হাজার রহমত

ওলামায়ে কেরাম কিতাবে লিখেছেন, প্রতিদিন আল্লাহ রবুল ইযযাতের এক হাজার রহমত দুনিয়াতে নাযিল হয়। তার মধ্যে নয়শত নিরান্নবইটি রহমত দান করা হয় উলামায়ে কেরাম ও তালেবুল ইল্‌মদের আর বাকী একটি রহমত সাধারণ মানুষদের উপর বন্টন করে দেওয়া হয়।

তাই হাদীছে পাকে ইরশাদ হয়েছে, তোমরা আলেম হও অথবা তালেবুল ইল্‌ম হও অথবা উপরুক্তদের কথাবার্তা শ্রবণকারী হও অথবা তাদের মহবতকারী হও। অন্য কিছু হয়ো না।

ইল্‌ম ও মাকামে ইল্লিইয়ীন

ইল্‌ম শব্দ লিখতে তিনটি হরফ লাগে। প্রথম ع এর দ্বারা عليين মাকাকে ইল্লিইয়িন উদ্দেশ্য। যখন এই ইল্‌মওয়ালা ব্যক্তি আল্লাহর কাছে পৌছবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে মাকাকে ইল্লিইয়ীনে স্থান দেবেন।

ইল্‌ম ও মহবতে এলাহী

ইল্‌মের দ্বারা মানুষের চিন্তা-চেতনা, অভ্যাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নীতি - আদর্শে অন্য রকম সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়ে যায়, পঙ্কিলতা মুছে যায়। ইল্‌ম যত বেশী হবে, আল্লাহর মারেফাত তত বেশি হবে। বান্দার ভেতর আল্লাহর মহবত বেড়ে যাবে। তো ইল্‌মের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রেম-ভালোবাসা প্রাপ্ত হয়।

আলেমকে ইকরাম করো

এক বর্ণনায় এসেছে, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো আলেমকে পাহারা দেয়, নিরাপত্তা দেয়, অসুস্থতায়, বার্ধক্যে এবং অন্য কোনো সমস্যায় তার সঙ্গ দেয়, আল্লাহ তা'আলা তখন ওই বান্দার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে গোলাম আজাদ করার সাওয়াব দান করেন। যদি আবেগে, মহবতে, আন্তরিক টানে কোনো ব্যক্তি কোনো আলেমের মাথায় চুমু দেয়, তাহলে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে সাওয়াব দেওয়া হবে।

আলেমের সঙ্গ অর্জনকারী নবীর সঙ্গ অর্জনকারীর সমান

তাম্বীহুল গাফিলীন কিতাবে লিখিত আছে, এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (রহ.) নকল করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আলেমের যিয়ারাত করল, সে যেন আমারই যিয়ারত করল। যে ব্যক্তি আলেমের সাথে মুসাফাহা করল, সে যেন আমার সাথেই মুসাফাহা করল। যে ব্যক্তি আলেমের সাথে উঠাবসা করল এবং আলেমের সঙ্গ ও সংস্পর্শ লাভ করল, সে যেন আমার সাথেই উঠাবসা করল এবং আমার সঙ্গ-সংস্পর্শ লাভ করল।

কিয়ামতের দিন উলামায়ে কেরামের ইকরাম

এক বর্ণনায় এসেছে, কিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মদী নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হবে। তখন উম্মতের মধ্যে যত মানুষ পিপাসার্ত হবে, সকলকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে ফেরেশতারা হাউজে কাউসারের পানি পান করাবে। কিন্তু এই উম্মতের উলামায়ে কেরাম যারা থাকবেন, তাদেরকে খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পান করাবেন। কারণ, আলেমগণ তো নবীগণেরই ওয়ারিশ।

তো ইল্‌মের কারণে বহু সম্মান অর্জন করা যায়। ইল্‌ম স্থায়ী এক সম্পদ। নবীজির উম্মতের মধ্যে উলামায়ে কেরামের অবস্থান তো খোদ নবীজিই বলে গেছেন যে, তারা আমার নায়েব, আমার স্থলাভিষিক্ত। আমার অবর্তমানে আমার সব কাজ তাঁরাই আঞ্জাম দিবে।

কাকে বলে ইল্‌ম : ইল্‌মের মর্ম কী

ইল্‌ম তাকেই বলা হবে যার উপর আমল করা হবে। আলেম তাকেই বলা হবে, যে তার ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করবে। যে আমল করবে না উক্ত

সুসংবাদগুলো তার জন্য নয়। হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) বলেছেন, ইল্‌ম তো ওই নূর, যা অর্জিত হওয়ার পর আমল ছাড়া স্থিরতা আসে না। যদি কোনো আলেমের অবস্থা আমলের জন্য ব্যাকুল হয়, তাহলেই সে হবে আলেম। অন্যথায় ওই ইল্‌ম আলেমের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে।

বে-আমল আলেম : বদকার আলেম

হাদীছে আছে, কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার নিকট অভিযোগ তুলবে, হে আল্লাহ! দুটা জিনিসের দুর্গন্ধ সকলকে পেরেশান করে দিচ্ছে। এক. কাফেরেদের শরীর থেকে বের হওয়া দুর্গন্ধ। দুই. বে-আমল ও বদকার আলেম থেকে বের হওয়া দুর্গন্ধ।

শূকরের গলায় মুতি

ইবনে সীরীন (রহ.)-এর সামনে কেউ একটি স্বপ্নের কথা বলল, দেখলাম, আমি শূকরের গলায় মুতি পরাচ্ছি। স্বপ্নে ব্যাখ্যায় ইবনে সীরীন বললেন, তুমি অযোগ্যদের ইল্‌ম শিখাচ্ছ। তাদের ইল্‌ম শিখাবে না। অযোগ্যদের, পাপীদের ইল্‌ম শিক্ষা দিও না। ইল্‌ম তো সম্মানের জিনিস।

ইমাম বোখারীর ইল্‌মের কদর ও মর্যাদাদান

ইমাম বুখারী (রহ.) ইল্‌মের বড় কদর করতেন। তাই তো আল্লাহ তার কিতাবের মাধ্যমে তাঁকে এত সম্মান দিয়েছেন। তাকে সে যুগের বিচারক বলেছিল, তুমি ঘরে এসে আমার বাচ্চাদের পড়াও। ইমাম বোখারী (রহ.) বললেন, এতে ইল্‌মের অসম্মান হবে। আমি ইল্‌মের অসম্মান করতে পারব না। বিচারক বলল, এ শহর ছেড়ে দিতে হবে তোমাকে। ইমাম বোখারী বললেন, দেশ ছেড়ে দিতে রাজী আছি; কিন্তু ইল্‌মের অবমাননা করতে রাজী নই। এর বিনিময়ে আজ ইমাম বোখারী (রহ.)কে আল্লাহ তা'আলা বিপুল সম্মানের অধিকারী বানিয়েছেন।

আলেম ও মূর্খের মাঝে পার্থক্য

ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন, কখনও দ্বীনের খাতিরে কোনো আলেমকে এবং সাধারণ মানুষকে এক সাথে গ্রেফতার করা হয় আর রাষ্ট্রপক্ষ একজনকে অনুমতি প্রদান করে, তুমি চাইলে আলেম ও সাধারণ পাবলিকের মধ্যে যেকোনো একজনকে ছেড়ে দিতে পার, তখন উচিত হবে সাধারণ পাবলিককে ছেড়ে দেওয়া এবং আলেমকে গ্রেফতার করা। কারণ, আলেম

দ্বীনের খাতিরে কষ্ট সহ্য করতে পারবে। তার সেই বুঝ আছে। পাবলিকের তা নেই। আলেমের তাওয়াক্কুল বেশী আল্লাহ্ তা'আলার উপর। তাই আলেম কারাগারে কষ্টে থাকলেও সে কোনো সময় জালিমের সামনে মাথা নত করবে না এবং আল্লাহর অবাধ্য হয় না। এমন কোনো কথাও বলবে না। কিন্তু সাধারণ পাবলিক তো মুসিবতে পড়ে কুফরীকেও গ্রহণ করে নিবে।

তবে আরেকটি মাসআলা এই যে, যদি কোনো সময় এমন পরিস্থিতি সামনে আসে যে, একজন আলেম ও একজন পাবলিক পরিধান করার মতো কাপড় পাচ্ছে না। আরেকজনের অবস্থা এমন যে, তার কাছে অন্যকে দেওয়ার মতো একটি কাপড় আছে। তাহলে তার উচিত কাপড়টি আলেমকে দেওয়া। কারণ, আলেম তো শরীয়তের কারণে ওই পাবলিকের বস্ত্রহীন শরীরের দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু পাবলিক বিরত থাকবে না। এত গুরুত্ব আলেমের। তাই আলেমের উচিত নিজ ইল্‌মের উপর আমল করা।

উলামায়ে কেরাম উম্মতের আয়না

বাদশাহ হারুনুর রশীদ উলামায়ে কেরামকে বড় সম্মান করতেন। একবার উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে শাকীক বলখী (রহ.) বাদশাহ হারুনুর রশীদকে একটি নসীহত করলেন যে, সমুদ্রের পানি যদি পরিচ্ছন্ন হয়, তাহলে নদীর পানিও পরিচ্ছন্ন হবে। আর যখন সমুদ্রের পানি নষ্ট হয়ে যাবে, তখন নদীর পানিকেও নষ্ট পাবে। এমনিভাবে উলামায়ে কেরামের দিলে যদি দ্বীনের তড়প থাকে, তাদের হৃদয়ে যদি দ্বীনের জন্য আকুলতা থাকে, তাহলে সাধারণ পাবলিকের হৃদয়েও সেই আকুলতা ছড়িয়ে পড়বে। আর যদি উলামায়ে কেরাম দুনিয়াদার হয়ে যায়, তাহলে সাধারণ মানুষকে দ্বীনের পথে খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

বদকার আলেম : নেককার আলেম

ইমাম মালেক (রহ.)কে জিজ্ঞেস করা হলো, হযরত! এই উম্মতের পতন যদি আসে কেন আসবে? ইমাম মালেক বললেন, উলামায়ে কেরামের কারণে এই উম্মতের পতন আসবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হযরত! এই উম্মতের সেই নিমজ্জমান কিস্তিকে রক্ষা করবে কে? উত্তরে তিনি বললেন, উলামায়ে কেরাম। প্রশ্নকারী বললেন, এটা কীকরে সম্ভব? পতনও আসবে উলামায়ে কেরামের কারণে আবার রক্ষাও করবে উলামায়ে কেরাম এর রহস্য কী?

ইমাম মালেক উত্তর দিলেন, যে আলেম বদকার হবে সে পতন আনবে আর যে আলেম নেককার হবে, সে উম্মতকে রক্ষা করবে।

গোমরাহীর পথ

তো আলেম সে, যে তার ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করবে। এই ইল্‌মের দ্বারা মানুষ সত্য পথের সন্ধান প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন–

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ

'যে চোখে দেখে আর যে দেখে না তারা উভয়ে এক নয়। আলো ওঅন্ধকার সমান নয়।'[১]

ইমাম গাযযালী রহ. বলেন, এখানে اعمى তথা যে দেখে না এর দ্বারা উদ্দেশ্য জাহেল ও মূর্খ ব্যক্তি। আর بصير তথা যে দেখে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আলেম। আবার দেখুন, গুমরাহীর রাস্তা তো অনেক হয়। তাই ظلمات শব্দটি বহুবচন আনা হয়েছে। আর সত্য পথ তো একটি হয়, তাই نور একবচন আনা হয়েছে।

ইল্‌ম ও আম্বিয়া কেরাম

এই ইল্‌মের কারণেই আম্বিয়ায়ে কেরামকে আল্লাহ তা'আলা এমন মহামর্যাদায় সমাসীন করেছেন। হযরত আদম (আ.)কে এই ইল্‌মের কারণেই তো ফেরেশতারা সিজদা করেছে। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ করেন–

عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

'আদমকে সর্ব প্রকার জিনিসের নামের ইল্‌ম দান করা হয়েছিল।'[২]

আল্লাহ তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এই শিক্ষার কারণে তাঁকে ফেরেশতারা সেজদা করতে বাধ্য হয়েছিল।

হযরত সুলাইমান (আ.)কেও এই ইল্‌মের মাধ্যমেই এমন রাজত্ব, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দিয়েছিলেন। হযরত সুলাইমান (আ.)এর কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

---

১. সূরা ফাতির, আয়াত- ১৯,২০

২. সূরা বাকারাহ, আয়াত- ৩১

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ

'হে মানবসকল! আমাকে পাখির ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।'[১]

এমনিভাবে এই ইল্‌মের কারণেই হযরত দাউদ (আ.) বাদশাহী পেয়েছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ

'আমি দাউদকে বস্ত্র বানানো শিক্ষা দিয়েছি।'[২]

এই ইল্‌মের কারণেই হযরত ইউসূফ (আ.) জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাকে আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে মহান আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে ইল্‌ম দান করেছেন।

হযরত খিজির (আ.)

হযরত খিজির (আ.)কে আল্লাহ তা'আলা অগাধ ইল্‌ম দান করেছেন। হযরত মুসা (আ.) তাঁর যুগে হযরত খিজির (আ.) থেকে ইল্‌ম শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

'আর আমি আমার পক্ষ থেকে [খিজিরকে] ইল্‌ম শিক্ষা দান করেছি।'[৩]

শেষ কথা, ইল্‌ম সম্মানের বস্তু। ইল্‌ম মানুষের সম্মান বৃদ্ধি করে। আর ইল্‌ম তখনই মানুষের কাজে আসবে, যখন তার উপর আমল করা হবে। আমলহীন আলেম অত্যন্ত ঘৃণিত আল্লাহর নিকট। তাই ইল্‌ম শিক্ষাও করতে হবে আবার তার উপর আমলও করতে হবে। অজ্ঞতা মানুষের বড় দোষ। অজ্ঞতা দূর করতে হবে। ইসলামে মূর্খতা ও অজ্ঞতার কোনো স্থান নেই। ইসলাম বারবার জ্ঞান শিক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে। জ্ঞান ছাড়া মানুষ প্রকৃত মুসলমান হয় না। তাই ইসলাম ও জ্ঞান শিক্ষা করতে হবে। ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ।

সাধারণ জনতার ইল্‌ম শিক্ষা

এক রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলবেন, ও আমার প্রিয় রাসূল!

---

১. সূরা নামল, আয়াত- ১৬
২. সূরা আম্বিয়া, আয়াত- ৮০
৩. সূরা কাহাফ, আয়াত- ৬৫

আপনি আপনার উম্মতের উলামায়ে কেরামকে ডাকুন। ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গোটা উম্মতকে ডেকে সমবেত করবেন। যখন নবীজি সকল উম্মতকে ডেকে নিয়ে আসবেন, তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, ওগো আমার মাহবুব! আমি তো শুধু আপনার উম্মতের উলামাকে ডাকতে বলেছি। আপনি তো পুরা উম্মতকে ডেকে নিয়ে এসেছেন? নবীজি বলবেন, হে আমার মাওলা! আপনি তো আমার উম্মতের প্রত্যেক সদস্যকে ইসলামের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। জিজ্ঞেস করা হবে, আমার মাহবুব! এটা কীভাবে? তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করবেন–

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ

'যে বান্দা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর সাক্ষ্য প্রদান করবে, সেই হবে উলূল ইল্‌ম।'[১]

লা ইলাহার বরকতে আল্লাহ তা'আলা নিজের মাহবুব ও প্রিয় বানিয়ে নেন। তাই তো পুরো উম্মতের সকলেই উলামার ভেতর শামিল হয়ে যাবে।

তৃতীয় বড় নেয়ামত

তৃতীয় একটি নেয়ামত আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন, যেটি হচ্ছে আদব তথা শিষ্টাচার।

কারো যদি ইল্‌ম থাকে; কিন্তু আদব না থাকে, তাহলে তার ইলমে রং আসবে না। তার ইল্‌মের সৌন্দর্য ফুটে উঠবে না। শয়তান তো আজ আমাদের অধঃপতনের অতলে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

হযরত থানভী (রহ.)-এর বাণী

হযরত থানভী (রহ.) ইরশাদ করেছেন, আলেমের পেছনে লেগে থাকে আলেম শয়তান। মুফতীর পেছনে লেগে থাকে মুফতী শয়তান। মুফতীকে ধোঁকা দেয় মুফতীর মতো করে আর আলেমকে আলেমের মতো করে। মাওলানাকে মাওলানার মতো করে। অনেক সময় সাধারণ পাবলিকও জাহেল লোক গোনাহ করে এবং ভয়ে থাকে। নিজেকে লজ্জিত বোধ করে। আর

---

১. সূরা আল ইমরান, আয়াত- ১৮

আলেম গোনাহ করে নানা রকম তাবীল করে করে। জায়েযের সূরত বের করে করে। ফলে গুনাহ করার পর তাওবাও নসীব হয় না।

তাই যাদের জন্য সুসংবাদ বেশী দেওয়া হয়েছে, তারা সতর্কও থাকতে হয় বেশী। হীরে-মুতির দাম অনেক। এ কারণে এটি রাখাও হয় বড় সাবধানতার সাথে সুন্দর ও সুরক্ষিত স্থানে। তাই যার মূল্য বেশী, তাকে রাখতে হয় সাবধানে। আলেমের মূল্য বেশী;তাই তাকে থাকতেও হবে সাবধানে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী ও আদব

যদি কোনো মানুষের মাঝে ইল্‌ম একটু কম থাকে আর আদব বেশি থাকে, তাহলে ইল্‌মের কমতি আদব দ্বারা কেটে যায়। কিন্তু কারো যদি আদব কম থাকে, তাহলে কোনোভাবেই তার ঘাটতি পূরণ হয় না। আল্লাহ তা'আলা বেয়াদবকে মাফ করেন না।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) বলেছেন, একবার আমি হাজতে গিয়ে দেখি, আমার হাতে কলমের কালি লেগে আছে। আমি হাজত না সেরে বের হয়ে গেলাম এবং কালিটুকু ধুয়ে নিলাম। আমি চিন্তা করলাম, এই হাত যদি ব্যবহার করি, তাহলে কালির সাথে বেয়াদবী হবে। কারণ, কালি দিয়ে তো আমি ইল্‌ম শিক্ষা করি। তো আমি কালিটুকু ধুয়ে নেওয়ার সাথে-সাথেই আমাকে ইলহাম করা হলো, হে আহমদ সিরহিন্দী! জাহান্নামের আগুন তোমার জন্য হারাম করে দেওয়া হলো।

ইল্‌ম শিক্ষা করার সময় কিবলার দিকে ফিরে বসবে

আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, ইল্‌ম শিক্ষা করতে কিবলার দিকে ফিরে বসবে। এতে বরকত হবে। তবে যেখানে কিবলার দিকে ফেরা সম্ভব না হয়, সেখানে সাধারণভাবে যেভাবে সম্ভব সেভাবেই বসবে।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) ও ইল্‌মের আদব

হযরত মুফতীয়ে হিন্দ মুফতী কেফায়েতুল্লাহ (রহ.) একবার তালেবুল ইল্‌মদের জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো কীভাবে আল্লামা কাশ্মীরী এত বড় আলেম হয়েছেন? উত্তরে যে ছাত্র তাফসীরে ভালো পারত, সে বলল, বেশী-বেশী তাফসীরের কিতাব পড়ে। যার সাথে হাদীছের কিতাবের সম্পর্ক বেশী, সে বলল, হাদীছের কিতাব বেশী মুতা'আলা করে। এভাবে একেকজন

একেক কারণ বর্ণনা করতে লাগল। কিন্তু হযরত মুফতী সাহেব বললেন, তোমাদের কারো উত্তর সঠিক হয়নি। শোনো; আল্লামা কাশ্মীরী আল্লামা কাশ্মীরী হয়েছেন আদবের কারণে। তিনি ইল্‌মের ও কিবাতের আদব করার কারণেই আল্লাহ তাঁকে আল্লামা বানিয়েছেন।

তিনি নিজেই বলে গেছেন, তিনি এত পরিমাণ আদব রক্ষা করতেন যে, যদি হাদীছের কিতাব মুতালাআ করতে থাকতেন, তখন বাঁকা হাশিয়া ও টীকা দেখতে হলে তিনি কিতাব ঘুরিয়ে না দেখে নিজে ঘুরে গিয়ে দেখে নিতেন।

আরো বলেন, তিনি কখনো ওযু ছাড়া কিতাব স্পর্শ করতেন না। এমনকি কিতাবগুলো মর্যাদার স্তর হিসাবে বিন্যস্ত করে রাখতেন। হাদীছের কিতাবের উপর ফিকাহর কিতাব রাখতেন না। ফিকাহর কিতাবের উপর ইতিহাসের কিতাব রাখতেন না। এমন করে খুঁটিনাটি আদবগুলোও তিনি রক্ষা করতেন। তাই তো তাকে আল্লাহ তা'আলা এমন কবুলিয়্যাত দান করেছেন।

যাদুকর এবং আদব

হযরত মুসা (আ.) এর বিরুদ্ধে সত্তর হাজার যাদুকর ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে ইমাম আনয়ন করার তাওফীক দান করেছেন। সামান্য কিছু আগে যারা কাফের ছিলেন তথা সিজদায় পড়ে গেলেনসামান্য কিছু সময় পরে। পরিণত হলেন আল্লাহর মুমিন বান্দায়। কারণটা কী ছিলো। তার কারণ এই যে তাদের মাঝে আদব ছিলো। একে তো যুগের নবীর সাথে তারা সামঞ্জস্য বিধান করেছে। ২য় একটি কারণ কিতাবে এই লিখা হয়েছে যে যাদু কররা মুসা (আ.)এর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে পরস্পরে পরামর্শ করলো- কী করা যায়? তাদের মধ্যে একজন অন্ধ যাদুকর ছিলো সে বললো- দেখো এখানে দুটি সূরত হতে পারে- আমাদের প্রতিপক্ষ মূসা হয়তো সত্যিই নবী। নাহয় আমাদের মতোই যাদুকর। তাই আমার খিয়াল তোমরা তার যথাযত আদব করো। এতে- তিনি যাদুকর হলেও আমরা যদি তার উপর বিজয়ী হই তাহলে আমাদের তো ক্ষতি নেই। আর তিনি যদি আমাদের উপর বিজয়ী হন তাহলেও আমরা আদব দেখিয়েছি বলে তিনি আমাদের সাথে রুক্ষ হবেন না। বরং তা আমাদের জন্য উপকার দিবে। কিন্তু কী আদব দেখানো যায় তার সাথে। তারা বললো আমরা তাকে বলবো হযরত যাদুর উপকরণ আপনি আগে ছাড়বেন নাকি আমরা আগে ছাড়বো। এতে করে তার থেকে অনুমতির সূরতে মোকাবেলা হবে। তো যাদুকররা তাই করলো। জবাবে মুসা (আ.) বললেন-

أَلْقُوْا مَا أَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ

'তোমরা যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ করো।'

তো যাদুকরদের এই আমল আল্লাহ পছন্দ করলেন এবং এর বরকতে তাদের ঈমান গ্রহণের সুযোগ করে দিলেন।

আমাদের সিজদার রুপরেখা

ওই যাদুকররা একটি সিজদা করেছিল। এই একটি সিজদায় তারা আল্লাহর এতো নিকটে এসে পড়েছিলেন যে তাদের ঈমানের সুসংবাদ আল্লাহ কুরআনেও প্রদান করেছেন। অথচ আজ আমরা প্রতিদিন চল্লিশটি সিজদা করি, তবু আল।লাহর নৈকট্য আমরা লাভ করতে পারি না। বুঝা যায় আমাদের সিজদার অবস্থা মুসার যাদুকরদের চেয়ে খারাপ! এমন মুহাব্বতের সাথে সিজদা করতে পারলে সিজদায় মারেফাতের মজা পাওয়া যাবে। অবস্থাটা এমন হওয়া চাই–

اِلٰهِیْ سَجَدَلَكَ سَوَادِیْ وَخَیَالِیْ

হে আল্লাহ আমার দেহ, আমার মন, আমার শরীর আমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তোমার সিজদা করেছে।

তো এমন ভাবে সিজদা করতে পারলেই সে সেজদায় আমরা মারেফাতের মজা পাবো।

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আদব

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আদব ও শিষ্টাচারের শ্রেষ্ট শিক্ষক। তাঁর আগমন না ঘটলে মানুষ বুঝতই না শিষ্টাচার কাকে বলে। তিনি অত্যন্ত মহবত ও আদবের সাথে আল্লাহর নাম নিতেন। এমনকি কোনো বিষয়ে কথা বলতে হলে আল্লাহর নামটি আগে নিতেন। আল্লাহর নামওয়ালা কোনো বাক্য এলে আগে আল্লাহর নামটি নিতেন। তারপর বাক্যটি বলতেন। যেমন গারে সাওরে যখন হযরত আবুবকর (রাযি.) নবীজির জানের ব্যাপারে কাফেরদের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন–

اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

'নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।'[১]

---

১. সূরা তাওবা, আয়াত- ৪০

অথচ হযরত মুসা (আ.)-এর উম্মত ফেরাউনের কবলে পড়ে ভয়ার্ত হয়ে গেলে হযরত মুসা বলেছিলেন–

إِنَّ مَعِيَ رَبِّي

'নিশ্চয় আমার সাথে আছে আমার রব।'[১]

দেখুন, এখানে إِنَّ নিশ্চয়তা বুঝানো শব্দের পর مَعِيَ আসছে। আর আমাদের নবীর কথায় مَعَنَا পরে اللهُ আগে আসছে। তো এমন খুঁটিনাটি বিষয়ও নবীজি খেয়াল করতেন।

আদব হাসিল করার পথ ও পন্থা

মানুষ নিজে-নিজে আদব হাসিল করতে পারে না। শায়খের সোহবতে অবস্থান করে আদব শিখে নিতে হয়। শায়খ ধরে-ধরে প্রয়োজনে ধমকি দিয়ে-দিয়ে শিখিয়ে দেন, কোথায় কোন আদব রক্ষা করে চলতে হবে। শায়খ মহবত করেন তাঁর ছাত্রকে, তাঁর শিষ্যকে। কখনও মহবতের সাথে, কখনও ধমকি দিয়ে, কখনও নিজে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়ে শায়খ আদব শিক্ষা দেন। ফলে মানুষ আদব হাসিল করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর কাছে আদবের জন্য দু'আ করতে হবে। আজ আমরা কত কিছুর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ চাই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার আদবের জন্যে দু'আকারী মানুষের সংখ্যা অনেক কম।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَدَّبَنِيْ رَبِّيْ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِيْ

'আমার আল্লাহ আমাকে আদব শিক্ষা দিয়েছেন। এক উত্তম আদব শিখিয়েছেন।'

আমাদের মাশায়েখে কেরাম বলেছেন,

أَدِّبُوا النَّفْسَ أَيُّهَا الْأَصْحَابُ طُرُقُ الْعِشْقِ كُلُّهَا آدَابٌ.

'হে দোস্ত! আপন নফসকে আদব শিখাও! কারণ, ইশকের যত পথ আছে, তার পুরোটাই আদব।

---

১. সূরা শুআরা, আয়াত- ৬২

কাকে বলে আল্লাহর ভয়

যখন একজন মানুষের মাঝে এই বড় তিন নেয়ামত যথেষ্টভাবে বিদ্যমান হয়, অর্থাৎ আকলে সালীম তথা সুস্থ আকল থাকবে, ইলমে নাফে' তথা উপকারী ইল্‌ম থাকবে এবং আদব ও আমল থাকবে, তখনই বলা হবে ওই মানুষটির মাঝে خشية الهى তথা আল্লাহর ভয় বিদ্যমান আছে। কুরআনুল কারীমের আয়াত–

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

'নিশ্চয় আলেমগণই আল্লাহকে যথাযথ ভয় করে।'[১]

এখানে خشية দ্বারা এই ভয়ই উদ্দেশ্য। خشية মানেই তো ভয়। خشية হচ্ছে আত্মার এমন এক প্রকম্পিত অবস্থার নাম, যার কারণে মানুষ আল্লাহর মহবতে আমলে মগ্ন থাকে। তার হৃদয়ে সর্বদাই একথা বিদ্যমান থাকে। কিয়ামতের দিন আমার রবের দরবারে আমার আমলের হিসাব দিতে হবে। আমার রবের সাথে কেয়ামতের দিন মোলাকাত করতে হবে। তো মোলাকাতের দিনটি যখন তার স্মরণে থাকবে, তখন কোনো ছোট কাজও আল্লাহর হুকুমের বিপরীত সে করতে পারবে না।

সাথে যেন আল্লাহ আছেন

দেখুন, একটি বিষয় হচ্ছে কোনো জিনিসের সংবাদ আপনার কাছে থাকা। কোনো বিষয় সম্বন্ধে আপনার ইল্‌ম থাকা। ওই জিনিসটির কল্পনা নিজের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকা। এই কল্পনা বিদ্যমান থাকাটা সর্বদার জন্য স্থায়ী হয় না। কিন্তু আরেকটি বিষয় হচ্ছে সাথে থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যেখানে তিনজন সদস্য থাকবে, সেখানে ৪র্থ জন আমি তো আছিই। যেখানে চারজন থাকবে, সেখানে পঞ্চমজন আমি আছি। অর্থাৎ তোমার জানামতে যেখানেই তুমি আছ, তুমি একজন হও আর কয়েকজনের সাথে অবস্থান করো জেনে রেখো, সেখানে আরো একজন সদস্য আমিও আছি। ইরশাদ হচ্ছে–

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ

---

১. সূরা ফাতির, আয়াত- ২৮

'তিনি তোমাদের সাথেই আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন।'[১]

তো ইল্‌মীভাবে প্রত্যেক বান্দার এই খবর আছে যে, এখানে আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাপারটি কয়েকজনেরই মাত্র মনে থাকবে এবং মাত্র কয়েকজনেরই কল্পনায় সর্বদা বিরাজিত থাকবে। তাই বলছি, কোনো একটি বিষয়ে ইল্‌ম থাকা, জানা থাকা ও জ্ঞান থাকা এক জিনিস আর ওই বিষয়টি হৃদয়ে সর্বদা বিরাজমান থাকা আরেক জিনিস। তো এই যে আমাদের কাছে যিকিরের জন্য লোকেরা আসে, কেন আসে? আল্লাহ পাকের ধ্যান, খেয়াল ও কল্পনাকে তার মাঝে সর্বদাই বিদ্যমান থাকে সে কারণে আসে। একেই বলা হয় রবের কল্পনা সর্বদা হৃদয়ে বিদ্যমান থাকা। তো এখানে মানুষ এসে এই শক্তি অর্জন করতে চায়, যেন তাদের মাঝে বিদ্যমানতার সিফাত চলে আসে। তাদের জানা ইল্‌মই যেন বিদ্যমানতায় পরিণত হয়। এই যে আল্লাহ তা'আলা সর্বদা সবখানে আমাদের সাথে আছেন বলে আমরা জানি, এ কথাটা যেন আমাদের হৃদয়ে হাজির হয়ে যায়। খোদা আমাদের সাথেই আছেন, খোদা আমাদের সাথেই আছেন এই অবস্থা যেন সর্বদা আমাদের হৃদয়ে বিরাজমান থাকে।

একটি দলিল

একটি দলিল শুনুন। হযরত যাকারিয়া (আ.) আল্লাহ রাবুল ইযযাতের পয়গম্বর। তিনি মানুষের মাঝে দ্বীনের তাবলীগ করতে গেলেন। মসজিদে মারইয়াম একা। দীর্ঘ সময় হয়ে গেল। হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর হৃদয়ে খেয়াল এল, মারইয়াম তো রয়ে গেছে। তার খাবার-দাবার কম হয়ে যাবে না তো আবার। এই ভেবে তিনি মসজিদে চলে এলেন এবং মসজিদের মেহরাবে প্রবেশ করলেন।

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

'যখনই সে মেহরাবে প্রবেশ করল, তখন মারইয়াম-এর নিকট আনসিজনের ফল দেখতে পেল।'[২]

তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। কারণ, দুনিয়াটা উপায়-উপকরণের মাধ্যমে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস অর্জন করার জায়গা। দুনিয়া তো দারুল আসবাব। ফলে তিনি বলে ফেললেন–

---

১. সূরা হাদীদ, আয়াত- ৪

২. সূরা আল ইমরান, আয়াত- ৩৭

اِنّٰى لَكِ هٰذَا

মারইয়াম! এই ফল তুমি কোথায় পেয়েছ?[১]

হযরত মারইয়াম তো আল্লাহর ভাবনায় ডুবে ছিলেন। আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। আল্লাহর ভাবনায় বিভোর ছিলেন। আল্লাহর দিকে তিনি মুতাওয়াজ্জুহ ছিলেন। তাই সাথে-সাথে বলে দিলেন–

مِنْ عِنْدِ اللّٰه

'আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।'[২]

اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে বিনা হিসাবে দান করেন।'[৩]

হযরত যাকারিয়া (আ.) যখন হযরত মারইয়াম (আ.)-এর এই কথাগুলো শুনলেন, তখন তাঁর তাওয়াজ্জুহ ওই দিকে গেল। তিনি ভাবলেন, হে আল্লাহ! আপনি যদি মারইয়ামকে আনসিজনের ফল খাওয়াতে পারেন, তাহলে এই বৃদ্ধকে আপনি সন্তানও দিতে পারেন।

ইরশাদ হচ্ছে–

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

সে সেখানেই দু'আ করল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সন্তান দান করো।' ফলে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করলেন, তোমাকে আমি সন্তান দেব। তো এই যে এখানে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর চিন্তা প্রথমে অসবাবের দিকে গেল, উপায়-উপকরণের দিকে গেল এটি মন্দ কিছু নয়। মানবীয় স্বভাব এটি। কারণ, দুনিয়ায় তো দারুল অসবাব।

এভাবে উপায়-উপকরণের ভাবনায় নবীগণও পড়েছেন

হযরত মুসা (আ.) একজন নবী ছিলেন। কিন্তু তিনি ফেরাউনের বাহিনী দেখে শঙ্কিত হলেন। এটি নবুওয়াতের বিপরীত নয়। বরং মানবিক স্বভাবের কারণে বাহ্যিক উপায়-উপকরণের দিকে হঠাৎ দিল চলে যায়। তো তিনি যুগের নবী। তিনি যাচ্ছেন আর দু'আ করছেন,

---

১. সূরা আল ইমরান, আয়াত- ৩৭
২. সূরা আল ইমরান, আয়াত- ৩৭
৩. সূরা আল ইমরান, আয়াত- ৩৭

رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

'হে আল্লাহ আমাকে জালেমের হাত থেকে রক্ষা করুন।'[১]

এই ব্যাপারটা তাওয়াক্কুলের খেলাফ নয়। তাই তো শুয়াইব (আ.) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–

نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

'আপনি জালেম সম্প্রদায় থেকে নিস্কৃতি পেয়েছেন।'[২]

আমরা তো দারুল আসবাবের জিন্দেগী কাটাচ্ছি। তাই আমরাও অনেক সময় বাহ্যিক উপায়-উপকরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাই।

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর বাণী

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলেছেন, তোমরা যদি এক ছটাক মেহনত করো মাখলুকের উপর, তাহলে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক গড়ার জন্য মেহনত করো এক মন। তাই যখনই বাইরে যেতেন সময় লাগানোর জন্য তখন ফিরে এসে তিনি ই'তিকাফ করতেন। ইতিকাফ কী জিনিস? এই ইতিকাফ মানে তো আল্লাহর সাথে তাআল্লুক করা। যে কাজটা আজ আমরা খানকার মধ্যে করছি। এতে দিলটা আল্লাহর দিকে ফিরে। বান্দা আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জুহ হয়।

তাই উলামায়ে কেরামের জন্যও জরুরি, তারা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করবে আর নিজের ব্যাটারীকে চার্জ দেওয়ার জন্য প্রতিদিন কিছু সময় নিবৃত্তে অবস্থান করে রবে কারীমের সান্নিধ্যে সময় কাটাবে। নিজের ব্যাটারীতে চার্জ হবে।

হযরত মারইয়াম (আ.)

দেখুন, আল্লাহর প্রতি হযরত মারইয়াম (আ.)-এর তাওয়াক্কুল কত বেশী ছিল। একটু আগেই আমরা তাঁর কথা আলোচনা করে এসেছি। তিনি এত-এত দিন নির্জনে আল্লাহর সান্নিধ্যে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ঘরে জীবন যাপন করতে লাগলেন এবং হযরত জিবরাইল (আ.) এসেছিল তাঁর কাছে। তাঁকে সন্তান হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এই সংবাদ শুনে তিনি বলেছিলেন–

---

১. সূরা কাসাস, আয়াত- ২১

২. সূরা কাসাস, আয়াত- ২৫

أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

'কীভাবে আমার সন্তান হবে? অথচ আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি?আর আমি তো ব্যভিচারিণীও নই?'[১]

তো দেখুন, প্রথম ধাক্কায় মারইয়ামের দৃষ্টিও গেছে উপায়-উপকরণের দিকে। অথচ উপায়-উপকরণ ছাড়া যে আল্লাহ করতে পারেন সেটা তো তিনি আগে নিজেই দেখেছেন। তাকে আল্লাহ তা'আলা আনসিজনের ফল খাইয়েছেন। তো এটি মানবিক স্বভাব মাত্র। এই অবস্থাটা মন্দ কিছু নয়।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন

আজ আমাদের উচিত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মেহনত করা। রবের দিকে ধাবিত থাকা। কেন আজ আমরা আল্লাহকে পেতে মেহেনতটা করছি না? আল্লাহর জন্য নির্জনে কেন অবস্থান করছি না? প্রতিদিন কিছু সময় আল্লাহর জন্য দিতে হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لِي مَعَ اللهِ وَقْتٌ

'আল্লাহর সাথে থাকার একটি সময় আমার আছে।'

জাহেলরা তো তাদের মতো করেই আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহকে জপে। জাহেলরা সেই ডাক আল্লাহ অনেক পছন্দ করেন।

হযরত মুসা (আ.)-এর যুগে এক জাহেল আল্লাহকে ডাকছিল। আল্লাহকে স্মরণ করছিল। আল্লাহর সম্পর্কে এমন বাক্য বলছিল, যা মুসা (আ.)-এর দৃষ্টিতে আপত্তিকর। কিন্তু তা তো আল্লাহর বড় বেশী পছন্দের। তাই তো মুসা (আ.) যখন তকে বাধা দিলেন, তখন আল্লাহ উল্টো মুসা (আ.–)কে ধমক দিয়ে বললেন, মুসা! তুমি তাকে কেন বাধা দিয়েছ? তার কথা তো আমার কাছে বড় প্রিয় লাগছিল। কবি বড় চমৎকার করে বলেন আল্লাহর সেই কথাটি-

মাসিক আল কাউসার বর্ষ: ২০, সংখ্যা : ০৪

تو برائے وصل کردن امدی

نے برائے فصل کردن امدی

---

১. সূরা মারয়াম, আয়াত- ২০

মুসা! তুমি বান্দাকে আমার সাথে জুড়িয়ে দেওয়ার জন্য এসেছ। সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবার জন্য তো আসনি।

তাই আমরা আমাদের মতো করেই আল্লাহর ধ্যন করব। আল্লাহর ভাবনায় ডুবে থাকব। কবিতার ভাষায় আমাদের অবস্থা যেন এমন হয়ে যায়–

کہ مجھ کو اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے

بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں

ওগো মাওলা! আমার তো নিজের ব্যাপারেও হুঁশ-খেয়াল নেই। দুনিয়ার অন্য কোনো ব্যাপারেও হুঁশ-খেয়াল নেই। তোমার স্মরণে কাটাই সময়। তোমার জামাল ও সৌন্দর্যের ঝরনার নিচে আছি বসে।

تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی

راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں

আমার এই নির্ঘুম জীবনের কথা তুমি আকাশের তারকারাজিকে জিজ্ঞেস করো হে বন্ধু! হে আল্লাহ! রাতের পর রাত জেগে থাকি তো আমি তোমারই স্মরণে।

আমাদের অবস্থাটা যদি এমন করতে পারি, তাহলে দেখবেন আল্লাহ রাবুল ইযযাতের পক্ষ থেকে কেমন অজস্র রহমত আমাদের উপর বর্ষিত হয়। এতেই ইশকে ইলাহীর ভাগিদার হওয়া যাবে। মহবতের শরাব পান করানো হবে। হৃদয়ের ভেতর একটি তৃপ্তি একটি প্রশান্তি আগমন করবে। এই অবস্থাটাই আপনাকে রবের দরবারে পড়ে থাকতে বাধ্য করবে। কবি খুব চমৎকার বলেছেন–

لطف میں تجھ سے کیا کہوں اے زاہد

ہائے کمبخت تونے پی نہیں

হে দুনিয়া বিমুখ! তোমায় আমি শরাবের কোমল ছোঁয়ার কথা কী বলবো? কী বলবো তোমায় তার আমোদিত স্বাদের কথা!?

আরে হতভাগা তুমি তো পান করে দেখোনি! তুমি তো পান করোনি!

উক্ত কবিতাকে বদলে দিয়ে আমি এভাবে বলি–

لطف مے تجھ سے کیا کہوں اے دوست!

پائے بے علم تونے پی ہی نہیں

হে বন্ধু তোমায় আমি শরাবের সেই আমোদিত স্বাদের কথা কী বলবো?

হায়রে অজ্ঞ! হায়রে বে ইলম! তুমি তো পান করে দেখোনি! তুমি তো পান করোনি!!!

তো কবুও শরাবের স্বাদ যদি পেয়ে যেতে তাহলেই বুঝতে, আসলে বিষয়টা কী!!!

হৃদয়কে এটি আন্দোলিত করে। যেন খোদ আল্লাহ তার ভেতরে এলার্ম ফিট করে দিয়েছেন। ফলে সে নিজেই জেগে যায়।

দুই নম্বর আল্লাহপ্রেমিক

আজকের দুনিয়ায় দুই নম্বর ধোঁকাবাজ আল্লাহপ্রেমিকের অভাব নেই। তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, মামুলাত ঠিকমতো আদায় হচ্ছে তো? তারা বলে, সময় পাই না। আশ্চর্যের কথা! প্রেমিক যদি প্রেমিকাকে স্মরণে রাখতে সময়ই না পায়, তাহলে কিসের প্রেমিক হলো সে? কত-কত মুরীদ আছে আমল ঠিকমতো করে না। আমার কাছে এসে বলে, হুজুর! বুঝতে পারি না, আমার মধ্যে তো কোনো প্রভাব আসছে না। কত বছর ধরে আপনার হাতে বাই'আত হয়ে আছি। আরে! তুমি তো আসল কাজই করছ না। তুমি আমল করো; তারপর দেখো কী হয়।

আল্লাহর ভয় : আল্লাহর সাথে সাক্ষাত

আমি خشية এর কথা বলেছি। খাশইয়াত বা আল্লাহর ভয় তো দিলের এমন এক অবস্থার নাম, যা বান্দাকে আমল করতে বাধ্য করে। যার কারণে মানুষ সর্বদাই এই অনুভুতি অনুভব করে যে, কিয়ামতের দিন আমাকে আমার রবে কারীমের সামনে দাঁড়াতে হবে। আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। তাই তো কুরআনে বলা হয়েছে, এই নামায ভারী মনে হবে তাদের নিকট, যাদের মাঝে আমার خشية তথা ভয় থাকে। আর خشية কাদের দিলে আছে? ইরশাদ হচ্ছে–

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ

'যারা বিশ্বাস করে, আমাকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে হবে এবং আমাকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'[১] তাদের মাঝেই রয়েছে আল্লাহর ভয়।'

---

১. সূরা বাকারাহ, আয়াত- ৪৬

তাদের মাঝেই রয়েছে আল্লাহর ভালোবাসা, আল্লাহর মহবত। ফলে তারা তাদের ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে।

পূর্বসূরীর মাঝে আল্লাহর ভয়

আসুন, জেনে নেই আমাদের পূর্বসূরীর মাঝে খাসইয়াতে ইলাহী তথা আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা কেমন ছিল?

হযরত মাওলানা হুসাইন আলী ও আল্লাহর ভয়

হযরত মাওলানা হুসাইন আলী (রহ.) একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি হযরত খাজা নিয়াজুদ্দীন থেকে খেলাফত পেয়েছেন। এমনকি তাঁর শাগরেদও ছিলেন খাজা নিয়াজুদ্দীন। ছাত্রের কাছে বাই'আত হয়েছেন ওস্তাদ! বাই'আত হয়েছেন নিজের ইসলাহের জন্য।

দেখুন, বড় ব্যক্তি ফয়েজ লাভের জন্য বাই'আত হয়েছেন ছোট ব্যক্তির কাছে। আমাদের পূর্বসূরীদের এমন কর্মের মহিমান্বিত দৃষ্টান্ত কোথায় পাওয়া যাবে আর? এই বুযুর্গের অবস্থা শেষ বয়সে এমন হয়েছিল যে, তাঁর সাথে কেউ দেখা করতে এলে সালাম-মোসাফাহা ও কুশল বিনিময়ের পর বলতেন, দেখো, আল্লাহর সাথে মোলাকাতের সময় আমার হয়ে এসেছে। তুমিও প্রস্তুতি নাও। আমিও প্রস্তুতি নেই। এভাবে নসীহত করে বিদায় দিয়ে দিতেন। এভাবে সবার সাথেই বলতেন। কয়েক মাস এভাবে করলেন।

তো দেখুন, তার দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? তার বাচনভঙ্গি কী ছিল? আল্লাহর সাথে মোলাকাতের সময় আমার হয়ে এসেছে। মৃত্যুর জন্য এভাবে তৈরি নেওয়া এবং এভাবে মৃত্যুর কথা ব্যক্ত করা কত উঁচু দরজার কথা।

আমরা তো মনে করি, আমাদের ইন্তেকাল হবে। দুনিয়া থেকে আমরা বিদায় হয়ে যাব। আমাদের মৃত্যু হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরী আল্লাহওয়ালাগণ এমন ছিলেন যে, তাঁরা বলতেন, আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করব। মৃত্যুকে তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে যাওয়া বলতেন। তারা বলতেন, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় আমার হয়ে এসেছে। কত সুন্দর কথা।

আখেরাতের অলংকারঃ আখেরাতের পাথেয়

আমাদের দেশের সামাজিক অভ্যাস ও প্রথাগত নীতি এই হয়ে গেছে যে একজন মা যখন কন্যা সন্তান জন্মদেয় তখন সাথে সাথেই তার টেনশন শুরু

হয়ে যায়। এই মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে! এরজন্য অলংকার তৈরী করতে হবে। কারণ অলংকার ছাড়া স্বামীর কাছে গেলে ওতো কোনো সম্মান পাবে না। হে মা! আপনার কন্যা এখনো খেলনা নিয়ে খেলাকরে আর আপনি তার জন্য অলংকার তৈরীতে দিশেহারা। অথচ আপনি নিজের চিন্তা করছেন না! আপনার চুল শাদা হয়ে গেছে। পা কবরে চলে গেছে! আলকুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ.

আমার সামনে তোমরা আগত হবে। যেমন তোমাদেরকে প্রথম বারে সৃষ্টি করেছি! তো আমাদের অসীম যে সফর তার পাথেয় তার অলংকার কি আমরা সংগ্রহ করেছি?

আমাদের সামানা নেকী! তাই নেকী না থাকলে কিয়ামতের দিন নিঃস্ব রিক্তহস্তে দাড়াতে হবে আল্লাহর সামনে সেদিন আফসোস করে বলতে হবে–

يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا يٰوَيْلَتٰى لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا

হায়! আমি যদি নবীর পথেই চলতাম! হায় আমি যদি ওদেরকে বন্ধু না বানাতাম যারা আমাকে বিপথে নিয়েছে! তাহলে কতইনা ভালোহতো! আখেরাতের সামানা নিয়ে না এলে কিয়ামতের দিন এভাবে আফসোস করতে হবে। এর জন্য বুযুর্গদের সোহবতে থাকতে হবে। বুজুর্গদের সোহবত দ্বারা ইলম ও আদব শিক্ষা যায়। হৃদয় থেকে হৃদয় আলোকিত হয়। তবেই মানুষের কাছে আল্লাহর তরে ইযযাত করা সহজ হয়ে যায়।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর খোদাভীতি

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.), যার ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তো সকলের ইহসানের বদলা দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আবুবকরের ইহসানের বদলা দিয়ে দিতে পারব না। আল্লাহ তার বদলা দিবেন। হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর জীবন এমন সুন্দর ও পবিত্র ছিল। তার ব্যাপারে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি মাঝে-মাঝে এভাবে দু'আ করতেন যে, হায়! আমি যদি কোনো মুমিন বান্দার শরীরের পশম হতাম! হায় আমাকে আমার মা যদি জন্মই না দিতেন! হায় আমি যদি যমিনের ঘাস বা তৃণলতা হতাম! তো তিনি এমন কেন বলতেন? কারণ, তিনি ভাবতেন, এতে তো আমি আর কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দঁড়াতে হতো না। কিভাবে দাঁড়াব আমি আল্লাহর সামনে? কীভাবে হিসাব দিব জীবনের প্রতিটি কর্মের?

হযরত উমর (রাযি.)-এর মাঝে খোদাভীতি

হযরত উমর (রাযি.)-এর অন্তরে আল্লাহর ভয় এমন ছিল যে, হযরত হুযাইফা (রাযি.)কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, আপনার কাছে তো মুনাফিকদের নামের লিষ্ট আছে। আপনাকে তো নবীজি তা জানিয়ে দিয়েছেন; বলুন তো ভাই! আমার নামও কি মুনাফিকদের তালিকায় আছে? ওফাতের পূর্বে হযরত উমর (রাযি.) কী বললেন? আল্লাহু আকবার! ওয়াতের কাছাকাছি সময় এক সাহাবীকে তিনি ডাকলেন। তাকে ওসিয়ত করলেন, যখন আমার রূহ বের হয়ে যাবে, তখন আমাকে দ্রুত দাফন করে দিবে। সাহাবী বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! দ্রুত তো করবই; কিন্তু এতটা গুরুত্ব কেন দিচ্ছেন? তখন হযরত উমর (রাযি.) বললেন, কারণ, যদি আমার সাথে আল্লাহর মুআমালা উত্তম হওয়ার থাকে, তাহলে তোমরা দ্রুত আমাকে উত্তম বিষয়ের দিকে দিয়ে দাও। আর যদি আমার ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা খারাপ হয়, তাহলে তো আমি তোমাদের উপর বোঝা। তোমরা এই পাপীর বোঝা দুনিয়া থেকে দ্রুত সরিয়ে ফেলো।

একেই বলে আল্লাহর ভয়। একেই বলে খোদাভীতি। সব সময় শঙ্কিত থাকতেন। সর্বদা ভয়ার্ত থাকতেন। ভাবতেন, জানা তো নেই আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলে কী হতে কী হয়ে যায়! শঙ্কিত থাকতেন এই ভেবে যে, হায় কিয়ামতের দিন আমার কী হবে?

মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর খোদাভীতি

মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীকে তাঁর মৃত্যুর পর কেউ একজন স্বপ্নে দেখল। লোকটি বলল, হযরত! আপনার সাথে কী মুআমালা হয়েছে? তিনি বললেন, আমাকে আল্লাহর সমীপে পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ আমাকে বললেন, আহমাদ লাহোরী! আমাকে তুমি খুব ভয় করতে এবং সর্বদা আমার ভয়ে কাঁদতে থাকতে। একথাগুলো বলার সময় আমি তো আরো ভয় পেয়ে গেলাম। হায়! আল্লাহ কি তাহলে আমার উপর নারাজ? আল্লাহ বললেন, এখনো তুমি ভয় পাচ্ছ? আমি বললাম, হে আল্লাহ! হ্যাঁ আমি আপনার শান ও বুলন্দ মাকামকে এখনো ভয় পাই। আল্লাহ তা'আলা বললেন, এখন ভয়ের সময় শেষ। আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি, তুমি যে কবরস্তানে দাফন আছ, তোমার বরকতে সেই কবরস্তানের সকলকে আমি মাফ করে দিলাম। তো এমনই হয়ে থাকে আল্লাহকে ভয়কারীদের মাকাম। আল্লাহর দরবারে ভয়ে যারা শঙ্কিত ছিল, দুনিয়ায় তাদের অনেক অনেক সম্মান। আল্লাহ তাদের অনেক ভালোবাসেন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ

'যে আল্লাহর মাকামকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত।'[১]

একজন মুহাদ্দিসের খোদাভীতি

এক মুহাদ্দিছ হাদীছের দরস দেওয়া অবস্থায় বিবর্ণ হয়ে গেলেন। তাঁর চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে গেল। ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল চেহারায়। দরস শেষ হলে ছাত্ররা তাঁকে বলল, হযরত আজ আপনার অবস্থা এমন কেন হলো? হযরত বললেন, দেখো! আমার উপর তো ঝড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমি ভয়ে ছিলাম, নাজানি আমার উপর পাথর বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। আগের যুগের উম্মতের উপর তো পাথর বর্ষণ হতো তাদের গুনাহের শাস্তিস্বরূপ।

চিন্তার বিষয়

আজ আমরা যদি ইল্‌ম শিখে আমল না করি, আমাদের ইল্‌মকে বাস্ত বায়ন না করি, তাহলে তো আল্লাহ তাঁর দ্বীনের কাজ অন্যের দ্বারা নিয়েই নিবেন। দ্বীনের কাজ তো বসে থাকবে না। তবে ক্ষতি আমাদের হয়ে যাবে। আমরা অপদস্থ হয়ে যাব। কারণ, আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তার দ্বারা দ্বীনের কাজ করান। ইরশাদ হচ্ছে–

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

তোমরা যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর এবং সরে পড়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের কাজের দায়িত্ব পরিবর্তন করে অন্যকে দিয়ে দেবেন। তারা তোমাদের মতো হবে না।[২] তারা বরং আল্লাহর ফরমাবরদার ও আনুগত্যকারী হয়ে হবে। তো আমাদের উচিত আমরা এমন যেন না হই যে, কিয়ামতের দিন আমাদের জিজ্ঞেস করা হলো, কী করে এসেছ? আর আমরা সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। এমন যেন না হয়, আমরা আলেম হয়েছি ঠিক; কিন্তু জীবন যাপন করেছি জালেমের মতো। এমন যেন না হয় যে, হালাল-হারামও মেনে চলতে পারলাম না। রবের ইবাদত করার পরিবর্তে নিজের নফসের অনুসরণ করে নিয়েছি। এটা কেমন করে হতে পারে? তাই ইল্‌ম

---

১. সূরা রাহমান, আয়াত- ৪৬

২. সূরা মুহাম্মদ, আয়াত- ৩৮

যখন শিখব, তার উপর আমলও করব। ইল্‌মের রং আনতে চেষ্টা করব। ইল্‌মের সৌন্দর্য আনতে চেষ্টা করব। ইল্‌মের উপর আমল করলেই তো মানুষের মাঝে খুশু-খুযু পয়দা হয়। মানুষের মাঝে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। এটি আল্লাহ থেকে চেয়ে নেওয়ার জিনিস। তাই আল্লাহর কাছে খুব দু'আও করতে হবে এ বিষয়ে।

কুরআনের আয়নায় আমাদের ছবি

আসুন; কুরআন নামক আয়নার সামনে দাড়ান। দেখে নিন নিজের ছবি নিজে। ইরশাদ হচ্ছে–

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا

আল্লাহ একজন গোলাম বান্দার দৃষ্টান্ত পেশ করছেন।[১]

لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ

যে কোনো কিছু করতে সক্ষম ছিল না।[২]

وَهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰهُ

যে তার মালিকের উপর বোঝা হয়ে ছিল।[৩]

اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ

যেদিকেই যেত সে কোনো উত্তম সংবাদ বয়ে আনতে পারত না।[৪]

كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا

ওই নারীর মতো, যে সারাদিন তার চর্কিতে সূতা বাঁধল এবং শেষে এসে পুরো সুতোগুলোকে ছিড়ে শেষ করে দিল।[৫]

তো দেখুন, আমাদের ছবি কত সুন্দর করে বর্ণিত। কুরআনে আমাদের অবস্থা এই উপমা ও উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা তো একেবারে দুর্বল ও অক্ষম ছিলাম। ধীরে-ধীরে বড় হলাম। ৭/৮ বছর তো হেলায়-খেলায়, চাটাইয়ে শুয়ে-বসে কেটে গেল। তারপর বড় হলাম। তো

---

১. সূরা নাহল, আয়াত- ৭৫
২. সূরা নাহল, আয়াত- ৭৫
৩. সূরা নাহল, আয়াত- ৭৬
৪. সূরা নাহল, আয়াত- ৭৬
৫. সূরা নাহল, আয়াত- ৯২

দুনিয়ার কাজে এমনভাবে ডুবে গেলাম যে, দ্বীনের কল্যাণে, নিজের কল্যাণে আখেরাতের তরে কিছুই করতে পরলাম না। এই তো আজ আমাদের অবস্থা। শেষ পর্যায়ে ধ্বংস করে দিলাম তো নিজেকেই নিজে। এত ইল্‌ম শিখলাম। এত জ্ঞান অর্জন করলাম। এত কিছু করলাম অথচ শেষ পরিণাম যদি এই হয় যে, কিয়ামতের দিন কিছুই কাজে এল না, কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে ধরা পড়ে গেলাম। তাহলে তো নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনলাম সুতা তৈরীকারী নারীর মতো।

তাই শুধু শব্দ, বর্ণ আর বিষয় বর্ণনার নাম ইল্‌ম না। ইল্‌ম অন্য জিনিস। মহবতে ইলাহী ও খাওফে খোদাই ইল্‌মের মূল বিষয়। আর ইল্‌মের সাথে যখন মহবতে ইলাহী যুক্ত হবে, তখনই আমল অস্তিত্বে আসবে। তারপরই মানুষটির জীবনে আল্লাহ তা'আলার خشية পয়দা হবে। তারপরই বান্দার মাঝে খাওফ বিরাজ করতে থাকবে এবং সে আমল করতে থাকবে। এক-একটি নামায তখন সে এমনভাবে পড়বে যে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা ওই বান্দার পেছনের সব গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তাকে আল্লাহ কবুল করে নেবেন। আল্লাহ তখন ওই বান্দাকে দুনিয়াতেও কবুলিয়াত দান করবেন, আখেরাতেও কবুলিয়াত দান করবেন।

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন। সর্বদাই আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। সব সময় আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতে থাকবেন। ইল্‌মের কদর করুন। যে ছেঁড়া চাটাইয়ে বসে এত বছর পড়াশোনা করেছেন, সেই চাটাইয়ের সম্মান রক্ষা করুন।

পূর্বসূরীদের তাওয়াক্কুল

আমাদের নিকট অতীতের বুযুর্গ উলামায়ে কেরাম তো মালসম্পদ ভোগের পেছনে পড়েননি। তখন দেশে বৃটিশরা শানস করছিল। উলামায়ে কেরামের মাল-সম্পদ তারা লুণ্ঠন করে নিয়েছিল। ঈমান বিক্রির তরে সেই মাল তারা উলামায়ে কেরামের পায়ে এনে রেখে দিতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা দরিদ্রতাকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তারা ঈমান বিক্রি করেননি। দুনিয়াদাররা তাদের সামনে সম্পদ পেশ করত। উলামায়ে কেরাম তা প্রত্যখ্যান করে দিতেন। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে নিজে যা রোজগার করতেন, তা দিয়ে সংসার চালাতেন। আল্লাহই তাদের খাওয়াতেন, পরাতেন।

ইল্‌মের দাবি

ইল্‌মের দাবি এই যে, আমরা আল্লাহর উপর পাক্কা ইয়াকীন স্থাপন করব। আল্লাহর কাছেই সকল জিনিসের খাযানা। ইরশাদ হচ্ছে–

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

'এবং এমন কোনো প্রয়োজনীয় বস্তু নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি তা অবতীর্ণ করি সুনির্দিষ্ট পরিমাণে।'[১]

তাই আমি মুহতারাম উলামায়ে কেরামের সমীপে নিবেদন পেশ করছি, ইমামতকে ধংসের কারণ বানাবেন না। যদি ইমামতকে ইমামতই বানান, তাহলে আল্লাহ দুনিয়াতেও আপনাকে ইমাম বানিয়ে রাখবেন। যদি খুশু ও আমল থাকে, তাহলে দুনিয়াতে সে আপনার পায়ে পড়বে। আপনার হাতে চুমু দিবে। ইল্‌মের কারণে আল্লাহ আপনাকে সম্মান দান করবেন। কিন্তু যদি নিজেই আমল না করেন, তাহলে এত অভিযোগ করেন কেন যে, হায়! ইল্‌ম শিক্ষা করলাম; আমাদের তো পেরেশানির শেষ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে তার রঙে রঙিন হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমাদের ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন।

আল্লাহর বান্দাদের খুঁজে ফিরি

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমি আপনাদের দুয়ারে-দুয়ারে ফিরছি, ঘুরছি। কারণ, আল্লাহ রাবুল ইযযাত তো আমার মাথার উপর একটি বোঝা রেখে দিয়েছেন। আমি অধম এর উপযুক্ত ছিলাম না। এখনো এর উপযুক্ত আমি নই। কিন্তু হযরতের এজযাতে কাজ শুরু করেছি। হযরত জিজ্ঞেস করেছিলেন; কত লোক আমাদের সিলসিলার অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। আমি তো বড় টেনশনে পড়ে গিয়েছিলাম। হুযুর বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, কেন? কেন হয়নি? কারণ, তিনি জানেন, বোঝা রেখে দিয়েছেন। এখন এই নেয়ামতকে কোথায়-কোথায় ব্যবহার করছে? ডাকপিয়নের মতো দূর-দূরান্তে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। এটিও আল্লাহ রাবুল ইযযাতের রহমত যে, এই নিয়ম দূর-দূরান্ত থেকেও এক সীনা থেকে অন্য সীনায় স্থানান্তর হয়। চায় তো প্রত্যেকে যে, আমি সাহেবে নেসবত হয়ে যেতে পারি; কিন্তু এত সহজ তো নয় বিষয়টি। তাই অনেকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু নাপাক দিলে নূর সহজে প্রবেশ করে না।

---

১. সূরা হিজর, আয়াত- ২১

حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا

بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا

আমার হাল-হাকিকত বলতে পারি এমন তো কাউকে খুঁজে পাই না। মূর্তির বান্দা তো বহু আছে; কিন্তু আল্লাহর বান্দা তো আমি পাই না।

তো কোথায় আছে এমন মানুষ, যার দিলে খোদার ভয় আছে, যাদের আমল সুন্নাত মোতাবেক, যারা নির্জনে বসে জপে খোদার নাম। রাতের গভীরে যারা সিজদায় নত করে মস্তক। এমন বন্দা যদি পাওয়া যায়, তাহলে নেসবত তো সে পেয়েই যাবে। এমন বান্দা হয়ে দেখুন, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কেমন চমকিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওই নেসবতের নূর দান করুন। কিয়ামতের দিন আমাদের বুযুর্গ ও মাশায়েখে কিরামের সামনে যেন লজ্জিত না হতে হয়। আমাদের জন্য যেন কিয়ামতের দিন খায়রের ফয়সালা হয়ে যায়। নবীজির সামনেও যেন আল্লাহ আমাদের লজ্জিত না করেন। আল্লাহ আমাদের কবুল করে নেন। আমীন।

واٰخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین

'আজ আমাদের থেকে মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে গেছে। আমরা কেমন যেন একপ্রকার যান্ত্রিক মানবে পরিণত হয়েছি। মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকারগুলোই আজ আমরা মানুষকে প্রদান করছি না। মালিক শ্রমিকের অধিকার আদায় করছে না। স্বামী স্ত্রীর অধিকার আদায় করছে না। ছেলেমেয়ে মা-বাবার অধিকার আদায় করছে না। এভাবে একটা অগ্নিগর্ভ পরিবেশে আমরা আজ জীবন যাপন করছি। আশ্চর্য! আমরা কি পরকালের কথাটি একটিবারও স্মরণ করতে পারি না? একটিবারও কি আমরা ভাবতে পারি না? একদিন দরবারে এলাহীতে আমাদের হাজির হতে হবে। আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে আমাদের।

আজ আমরা অন্যের দোষ তালাশে ব্যস্ত থাকি! অন্যকে মাফ করে দেওয়ার ক্ষমতা আজ আমাদের মধ্য থেকে হারিয়ে গেছে। কেউ উপকার করলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করার বিধানও যেন আমরা ভুলে গেছি। পরোপকারের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানোর এক সুমহান শিক্ষাও তো ইসলামে আছে; তাও আমরা ভুলে গেছি! আর দাবি করছি, আমরা মুসলমান!'

হুকুকুল ইবাদ : মানুষের অধিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ. سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ . وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

ন্যায়পরায়ণতা ও মিথ্যাচার

দীন ইসলামে পূর্ণাঙ্গ জীবনের সকল বিধিবিধান বিদ্যমান রয়েছে। তাই দানের উপর আমলকারীদের জিন্দেগী একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির আওতায় পরিচালিত হয়। বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে তারা পড়ে না। বরং মিথ্যাচার ও ন্যায়নিষ্ঠতা বিদ্যমান থাকে তাদের প্রতিটি কর্মে। আর এই মিথ্যাচার ও ন্যায়নিষ্ঠতায় আল্লাহ তা'আলা বরকত রেখেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا

মধ্যপন্থা-ই সর্বোত্তম।

হক বা অধিকার দুই প্রকার

মানুষের উপর দুধরনের যিম্মাদারী আরোপিত হয়। এক. আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করা। দুই. আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের হক আদায় করা। যে ব্যক্তি উভয় প্রকার হক আদায় করবে, সে হবে অন্যদের জন্য আদর্শ। আল্লাহ রাবুল ইযযাতের প্রিয়তম হাবীব ও মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উভয় প্রকার হক ও অধিকার আদায় করে দেখিয়েছেন আপন যিন্দেগীতে। তাই তাঁর মসজিদের জীবন দেখুন, তার ঘরের পারিবারিক জীবন দেখুন। পরিপূর্ণ হক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করেছেন।

সবাই আজ রুগী

আজকের এই যুগে কিছু মানুষ ইবাদতের দিকে অনেক মনোযোগ দেয়। অথচ তারা খেয়াল করে না যে, তার দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়। আমাদের আমলের দ্বারাও মানুষের কষ্ট হয়। তারা বোঝেই না তাদের দ্বারা যে

মুসলমান ভাইদের কষ্ট হচ্ছে, অন্যকে অপমানিত করা হচ্ছে। কত মানুষ আছে; তারা লম্বা লম্বা কথা বলে। ভালো আচরণ করার জন্য নসীহত করে বেড়ায়। বলে বেড়ায়, এমন ভালো করা চাই, এমন ভালো আচরণ করা উচিত, এমন আখলাক হওয়া উচিত। মানুষকে এভাবে লম্বা-লম্বা নসীহত করে; কিন্তু নিজে করে খারাপ কাজ। নিজে মানুষকে কষ্ট দেয়, অপমানিত ও অপদস্থ করে। নিজে নামাজ পড়ার সুযোগ পায় না। নিজে তিলাওয়াত করারও সুযোগ পায় না। অন্যকে বলে বেড়ায় এমন করতে হবে, এমন করে চলতে হবে; অথচ নিজে নিয়মবহির্ভূত কাজ করে বেড়ায়। তো সে নিজেই রুগী; আরেকজনের রোগ দূর করবে সে কীভাবে?

এখানে একজন তো হুকুল্লাহ রক্ষা করেনি। আর আরেকজন হুকুকুল ইবাদ রক্ষা করেনি।

দেখুন, আরেকজনকে যখন আপনি বলবেন, এমন করে চলো, এই নিয়মে চলো, এই নিয়ম মানতে হবে, তখন তুমি নিজের দিকেই তাকাও, নিজে চিন্তা করো, তোমার তৈরী এ নিয়ম কি তুমি মানতে পারবে? তোমার অধীনদের তুমি ধমক দাও, তাদের কষ্ট দাও, তাদের সাথে দুর্ব্যবহার কর। কিন্তু বলো, তুমি কি তোমার দিকে একটিবার তাকিয়ে দেখেছ? চিন্তা করো তো তোমাকে যদি এভাবে ধমক দেওয়া হয়, তাহলে তোমার কাছে কেমন লাগবে? তুমি কি পারবে সহ্য করতে?

কিয়ামতের দিন আল্লাহর ঘোষণা

আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাযি.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেন, আমি ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। কোনো জান্নাতী জান্নাতে এবং কোনো দোযখী দোযখে তখন পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ কেউ কোনো বিষয়ের হকদারকে তার হক পরিশোধ না করবে।

বনী ইসরাইলকে সতর্ক করা

বনী ইসলাইলের মধ্যে দীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ছিল। এমনকি লোকেরা তাদের মৃতদের ও শিশুদের খেয়ে ফেলেছিল। তারা পাহাড়ে আরোহণ করে চিৎকার করে-করে দু'আ করত; কিন্তু তাদের দু'আ কবুল হতো না। শেষমেষ হযরত মুসা (আ.)-এর উপর ওহী নাযিল হলো, লোকদের বলে দিন, তারা যদি ইবাদত করতে-করতে শুকনো কাঠের মতোও হয়ে যায়, তবুও আমি তাদের দু'আ কবুল করব না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা লোকদের হক আদায় না করে।

দুজন ব্যক্তির মতো বিরোধ

সমাজে থাকতে হলে লোকদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যায়। বাবুর্চি যখন প্লেট ও বর্তন ধৌত করে, তখন একটি আরেকটির সাথে আঘাত খায়। ড্রাইভার যদি বেশ দক্ষও হয় তবু পরস্পরের গাড়ি ধাক্কা খেয়েই তো একসিডেন্ট ঘটে। তো দক্ষ ড্রাইভার থেকে এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারলে দুজন মানুষের মাঝে মতোবিরোধ হয়ে যাওয়া কঠিন কিছুই নয়। কিন্তু এই বিরোধের মাঝেও একে অন্যকে ক্ষমা করার গুণ থাকতে হবে। পরস্পরকে ছাড় দিয়ে চলতে হবে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে মানুষ দুনিয়ায় অন্যের দোষ দ্রুত মাফ করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তির ভুলগুলো মাফ করে দিবেন।

মর্মার্থ

দ্রুত মাফ করে দেওয়ার অর্থ হলো, মাফ তো করবেই; পুরো বিষয়টাকে অন্তর থেকেই মুছে ফেলবে। ঘটনা ঘটার পর তার রেশ রেখে দেওয়া যাবে না। অন্তরে সামান্য দাগও রাখা যাবে না। আর এই দাগ থেকে গেলে সেটা আবার নতুন ফেতনা জন্ম দিবে। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ। কাজেই পরিচ্ছন্ন হৃদয় অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ হৃদয়ে কারো প্রতি খারাপ ধারণা, সামান্য দাগও রাখা যাবে না। কাউকে মনে-মনে গালি তো দেওয়াই যাবে না। বদদু'আর কোনো শব্দও উচ্চারণ করা যাবে না। তাইলেই আপনি মুমিন হতে পারবেন। যদি কারো দ্বারা আপনি কষ্ট পেয়েও থাকেন, তাহলে তাকে অন্তর থেকেই মাফ করে দিন। এটি আমাদের নবীজির শিক্ষা। তবে মনে রাখবেন, আপনাকে যে, কষ্ট দিয়েছে, এই বদ-আমলীর কারণে তার শাস্তি হবেই। মুমিনকে যে ব্যক্তি কষ্ট দেয়, তার শাস্তি কী হবে তা এভাবে কল্পনা করুন। কোনো একবার আদরের সন্তানকে অন্য কেউ যদি বিনা অপরাধে মারে, তাহলে বাবা এর শাস্তির ব্যবস্থা করে। আরে! আল্লাহ তো মুমিন বান্দার জন্য বাবা থেকেও বহুগুণ বেশি কাছে। তাই আপনি যদি মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকেন, তাহলে সতর্ক হোন।

মানুষের দোষ তালাশ করবেন না

দেখুন, আপনারও দোষ কম নেই। মানুষমাত্রই তার দোষ গুণ থাকবেই। ফেরেশতার মতো মানুষ আপনি কোথায় পাবেন। আপনি আরেকজনের দোষ বের করেন আর বলেন, এটা কেন করলে? ওটা কেন করলে? আপনার

অধীনকে আপনি ধমকের পর ধমক দেন। মনে রাখবেন, আপনাকেও আল্লাহ্ এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন করবেন। তাই নিজের দোষ আগে দেখুন। অন্যকে ছাড় দিয়ে চলুন। অধীনকে মাফ করতে শিখুন। মাফ করা নবীদের অভ্যাস, আওলিয়া কেরামের অভ্যাস। বুযুর্গদের অভ্যাস।

এক আশেকে রাসূলের ঘটনা

একবুযুর্গ হজের সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে এক চোর তার হাতের ব্যাগ নিয়ে দৌড় দিল। কিছুদূর যাওয়ার পর চোর অন্ধ হয়ে গেল। চোর লোকদের কাছে কান্নাকাটি করে ওই বুযুর্গকে বহু কষ্টে খুঁজে বের করল। অনুতপ্ত হলো বুযুর্গের কাছে। বুযুর্গ বললেন, আমি তো তোমাকে আগেই মাফ করে দিয়েছি। চোর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, হযরত! এতে কী রহস্য? বুযুর্গ বললেন, দেখো হাদীছে এসেছে, নবীজি বলেন, কিয়ামতের দিন আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মিযানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সর্বশেষ উম্মতের ব্যাপারে ফয়সালা না হবে। হাদীসটি আমার মনে পড়ে গেছে। ভাবলাম, আমি যদি এই চোরকে মাফ না করি, তাহলে কিয়ামতের দিন চোর আর আমার উভয়েরই কাঠগাড়ায় দাঁড়াতে হবে। ফয়সালা হতে-হতে কত সময় লাগে তা কে জানে? এতে তো খামোখাই আমি জান্নাতের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তাই এখানেই আমি আমার সমস্যাকে খতম করে যেতে চাই।

প্রত্যেক কাজে শুকরিয়া আদায় করা

কেউ যদি আমাদের উপকার করে, তবে তার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আজ আমাদের মুসলমানদের এত অধঃপতন হয়েছে যে, আমরা উপকারকারীর শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না। ইরশাদ হচ্ছে–

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ

'যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না।'

আমাদেরকে তো আমাদের নবীজি এমন শিক্ষা প্রদান করে গেছেন। অথচ আমরা আজ এই শিক্ষার দিকে ভ্রূক্ষেপই করছি না। তো হুকুকুল ইবাদের দিকেও পূর্ণ খেয়াল রাখতে হবে, যেন মানুষের জীবন একটি নিয়মতান্ত্রিক ও পরিমিত জীবন হয়ে যায়।

রাগ দমন

যদি কারো দ্বারা কখনও কষ্ট হয়ে যায়, তুমি কষ্ট পেয়ে যাও এবং এমন হয় যে, বাড়াবাড়িটা ওই লোকের হয়ে থাকে, তাহলেও তাকে তুমি মাফ করে দাও। এর বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দেবেন। যদি কোনো কথার উপর কখনও রাগ ওঠে যায়, তাহলে ওই রাগের ঢোক গিলে ফেলবে। এই ঢোক অত্যন্ত তিক্ত হবে ঠিক; তবে এর ফল হবে বড়ই সুমিষ্ট।

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যে বান্দা তার রাগের ঢোক গিলে ফেলবে যখন সে রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম ছিল, তার কাছে এমনসব উপায়-উপকরণ বিদ্যমান ছিল। ইচ্ছে করলে সে সেই রাগ ঝাড়তে, এর বদলা নিতে পারত। কিন্তু সে আল্লাহর দিকে তাকিয়ে ওই রাগের ঢোক গিলে ফেলেছে। তো কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেকটি ঢোকের বিনিময়ে ওই বান্দাকে আপন দিদার দান করবেন। সে আল্লাহর দূরে বিচ্ছুরণ দেখতে পাবে।

তো এখন চিন্তা করুন, কোনটি উত্তম। দুনিয়ায় রাগের বহিঃপ্রকাশ উত্তম, নাকি আখেরাতে রবে কারীমের দিদার উত্তম।

আকলের যাকাত

এসব কথা যখন মুমিন সামনে রাখে, তখন তার মাঝে সহনশীলতা, বিচক্ষণতা ও শিষ্টাচার পয়দা হবে। হেলেম বলা হয়, অন্য ব্যক্তি না জেনে কোনো কথা বলেই ফেলতে পারে; তবুও তাকে মাফ করে দেওয়া।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) বলেছেন, অজ্ঞদের অজ্ঞতাপূর্ণ কথাকে সহ্য করে নেওয়াই আকলের যাকাত। শিক্ষিত ও জ্ঞানী-গুণীদের উচিত ছোট-ছোট কথায় অন্তরকে বিষাক্ত না করা। নিজের ভেতর রোগকে পালন করবে না। এসব ছোট-ছোট কথার কারণে অন্যের ভুলকে মাফ করে দেওয়া চাই। কষ্টকে সহ্য করে নেওয়া চাই। এগুলো মানুষের আকলের যাকাত। তো আল্লাহ আপনাকে জ্ঞানী ও আকলমন্দ বানালে আপনি এ আকলের যাকাতও আদায় করুন। কিন্তু আজকের মানুষ নিজে চায়, আমার বড়-বড় দোষও কেউ না ধরুক, আমার অন্যায়গুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুক। কিন্তু নিজে অন্যের ছোট-ছোট দোষগুলোও মাফ করতে প্রস্তুত নয়। এটা কত বড় খারাপ কথা?

মানুষ দুপ্রকার

মানুষ দুপ্রকার হয়ে থাকে। কিছু মানুষ মৌমাছির মতো। কিছু মানুষ সাধারণ মাছির মতো। মৌমাছি তো মধু তৈরি করে। কিন্তু মাছিগুলো নাপাক

ও পচা বস্তুর উপর বসে। উভয় মাছির মধ্যে বড় একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। সাধারণ মাছির মাথায় নাপাকের দুর্গন্ধ থাকে। সে সব সময় পচা, গলা, দুর্গন্ধ ও খারাপ জিনিস খুঁজে বেড়ায়। যেখানেই দুর্গন্ধ জিনিস পায়, সেখানেই বসে যায়। শরীরের জখমের মধ্যে, পুঁজের মধ্যে বসে। তাই এই গান্ধা মাছির মুখের রসও নাপাক, দুর্গন্ধ। পচা-গলা জিনিসের চারপাশে এই মাছি ভনভন করে।

আর মৌমাছির মাথা সুগন্ধ। তার মেজাজ উন্নত। সে সুগন্ধ পুষ্পবৃক্ষে ঘুরে বেড়ায়। পুষ্পের সুরভিত প্রাঙ্গণই তার ঠিকানা। ফলে তার মুখের রস আর অর্জিত জুস সুমিষ্ট ও সুঘ্রাণযুক্ত হয়ে থাকে। তার অর্জিত রস হয়ে থাকে উপকারী। তেমনি দুধরনের মানুষ বিদ্যমান আমাদের চারপাশে। কিছু লোক সাধারণ মাছির মতো। পচা-গলা দুর্গন্ধ বিষয়, খারাপ বিষয়, ঝগড়ার বিষয় সে খুঁজে ফিরে সারা দিন। ফলে তার দ্বারা শুধু মানুষ কষ্ট পায়। তার দ্বারা মানুষ অপমানিতও লাঞ্ছিত হয়। তার দ্বারা অন্যের ইযযত নষ্ট হয়। আরেকদল মানুষ মৌমাছির মতো। সে সর্বদা উন্নত বিষয়, ভালো কথা, সুন্দর বিষয়, কাঙ্ক্ষিত ও উত্তম বিষয়ের সন্ধানে বিভোর থাকে সব সময়। ফলে অসঙ্গত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও পচা বিষয় থেকে দূরে থাকে। তাই তার দ্বারা মানুষ সুখ পায় – কষ্ট পায় না। তার কাছে মানুষ স্বস্তি পায়। তার সাথে মানুষ বন্ধুত্ব তৈরি করে। তার সাথে মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। তার দ্বারা মানুষের উপকার হয়। ক্ষতি হয় না। সে মানুষকে সর্বদা উপকার করতে চেষ্টা করে, সম্মান করতে চেষ্টা করে। মানুষকে কোনোভাবেই সে কষ্ট দেয় না। মানুষের পচা বিষয় নিয়ে সে ঘাঁটাঘাঁটি করে না।

ইতর মানুষ

যেসব মানুষ খারাপ, যেসব মানুষ ইতর, তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করা চাই। খারাপ মানুষ, বদস্বভাবের মানুষ এবং যারা সারা দিন অন্যের অসঙ্গতি এবং অন্যের ভুল ও দোষ খুঁজে বেড়ায়, তাদের উদাহরণ কয়লার মতো। কয়লা যদি গরম হয়, তাহলে তা হাতে নিলে হাত পুড়ে যায়। আর কয়লা যদি ঠাণ্ডা হয়, তাহলে তা হাতে নিলে হাত কালিতে ভরে যায়। খারাপ মানুষদের অধীনে কেউ কাজ করে না। এদের সাথে কেউ সুসম্পর্ক রাখে না। এমন মানুষের সাথে শুধু মানুষের ঝগড়া-ফাসাদ ও হানাহানি হয়। এরা কাউকে মূল্য দেয় না। ফলে মানুষও তাদের মূল্য দেয় না। তারা কাউকে সম্মান দেয় না। ফলে তারা সম্মান পায় না।

স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর অভিযোগ

অনেক সময় দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য জীবন যাপন করছে। কিন্তু স্ত্রী স্বামীর উপর অসন্তুষ্ট থাকে। স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলে। তার স্বামী তার সাথে ভালো আচরণ করে না, তাকে সর্বদা কষ্ট দেয়। আরে বেকুব! এই স্বামীর জন্য এই স্ত্রীরা কী না করে! আজ যদি এ স্ত্রী সংবাদ পায়, স্বামী একসিডেন্ট হয়ে মারা গেছে, স্ত্রী কীভাবে কান্না করে খবর আছে? কষ্টে থাকে, স্বামীর কাছে সম্মান পয় না; তবুও সে স্বামীকে ভালোবাসে। তাই স্বামীকে ভালো আচরণ করতে হবে। আর স্বামী ভালো আচরণ করার পরও যদি কোনো নারী, কোনো স্ত্রী স্বামীর উপর এটা পাইনি ওটা পাইনি, আমাকে এই দেয়নি, ওই দেয়নি বলে অভিযোগ তোলে, তাহলে বুঝবে মরলেও সে সুখ পাবে না। এক্ষেত্রে স্বামীই বরং ভালো বিনিময় পাবে আল্লাহর কাছে।

মানুষের মূল্য দিন

আজ আমরা মানুষকে মূল্যায়ন করি না। আমরা মানুষকে কষ্ট দেই। আমরা মানুষকে অসম্মান করি। অনেক সময় মরার পর, নিজের কাছ থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পর আফসোস করি, আহ! মানুষটি তো ভালো ছিল। এই আফসোসের কোনো লাভ নেই। যা করার জিন্দা থাকলে কাছে থাকতেই করো। তাকে সম্মান করো, তার মূল্যায়ন করো।

একটি চমৎকার ঘটনা

মাওলানা রুমী (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন। এক আতর ব্যবসায়ী একটি প্রশিক্ষিত তোতা পাখি তার দোকানে রাখল। গ্রাহক এলে তোতা পাখি সালাম দিত এবং কুশলবিনিময় করত। মানুষ তো অবাক। ওই দোকানের ক্রেতা বেড়ে গেল। মানুষ মজা নিতেও ওখানে যেত। অনেক বিক্রি হতো এ লোকের আতর। কৌতূহলী মানুষের সে কি উপচেপড়া ভিড়। কয়েক মাস এভাবে জমজমাট ব্যবসা হলো। একদিন আতর ব্যবয়ী দোকান বন্ধ করে তোতাটা খানচায় ঢোকাতে ভুলে গেল। লোকটি তোতাকে এমনি রেখেই দোকান বন্ধ করে চলে গেল। রাতে বিড়াল এসে তোতার উপর হামলা করল। ফলে তোতা এদিক-ওদিক উড়াউড়ি করতে লাগল। আতরের দোকানে তো সব কাঁচের বোতল। তোতা ভয়ে একবার এপাশের বোতলের তাকে পড়ে আবার ওপাশের বোতলগুলোর উপর পড়ে। এভাবে অনেক আতর নষ্ট হয়ে গেল। সকালে মালিক এসে এই অবস্থা দেখে তোতা পাখিকে জুতা দিয়ে আঘাত করল। পাখির মাথার পালক ছিঁড়ে গেল। এটি আর কথা বলে না। এবার তো মালিক আসসোস করল। কত রকমে চায়; কিন্তু পাখি

কথা বলে না। এবার তার ক্রেতা কমে গেল। বিক্রি হয় না। এদিকে আতরের বোতল ভেঙেও ক্ষতি হয়ে গেল আবার বিক্রিও বন্ধ হয়ে গেল। তোতা আর কোনো দিন কথা বলল না। এখন লোকটি আফসোস করে, হায় হায় কী করলাম আমি!

এই উদাহরণ নিজের জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখুন। স্বামীরা স্ত্রীদের কষ্ট দেয়, কষ্টের মধ্যে রাখে। ফলে কয়েকদিনের মাথায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝামেলা হয়ে যায়, ঝগড়া বেঁধে যায়। স্বামী-স্ত্রীর সুখ নষ্ট হয়ে যায়। যে স্ত্রী স্বামীর জন্য নিজের বাপের বাড়ি ছেড়ে আসছে তাকে কষ্ট দিবা? পরে দেখা যায় স্ত্রী-স্বামীর মধ্যে অমিল হয়ে যায়। স্ত্রী কোনো কাজ আর ঠিক মতো করে না। স্বামী বাইরে গেলে স্ত্রী সব কিছুতে গোলমাল বাঁধিয়ে ফেলে। এখন তো সব সুখ শেষ। স্ত্রীরা প্রথমে এমন থাকে না। স্বামীদের কারণে বিগড়ে যায়। আরে, স্ত্রীরা তো বরং সারাদিন খাটাখাটুনি করার পর রাতে স্বামী যদি স্ত্রীকে সামান্য আদর করে, তাহলে স্ত্রী সারা দিনের সব কষ্ট ভুলে যায়। এটি নারীদের স্বভাব। কিন্তু স্বামীদের উল্টা-পাল্টা আচরণের কারণে কোমলমতি অসহায় স্ত্রীরা শক্ত হয়ে যায়। ফলে স্বামীর অনেক কষ্ট হয়। তাই আগে থেকেই সতর্ক থাকবে। এ তোতাওয়ালা আতর ব্যবসায়ীর মতো যেন না হয়ে যায়।

আবার অনেক সময় স্বামীরা ভালো থাকে। স্ত্রীরা স্বামীদের নষ্ট করে ফেলে। প্রথমে স্বামীর সাথে খারাপ আচরণ করে, স্বামীকে কষ্ট দেয়। যার ফলে স্বামীও খারাপ আচরণ শুরু করে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে খেয়াল করতে হবে। দেখা যায়, স্বামীরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেয়। এতে পরে হায়-হায় করতে হয়। তাই খুব সতর্ক থাকবে। তোতাওয়ালা আতর ব্যবসায়ীর মতো না করা চাই।

ভুল বোঝাবুঝির ক্ষতি

অনেক সময় আমাদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যায়। ফলে পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ তৈরি হয়। তাই হুকুকুল ইবাদ রক্ষার্থে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না কোনোদিন। অন্য মানুষের অবমূল্যায়নও করব না এবং ভুল বোঝাবুঝির কবলে পড়ে মানুষের অধিকারও নষ্ট করব না। কোনো সমস্যা হয়ে গেলে ঠাণ্ডা মাথায় আগে যাচাই করবে; তারপর পদক্ষেপ নিবে।

প্রকৃত বীর কে?

হাদীছে আছে, নবীজি বলেছেন, কুস্তির সময় যে অন্যকে ভূপাতিত করে, সে প্রকৃত বীর নয়। প্রকৃত বীর হচ্ছে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়।

প্রকৃত বন্ধা যে নারী

একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন– প্রকৃত বন্ধা কোন নারী? সাহাবাগণ বললেন, যে নারীর সন্তান সন্ততি হয়না সে নারী বন্ধা।

নবীজি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন– দুনিয়াতে যে নারীর কোনো সন্তান শিশুকালে মৃত্যুবরণ করেনি সেই প্রকৃত বন্ধা নারী। কারণ, কাল কিয়ামতের দিন এই মা'সুম বাচ্চারা মা বাবার জন্যে শাফায়াত করবে। যদি কোনো নারীর বাচ্চা শিশু বয়সে মৃত্যুবরণ না করে তাহলে তো কিয়ামতের দিন শাফায়াত করার মতো বাচ্চা তার থাকলো না। ফলে নারীটি বন্ধা বলেই প্রমাণিত হবে।

এটি আমাদের ঐ সকল মায়েদের জন্যে সান্তনা যাদের শিশু বাচ্চা ইন্তে কাল করেছে। এসব মা যদিও তার সন্তানের কৈশর, যৌবন ও তারুণ্য প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি, কিন্তু তারা এই ভেবে ভেবে নিজেকে সান্তানা দিবেন যে ইনশাআল্লাহ কিয়ামতের দিন তো বাচ্চা ওই শিশু আমার জন্য আল্লাহর দরবারে শাফায়াত করবে। আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে। আল্লাহর দরবারে মা-বাবার মুক্তির জন্যে ফরিয়াদ করবে এবং মা-বাবাকে হাত ধরে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

প্রকৃত দরিদ্র কে

নবীজি একবার সাহাবায়ে কেরামকে একটি প্রশ্ন করলেন যে, বলো তো গরীব কে? সাহাবা কেরাম বললেন, যার মাল নেই সে গরীব। নবীজি বললেন, না; প্রকৃত গরীব সেই ব্যক্তি, যে অনেক নেক আমল করল; কিন্তু কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে কষ্ট দিয়েছে, কাউকে অপমান করেছে, কারো হক নষ্ট করেছে। কিময়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উঠবে যে, মানুষ তার কাছে পাওনা চাইবে, এরা তার কাছে হক চাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা তার নেকী থেকে সকলের হক আদায় করে দেবেন। ফলে লোকটির নেকী শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু হকদার বাকী থেকে যাবে। এবার আল্লাহ্ বাকীদের গুনাহ এই ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন। ফলে গুনাহের পাহাড় জমে যাবে তার মাথায়। নবীজি বললেন, প্রকৃত গরীব তো এই লোকটি, যে অনেক নেক কামাই করল; কিন্তু হুকুকুল ইবাদের প্রতি খেয়াল করল না। যার কারণে কিয়ামতের দিন তার আর কোনো নেক থাকবে না। সে নিঃস্ব হয়ে যাবে। ফলে সে জাহান্নামে চলে যাবে।

মুখ সাবধানে ব্যবহার করুন

হে বন্ধুগণ! কাউকে উল্টাপাল্টা কথা বলে দেওয়া সহজ। কিন্তু কিয়ামতের দিন এর জবাব দেওয়া বড় কঠিন হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এমন প্রতাপের সাথে থাকবেন যে, আম্বিয়া কেরামও ভয়ে কম্পিত থাকবেন। সবাই ইয়া নাফসী ইয়া নাফসী বলতে থাকবে। তো এমন কঠিন মুহূর্তে যদি আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়, ওমুক ব্যক্তিকে কেন গালি দিয়েছ? ওমুক ব্যক্তিকে কেন অপমান করেছ? ওমুক ব্যক্তিকে কেন লজ্জা দিয়েছ? এভাবে যখন প্রশ্ন করা হবে, তখন আমরা আল্লাহর সামনে কী জবাব দিব? আমরা কি কোনো জবাব দিতে পারব? তাই আজই সতর্ক হোন। মুখ সাবধানে ব্যবহার করুন। অপনার ভাষা ও মুখের দ্বারা কেউ যেন কষ্ট না পায়, সেদিকে লক্ষ রাখুন।

মৃত্যুর পর মানুষকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, মৃত্যুর পর মানুষকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হবে।

এক. রূহ, মালাকুল মাওত যাকে নিয়ে যাবে।

দুই. মানুষের দেহ। এটা পোকামাকড় খেয়ে ফেলবে।

তিন. লোকটির মাল। তার ওয়ারিশরা নিয়ে যাবে।

চার. হাড্ডি। তা মাটি খেয়ে ফেলবে।

পাঁচ. লোকটির নেক আমল। তা হকদাররা নিয়ে যাবে। তাই সেই মানুষটির জন্য বড়ই আফসোস, কিয়ামতের দিন যে নেকের পাহাড় নিয়ে উঠবে; তবু সে জাহান্নামে যাবে।

হিংসার আগুন

হাদীছ শরীফে এসেছে–

اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

'আগুন শুকনা কাঠকে যেমন খেয়ে ফেলে, হিংসাও নেকিকে সেভাবে খেয়ে ফেলে।'

গীবতের বিপদ

গীবত করলে যার গীবত করা হয়েছে গীবতকারীর মাথায় তার গুনাহগুলো চাপিয়ে দেওয়া হবে।

অন্যের মঙ্গল কামনা করা : একটি উত্তম গুণ

কুরআনের একটি সূরার নাম সূরা নামল। নামল মানে পিঁপড়া। এ সূরার নাম পিঁপড়া হয়েছে এভাবে– সূলাইমান (আ.)-এর বাহিনী সফরে বের হলো। পিঁপড়া তা দেখে বলল–

يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ

'হে পিঁপড়ার দল! তোমরা তোমাদের ঘরে ঢুকে পড়ো।'[১]

হযরত সুলাইমান (আ.) ওই পিঁপড়াকে ধরে বললেন, কেন এমন করলে? পিঁপড়া বলল হযরত! আপনারা অজান্তেই হয়ত আমাদের উপর পা চাপা দিয়ে চলে যাবেন। তাই আমার গোত্র-গুষ্ঠিকে বাঁচানোর জন্য আমি এমন করেছি। তো পিঁপড়া অন্য পিঁপড়াদের মঙ্গল চেয়েছিল। আল্লাহ তার আমলটিতে এত খুশি হলেন যে, তার নামে সূরা নাযিল করলেন।

মুসলমানদের তিনটি হক

এক বুযুর্গ বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের তিনটি হক রয়েছে।

১. মুসলমান ভাইয়ের উপকার না করতে পারলেও ক্ষতি করবে না।

২. মুসলমান ভাইকে খুশি না করতে পারলেও দুঃখ দিবে না।

৩. মুসলমান ভাইকে হাসাতে না পারলেও কাঁদাবে না।

অন্যের হৃদয় জ্বালানো

আজ আমাদের অনেক মহিলা বলে, ইস আজকে ওমুক মহিলাকে এমন বকুনি দিয়েছি যে, ওর অন্তর সারা দিন জ্বলবে। আরে বোন! তুমি তো তার দিল জ্বালাওনি। তার অন্তর জ্বালাওনি, তুমি নিজেই নিজের অন্তর জ্বালিয়েছ। ইরশাদ হচ্ছে–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

'যারা সামনে ও পেছনে লোকদের নিন্দা করে, তাদের জন্য দুর্ভোগ অবধারিত।'[২]

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ

---

১. সূরা নামল, আয়াত- ১৮

২. সূরা হুমাযাহ, আয়াত- ১

এটি আল্লাহর প্রজ্বালিত আগুন, যা তার হৃদয়কে গ্রাস করে নেয়।'[১]

শোনো! এই অন্যায়ের কারণে কাল কিয়ামতের দিন তোমার দেহও জ্বলবে, হৃদয়ও জ্বলবে। আজ তো তুমি আরেকজনের শুধু হৃদয় জালিয়েছ মাত্র। কবির ভাষায়–

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

আজ তো এই দুনিয়ায় ভাবছ, হায় মরে যেতাম যদি। কিন্তু মরেও তুমি শান্তি পাবে না। আর তখন তো মৃত্যুও হবে না। তখন কোথায় যাবে?

কেঁদে লাভ হবে না তখন

আজ যে তুমি আরেকজনের অন্তর জালিয়ে ফেলছ, কষ্ট দিচ্ছ, কাল কিয়ামতের দিন তোমাকে বেঁধে আগুণে পোড়ানো হবে। তখন তোমার শরীরও জ্বলতে থাকবে, অন্তরও জ্বলবে। কত চিৎকার করবা। কত কান্নাকাটি করবা। কোনো লাভ হবে না তখন। তাই আজই সতর্ক হও, কিয়ামতের দিন পর কালে কেঁদে-কেঁদে কোনো লাভ হবে না। যা কাঁদার দুনিয়াতেই কেঁদে নাও।

দুনিয়ায় লজ্জা পাওয়া সহজ

আমাদের উচিত আমরা ঝগড়া করব না, কাউকে কষ্ট দেব না। যদি কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকি, তাহলে দুনিয়ায় দুফোঁটা চোখের পানি ফেলুন। দুনিয়ায় আরেকজনের পা ধরাও সহজ। কারো কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে দুটি কথা বলে নেওয়াও সহজ। একটিমাত্র মানুষের সামনে একটি লজ্জা পাওয়া সহজ। কিন্তু এ ঝগড়া না মিটালে, আপসে মিলে না গেলে এবং এই অবস্থায় মাফ না নিয়ে কবরে গেলে তো কিয়ামতের দিন সবার সামনে বড় কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে হবে। কিয়ামতের আদালতে বড় ইনসাফের সাথে বিচার হবে। সেই বিচারে পরাজিত হলে, অটকে গেলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। তখন তো দর্শক একজন দুজন থাকবে না – গোটা মানবজাতি থাকবে। আম্বিয়া কেরাম, আউলিয়া কেরাম থাকবেন। ফেরেশতারা থাকবে। তাই দুনিয়ার ঋণ দুনিয়ার বিবাদ, দুনিয়ার পাওনা-দেনা দুনিয়াতেই মিটিয়ে যেতে হবে।

---

১. সূরা হুমাযা, আয়াত- ৬-৭

অন্যের কল্যাণ কামনার ফায়দা

হাদীছ শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি অন্যের খায়েরখাহী ও কল্যাণ কামনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার খায়েরখাহী করবেন। যেমন যদি একজন মানুষ অন্যজনের খেদমতে লেগে থাকে, আল্লাহ খোদ এই ব্যক্তির সকল কাজের দায়িত্ব নিয়ে সেগুলো সমাধা করেন। যে মানুষটি অন্যের সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্য করবেন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ

যে ব্যক্তি অন্য মানুষের উপকার করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে যমিনে প্রতিষ্ঠিত করবেন।[১] যে ব্যক্তি অন্যের খায়েরখাহী করবে আল্লাহ তাকে কবুল করে নিবেন।

আল্লাহওয়ালাদের ভালোবাসা

দেখেছেন, আল্লাহওয়ালাদের সাথে আল্লাহ কী মুআমালা করেন? তাদের অন্তরে আল্লাহর মহাব্বত এত হয়ে থাকে যে, তিনি আল্লাহর মাখলুককে মহবত করেন আর মাখলুক তার উপর কুরবান হয়ে যায়। আল্লাহওয়ালাদের উপর সালেকরা এভাবে জান কুরবান করে দেয়। তো তারা আল্লাহকে মহবত করেন। ফলে আল্লাহর সব মাখলুক তাদের মহবত করে। তারা আল্লাহর হয়ে যান; ফলে আল্লাহ লোকদের তাদের কাজে লাগিয়ে দেন। আল্লাহওয়ালাগণ আল্লাহর ইবাদাতে জীবন কাটিয়ে দেন। ফলে আল্লাহ তাকে এমন মাকাম দান করেন যে, তিনি লোকদের খায়েরখাহী করেন আর আল্লাহ তাঁদের খায়েরখাহী করেন। আল্লাহ তাদেরকে সমগ্র সৃষ্টিজীবের কাছে প্রিয় বানিয়ে দেন। তাঁরা আল্লাহকে ভালোবাসেন আর আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।

হাদীছ শরীফে এর দলীল আছে। যখন বান্দা নফল নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর বন্দনা করে, তখনকার ব্যাপারে বলা হয়েছে–

يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ عَبْدِيْ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهٗ

'নফলের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার এত নৈকট্য লাভ করে যে, আমি তাকে মহবত করি।'

তখন আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আ.)কে ডাকেন এবং বলেন, জিবরাঈল! আমি অমুককে মহবত করি। তারপর হযরত জিবরাঈল (আ.) আসমানের ফেরেশতাদের মাঝে ঘোষণা দিয়ে বলেন, হে ফেরেশতারা!

---

১. সূরা রাদ, আয়াত- ১৭

আল্লাহ তা'আলা ওমুক বান্দাকে মহবত করেন; তাই তোমরা তাকে মহবত করো। তারপর যমিনের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে দেন, হে লোকেরা! আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে মহবত করেন; তোমরা তাকে মহবত করো।

ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِي الْاَرْضِ

তারপর সারা যমিনে ওই বান্দার মহবত প্রমাণিত হয়ে যায়। সকলে তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। তাকে কবুল করে নেওয়া হয়। যেখানেই সে যায়, সেখানেই লোকেরা তার কথাকে গ্রহণ করে। লোকেরা তাকে মহবত করে, ভালোবাসে। তো যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসবে, আল্লাহর সকল সৃষ্টি তাকে ভালোবাসবে।

আল্লাহর ভালোবাসায় কমতি করবে না

আজ মানুষের অন্তরে আল্লাহর মহবত কম। তাই আজকের সাধারণ মানুষ মনে করে, ওই ব্যক্তি আমাকে ঘৃণা করে। বউ মনে করে, শাশুড়ী আমাকে ঘৃণা করে। শাশুড়ি মনে করে, বউ আমাকে ঘৃণা করে। একজন মনে করে, আমার ওই আত্মীয় আমাকে ঘৃণা করে। ননদ মনে করে, আমার ভাবি আমাকে ঘৃণা করে। ভাবি মনে করে আমার ননদ আমাকে ঘৃণা করে। এমন হাজারো অভিযোগ আজ বিদ্যমান। এর মূল রহস্য এই যে, বান্দার মাঝে মহাব্বতে ইলাহী তথা আল্লাহর ভালোবাসা কম, যার কারণে তার মাঝে এই খেয়াল তৈরি হয়েছে, লোকেরা আমাকে ভালোবাসে না। লোকেরা মনে হয় আমার গীবত করে। অমুক আমার অমঙ্গল চায়। সকলকেই মনে করে, ও আমার খারাপ চায়। অমঙ্গল চায়। তো উচিত হচ্ছে নিজের ধারণাকে বদলে ফেলা। নিজের দিলকে আল্লাহর মহবতে পূর্ণ করে ফেলা। এতে আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের দিলে আপনার মহবত দান করে দিবেন। আমার যিন্দেগীকে সুন্দর ও সুশোভিত করে দিবেন।

فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لئے
لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لئے

আরে! প্রেম ভালোবাসা ও মহবতের জন্যই তো জীবনের ফোরসত অনেক কম। লোকেরা ঘৃণার জন্য যে কোথায় এত সময় পায়!

ঘৃণার উৎস কুফরীতে

এই সংক্ষিপ্ত জীবনে লোকেরা কোথায় অন্যকে ঘৃণা করবার সময় পায় সে কথা আমার বুঝে আসে না। যাকে জিজ্ঞেস করবেন, যারই খবর নিবেন,

দেখবেন, অমুকের সাথে তার বিদ্বেষ আছে, অমুকের সাথে হিংসা আছে। তো ভাইয়েরা! কারো সাথে যদি কারো বিদ্বেষ থাকতেই হয়, তাহলে সেই বিদ্বেষ হতে পারে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর ভালোবাসা নসীব করুন এবং রবে কারীম আমাকে অন্যের খায়েরখাহী করার তাওফীক দান করুন। আর যত গুনাহ করেছি তা মৃত্যুর আগে-আগেই মাফ নিয়ে বিদায় নেওয়ার তাওফীক দান করুন।

হৃদয়ের ধনি

অনেক মহিলা বলে, আহা! আমার দু'আ কবুল হয় না। আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। আল্লাহ আমার দু'আ শোনেন না। আরে আল্লাহ তো সবার দু'আই শোনেন। কিন্তু কথা হলো, আল্লাহ অন্তরের ধনিই শোনেন। তুমি তো মুখে-মুখে ডাক। অন্তর থেকে তো ডাকছ না। তাই তোমার দু'আ আসমানেও উঠে না। আল্লাহ তো মুখের কথা শুনতে চান না। আল্লাহ শুনতে চান হৃদয়ের ধনি। তোমার দু'আ যদি তোমার হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়, তবে অবশ্যই আল্লাহ সেই দু'আ কবুল করবেন। তোমার অন্তর কালো। তোমার হৃদয় বন্ধ। তোমার অন্তর অন্ধকার। তুমি আগে হৃদয় ঠিক করো। হৃদয় থেকে তুমি দু'আ করো। তবেই তোমার হৃদয়ের দু'আ আল্লাহর আরশে পৌঁছবে। আজ মানুষের দিল বোবা হয়ে গেছে। মানুষ আজ দিল থেকে কথা বলে না। কথা বলে মুখে-মুখে, দু'আ করে মুখে-মুখে। মুখের দু'আ নয় আল্লাহ শোনেন হৃদয়ের দু'আ। তুমি হৃদয় থেকে দু'আ করে দেখো না। অবশ্যই আল্লাহ তা কবুল করবেন।

ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

আমরা অভিযোগ তুলছি আল্লাহর উপর। অথচ ভুলটা হয়ে চলছে আমাদের থেকেই। আমরা আজ আমাদের দিলের হালত যাচাই করা উচিত।

নিজের চরিত্রকে সুন্দর বানাতে হবে

আজ নারীরা বহু সময় নিজের চেহারার সৌন্দর্য তৈরিতে ও রূপচর্চায় ব্যয় করে দেয়। নিজের দেহকে খুবসূরত করার চেয়ে চরিত্রকে খুবসূরত করতে হবে। দৈহিক সৌন্দর্য রক্ষায় সারাটা সময় ব্যয় করে দেয়। হায় তারা যদি সামান্য কিছু সময় নিজেদের অভ্যন্তরকে সুন্দর করার কাজে ব্যয় করত। নিজের চরিত্র সুন্দর করার জন্য যদি তারা সামান্য সময়ও ব্যয় করত, আমার মনে হয়, তাহলে তারা জাহান্নামের স্থলে জান্নাতের অধিকারী হয়ে যেতে পারত।

আর নিজের দেহকে, বাহ্যিক রূপকে সুন্দর করার জন্য সারাটা সময় ব্যয় করছ। কিন্তু নিজের চরিত্রকে ঠিক করার জন্য, সুন্দর করার জন্য সামান্য সময়ও ব্যয় করছ না। যে বিষয়টি আল্লাহ দেখবেন, তার প্রতি তোমার কোনোই যত্ন নেই। আর যা মানুষ দেখবে, তার কত যত্ন করছ!

তাই বলছি, নিজের চরিত্রকে গঠন করো। সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হও। পূত-পবিত্র জীবন নির্মাণ করো। দেখবে, সবাই তোমাকে ভালোবাসবে, সবাই তোমাকে স্নেহ করবে। তুমি কোনো কথা বললে সবাই সেটা গ্রহণ করবে। তুমি কোনো পদক্ষেপ নিলে সবাই তোমার ডাকে সাড়া দিবে। ওই বাহ্যিক সৌন্দর্য তোমার মাঝে কদিন থাকবে। অথচ তোমার চরিত্রের সৌন্দর্যের লাবণ্য থেকে যাবে আমরণ। এমনকি মৃত্যুর পরও তোমার চরিত্রের তোমার গুণের আলোচনা করতে থাকবে মানুষ।

আমার বোনেরা! একটু দ্বীনের দিকে তাকান। দ্বীনের পথে নিজেকে পরিচালিত করুন। দেখবেন, এক অনন্ত সুখের সন্ধান পাবেন। নবীজির সুন্নাতমতো জীবন গঠন করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে ইজ্জতের জীবন দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

মানবজাতির জন্য ইল্‌ম এক অমূল্য সম্পদ। মানুষের জীবন যাপনের পাথেয় এই ইল্‌ম! আবার ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করলেই হবে সঠিক কাজ। প্রদীপ যেমন প্রজ্বালিত হওয়া ছাড়া আলো দেয় না, তেমনি ইল্‌মও আমল ছাড়া উপকার দেয় না। আমল ছাড়া ইল্‌মের মূল্য নেই। কুরআনে বনি ইসলাইলের বিদ্বানদের কুকুরের সমতুল্য বলা হয়েছে। এমনকি তার চেয়ে হীন বলা হয়েছে। কারণ, ওরা তাদের বিদ্যা অনুযায়ী আমল করত না।

আর, আমলে কবুলিয়াতের জন্য প্রয়োজন ইখলাস। প্রয়োজন অকপটতা, আন্তরিকতা, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা। ইখলাস ছাড়া আমলের মূল্য নেই। ইল্‌ম, আমল ও ইখলাসের বরকতে বান্দার মাঝে এমন এক অপ্রতিরোধ্য ঈমানী শক্তি সঞ্চারিত হয়, যার সামনে চ্যালেঞ্জ দিয়ে দাঁড়াতে পারে না কোন শক্তি, মহাশক্তি।

প্রকৃত বুদ্ধিমান সে, যে নিজেকে ইল্‌মের নূরে আলোকিত করে। ইল্‌মের ভূষণে সজ্জিত করে। আর সেই ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে। অগাধ ইখলাসে সে পূর্ণ থাকে।

ইল্‌ম, আমল ও ইখলাস

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓاءُ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُطْلُبُوْا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّحْدِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ. سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

মানুষ দুনিয়াতে সম্মানের জীবন যাপন করতে চায়। সেই সম্মানের অন্বেষণে দিন-রাত মেহনত করতে হয়। কিন্তু সে থমকে দাঁড়ায় না। সে কিন্তু বসে থাকে না। নিজের সম্মানের অন্বেষণে ছুটে বেড়ায়।

সম্মান অর্জনের পথ দুটি

দুনিয়ায় সম্মান দুটি পদ্ধতিতে পাওয়া যায়। এক. মালের দ্বারা। দুই. নেক আমল দ্বারা। তবে মাল ও আমলের মাঝে অর্জিত এই দুই প্রকার ইজ্জত ও সম্মানের মাঝে বিস্তর ব্যবধান আছে। মাল মানুষের একটি আনুষঙ্গিক ও অস্থায়ী জিনিস। তাই মালের কারণে অর্জিত সম্মানও হয়ে থাকে অস্থায়ী। আর নেক আমল যেহেতু চিরস্থায়ী; তাই এর মাধ্যমে অর্জিত সম্মানও চিরস্থায়ী। একথাও তো স্পষ্ট যে, অনেক দিক থেকেই মাল-সম্পদের চেয়েও ইল্‌মের মূল্য-মর্যাদা অনেক বেশী। ইল্‌ম দ্বারা মানুষ আমল করে আর আমলের মাধ্যমে একজন মানুষ দুনিয়ায় নেক, আখেরাতে সম্মানিত ও কামিয়াব হয়। ইরশাদ হচ্ছে–

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

ইজ্জত আল্লাহর, রাসূলের ও মুমিন বান্দাদের।[১]

সম্পদের উপর ইল্‌মের শ্রেষ্ঠত্ব

১. ইল্‌ম নবীদের মীরাস আর ধন-সম্পদ কারুন ও ফেরাউনের মীরাস।

---

১. সূরা মুনাফিকুন, আয়াত- ৮

২. ইল্‌ম হাসিলের দ্বারা মানুষের বন্ধু বেড়ে যায়। আর সম্পদ হাসিলের কারণে মানুষের শত্রু বেড়ে যায়।
৩. ইল্‌ম চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় নেই। সম্পদ চুরি হওয়ার ভয় আছে।
৪. ইল্‌ম মানবসমাজের সীনার নূর। মানুষ যেখানেই যাবে এই ইল্‌ম তার সঙ্গে যাবে। সম্পদ পণ্যের মাঝে, ব্যংকে থাকে । সর্বদা মালিকের কাছে থাকে না।
৫. ইল্‌ম যত পুরাতন হয়, তত তার গভীরতা ও মূল্য বাড়ে। আর সম্পদ যত পুরাতন হয়, তার দাম তত কমে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে রুপার যে মূল্য ছিল, আজ তেমন নয়। আগে টাকার মূল্য যেমন ছিল আজ তেমন নয়।
৬. ইল্‌মের মহবতে মানুষ প্রজ্ঞাবান হয়। মানুষ দয়াদ্র হয় আর সম্পদের মহবতে মানুষ কৃপণ হয়।
৭. ইল্‌ম যত খরচ করা হয়, ততই তা বৃদ্ধি পায়। সম্পদ যত খরচ করা হয়, তত কমে যায়।
৮. ইল্‌মের মহবত থাকলে মানুষের দিল নূরে পূর্ণ হয়ে যায়। সম্পদের মহবত থাকলে মানুষের দিল অন্ধকার হয়ে যায়।
৯. ইল্‌ম মানুষকে হেফাযত করে আর মালের হেফাযত মানুষের করতে হয়।
১০. মাল দ্বারা কোনো দিন ইল্‌মের মালিক হওয়া যায় না। কিন্তু ইল্‌ম দ্বারা মালের মালিক হওয়া যায়।
১১. মালের কারণেই ফেরাউন নিজেকে খোদা দাবি করেছিল। সম্পদ তাকে অহংকারী বানিয়ে দিয়েছে। আর ইল্‌মের কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

ইল্‌ম বিনয়-নম্রতা শিক্ষা দেয়।

সম্পদের স্থায়িত্ব নেই

সাধারণভাবে মনে হয়, মাল হলে সব সমাধান হয়ে যাবে। প্রবাদ আছে, অর্থ থাকলে বাঘের দুধও কেনা যায়। হ্যাঁ, সম্পদ থাকলে অনেক কাজ করা যায়। তবে বুঝতে হবে, সব কাজ টাকা দিয়ে হয় না।

আপনি নিজেই চিন্তা করুন–

১. মানুষ টাকা দিয়ে চক্ষু কিনতে পাবে; কিন্তু দৃষ্টিশক্তি কিনতে পাবে না।
২. টাকা দিয়ে মানুষ গ্রন্থরাজি কিনতে পারে; কিন্তু ইল্‌ম ও জ্ঞান কিনতে পারে না।
৩. টাকা দিয়ে নরম গালিচা, কোমল বিছানা, সুখ-সামগ্রী কেনা যায়; কিন্তু মধুর ঘুম কেনা যায় না।
৪. টাকা দিয়ে ভালো ও সুন্দর কাপড় কিনতে পারবে; কিন্তু সৌন্দর্য কিনতে পারবে না।
৫. টাকা দিয়ে ঘরে বহু চাকর রাখতে পারবে; কিন্তু নেক সন্তান পাবে না।
৬. টাকা দিয়ে ওষুধ কেনা যায়; সুস্থতা কেনা যায় না।
৭. টাকা দিয়ে খেজাব কেনা যায়; কিন্তু যৌবন ফিরিয়ে আনা যায় না।
৮. টাকা দিয়ে মানুষ সামগ্রী কিনতে পারে; কিন্তু কারো ভালোবাসা কিনতে পারে না।

টাকা দিয়ে সব কাজ দুনিয়াতে হয় না। আর কিয়ামতের দিন তো টাকা ও সম্পদ কোনো কাজেই আসবে না।

আল্লাহ রাবুল ইযযাত ইরশাদ করেছেন–

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

'কিয়ামতের দিন এই সম্পদ, এই সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না। কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে এসেছে, তা কাজে আসবে।'[১]

জ্ঞান ও মূর্খতা কুরআনের আলোকে

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ রাবুল ইযযাত ইরশাদ করেন–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

আপনি বলে দিন, যে ব্যক্তি জানে আর যে জানে না উভয়ে কি সমান?[২]

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ

বলে দিন, অপবিত্র ও পবিত্র বস্তু সমান নয়।[৩]

لَا يَسْتَوِيْ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ

---

১. সূরা শুআরা, আয়াত- ৮৮-৮৯
২. সূরা যুমার, আয়াত- ৯
৩. সূরা মায়িদা, আয়াত- ১০০

জান্নাতবাসী ও দোযখবাসী এক নয়।[১]

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ

দৃষ্টিসম্পন্ন আর দৃষ্টিহীন উভয়ে এক নয়।[২]

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّوْرُ

আলো ও অন্ধকার এক নয়।[৩]

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ

ছায়া ও গরম এক নয়।[৪]

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

জীবন্ত ও মৃত এক নয়।[৫]

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেছেন, এখানে এই ৭ আয়াতে উল্লেখিত ৭টি জিনিস দ্বারা উদ্দেশ্য ইল্‌ম এবং তার বিপরীতে উল্লিখিত ৭টি জিনিস দ্বারা উদ্দেশ্য মূর্খতা। তাই (১) علم (২) طيب (৩) جنت (৪) بصير (৫) نور (৬) ظل (৭) احياء এগুলোর প্রত্যেকটি দ্বারা ইল্‌ম উদ্দেশ্য। আর (১) لا (২) يعلمون (৩) خبيث (৪) النار (৫) الاعمى (৬) ظلمات (৭) حرور الاموات এগুলো দ্বারা মূর্খতা ও অজ্ঞতা উদ্দেশ্য।

কুরআন মজীদে ইল্‌মের ফযীলত

এই দুনিয়ায় বাস্তব ও শাশ্বত সম্মান শুধু আম্বিয়া কেরামই পেয়েছেন। আর তাঁরা এমন মানব ছিলেন, যারা আল্লাহর সুনির্বাচিত ও প্রিয় বান্দা। যাদের জীবন বিশ্বমানবতার জন্যে আদর্শ। দুনিয়া দারুল আসবাব। তাই আম্বিয়া কেরামের মর্যাদার উৎস ছিল ইল্‌ম। ইল্‌মের কারণেই তারা এমন সম্মান প্রাপ্ত হয়েছেন। বিষয়টি কুরআনের আলোকে বুঝে নিই।

---

১. সূরা হাশর, আয়াত- ২০
২. সূরা ফাতের, আয়াত- ১৯
৩. সূরা ফাতের, আয়াত- ২০
৪. সূরা ফাতের, আয়াত- ২১
৫. সূরা ফাতের, আয়াত- ২২

হযরত আদম (আ.) ও ইল্‌ম

হযরত আদম (আ.)কে ফেরেশতারা সিজদা করেছে। কেন আদমকে সিজদা করেছে? এই ইল্‌মের কারণে। কারণ, ফেরেশতাদের কিছু জিনিসের নাম বলার জন্য প্রশ্ন করা হলে তারা তা বলতে পারেনি। আদম (আ.) পেরেছিলেন। কেন পেরেছিলেন? তাঁকে যে ইল্‌ম দেওয়া হয়েছিল, সেজন্য পেরেছিলেন।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا

'আল্লাহ হযরত আদম (আ.)কে সকল বিষয়ের ইল্‌ম দান করেছেন।'[১]

তো এই ইল্‌মের কারণেই হযরত আদম (আ.) এত সম্মান পেয়েছেন, যে ফেরেশতারা তাঁকে সিজদা করেছে।

হযরত দাউদ (আ.) ও ইল্‌ম

আল্লাহ হযরত দাউদ (আ.)কে অনেক বড় রাজত্ব দান করেছেন। কেন? কারণ, তাঁর ইল্‌ম ছিল–

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ

'আমি দাউদকে পোশাকশিল্প শিক্ষা দিয়েছি।'

তো তাঁর এ শিক্ষার মধ্যে আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ার বাদশাহী দান করেছেন।

হযরত সুলাইমান (আ.) ও ইল্‌ম

হযরত সুলাইমান (আ.)কে দুনিয়ার বাদশাহী দেওয়া হয়েছে। তাঁর সামনে প্রথমে ইল্‌ম ও সম্পদ এদুটি পেশ করা হয়েছিল। সুলাইমান (আ.) ইল্‌ম গ্রহণ করেছিলেন। ইল্‌মের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে বাদশাহি দান করেছিলেন। তিনি জলভাগ ও স্থলভাগ সর্বপ্রকার প্রাণীর ভাষা বুঝতেন। এত জ্ঞান তাঁর ছিল– يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ

'হে লোকেরা! আমাকে পাখির ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।'[২]

হযরত ইউসূফ (আ.) ও ইল্‌ম

হযরত ইউসুফ (আ.)কে জেলে আটক করা হয়েছিল। তিনি সেখান থেকে মুক্তি পেয়েছেন ইল্‌মের মাধ্যমে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার ইল্‌ম তাঁর

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত- ৩১

২. সূরা নামল, আয়াত- ১৬

ছিল। এমনকি এই ইল্‌মের কারণেই তিনি একদিন মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

'যখন তিনি চুড়ান্ত বয়সে উপনীত হলেন, তখন তাঁকে আমি হেকমত ও ইল্‌ম দান করেছি।' [১]

আরো ইরশাদ হচ্ছে–

وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

'তোমাকে এভাবেই আল্লাহ নির্বাচন করেছেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার ইল্‌ম দান করা হয়েছে।'[২]

হযরত ঈসা (আ.) ও ইল্‌ম

হযরত ঈসা (আ.)-এর মাকে সারা দুনিয়া অপবাদ দিয়ে বসল। সেই অপবাদের হাত হতে তিনি তার মাকে রক্ষা করেছেন এই ইল্‌মের মাধ্যমে।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ

'আমি ঈসাকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিয়েছি। শিক্ষা দিয়েছি তাওরাত ও ইনজিল।' [৩]

হযরত খিজির (আ.) ও ইল্‌ম

হযরত খিজির (আ.)কে মুসা (আ.)-এর ওস্তাদ বানানো হয়েছিল। তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। হযরত মুসা (আ.)কে তাঁর কাছে জ্ঞান শিখতে পাঠানো হয়েছিল। তখন হযরত মুসা (আ.)-এর জ্ঞান সংগ্রহের সফর নিয়ে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

মুসা (আ.) ও তাঁর খাদেম আমার এক বান্দার সাক্ষাত পেল, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত ও ইল্‌ম দান করেছি।[৪]

---

১. সূরা ইউসুফ, আয়াত- ২২
২. সূরা ইউসুফ, আয়াত- ৬
৩. সূরা ইউসুফ, আয়াত- ৬
৪. সূরা কাহাফ, আয়াত- ৬৫

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইল্‌ম

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা উভয় জগতে বাদশাহ বানিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে ইল্‌ম দান করেছেন–

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

'আপনাকে ওই ইল্‌ম দান করা হয়েছে, যা আপনার কাছে ছিল না। আল্লাহ আপনার ব্যাপারে অনেক ফযল ও করুণা করেছেন।'[১]

তো উল্লিখিত আম্বিয়া কেরামের কথা তো বললাম। এমনিভাবে সকল আম্বিয়া কেরামকে শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্ব দান করেছেন আল্লাহ তা'আলা ইল্‌মের বিনিময়ে। এই ইল্‌মের দ্বারাই তাঁরা এত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। তাই তো তাদের মর্যাদা ও সম্মান চিরস্থায়ী। তাই আমরাও যে সম্মান ইল্‌মের কারণে পাব, তা চিরস্থায়ী ও শাশ্বত হবে। সম্পদ দারা যে মর্যাদা বা সম্মান অর্জিত হয়, তা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। সম্পদ শেষ হয়ে গেলে সম্মানও শেষ হয়ে যায়। মানুষ আর তখন সম্মান করে না।

জ্ঞানীজন

বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী মানুষ সে যে নিজেকে ইল্‌মের অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত করে। যে নিজের দিলকে ইল্‌মের নূরে আলোকিত করে। যেন সে দুনিয়ায় মর্যাদার যিন্দেগী যাপন করতে পারে এবং কামিয়াবী হাসিল করতে পারে।

অমূল্য কথন

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) একজন বড় ফকীহ তথা ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ ও ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তিনি বলেন, যদি নেক নিয়তে ইল্‌ম শিক্ষা করে, তাহলে তালেবুল ইল্‌মের চেয়ে উত্তম আর কোনো মানুষই হতে পারে না। সত্য হলো, যে ঘরে কোনো আলেম না থাকে, সেই ঘর জীব-জন্তুর আড্ডাখানা ও চিড়িয়াখানা হয়ে যায়। এই বিষয়টিকেই কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে–

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

তারা নিকৃষ্ট জন্তুর মতো। এমনকি তার চেয়েও অধম।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

আর তারা গাফেল।[২]

---

১. সূরা নিসা, আয়াত- ১১৩

দেখুন, মানুষের যদি পথ জানা থাকে, তাহলে নিজের ল্যাংড়া গাধাকেও মনযিলে নিয়ে যেতে পারে। পথ না জানা থাকলে মোটাতাজা সুস্থ-সবল ঘোড়া নিয়ে সফর করলেও মনযিলে পৌঁছতে পারবে না। তাই ইল্‌ম থাকলে মানুষ মানুষের মতো জীবন যাপন করতে পারবে। আর ইল্‌ম না থাকলে মানুষের জীবন হয়ে যাবে পশুর জীবনের চেয়েও নিকৃষ্ট।

আমল চাই

দেখুন, চেরাগ যেমন প্রজ্বলিত হওয়া ছাড়া আলো দেয় না, ইল্‌মও তেমন আমল ছাড়া উপকার দেয় না। আমল ছাড়া ইল্‌মের মূল্য নেই। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈলের বে-আমল পীরেরা কুকুরের সমান। আর বে-আমল আলেমরা গাধার সমান। বলা হয়েছে–

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

বে-আমল পীরেরা কুকুরের মতো।[২] আর–

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا

বে-আমল আলেমরা বোঝা বহনকারী গাধার সমান।[৩]

তাই বলছি, ইল্‌ম তো শিখবেনই, ইল্‌ম তো শিক্ষা করতে হবেই আবার সেই ইল্‌ম অনুযায়ী আমলও করতে হবে। সেই ইল্‌মের উপর আমলও করতে হবে।

পাশাপাশি ইখলাস চাই

ইল্‌মের পর আরেকটু আগে বেড়ে যে বিষয়টি প্রয়োজন, তাকে বলা হয় ইখলাস। ইল্‌ম, আমল ও ইখলাস যখন একত্র হয়ে যাবে, তখন এটি একটি শক্তিতে পরিণত হয়। যে শক্তির বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা ওই লোকটিকে অকল্পনীয় মর্যাদায় ভূষিত করেন।

ইল্‌ম, আমল ও ইখলাসের বরকত

দেখুন, দুনিয়ার মধ্যে মানুষ এমন কর্ম করে দেখিয়েছে, যা জিনরাও করতে পারে না। হযরত সুলাইমান (আ.) যখন বিলকিসের সিংহাসন নিজের

---

১. সূরা আরাফ, আয়াত- ১৭৯
২. সূরা আরাফ, আয়াত- ১৭৬
৩. সূরা জুমুআ, আয়াত- ৫

কাছে নিয়ে আসতে চাইলেন, তখন ইফরীত নামক জিন দাঁড়িয়ে বলল, আমি আপনাকে এই মজলিস থেকে উঠবার আগেই ওই সিংহাসনটি এনে দিতে পারব। হযরত সুলাইমান (আ.) বললেন, এ তো অনেক দেরী! এর চেয়ে জলদি কে এনে দিতে পারবে?

তখন এক বান্দা দাঁড়ালেন–

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

'যার কাছে ইল্‌ম ছিল এমন একজন দাঁড়িয়ে বলল, আমি সিংহাসনটি আপনার পলক পড়ার আগেই এনে দিতে পারব।'[১]

তো হযরত সুলাইমান যখন পলক ফেলে আবার পলক তুলে তাকালেন, দেখতে পেলেন–

فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي

'যখন সে তাকাল, তখন সিংহাসনটিকে দেখল। তখন সে বলল, এটি আমার আল্লাহর অনুগ্রহ।'

তো এই যে বান্দা, যে এটি নিয়ে এল তার শক্তি কী ছিল? তার শক্তি ছিল তিনটি বিষয়ের সমষ্টি। তা হচ্ছে ১. ইল্‌ম ২. আমল ৩. ইখলাস। এর বরকতে এমন ঈমানী শক্তি তার কাছে সঞ্চিত ছিল। যেকাজ জিনে করতে পারেনি, সে কাজ তিনি করে দেখিয়েছেন। তো ঈমানের এই শক্তিই মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করে।

হযরত উমর (রাযি.)-এর ইল্‌ম, আমল ও ইখলাসের বরকত

ইল্‌ম আমল এবং ইখলাসের সমন্বয়ে সৃষ্ট এ শক্তিটা হযরত উমরেরও ছিল। এই শক্তির বরকতেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার নেতৃত্ব এবং বাদশাহী হযরত উমরের পায়ের নীচে রেখে দিয়েছেন। বড় সাধারণ ও ফকিরী জীবন ছিল তাঁর। কিন্তু সময়ের বড়-বড় সুপার পাওয়ারদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখতেন। বাদশাহ কায়সার ও কিসরার কেমন শোচনীয় পরাজয় তিনি করলেন। তাঁর নাম শুনে কম্পিত হতো সারাটা জাহান। কারণ কী? কারণ, তার কাছে ইল্‌ম ছিল, আমল ছিল, ইখলাস ছিল। ফলে তাঁর কাছে সেই শক্তি ছিল, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে এমন মর্যাদায় আসীন করেছেন।

---

১. সূরা নামল, আয়াত- ৪০

বাতাসের উপর শাসন

একবার হযরত উমর (রাযি.) মিম্বরে বসে বললেন–

يَا سَارِيَةَ الْجَبَلَ

'হে সারিয়া! পাহাড়।'

বাতাস আদেশটা বাহিনীর আমীরের কানে পৌঁছিয়ে দিল। বাতাসের উপর তাঁর শাসন কেমন ছিল দেখেছেন?

যমিনের উপর শাসন

তার রাজত্ব এই ভূমিও মানত। কিতাবে লেখা আছে, একবার মদীনায় ভূমিকম্প হলো। হযরত উমর (রাযি.) যমিনের উপর পদাঘাত করে বললেন, এই যমিন! এভাবে নড়ছ কেন? উমর কি তোমার পীঠে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত রাখেনি?

আগুনের উপর তাঁর রাজত্ব

একবার মদিনার বাইরে একস্থানে অগ্নি বের হলো। মদীনা তাইয়্যেবার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। হযরত উমর (রাযি.) একজন সাহাবীকে ডেকে হুকুম দিলেন, এই আগুনটাকে তার উৎসে ফিরিয়ে দাও। সাহাবী নিজের চাদরটা চাবুকের মতো আগুনের দিকে মারতে লাগলেন। আগুন পিছনে হটতে-হটতে উৎসস্থল পর্যন্ত চলে গেল। সুবহানাল্লাহ। আগুনের উপর রাজত্ব। বাতাসের উপর রাজত্ব। যমিন ও ভূপৃষ্ঠের উপর রাজত্ব।

পানির উপর তাঁর রাজত্ব

হযরত উমর (রাযি.)-এর কাছে একবার বাহিনীর আমীর সংবাদ পাঠালেন, হে আমীরুল মুমিনীন, মিসরের নীল দরিয়ার পানি প্রবাহিত হওয়ার জন্য প্রতি বছর একজন যুবতী নারী বলি দিতে হয়। হযরত উমর (রাযি.) জবাবে একটি চিঠি লিখে দিলেন। চিঠিটি নীল দরিয়ায় ছেড়ে দিতে বললেন। চিঠিটি ফেলার পর সাথে-সাথে নীল দরিয়ায় পানি প্রবাহিত হতে লাগল। সেই চিঠিতে লিখা ছিল, হে নীল দরিয়া! তুমি যদি নিজের মর্জিতে চলে থাক, তাহলে প্রবাহিত হয়ো না। আর যদি আল্লাহর মর্জিতে চলে থাক, তাহলে শোনো, আমীরুল মু'মিনীন উমর তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তুমি প্রবাহিত হও! –ইতি উমর ইবনে খাত্তাব

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়

হযরত উমর তাঁর প্রজ্ঞা, ইল্‌ম, আমল ও ইখলাসের বরকতে বাইতুল মোকাদ্দাস জয় করেছিলেন। বিজয়ের সফরে তিনি গমন করেছেন এভাবে– তিনি ও তাঁর খাদেম দুজন রওনা হলেন বাইতুল মোকাদ্দাসের পথে। উট একটি, মানুষ দুজন। তাঁরা পালাক্রমে চলতে লাগলেন। কয়েক মাইল পথ হযরত উমর উটের উপর থাকলেন আর কায়েক মাইল খাদেম উটের উপর থাকল। এভাবে চলতে-চলতে বাইতুল মোকাদ্দাসের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। তখন উটের উপর থাকার পালা ছিল খাদেমের আর লাগাম টানার পালা হযরত উমরের। আমীরুল মু'মিনীন এমন অবস্থায় দুশমন বাহিনীর সামনে উপস্থিত যে, উটের লাগাম টেনে-টেনে হাঁটছেন। গোলাম উটের উপর বসা। তার কাপড় ছেঁড়া-ফাড়া। কিন্তু চেহারায় আভিজাত্য, বীরত্ব ও পৌরুষ জ্বলজ্বল করছে। আল্লাহ্ তাঁর চেহারার গম্ভীর্য দ্বারা এমন সাহায্য করলেন যে, যখন কাফেররা তাঁকে দেখল, তখনই তাঁকে চিনে ফেলল। বলতে লাগল, এ তো ওই ব্যক্তিত্ব, যার নিদর্শন আমাদের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। ফলে বাইতুল মুকাদ্দাসের চাবি তারা তাঁর হাতে দিয়ে দিল। তো এই ইজ্জতও তিনি লাভ করেছেন ইল্‌ম আমল ও ইখলাসের সমন্বয়ে সৃষ্ট শক্তির বরকতে।

ইল্‌মের প্রদীপ প্রজ্বালিত করুন

আজ আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি বিষয় হচ্ছে, আমরা আমাদের ইল্‌মের উপর আমল করব। আজ তো আমরা ফারেগ হয়ে সনদ নিয়ে যাচ্ছি। তো যাদেরকে আল্লাহ এই সৌভাগ্য দিয়েছেন, তাদের উচিত ইল্‌মের এ প্রদীপটি প্রজ্বালিত করা, নেককার হওয়া, নেক আমল করা।

چراغ علم جلاؤ بڑا ندھیرا ہے

পথ বড় অন্ধকার; ইল্‌মের প্রদীপ জ্বালাও।

নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করে যে যেখানে যাবে, সে সেখানেই তার ইল্‌মের প্রদীপটি প্রজ্বালিত করবে। তার ইল্‌মকে ছড়িয়ে দিবে। যে পুরুষ যেখানে যাবে, সে পুরুষও তার ইল্‌মকে সেখানে প্রজ্বালিত করবে। এতেই উম্মতের মূর্খতা দূর হবে। শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হবে চারদিক। মানুষ পাবে সত্য ও ন্যায়ের দিশা। কেটে যাবে সব অন্ধকার। আসবে আলোকময় প্রহর। তবেই আমরা শামিল হতে পারব নবীজির ওয়ারিসদের কাফেলায়।

নবীজির দু'আ

আল্লাহ তা'আলার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

نَضَّرَ اللهُ امرًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا

আল্লাহ ওই ব্যক্তির চেহারাকে তরতাজা করে দিন, যে আমার কথা শুনেছে, তার উপর আমল করেছে এবং এই ইল্‌মকে সংরক্ষণ করেছে এবং লোকদের মাঝে পৌঁছে দিয়েছে।

আজ আমাদের নারীরা ইল্‌ম শিখছে। আমি আমাদের এই নারীদের বলব, হে মুহতারামা! হে আলেমা! কত সুন্দর দু'আ করে গেছেন আমাদের জন্য আমাদের নবীজি। কত প্রিয় দু'আ করে গেছেন আমাদের জন্য আমাদের নবীজি। কেন? কেন আমাদের জন্য এই দু'আ। আমাদের উচিত, আমাদের নারীদের উচিত, আমাদের মুহতারামা আলেমা ও জ্ঞানীগুণীদের উচিত তাদের ইল্‌মকে ছড়িয়ে দেওয়া। তারা যে যেখানেই যাবে– স্বামীর বাড়িতে, বাপের বাড়িতে, তারা সেখানেই নারীদের মাঝে তাদের ইল্‌মকে ছড়িয়ে দিবে। তারা নারীদের দীন শিক্ষা দিবে। নিজের সন্তানকে দীন শিক্ষা দিবে। কুরআন শিক্ষা দিবে। মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা দিবে। তালীম করবে। তারা ইল্‌ম শিক্ষা করে বসে থাকা উচিত হবে না। কোনোভাবেই তাদের জন্য উচিত নয় তারা নিজেরা ইল্‌ম শিখে বসে থাকবে। বরং তাদের কর্তব্য হচ্ছে যেখানেই সুযোগ হয়, সেখানেই নারীদের মাঝে এবং মাহরামদের মাঝে নিজের ইল্‌মকে ছড়িয়ে দেওয়া, দ্বীনের ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করা।

একটু চিন্তা করুন

আপনি যদি দ্বীনের জন্য এই কাজটি করেন, সকলকে দীন শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা করেন এবং মানুষকে দীন শিক্ষা দান করেন, তাহলে আল্লাহ আপনার ইজ্জত অকল্পনীয়ভাবে বাড়িয়ে দেবেন। আজো যে ব্যক্তি ইজ্জত চায়, তার জন্য পথ এটিই যে সে ইল্‌ম শিখবে। সে ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করবে এবং ইখলাস অর্জন করবে। এই তিনটি জিনিস অর্জন করেই দেখুন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কেমন সম্মান করেন। শুধু ইল্‌ম শিক্ষা করলেই হবে না। আবার ইল্‌ম শিখে শুধু আমল করলেই হবে না। সাথে-সাথে ইখলাসও লাগবে। অর্থাৎ তিনটি বিষয়ই একসাথে থাকতে হবে। তবেই আমরা কামিয়াব হতে পারব। আমরা যে যেটুকু ইল্‌মই শিক্ষা করব, তা অন্যকে শিখানোর চেষ্টা করব। দীনকে অন্যের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা আমাদের সন্তানদের দীন শিক্ষা দেব, কুরআন শিক্ষা দিব। আবার পাড়া-পড়শী ও আত্মীয়-স্বজনকে দীন শিক্ষা দিব, তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিব।

গুনাহ্ থেকে মাফ চাইবে

আমরা আজ পর্যন্ত যত গুনাহ করেছি, আমাদের উচিত আজকের এই মাহফিলেই আল্লাহ রাব্বুল ইযযাতের কাছে পাক্কা তাওবা করে মাফ চাওয়া। অন্তরে ইরাদা করা যে, হে রবে কারীম! যা হয়ে গেছে, তা তো চলে গেছেই। আমরা অনুতপ্ত। আমরা লজ্জিত। রবে কারীম! সামনে যতদিন হায়াত পাব ততদিন নেক কাজ করে যাওয়ার তাওফীক দান করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়ায় ইল্‌ম দান করেছ। হে আল্লাহ! এই ইল্‌মের দাবিকে রক্ষা করার তাওফীক দান করো। এমন যেন না হয় যে, আমরা আমাদের ইল্‌মের কারণে উল্টো বিপদে পড়ে যাই। এমন যেন না হয়, ইল্‌ম আমাদের জন্য লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বরং আমাদের গুনাহমুক্ত জীবন দান করো। আমাদের গুনাহ থেকে হেফাজতে রাখো। বহু আলেম অতীত হয়েছেন। তারা তো পূত-পবিত্র ছিলেন। তাদের জীবন তো গুনাহমুক্ত ছিল। তাদের জীবন সুন্দর, পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত ছিল। আমাদেরকে তাদের মতো জীবন যাপন করার তাওফীক দান করো। আমাদেরকে ইল্‌মের উপর আমল করার তাওফীক দান করো। আমাদেরকে ইখলাস দান করো। ইল্‌মকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তাওফীক দান করো। অন্যকে ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়ার তাওফীক দান করো।

তো এভাবে বেশী-বেশী করে আল্লাহর কাছে দু'আ করবে। বারবার চাইবে। বারবার দু'আ করবে। মায়ের কাছে বারবার কোনো জিনিস চাইলে প্রথম-প্রথম মা ধমক দিলেও পরে তা দিয়ে দেন। তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলাও আমরা বারবার চাওয়ার পর একদিন দিয়েই দিবেন।

عمل کی اپنے اساس کیا ہے
بجز ندامت کے پاس کیا ہے
رہے سلامت تمہاری نسبت
میرا تو بس آسرا یہی ہے

আজ তো আমলের কোনো ভিত্তি নেই। কী আছে আমার? আজ তো শুধু লজ্জার প্রহর পার করছি। এ ছাড়া আর কী আছে আমার? তোমার সাথে যে সম্পর্কটা আমার হয়েছে হে মালিক, তা নিরাপদ থাকাই যথেষ্ট আমার জন্য। আমি তো এটিই চাই।

তো আল্লাহ যেমনিভাবে এই ইল্‌ম দান করে একটি বাহ্যিক সংযোগ আমাদের সাথে করেছেন, তেমনিভাবে কিয়ামতের দিনও আমাদেরকে তোলাবা ও উলামায়ে কেরামের কাতারে স্থান দিন। এটুকুই আমাদের মাগফিরাতের মাধ্যম ও উসীলা হবে।

নিজের আমিত্বকে মিটিয়ে দিন

অনেক সময় মানুষের আমিত্ব মানুষকে উন্নতি ও অগ্রগতি করতে বাধা দান করে। নিজের এই নফসকে দমিয়ে রাখতে হবে। আমিত্বকে মিটিয়ে দিতে হবে। বিনয়ী ও বিনম্র হতে হবে।

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ

'যে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হবে, আল্লাহ তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেবেন।'

আল্লাহর দরজা

আমরা সত্য দিলে প্রাণ খুলে মাফ চাইব, বারবার আল্লাহর দরজায় হাজিরী জানাব। বারবার দরজায় করাঘাত করব। কেউ কারো দরজায় দাঁড়িয়ে বারবার করাঘাত করলে একবার না একবার সে দরজা খুলে দেওয়া হয়ই। তেমনই আল্লাহর দরজায় করাঘাত করতে হবে। তবে অন্তরে পাক্কা একীন থাকতে হবে। দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। তাহলেই একদিন না একদিন আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাফ করে দিবেন। ইজ্জত দান করবেন। ক্ষমা করে দিবেন এবং কবুল করে নিবেন।

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করুন

আল্লাহকে ততদিন পর্যন্ত ডাকতে থাকতে হবে, যতদিন পর্যন্ত তিনি রাজি না হন। ওই দরজাকে আঁকড়ে ধরে রাখুন। দিন-রাত দু'আ করতে থাকুন। তাহাজ্জুদ পড়ুন। নফল পড়ুন। নির্জনে বসুন। আল্লাহকে ডাকুন। আল্লাহর সামনে সিদজাবনত হয়ে দু'আ করতে থাকুন। রবে কারীমকে রাজি করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ রাজি হলে সারা জগত রাজি হয়ে যাবে। যদি আল্লাহ রাজি হয়ে যান, তাহলে সারা দুনিয়ায় ইজ্জত পাবে । তার দরজায় দৃঢ়ভাবে জমে থাকুন, যেন আল্লাহ আমাদের জন্য উত্তম কিছুর ফয়সালা করে দেন।

একজন গ্রাম্যলোকের আশ্চর্য দু'আ

আমার বেশ মনে পড়ছে একজন গ্রাম্যলোকের কথা। তিনি একজন সাহাবী। মসজিদে নববীতে এসে দু'আ করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ فَاِنَّكَ لَا تَغْفِرْ فَاغْفِرْ

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। যদি আমাকে তুমি ক্ষমা নাও করতে চাও, তবুও তুমি আমাকে মাফ করে দাও। বারবার এই দুই করতে থাকলেন। চিন্তা করুন, যখন এমন বিনয়ের সাথে কোনো বান্দা আল্লাহর দরজায় কাকুতি-মিনতি পেশ করে দু'আ করতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল না করে পারেন না। আল্লাহর রহমতে তখন জোয়ার এসে যায়। আল্লাহ তা'আলা তখন মেহেরবানি করেন। আমাদের ডেকে-ডেকে বলছে–

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

'আমার বান্দাদের বলে দিন, যারা গুনাহের মধ্যে ডুবে আছে, তোমরা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা।'[১]

اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا

'নিশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহকে মাফ করে দেন।'[২]

আল্লাহ আমাদের রহমত করুন। আমাদের ভুলগুলো, আমাদের ভ্রান্তি গুলো মাফ করে দিন। সামনে যত দিন হায়াত আছে, ততদিন ইল্‌মের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

১. সূরা যুমার, আয়াত- ৫৩

২. সূরা যুমার, আয়াত- ৫৩

'আমাদের জীবন কত রূপ-রঙে, কত বর্ণে সাজানো। এই যে আঁতুড়ঘরে ছোট শিশু কটা দিন পড়ে থেকে পরে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শুরু করে লাউয়ের ডগার মতো। আর কটা দিন পরেই শুরু করে হাঁটতে। তারপর তার জীবনে শৈশব আসে, কৈশোর আসে। তারুণ্য আসে, যৌবন আসে। তারপর শেষে আসে জীবনের পড়ন্ত বিকেল। এভাইে তো চলছে জীবন। চলছে পরিক্রমা।

মানুষের জীবনের গতিধারা প্রত্যেক ৮ বছর পর-পর পরিবর্তন হয়। প্রথম আট বছর খেলা-ধুলায় কাটে। ২য় আট বছর কাটে দৌড়-ঝাঁপ আর অর্থহীন কাজে। তৃতীয় আট বছর সৌন্দর্য ও রূপচর্চায়। তার পরের আট বছর একে অন্যে বড়াই করে কাটে। তারপরের আট বছর কাটে সম্পদ উপার্জনে।

এভাবে পাঁচটি স্তরে জীবন কাটে। সাঙ্গ হয় হায়াত। তারপরই হুঁশ আসে, হায়! হায়! আমাকে দুনিয়ায় কেন পাঠানো হয়েছে আর আমি কী করছি! অথচ এই চিন্তাটা সেই প্রথমেই করা উচিত ছিল।'

হৃদয়কাড়া নসীহত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُعْرِضُوْنَ. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

মানবজীবনে তিনটি দিনের গুরুত্ব

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ

মানুষের হিসাবের দিন নিকটে এসে গেছে।[১]

وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

আর তারা গাফলতের মধ্যে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।[২]

মানবজীবনে তিনটি দিনের অনেক গুরুত্ব রয়েছে–

এক. ওই দিন, যে দিন সে এই দুনিয়ায় আগমন করেছে। সেই দিনটি তার জীবনের কয়েকটি বিষয় নির্ধারণ করে দেয়। কতদিন দুনিয়ায় থাকতে হবে? কী-কী রিযিক ভক্ষণ করবে? লোকটি সৌভাগ্যবান হবে, না দুর্ভাগা হবে। আল্লাহ তা'আলা আযলী ইল্‌মের দ্বারা এসব বিষয় আগেই লিখে রেখেছেন। আল্লাহ চাহেন তো সেই দিনটি মানুষের জন্য ভালো হোক। ভালো ভাগ্য নিয়েই দুনিয়াতে লোকটি আগমন করুক।

দুই. ২য় দিনটি হচ্ছে ওই দিন, যেদিন মানুষটি দুনিয়া থেকে কবরে যাবে। সেই দিনটি মানুষের জীবনে বড় গুরুত্বপূর্ণ দিন।

তিন. তৃতীয় ওই দিন, যেদিন মানুষ আপন রবে কারীমের সামনে পুনরুত্থিত হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। হে আল্লাহ! ওই দিনটিকে আমাদের জন্য সকল দিন থেকে উত্তম দিন বানিয়ে দিন। হযরত ঈসা (আ.) দু'আ করেছেন–

---

১. সূরা আম্বিয়া, আয়াত- ১

২. সূরা আম্বিয়া, আয়াত- ১

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

'আমার উপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক যেদিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি। যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমাকে পুনরায় উঠানো হবে।'[১]

সবচেয়ে বড় ধোঁকা

এ জীবন আমাদের জন্য একটি সুযোগ। এ সুযোগ আমাদের দেওয়া হয়েছে আখেরাতের সামানা অর্জন করার জন্য। আজ আমরা আখেরাতের সামানা অর্জনের পরিবর্তে দুনিয়ার সামানা অর্জনের পিছনে পেরেশান হয়ে ঘুরে ফিরছি। আমরা চিন্তা করি, আমার ব্যস্ততা কমলে আমি ইবাদাত করব। আমার সব হাজত শেষ হয়ে গেলে আমি রাত-দিনের জন্য ইবাদতে মগ্ন হয়ে যাব। কুরআনের ভাষায় একে সবচেয়ে বড় ধোঁকা বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই ধোঁকা-প্রতারণার শিকার শুধু সাধারণ পাবলিকই হয় না; বরং আলেমরাও এই ধোঁকায় পড়ে যায়। সে অপেক্ষা করে, যখন সময় পাব, বুড়ো হয়ে যাব, অবসর হয়ে যাব, কাজ-কাম থাকবে না, তখন আমি ভালো হয়ে যাব, নেককার হয়ে যাব, আমলদার হয়ে যাব। আমার মৃত্যু যে কখন হয়ে যাবে, তার কথা চিন্তা করি না। দেখা যায়, ভালো হব ভালো হব করতে-করতে হঠাৎ একদিন মৃত্যু চলে আসে।

তাই পেরেশানি থাকুক আর না থাকুক, ব্যস্ততা থাকুক আর না থাকুক সর্বাবস্থায় আখেরাতের প্রস্তুতি নিতে হবে। যদি সুখ, শান্তি ও অবসর থাকে, তাহলে শোকর আদায় করবে। আর যদি পেরেশানি আসে, ব্যস্ততা আসে, তাহলে সবর করবে। শোকর আদায়কারীও জান্নাতী, সবরকারীও জান্নাতী।

জীবনের নানা দিক নানা স্তর

মানুষের জীবনের নানা দিক ও নানা স্তর রয়েছে। এগুলোকে জীবনের ধাপ বলা হয়। যেমন– মানুষ যখন বাচ্চা বয়সে থাকে, তখন তার ভাবনা থাকে খেলার দিকে। বয়স বাড়ার সাথে-সাথে তার রুচি ও চিন্তা-চেতনার মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে থাকে। হযরত নাজমুদ্দীন নাসাফী (রহ.) লিখেছেন, মানুষের জীবনের গতিধারা প্রত্যেক আট বছর পর-পর পরিবর্তন হয়। প্রথম আট বছর খেলাধুলায় কাটে। ২য় আট বছর দৌড়ঝাঁপ আর

---

১. সূরা মারয়াম, আয়াত- ৩৩

অর্থহীন কাজে। পরের আট বছর সৌন্দর্য ও রূপচর্চায় যায়। তারপরের আট বছর একে অন্যে বড়াই করে-করে যায়। তারপরের আট বছর মাল উপার্জনের পেছনে যায়। এভাবে পাঁচটি স্তরে জীবন কাটে। পরে হুঁশ আসে, হায়-হায় আমাকে দুনিয়াতে কেন পাঠানো হয়েছে আর আমি কী করছি!

সফল মানুষ

যে ব্যক্তি যিকিরে-ফিকিরে এবং সুলূকের পথে নিজের জীবন ব্যয় করবে, তাকে সর্বস্থানে এই তালীমই দেওয়া হয় যে, এক হাতে ধারণ করো কুরআন আর অপর হাতে ধারণ করো নবীজির সুন্নাত। যে তার জীবনে এই দুটি জিনিস ধারণ করতে পারবে, সে কামিয়াব হয়ে যাবে।

আল্লাহ রাবুল ইযযাত সাওয়াব দেওয়ার জন্যেই মানুষ বানিয়েছেন। আযাব দেওয়ার জন্যে তো তিনি মানুষ পয়দা করেননি। আল্লাহ তা'আলা চান আমার বান্দা নেক আমল করুক। ইবাদত করে-করে তারা আমার থেকে নেয়ামত নিক। অথচ আজ আমাদের জীবন ভিন্ন রকম। কতক মানুষ আছে, তারা এই দুনিয়ায়ই সব কিছু পেয়ে যেতে চায়। আবার কতক মানুষ আছে, তারা পেতে চায় আখেরাতে।

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ

'তাদের মধ্যে কতক আছে দুনিয়া পেতে চায়। আর কতক আছে আখেরাত পেতে চায়।'[১]

খারাপ লোকদের পরিচয়

হযরত ইবনে আবাস (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদের সবচেয়ে খারাপ লোকটার কথা বলে দেব? বলা হলো, হে আল্লাহর নবী! অবশ্যই বলে দিন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ওই ব্যক্তি, যে সারা পথে একা-একা খায় আর গোলামকে মারে। একা-একা খায় মানে মিলে-মিশে থাকার অভ্যাস তার নেই। আর গোলামকে মারে মানে নিজের অধীনদের উপর কড়াকড়ি করে। অধীনদের কষ্ট দেয়। তারপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি কি এর চেয়েও নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে তা বলে দেব? বলা হলো, বলুন হে আল্লাহর নবী! নবীজি সাল্লাল্লাহু

---

১. সূরা আল ইমরান, আয়াত- ১৫২

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি লোকদের সাথে শত্রুতা রাখে, সেই ব্যক্তি উপরোক্তদের থেকেও নিকৃষ্ট। তারপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এরপর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কে আমি কি তাও বলে দেব? বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! বলে দিন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, এমন ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তির চেয়েও নিকৃষ্ট, যে নিজে নেক কাজ করে না আর তার খারাপ কাজ থেকে লোকেরা নিরাপদ থাকে না। তারপর বলা হলো, আমি কি তোমাদের এমন একজনের কথা বলে দেব, যে তার চেয়েও নিকৃষ্ট? বলা হলো, জি; বলে দিন। বললেন, ওই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যে কাউকে মাফ করে না এবং যে কারো ওজর-আপত্তি মেনে নেয় না।

তো দেখুন এবার আমাদের মাঝে খারাপ কে?

ভালোবাসা এমনই হতে হবে

মাখলুকের মধ্যে মা-ই এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি তার অবাধ্য ও পাপী সন্তানকেও ভালোবাসেন। সন্তান ভালো-নেককার হলেও মহবত করেন আবার বদকার-অবাধ্য হলেও মহবত করেন। এটি মায়ের বৈশিষ্ট্য। আর আল্লাহ রাবুল ইযযাত এমন এক সত্ত্বা, যে বান্দাই কালিমা পড়ে নেয়, আল্লাহ রাবুল ইযযাত ওই বান্দাকেই মহবত করেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা রহমানও এবং রাহীমও, হান্নানও, মান্নানও। কারীমও, কাদীরও। তো মানুষ নেক কাজে অগ্রসর হোক আর বদ কাজে অভ্যস্ত হোক কারো সাথে আল্লাহর দুশমনি নেই। গুনাহগার হলেও সেই বান্দাকে আল্লাহ তার দরবার থেকে মাহরুম করেন না। অন্যায় ও পাপাচারকে ঘৃণা করতে হবে। কিন্তু যে বান্দা ওই পাপে মগ্ন, সেই বান্দাকে ঘৃণা করা যাবে না।

সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি

এক হাদীছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, উম্মতের মধ্যে এমন লোকও হবে, যে রং-বেরংয়ের খাবার খাবে, নানা রকম পানীয় পান করবে আর খুব কথা বানিয়ে বেড়াবে। সে হবে আমার উম্মতের সবচেয়ে মন্দ মানুষ। আজ যে মানুষের খুশির সময় এসে গেছে, সুখের দিন এসে গেছে, সে অন্যদের নিকৃষ্ট মনে করে। সে তার অতীত ভুলে যায়। সে ভুলে যায়, পরীক্ষা তারও হতে পারে। দিন বদলাতে সময় লাগে না।

একটি সতর্কবাণী

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মুসিবতে খুশি হয়, আল্লাহ তা'আলা এই ব্যক্তিকে ওই সময় পর্যন্ত মৃত্যু দিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যক্তি ওই মুসিবতের শিকার না হবে। অন্য এক হাদীছে এসেছে, যদি কোনো মানুষ কোনো গুনাহ করে ফেলে; কিন্তু পরে আল্লাহ রবুল ইযযাতের দরবারে সত্য তাওবাও করে নেয়, এখন তাওবা করার পরও যদি কোনো ব্যক্তি ওই লোকটিকে ভর্ৎসনা দেয়, তাহলে রাবুল ইযযাত এই ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিবেন না, যতক্ষণ এই লোকটি এই গুনাহের শিকার না হবে। তাই কাউকে পেরেশানি ও মুসিবতে দেখে কখনও খুশি হওয়া যাবে না। কাউকে কোনো কারণে ভর্ৎসনা দেওয়া যাবে না। কারণ, হতে পারে, লোকটি দিলে-দিলে তাওবা করে নিয়েছে।

তাহাজ্জুদ থেকে মাহরুম হয়ে যাওয়ার কারণ

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেছেন, আমি একবার একটি গুনাহ করেছি। এর কারণে আমাকে পাঁচ মাসের জন্য তাহাজ্জুদ নামায থেকে মাহরুম করে দেওয়া হয়েছে। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, হযরত কী গুনাহ করেছিলেন? বললেন, এক ব্যক্তি কেঁদে-কেঁদে দু'আ করছিলেন। আমি মনে করলাম, এ লোকটি রিয়াকারী। আমার এ বদগুমানি ও ভুল ধারণার কারণেই আল্লাহ আমাকে পাঁচ মাস তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। তো আজ যাদের কাজই সকাল-সন্ধ্যায় শুধু বদগুমানি করা, খারাপ কথা বলা, তাদের তো মনে হয় ঈমানেরই খবর নেই।

নিজের চিন্তা করুন

মুহতারাম হাজিরীন! ওই রাতের কথা স্মরণ করুন, যে রাতের প্রভাতে কিয়ামত হবে। যেদিন আমার আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে হবে–

كُلُّ امْرِءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

প্রত্যেক বান্দা যা করেছে, তার ব্যাপারে সে রেহনের মালিক হয়ে আছে।'[১]

তাই প্রত্যেক বান্দা নিজ আমলের হিসাব দিতে হবে। আমাদের হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) বলেছেন, নিজের ফিকির নিজে করুন। নিজের চিন্তাটা

---

১. সূরা তূর, আয়াত- ২১

অন্তত নিজে করুন। অন্যের পেছনে পড়ে থাকবেন না। চোখ খোলা রাখুন। অন্তর জাগ্রত রাখুন। চেতনা সতেজ রাখুন। যখন অন্যের ভুল-ত্রুটির দিকে দৃষ্টি পতিত হয়, তখন নিজের আমলও আখলাকের কথাও একটু চিন্তা করুন। নিজের দিকে একটু লক্ষ করুন। অন্যের দোষ দেখা সহজ; নিজের দোষ নিজে ধরা কঠিন। নিজেকে বাঁচানোর ফিকির করুন। জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।

আল্লাহর যিকিরের গুরুত্ব

বেশী-বেশী যিকির করার দ্বারা মানুষের অন্তরের ও চিন্তার পঙ্কিলতা দূর হয়। একথা অন্তরে বদ্ধমূল করে রাখুন যে, সর্বদা চিন্তার পঙ্কিলতার কারণেই মানুষ যিকির থেকে দূরে সরে পড়ে। যে ব্যক্তি শয়তানের ওসওয়াসার শিকার, যে ব্যক্তি পেরেশানির কবলে পতিত, তারও একথা স্মরণ রাখা চাই যে, সকল সমস্যা ও সকল পেরেশানি শুধু আল্লাহ রাবুল ইযযাতই দূর করতে পারেন। তাই সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ রাখবে, আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকবে।

একটি হাদীছ

হাদীছ শরীফে এসেছে, যখন কোনো পাখি আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখ হয়ে অন্য ধ্যানে মশগুল হয়ে যায়, তখন শিকারকারী পাখিটিকে শিকার করে ফেলে। চিন্তা করুন, পাখি যখন যিকিরবিমুখ হয়ে যায়, তখন সে শিকারীর কবলে পড়ে যায়। তো আমরা যখন যিকিরবিমুখ হয়ে যাব, আমাদেরও শয়তান শিকার করে ফেলবে।

بسم الله الرحمن الرحيم সম্পর্কে আলোচনা

বিসমিল্লাহকে (تسمية) তাসমিয়াও বলা হয়। অথচ আমরা প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ার অভ্যাস করতে পারিনি। আমরা আমলে কত পিছিয়ে আছি!

মানবজাতির সতর

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি নিজের কাপড় পরিবর্তন করতে চায়, তখন যদি সে বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়, তাহলে তার মাঝে এবং ফেরেশতাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলা একটি আড়াল তৈরি করে দেন। তখন জিন হোক আর ফেরেশতা হোক অদৃশ্যের কেউ ওই বান্দার বিবস্ত্র দেহ দেখতে

পায় না। এখানে একটি সূক্ষ্ম কথা এই যে, বিসমিল্লাহর দ্বারা যদি এমন আড়াল সৃষ্টি হতে পারে, তাহলে আমরা যদি সারা জীবন সব কাজের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠে অভ্যস্ত হয়ে যাই, তাহলে আমাদের মাঝে ও জাহান্নামের ফেরেশতাদের মাঝেও আল্লাহ তা'আলা আড়াল তৈরি করে দিবেন।

জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাওয়ার অর্থ

بسم الله الرحمن الرحيم -এর মধ্যে ১৯টি হরফ আছে। আবার জাহান্নামের ফেরেশতাও ১৯ জন। তাদেরকে জাহান্নামের দারোগা বলা হয়। তো বিসমিল্লাহর ১৯ হরফ আবার জাহান্নামের ফেরেশতাও ১৯ জন। প্রত্যেক হরফ একেকজন ফেরেশতা থেকে বাঁচার উসীলা হয়ে যাবে। তাই বেশী-বেশী বিসমিল্লাহ পাঠের অভ্যাস করবে।

গুনাহের কাফফারা

بسم الله الرحمن الرحيم এর মধ্যে শব্দ আছে মোট ৪টি। আর গুনাহ হয়ে থাকে চার প্রকার।

১. প্রকাশ্যে
২. অপ্রকাশ্যে
৩. দিনে
৪. রাতে।

চার বর্ণের একেকটি শব্দ একেক প্রকার গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে।

তিন প্রকার গুনাহ থেকে মুক্তি

বিসমিল্লাহর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা নিজের তিনটি নাম ব্যবহার করেছেন। (১) আল্লাহ (২) রাহমান (৩) রাহীম। আর গুনাহের তিনটি স্তর রয়েছে। ১. কুফর-শিরক ২. কবীরা গুনাহ ৩. অন্যান্য গুনাহ।

তো কুফর থেকে বাঁচা, কবীরা গুনাহ ছাড়া; ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্তি পাওয়া এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা। যে ব্যক্তি নিজের প্রত্যেক কাজে বিসমিল্লাহ পড়বে, সে সব প্রকার গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে।

আল্লাহর সন্তুষ্টির দলিল

যখন কোনো মানুষ অন্যের কাছে চিঠি লেখে, তখন শুরুতে জানা হয়ে যায় লোকটির স্বভাব কেমন। লোকটি কি সন্তুষ্ট, না অসন্তুষ্ট। লোকটি কি

খুশী, না বেজার। কুরআনের শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখা আছে। এই বিসমিল্লাহর কথাই আমরা বলছি। এই বিসমিল্লাহ আমাদের বলে দিচ্ছে, আমাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট। কুরআন তো আমাদের প্রতি আল্লাহর চিঠি।

বিসমিল্লাহতে আল্লাহর রহমত তথা দয়াশীল ও রহীম অর্থাৎ করুণাময় এ দুটি নাম আনা হয়েছে। কত সুন্দর করে বলা হয়েছে, রহমান ও রহীম আল্লাহর নামে শুরু। এমন তো বলা হয়নি– بِسْمِ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ – قهار ও جبار এবং এ জাতীয় সিফাত নাম ব্যবহার হয়নি, যেগুলোর অর্থ হলো আল্লাহ কিন্তু শক্তিমান, আল্লাহ কিন্তু বিশাল ক্ষমতাবান। তিনি প্রতাপশালী। এমন সব নাম তো ব্যবহার করা হয়নি বিসমিল্লাহয়। এর দ্বারাই বোঝা যায়, কুরআন নামক চিঠির প্রেরক মহান আল্লাহ আমাদের উপর সন্তুষ্ট।

আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ ভালো কিছু ফয়সালা করে রেখেছেন। তিনি বান্দাকে আযাব দিতে চান না। তিনি বান্দাকে সাওয়াব দিতে চান। তিনি বান্দাকে নাজাত দিতে চান। তো আমাদের উচিত সব কাজে বিসমিল্লাহ পড়ার অভ্যাস করা।

নেয়ামতের মূল্যায়ন করা চাই

الحمد لله কত সংক্ষিপ্ত একটি শব্দ। নিজেদের কথাবার্তায় এই শব্দগুলো বলার অভ্যাস করবে। আল্লাহর নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় বরবে। আরেকটি বিষয় শুনুন। নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়ার আগেই শুকরিয়া আদায় করুন। নেয়ামত হারিয়ে যাওয়ার আগেই ওই নেয়ামতের মূল্যায়ন করুন। কত মানুষ আছে, দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী ভালোভাবে থাকে না। স্ত্রীর সাথে স্বামী ঝগড়া করে। স্বামীর সাথে স্ত্রী ঝগড়া করে। যখন কোনোভাবে কোনো দুর্ঘনা ঘটে যায়, ঝগড়ার ফাঁকে একে অন্যকে তালাক দিয়ে দেয়, তখন দুজনই কাঁদে। স্বামীও হায়-হায় করে কাঁদে। স্ত্রীও হায়-হায় করে কাঁদে। এজন্য নেয়ামত থাকতেই এর মূল্যায়ন করবে এবং শুকরিয়া আদায় করবে। মারা গেলেও একই রকম করে। আগে বউয়ের মূল্য বুঝে আসে না। আগে স্বামীর মূল্য বুঝে আসে না। মারা যাওয়ার বা তালাক হয়ে যাওয়ার পরে কান্নাকাটি থামানো যায় না। অথচ আগেই বুঝে-শুনে কাজ করা উচিত ছিল।

আলহামদুলিল্লাহ বললে পুরস্কার পাওয়া যায়

বান্দা যদি নিজের যিন্দেগীতে সর্বদা বেশী-বেশী আলহামদুল্লিাহ পড়ে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ওই বান্দাকে দুটি পুরস্কার দিবেন। এক. আল্লাহ

তা'আলা কঠিন ও করুণ পরিস্থিতিতেও সবকিছু সহজ করে দেন। মুখাপেক্ষী হলে আল্লাহ তা'আলা তার সংকীর্ণতা দূর করে দিবেন এবং তার জীবনে প্রশস্ততা দান করবেন। দুনিয়ার ঝামেলা থেকে নাজাত দান করবেন। তাই নিজের সব কাজ শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ বলবে এবং কাজ শেষ হলে আলহামদুলিল্লাহ বলবে।

আলহামদুলিল্লাহ শব্দে আটটি হরফ আছে। আর জান্নাতও আটটি। প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে যেন একটি করে জান্নাত।

কালিমায়ে তায়্যিবা

لا اله الا الله এমন একটি কালিমা, যা পড়লে মানুষ কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মাঝে শামিল হয়ে যায়। সব সময় কালিমা জপতে থাকবে। لا اله الا الله -এর যিকির তো আমাদের নকশবন্দী তরীকায় স্বতন্ত্র একটি সবক। لا اله الا الله বেশী-বেশী পড়তে হবে। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে لا اله الا الله পড়তে থাকবে। এই কালিমাটি আশ্চর্য সব হেকমত ও বরকতে পরিপূর্ণ।

প্রথম মর্ম : لا اله الا الله -এর হরফসমূহকে যদি আপনি গণনা করেন, তাহলে দেখবেন ১২টি হরফ আছে। আবার দেখবেন مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ الله এর মধ্যেও ১২টি হরফ আছে। তো যে বান্দা لَا اِلٰهَ اِلَّا الله -এর যিকির বেশী-বেশী করবে, আল্লাহ তা'আলা তার ১২ মাসের গুনাহ মাফ করে দিবেন।

দ্বিতীয় মর্ম : দিনে ও রাতে ঘন্টা মোট ২৪টি। আরো পুরো কালিমা তথা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ الله ২৪ টি হরফ ২৪ ঘন্টার গুনাহকে মাফের উসীলা হয়ে যায়।

তৃতীয় মর্ম : কালিমাটির মধ্যে মোট ৭টি শব্দ আছে। لَا اِلٰهَ اِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ الله গণনা করে দেখুন ৭টি শব্দ আছে। আর মানুষ ৭ অঙ্গে গুনাহ করে। (১) চোখ (২) কান (৩) জিহা (৪) হাত (৫) পা (৬) লজ্জাস্থান (৭) পেটে হারাম ভক্ষণ করে।

তো যে ব্যক্তি কালিমার ৭টি শব্দ বেশী-বেশী জপবে, আল্লাহ তা'আলা তার ৭ অঙ্গে সংঘটিত গুনাহকে মাফ করে দিবেন। আর জাহান্নামের দরজা ৭টি। কালিমার এক-একটি শব্দ জাহান্নামের এক-একটি দরজা থেকে মুক্তি দেওয়ার উসীলা হবে।

চতুর্থ মর্ম : কালিমাটির মাঝে যে কী আজব হেকমত! এতে নুকতাওয়ালা একটি হরফও নেই। এই কালিমা একথাই বোঝায় যে, আল্লাহ তা'আলা এতে আপন একক সত্ত্বার পয়গাম দিচ্ছেন। যেন বলে দিচ্ছেন, আমার দরবারে কোনো শিরক নেই।

পঞ্চম মর্ম : এমন কতগুলো হরফই তাতে বিদ্যমান, যা নুকতামুক্ত। তাই কালিমা আমাদের তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছে।

ষষ্ঠ মর্ম : আরবী হরফ অনেক প্রকার আছে। কিছু হরফ কণ্ঠনালী থেকে উচ্চারিত হয়। কিছু হরফ ঠোঁট থেকে, কিছু হরফ দাঁতের গোড়া থেকে, কিছু হরফ জিহা থেকে বের হয়। কিন্তু এই কালিমার মধ্যে এমন হরফই বিদ্যমান, যা মাঝামাঝি স্থান থেকে বের হয়। তার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেমনিভাবে এ হরফ তোমাদের মুখের ভেতর থেকে উচ্চারিত হয়, তেমনিভাবে এই কালেমা তোমাদের দিল থেকে উচ্চারিত হবে। আল্লাহ রবুল ইযযাতের দরবারে কবুল হবে। তো আমাদের উচিত কালিমার যিকির বেশী-বেশী করা। এই আমল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সকাল-সন্ধার আমলরূপে বর্ণিত হয়েছে।

মাসনূন দু'আসমূহের দুটি বড় ফায়েদা

দুটি কথা মাথায় রাখুন। এক. যে ব্যক্তি মাসনুন দু'আকে সঠিক সময়ে পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আত্মাকে প্রশান্ত রাখবেন। আর ভাই! অনেকে তো এই মাসনূন দু'আর উপর আমল করে-করেই নেসবতের নূর হাসিল করে ফেলেছেন। তাদের অন্য কোনো মুজাহাদা ছিল না। শুধু মাসনূন দু'আর ইহতেমাম করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয়কে এতটা পূর্ণ করে দিয়েছেন যে, নূরের দ্বারা তাঁরা সাহেবে নেসবত হয়ে গেছেন। দুই. যে ব্যক্তি মাসনূন দু'আসমূহ পড়ার অভ্যাস বানাবে, তার আর তাবীজ-কবচ ও অন্যান্য তদবীর করতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার রক্ষক হয়ে যাবেন। সর্ব প্রকার পেরেশানি থেকে আল্লাহ তা'আলা তাদের রক্ষা করবেন। তাই দু'আ করা চাই–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْمُعَافَاتِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

'হে আল্লাহ! আমি দুনিয়াতেও, আখেরাতে তোমার কাছে সুখ চাই।'

এখানে معافات মানে মানুষটির জীবন হবে শান্তিময়। তার জীবনে বিপদ-আপদ আসবে না। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন তার অনুভূত হবে না। কোনো মুদাবির তথা কবিরাজের কাছে যেতে হবে না। আপন যিন্দেগীতে নিজের কোনো ভাইয়ের মুখাপেক্ষী হবে না।

রোযা ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন

সময়ে-সময়ে রোযা রাখা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন বৃদ্ধি করে। সালেকীনকে রূহানী সবক দেওয়া হয় যে, যতটুকু পরিমাণ পেট খালি রাখবে, ততটুকু পরিমাণ অধ্যাত্মিক উন্নয়ন হবে। কারণ, খাবার-দাবার নাপাকি তৈরি করে। আর না খেয়ে রূহানী সাধনা পবিত্রতার সাথে সম্পর্ক রাখে। আজ যে আমাদের এই অবস্থা, তা আমল আদায় না করারই কুফল। আবার এই যে পেট ভরে-ভরে শুধু খাই, তাও একটি বড় কারণ।

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেছেন, যেদিন আমি দুবার খাই, সেদিন তো আমি বুঝতেই পারি না ক্ষুধা কাকে বলে। আহ বন্ধুরা! আজ তো আমরা তিন বেলা খাবার খাই। তো পেটকে ক্ষুধার্ত রাখার দ্বারা, যিকির দ্বারা যে নূর হাসিল হয়, তা অর্জিত হয়ে যায়। বরং যুবকরা যদি রোযা রাখে, তাহলে সকল বিষয়ে তাদের একনিষ্ঠতা বিদ্যমান থাকে।

আম্বিয়া কেরাম (আ.) ও নফল রোযা

হযরত ইবনে আবাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হযরত ঈসা (আ.) সারাটা মাস রোযা রাখতেন। হযরত সোলাইমান (আ.) প্রত্যেক মাসের প্রথম তিন দিন রোযা রাখতেন। মাসের মাঝের তিন দিন রোযা রাখতেন এবং মাসের শেষের তিন দিন রোযা রাখতেন। হযরত মারইয়াম (আ.) দু-দিন রোযা রাখতেন আর তৃতীয় দিন রোযা ছাড়া থাকতেন। হযরত দাউদ (আ.)-এর অভ্যাস ছিল একদিন রোযা রাখা আর একদিন রোযা না রাখা। আর আমাদের নবীজির সুন্নাত হচ্ছে প্রত্যেক মাসের আইয়ামে বীয তথা ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখা।

হাদীছে আছে, হযরত আদম (আ.)কে তার পদস্খলনের কারণে দুনিয়ায় প্রেরণের পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আইয়ামে বীযের দিনগুলোতে রোযা

রাখতে বলেছেন। তো তিনি রোযা রাখলেন। তাতে তার চেহারা নূরে পূর্ণ হয়ে গেল। তাই যে ব্যক্তি আইয়ামে বীযের রোযা রাখবে, তার চেহারা তরতাজা হয়ে যাবে।

হযরত আবু দাজাজাহ (রাযি.)

প্রত্যেকটি কাজই কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবেক সম্পন্ন করা আমাদের কর্তব্য। চাই কাজটি ছোট হোক বা বড় হোক। হযরত আবু দাজাজা (রাযি.) ফজরের নামায পড়ে দ্রুত ঘরে চলে যেতেন; ফজরের মাহফিলে নবীজির দরবারে বসতেন না। নবীজি এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে সাহাবী বললেন, হুযুর! আমার এক পড়শীর ফল গাছের ডাল আমার ঘরের উপর চলে এসেছে। তাতে ফল ধরেছে এবং পেকেছে। আমি নামায পড়ে দ্রুত যাই এ জন্য, যেন সেই ফলগুলো কুড়িয়ে আমার পড়শীর ঘরে দিয়ে আসতে পারি। কারণ, হতে পারে আমার সন্তানরা ঘুম থেকে জেগে অনুমতি ছাড়া এই ফল নিয়ে এসে খেয়ে ফেলবে। দেখুন, এরাই সেই স্বর্ণমানব। এরাই আমাদের পূর্বপুরুষ। কত সতর্ক থাকতেন তাঁরা।

অন্যের মঙ্গল কামনা করুন

প্রত্যেকটি কাজেই আমরা অন্যের কল্যাণ কামনা করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

দীন খায়েরখাহীর নাম। কল্যাণ কামনার নাম।

মনে রাখবে, মুসলমান যদি মুসলমানের ক্ষতি সাধনে সচেষ্ট হয়, তাহলে দীন ধ্বংস হয়ে যাবে।

খায়েরখাহীর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ

একবার একবৃদ্ধ ও একযুবক কোনো একটি শরিকি কাজ করল। তারা প্রত্যেকেই গোপনে অপর ভাইয়ের ভাগে নিজের ভাগ থেকে কিছু দিয়ে দিত। বৃদ্ধ চিন্তা করত, ছেলে মানুষ; তাকে গোপনে কিছু দিয়ে দেই। আবার যুবক চিন্তা করত, আমার শরীক বৃদ্ধ মানুষ; আমি কম নেই, তাকে বেশী দেই। তো তারা প্রত্যেকেই পরস্পরের ইকরাম করত। দেখুন, তাদের এই ব্যবসাটিতে কত বরকত হাসিল হতো।

যে কুকুরটি জান্নাতে যাবে

ওই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, যে নেককার লোকের সংস্পর্শ লাভ করেছে। তার হাত হতে মানুষ সুরক্ষিত থাকে। সেও নফস্-শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্ত থাকে। সৎ লোকের প্রভাব লোকটির উপর পড়ে। কুরআনে আসহাবে কাহফের কুকুরের কথা এসেছে। কুকুর জান্নাতে যাবে। কেন কুকুরটা জান্নাতে যাবে? কারণ, সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা আসহাবে কাহফের সান্নিধ্যে থেকেছে।

মহবতে ইলাহীতে সতর্কতা

যে মানুষটির অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে, সেও সৌভাগ্যবান। বিশেষ করে যেসব ব্যক্তি সিলসিলায় দাখেল আছেন, তারা এবং যারা আল্লাহর মহবত অন্বেষী এমন লোকেরা সর্বদা সতর্ক থাকো, আল্লাহর মহবত ছাড়া অন্য কারো মহবত যেন দিলে প্রবিষ্ট না হয়ে যায়। তাঁরা চিন্তা করতেন, গাইরুল্লাহর মহবত অন্তরে প্রবল হয়ে গেলে আল্লাহর মহবত থেকে মাহরুম হতে হয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখুন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর খোদাপ্রেম

হযরত ইবরাহীম (আ.) তীব্রভাবে কামনা করতেন তার যেন সন্তান হয়। অবশেষে একজন ছেলে দান করা হলো তাঁকে। একবার হযরত ইসমাঈলকে হযরত ইবরাহীম মহবতের দৃষ্টিতে দেখলেন। তো আল্লাহর কাছে বিষয়টি ভালো লাগল না। কারণ, প্রেম-ভালোবাসার জগতটাই তো এমন মান-অভিমানের। ফলে আল্লাহ হুকুম দিলেন, হে ইবরাহীম খলীল! আপনি আপনার সন্তানটিকে কুরবান করুন। হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রাণপ্রিয় সন্তানকে জবাই করতে প্রস্তুত। ছুরি চালাচ্ছেন প্রিয় ছেলের গলায়। পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন নবী ইবরাহীম। আল্লাহ বলে দিলেন, ইবরাহীম! আমি দেখতে চেয়েছি, তোমার দিলে আমার মহবত বেশী, নাকি তোমার পুত্রের মহবত বেশী।

হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর আল্লাহপ্রেম

হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁর আদরের পুত্র ইউসুফকে বড় বেশী ভালোবাসতেন। ফলে আল্লাহ তাঁর থেকেও ভালোবাসার পরীক্ষা নিলেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী তো সবারই জানা। পরিশেষে বাবা

ইয়াকুব আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। তিনি সবরের পরীক্ষায় সফল হলেন। فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ বলেই তিনি উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন।

একটি মৌলিক কথা

মনে রাখবে, আল্লাহপ্রেমের এই দুর্গম পথে অন্যের প্রতি মহবত অনেক বড় ক্ষতির কারণ হয়। সাধারণ জনতাকে এসব বিষয়ে ধরপাকড় করা হয় না। কিন্তু আলেম-উলামা-বুযুর্গ যাঁরা এই আল্লাহপ্রেমের পথে পা বাড়িয়েছে, যারা আল্লাহপ্রেম খুঁজে ফিরে, তারা কঠিন পরীক্ষায় পড়ে যায়। গাইরুল্লাহর প্রতি তাদের সামান্য প্রেম প্রকাশ পেয়ে গেলে আল্লাহ পরীক্ষা নেওয়া শুরু করে দেন। আল্লাহ তাকে যাচাই করে দেখেন, আসলে লোকটি কাকে বেশী ভালোবাসে। আল্লাহকে, না গাইরুল্লাহকে?

আজ আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমরা আল্লাহকে ভুলে গেছি। আল্লাহর পরিচয় আজ আমাদের সামনে নেই। আল্লাহর সৌন্দর্য আজ আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম নই। তাই তো আজ আমরা রবে কারীমকে ভালোবাসতে পারিনি। আমরা তো গাইরুল্লাহর ভালোবাসায় বিভোর হয়ে আছি। তাই তো আজ আমাদের এমন করুণ অবস্থা।

হযরত মুসা (আ.) ও দিদারে ইলাহী

হযরত মুসা (আ.) ও আল্লাহর মাঝে গভীর ভালোবাসা ছিল। তিনি বারবার আল্লাহর দিদার কামনা করেছিলেন। বলেছেন–

رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ

'হে আল্লাহ! আমাকে দেখা দাও; আমি তোমাকে দেখতে চাই।'[১]

আল্লাহ তা'আলা বললেন–

لَنْ تَرٰىنِيْ

'তুমি কখনও আমাকে দেখতে পারবে না।'[২]

তারপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি ওই পাহাড়ের দিকে তাকাও। আল্লাহ তা'আলা ওই পাহাড়ের উপর ৭০ হাজার পর্দার আড়াল থেকে তাজাল্লি দিলেন। এত নূরের ঝলক ঝলসে উঠল যে, হযরত মুসা (আ.)

---

১. সূরা আরাফ, আয়াত- ১৪৩

২. সূরা আরাফ, আয়াত- ১৪৩

দেখে বেহুশই হয়ে গেলেন। দেখুন, আল্লাহ কোনো জিনিসের প্রতি তাজাল্লি দিলে সেই জিনিসের তাপই সহ্য করা যায় না। এই দুনিয়াতে আল্লাহ রাবুল ইযযাতের দিদার কীভাবে সম্ভব? আল্লাহর জালওয়া ও সৌন্দর্য আমরা সরাসরি দেখব কী করে এই দুনিয়ায়। তবে হ্যাঁ আখেরাতে যে আল্লাহর দিদার হবে, তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা দিয়েছেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

যখন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন সকল আম্বিয়া কেরাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়েছিলেন। হযরত মুসা (আ.) নবীজির ফিরে আসার অপেক্ষা করছিলেন নবীজির সাথে কথা বলার অভিলাষে। অন্য কোনো নবী এটি করতে চাননি। কারণটা কী? কারণ, হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ রাবুল ইযযাতের দিদারপ্রত্যাশী ছিলেন। দুনিয়ায় তো তিনি দিদার পাননি। যখন খবর পেলেন আল্লাহ নবীজিকে দিদার-দর্শন দিবেন, তাই ফিরে আসার অপেক্ষায় তিনি প্রহর গুণতে থাকলেন। ভাবলেন, আমি আল্লাহর দিদার তো পেলামই না; কিন্তু যিনি দিদারে ধন্য হয়েছেন, তার দিদার তো পাব। তাই তো নামায কমানোর ব্যাপার নিয়ে নবীজির সাথে অনেকবার হযরত মুসা (আ.)-এর দিদার ও কথাবার্তা হলো। দিদার তো নিজে পাননি; যিনি পেয়েছেন, সেই মহামানবের দিদারের জন্য হযরত মুসা (আ.) অধীর ছিলেন।

তাওহীদের সবক

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী বলেন, আমাকে এক নারী তাওহীদ শিখিয়েছেন। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, হযরত এটা কীভাবে? উত্তর দিলেন, আমার কাছে এক পর্দানশীন নারী এল। মহিলা বলল, আমার স্বামী আরেকটি বিয়ে করতে চাইছেন। আপনি ফাতাওয়া লিখে দিন, তার জন্য আরেক বিয়ে করা জায়েয নেই। জুনায়েদ বাগদাদী বললেন, আরে, আপনার স্বামীর যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে তো শরীয়ত তার জন্য আরেকটি কেন আরো তিনটি বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। আমি কীভাবে নাজায়েয ফাতওয়া লিখে দিব?

এবার মহিলা বলল, হযরত! শরীয়ত যদি পরপুরুষকে চেহারা দেখানো হারাম না করত, তাহলে এখন আমার চেহারার নেকাব খুলে আপনাকে

আমার সৌন্দর্য দেখিয়ে দিতাম। তখন বুঝতেন, যে ব্যক্তির স্ত্রী এত সুন্দরী, তার জন্য আরেকটা বিয়ে করা জায়েয নেই।

জুনায়েদ বাগদাদী বলেন, মহিলা এ কথা বলে তো চলে গেল; কিন্তু আমার হৃদয়ে একথা উদ্ভাসিত হলো যে, হে আল্লাহ! আপনি একজন নারীকে এত সৌন্দর্য দান করেছেন যে, সে নিজের সৌন্দর্যের ব্যাপারে এতটা আত্ম বিশ্বাসী যে, সে নিজেই বলছে, যার স্ত্রী এত সুন্দরী, তার জন্য ২য় বিয়ে নাজায়েয। তো হে পরওয়ারদেগার! তোমার বান্দী এত সুন্দর হতে পারলে তুমি কত সুন্দর! আর আপনি যখন এত সুন্দর, তখন আপনিও তো বলবেন, আমার মহবত ছেড়ে কোনো বান্দা অন্যকে মহবত করা, গাইরুল্লাহকে মহবত করা নাজায়েয।

লায়লার মাজনু

কোনো এক কবি লায়লার মাজনুর প্রেমের ছবি এভাবে চিত্রায়িত করেছেন–

وَلَوْ اَنَّ لَيْلٰى اَبْرَزَتْ حُسْنَ وَجْهِهَا
لَهَا مُبْهَا الْوَامُ مِثْلَ حَيَامِىْ
وَلٰكِنَّ هَا اَخْفَتْ مَحَاسِنَ وَجْهِهَا
فَوَلُّوْا جَمِيْعًا عَنْ حُضُوْرِ مَقَامِىْ

যদি লায়লা তার সৌন্দর্য-সুষমা খুলে দিত এবং সেই মনোহারী সৌন্দর্যকে লোকেরা দেখে নিত, তাহলে তারাও মজনুর মতো দেওয়ানা হয়ে যেত। কিন্তু লায়লা তো তার সৌন্দর্য গোপন ও আড়াল করে রেখেছে; তাই লোকদের সাথে এখনই তার সেই সম্পর্ক হয়নি, এত সৌন্দর্যের কারণে যা হওয়ার কথা ছিল।

তাই বলছি, আল্লাহর সৌন্দর্যের আলোচনা বেশী-বেশী হওয়া উচিত। তাহলেই আমরা আল্লাহকে প্রাণভরে ভালোবাসতে পারব। আর ওই ভালোবাসার কারণে সর্বদা আল্লাহর স্মরণে আমরা বিভোর থাকতে পারব।

পাখির ডিম দেখে মারেফাতের শিক্ষা নিন

দুনিয়াতে কিছু কিছু পাখি আছে, যেগুলি ডিম দিয়ে বাসা থেকে দূরে চলে যায়। দূর থেকে ডিমের উপর দৃষ্টি ফেলে। সে থেকেই তাতে বাচ্চা হয়।

এরা অন্য পাখি ও মুরগীর মতো তাও দেয় না। তাও দিয়ে বাচ্চা ফোটায় না। যেমন কচ্ছপ। কচ্ছপের ব্যাপারে হায়তুল হাইওয়ান কিতাবে লিখিত আছে ডিম দেয়ার পর এটি দূরে অবস্থান করতে থাকে। দূর থেকে ডিমের উপর দৃষ্টি দিয়ে রাখে। এর কারণেই ডিমে বাচ্চা হয়ে যায়। আমরা একটু চিন্তা করি। একটি কচ্ছপ দৃষ্টি দেয়ার কারণে তার ডিম ফোটে। বাচ্চাবের হয়। তাহলে রব্বে কারীম যদি আমাদের হৃদয়ের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান, আমাদের প্রতি যদি তাওয়াজ্জুহ দেন তাহলে কি মারেফাতের হিরে মুতি পান্না বের হবে না সেই হৃদয় থেকে? অবশ্যই হবে। আমরা যদি আল্লাহকে মুহাব্বত করতে পারি তবে আল্লাহও আমাদেরকে মুহাব্বত করবেন।

শয়তানের হাত থেকে বাঁচার পথ

দেখুন, বাইতুল্লাহ তো আল্লাহ তা'আলার ঘর। আবরাহা চেয়েছিল এ ঘরের কর্তৃত্ব নিতে এবং তাকে ধংস করে দিতে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আবাবিল পাঠিয়ে দিলেন। পাখিরা কঙ্কর মারল ফলে পুরো দলবলসহ আবরাহা ধংস হয়ে গেল। ঠিক তেমনিভাবে মানুষের দিল হচ্ছে আল্লাহর ঘর। শয়তান মাঝে-মাঝে এঘর দখল করে নিতে চায় এবং হামলা করে ধংস করে দিতে চায়। কিন্তু আপনি যখন لا اله الا الله এ কালিমার যিকির করতে থাকবেন, তখন এ যিকির শয়তানের উপর তীরের এত গিয়ে বিদ্ধ হবে। ফলে দেখবেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শয়তান থেকে সুরক্ষা দান করছেন।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

'যারা মুত্তাকী যদি শয়তানের বাহিনী তার উপর হামলা করে, তখন ওই বান্দা যিকির করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে শয়তানের থাবা থেকে হেফাযত করেন।'[১]

হৃদয়ের চাবি

আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে ইরশাদ করেছেন, আমি মানুষের নফস ও মালকে জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছি। তো নফসের মূল্যে তো

---

১. সূরা আ'রাফ, আয়াত- ২০১

জান্নাতকে রাখা হয়েছে আর দিলের মূল্যে আল্লাহ নিজের দিদার দর্শনকে নির্ধারণ করেছেন। তাই যে মানুষ নিজের দিলকে আপন রবের হাওলা করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে আপন দিদার প্রদান করবেন।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

'সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে, যারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।'[১]

তাই ভায়েরা আমার! আল্লাহর দিদার অত্যন্ত বড় বিষয়। রবে কারীমের দিদার পেতে হলে দিলটা রবে কারীমকে সঁপে দিতে হবে। প্রাণভরে আল্লাহকে ভালোবাসা নিবেদন করতে হবে। সাথে-সাথে আল্লাহর দরবারে দু'আ করে যেতে হবে। বলবে, হে রবে কারীম! যখন দিলের মুআমালা আপনারই হাতে, দিলের চাবি যখন আপনারই কব্জায়, তো আপনি আমাদের দিলের তালা খুলে দিন। আপনি আমাদের হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করে দিন যেন আপনার মহবতে আমাদের জীবন পূর্ণ থাকে।

মহবতে ইলাহীর বিজয়

এই দুনিয়ায় কিছু লোক এমনও অতীত হয়েছেন যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমন মহবত দান করেছেন, তারা দুনিয়ার মধ্যে অন্য কারো দিকে মুতাওয়াজ্জুহ হননি।

আমাদের আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে একজন এমন বুযুর্গ অতীত হয়েছেন, তাঁকে যিকিরের এমন প্রাধান্য দান করা হয়েছে যে, তাঁর জামাতা দুটি বছর তাঁর খেদমতে ছিলেন; তবুও তার নামটি তিনি মুখস্থ করতে পারেননি। যখন তার এ খাদেম বুযুর্গের সামনে যেতেন, তিনি বলতেন, তুমি কে? খাদেম বলতেন, আমি আল্লাহর বান্দা। বুযুর্গ বলতেন, আরে ভাই! সবাই তো আল্লাহর বান্দা। তুমি কে সেই পরিচয় দাও। তো লোকটি বলত, হযরত! আমি আপনার জামাতা। বুযুর্গ বলতেন, আচ্ছা। আবার কিছু দিন পর বুযুর্গ তার নাম ভুলে যেতেন। আবার জিজ্ঞেস করতেন, আবার ভুলে যেতেন। তো তিনি সারা দিন আল্লাহর যিকিরে এমন বিভোর থাকতেন যে, অন্যের নামও মনে রাখার ফোরসত তাঁর হতো না। এমন

---

১. সূরা কিয়ামা, আয়াত- ২২-২৩

গভীর প্রেম মহবত-ছিল তাঁদের। একটি নামই তাঁদের হৃদয়ে বসে গিয়েছিল। সেই নামটি হচ্ছে আল্লাহ। আল্লাহ। আল্লাহ। আল্লাহ।

হযরত মা'রুফ কারখী (রহ.)-এর আল্লাহ প্রেম

কিতাবে লেখা আছে, হযরত সিররী সাকতী (রহ.) একবার স্বপ্নে দেখলেন, তাকে কিয়ামতের অবস্থা দেখানো হচ্ছে। তিনি দেখলেন, কিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে। লোকেরা আল্লাহ রাবুল ইযযাতের দরবারে উপস্থিত। তাদের মধ্যে একজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে আল্লাহর প্রেমে বিভোর, আল্লাহর ভালোবাসায় দেওয়ানা হয়ে আছে। দেওয়ানাদের মতোই আল্লাহর স্মরণে মশগুল। জিজ্ঞেস করা হলো, এই লোকটি কে? আল্লাহ রাবুল ইযযাত বললেন, হে আজ এখানে অবস্থানকারীরা! তোমরা তো বিস্মিত ও হতবাক হয়ে লোকটিকে দেখছ? শোনো! এ তো আমার প্রিয় বান্দা মারুফ কারখী। আমার মহবতে জযবা জেগে আছে তার মাঝে। এ সেই সময় পর্যন্ত শান্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার সাথে দেখা না দেব। আমার দিদার যতক্ষণ পর্যন্ত সে না পাবে। ফলে আল্লাহ তাকে আপন দিদার নসীব করবেন। তারপরই তার দেহ শীতল ও প্রশান্ত হবে।

বরকতময় নাম

আমরা আল্লাহর মহবতকে আমাদের জন্য আবশ্যক করে নেব। তার পরই দেখতে পাব এর প্রভাব আমাদের যিন্দেগীতে কীভাবে বিস্তার লাভ করে। আমরা যে আমাদের মাশায়েখে কেরামের সোহবতে আসি এর মাকসাদ তো এই যিকির ও আল্লাহপ্রেমে মতোয়ারা হওয়ার তরীকা শিক্ষা করা। খুব পাবন্দীর সাথে যিকিরের আমল করা চাই। আল্লাহর নাম বড় বরকতওয়ালা। আল্লাহ তা'আলা ফরমান–

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ

'বরকতওয়ালা নাম তোমার রবের।'

তাই আপনারা যে তিনটি দিন এখানে কাটাবেন বা তার চেয়ে বেশী দিন যে থাকবেন এ কটা দিন রাজনৈতিক বা দুনিয়াবী কোনো কথা বলবেন না। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন না। তিন দিন বা এক সপ্তাহের জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছেন তো এই সময়টুকুকে আমানত মনে করবেন। সারাটা সময়কে যিকিরে কাটিয়ে দেবেন। সব সময় অন্তরে

আল্লাহর ধ্যান ও খেয়াল বিদ্যমান রাখবে। ইনশাআল্লাহ এই কটা দিনেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার খুলে দেবেন।

হে মুমিন বান্দারা! যদি তোমরা দিলকে আল্লাহর নামের সাথে বেঁধে দিতে পার, তাহলে আল্লাহ রাবুল ইযযাত তোমাকে বুলন্দ মরতবা দান করবেন। যেমন بِسْمِ اللهِ এর মধ্যে যে بِ আছে, সে بِ কে আল্লাহ তা'আলা বুলন্দ মর্তবা দান করেছেন।

দেখুন, একটা। (আলিফ) যে দাঁড়িয়ে থাকে সে অহংকারী। আর بِ শুয়ে থাকে। সে বিনয়ী। তবে بِ যুক্ত রয়েছে আল্লাহর সাথে যেমন بِسْمِ اللهِ ফলে আল্লাহর সাথে যুক্ত থাকার কারণে তাকে আল্লাহ তা'আলা বুলন্দ ও উঁচু করে দিয়েছেন। দেখবেন, সাধারণত بِسْمِ اللهِ এর بِএর মাথা একটু উঁচু রাখা হয়। তো এভাবে আমরা যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখি, তাহলে আল্লাহ আমাদের বুলন্দ করে দিবেন। দু'আ করবেন, আপনি যত দিন এখানে থাকবেন আল্লাহ আপনাকে-আমাকে তার যিকির-আযকারে লেগে থাকার তাওফীক দান করেন। পরস্পরে যত কম কথা বলে থাকা যায়, তত কম কথা বলবেন। চেষ্টা করবেন যিকির-আযকারের পেঁছনে সময় কাটাতে। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

খুতুবাতে জুলফিকার

[ষষ্ঠ খণ্ড]

কিছু লোক চুরি করার কারণে ধরা পড়ে গেল। ফলে অন্যরাও চুরি করা থেকে হাত গুটিয়ে নিল। কেননা, সবার মাঝে এ একটা বিষয় কাজ করছে যে, আমার গতিবিধি সি.সি ক্যামেরায় রেকর্ড হচ্ছে। তো সি.সি ক্যামেরার কারণে যদি বান্দার মাঝে এতটুকু ভয় কাজ করে, তাহলে যার অন্তরে সর্বদা একথা জাগ্রত থাকবে যে, আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন তার দ্বারা গোনাহ সংঘটিত হওয়ার কল্পনাই করা যায় না।

আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ. سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

আল্লাহর সান্নিধ্যের জ্ঞান

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

'তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক।'[১]

প্রত্যেক মুসলমানই জানে, আল্লাহ তার সাথে আছেন। আমরা তাঁকে আমাদের গর্দানের রগের চেয়েও বেশি কাছে আছেন বলেই জানি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

'আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।'[২]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তিনজন থাকে, সেখানে চতুর্থজন আল্লাহ তা'আলা থাকেন। আর যেখানে পাঁচজন থাকে, সেখানে ষষ্ঠজন আল্লাহ উপস্থিত থাকেন।

জ্ঞান আর সর্বদা স্মরণ থাকার মধ্যে পার্থক্য

কোনো বিষয়ে জ্ঞান থাকা এক কথা আর কোনো বিষয় মনে সর্বদা স্মরণ থাকা অন্য কথা। কোনো বিষয় জানাকে জ্ঞান বলে। আর কোনো বিষয় সর্বদা মনে স্মরণ থাকাকে এস্তেহজার বলে। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন, এই কথা আমারা সবাই জানি। কিন্তু আল্লাহর উপস্থিতির কথা সব সময় আমাদের মনে স্মরণ থাকে না। যে কারণে অন্তরের অবস্থাও সব সময় একই রকম থাকে না।

---

১. সূরা হাদীদ, আয়াত-৪

২. সূরা কা-ফ, আয়াত-১৬

ওয়াজিফা ও দু'আসমূহের বৈশিষ্ট্য

তরিকতের শায়খ বাইআতের পর যে ওয়াজিফা ও দু'আসমূহ বাতলে দেন, তার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই দু'আসমূহের কারণে বান্দার অন্তরে আল্লাহর স্মরণ সর্বদা উপস্থিত থাকে, যা আসল উদ্দেশ্য। যদি ওয়াজিফা আর দু'আসমূহের পাবন্দি করার পরও কারো অন্তরে আল্লাহর স্মরণ এস্তেহজার না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি নিয়ম নেমে সেগুলো পালন করেননি।

নকশবন্দি সিলিসিলায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ

আমাদের এই সিলসিলায়ে আলিয়া নকশবন্দিয়াতে পঁয়ত্রিশটি (৩৫) ছবক আছে। এর মধ্যে ষোল নম্বর ছবক এর নাম مراقبہ معیت সান্নিধ্যের মুরাকাবা বা ধ্যান। যে ব্যক্তি নিয়ম মেনে পনেরোটি ছবক শেষ করবে, তার জন্য ষোল নম্বর ছবকে আল্লাহর সান্নিধ্যর এস্তেহজার লাভ না হয়ে পারে না। যেমন– কোনো ছাত্র প্রথমে প্রাইমারীতে ভর্তি হয়। তারপর সে মাধ্যমিক স্কুলে পড়ে, তারপর উচ্চমাধ্যমিক তারপর এম.এ, বি,এ করে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করে। আমাদের এখানেও ষোল নম্বর ছবকে মুরিদের কাছে আল্লাহর সান্নিধ্যের এস্তে হজার (আল্লাহর উপস্থিতির স্মরণ সর্বদা মনে রাখা) অর্জন হয়ে যায়।

নবুওয়াতি দৃষ্টির বরকত

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ভিন্ন। তাদের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্যের এস্তেহজার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম সাক্ষাতেই অর্জন হয়ে যেত।

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

যে নিজেই সঠিক রাস্তায় ছিল না, সে-ই হয়ে গেল পুরো জাতির পথপ্রদর্শক। সেটি কেমন দৃষ্টি ছিল, যে মুর্দাকে পর্যন্ত জীবিত করে দিল?

তারা দিলমরা অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যেতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক অমূল্য দৃষ্টিতেই তাদের জীবনের মোড় ঘুরে যেত। আর আল্লাহর সান্নিধ্যের এস্তেহজার তাদের মধ্যে অর্জন হয়ে যেত। মনে রাখতে হবে, নবুওয়াতি দৃষ্টির বরকত এক অনন্যসাধারণ জিনিস, যা এখন নেই। তা এখন থেকে চৌদ্দ শত বছর আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে। তাই এই যুগে আল্লাহর সান্নিধ্যের এস্তেহজার অর্জন

করতে হলে মেহনত করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, কী রকম মেহনত করবে? হ্যাঁ, সে আল্লাহর যিকির আর মুরাকাবার মেহনত করবে। আমাদের এই সিলিসিলায় একে মুরাকাবা বলে।

মুরাকাবা কী?

মুরাকাবা কী? শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) তাঁর কিতাব আল কাওলুল জামীল-এ লিখেছেন, মুরাকাবা বলা হয় অন্তরে এরকম একটি অবস্থা সৃষ্টি করা যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সব সময় দেখছেন। এই অবস্থাটা মানুষ অনুশীলন করার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে।

আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টির পদ্ধতি

যেসব ছাত্র বুখারী শরীফের জামাতে পড়ছে, তারা এর আগে এমন আরও অনেক কিতাব পড়ে এসেছে, যেগুলো বুখারী শরীফসহ হাদীছের অন্যান্য গ্রন্থগুলো বুঝবার যোগ্যতা সৃষ্টি করে। এভাবে আমাদের মাশায়েখে কেরামও ষোল নম্বর ছবকের ফলাফল পাওয়ার জন্য তার আগে আরো পনেরোটি ছবকের উপব মেহনত করান।

ওয়াজিফা ও দু'আর উদ্দেশ্য

আমাদের মাখায়েখে কেরাম শুধু সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে ওয়াজিফা ও দু'আ-দরুদের আমলগুলো মুরিদকে পালন করার আদেশ দেন না। শুধুই যদি সওয়াবের উদ্দেশ্য থাকত, তাহলে আরও বেশি সওয়াব হয় এমন কোনো আমলের কথা নিশ্চয় বলতেন। আমাদের মাখায়েখগণ যেসব ওয়াজিফা ও দু'আ-দরুদের আমল দিয়ে থাকেন, তার আসল উদ্দেশ্য হলো, তাজকিয়ায়ে নাফস বা অন্তর পরিশুদ্ধ করা, কলবের রোগ সারানো। যিকিরের দ্বারা অন্তর পবিত্র হয়, ভিতরের অপরিচ্ছনতা দূর হয় আর আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যের এস্তেহজার অর্জন হয়। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ অন্তরে এমনভাবে জমে যায় যে,

مجھے بھلانا بھی چاہو تو بھلا نہ سکو گے

'ভুলতে তুমি চাইলে আমায়, ভুলতে যে আর পারবে না।'

একটি উপমা

গত কাল যে মায়ের সন্তান মারা গিয়েছে, তাকে যদি বলা হয়, আজ তুমি তোমার বাচ্চার কথা মনে করো না, তাহলে সে পারবে না। বাচ্চাকে

ভুলে থাকা তার সাধ্যের বাইরে। সব সময় তার বাচ্চার কথা মনে পড়বে। মনে হবে, বাচ্চা যেন তার সামনেই আছে। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে সব সময় তার বাচ্চার কথা মনে পড়বে। এমনকি ঘুমাতে গেলেও বাচ্চার কথা ভুলে থাকা যাবে না।

সেই মায়ের জন্য যেমন বাচ্চার কথা ভুলে থাকা সম্ভব নয়, সেরকম যে ব্যক্তি এই ছবকগুলো পালন করবে, তার জন্যও আল্লাহর সান্নিধ্যর অবস্থা এমনভাবে মনের ভিতর গেঁথে যাবে যে, সে চাইলেও তখন আর আল্লাহকে ভুলে থাকতে পারে না। তার অর্থ এই নয় যে, সে বেলায়তের সবগুলো স্তর অতিক্রম করেছে। বরং এই অবস্থায় সে আল্লাহর হেফাজতের মধ্যে চলে আসে।

আওলিয়ায়ে কেরাম ও আল্লাহর হেফাজত

আম্বিয়ায়ে কেরাম মাসুম হয়ে থাকেন আর আওলিয়ায়ে কেরাম হন মাহফুজ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আওলিয়ায়ে কেরামকে গোনাহের অপমান থেকে দূরে রাখেন। যেমন– কোনো পিতা যখন তার সন্তানকে বখাটে ছেলেদের সাথে দেখে, তখন সেই পিতার পছন্দ হয় না যে সন্তান বখাটেদের সাথে থাকুক। বরং পিতা চায় তার সন্তানকে বখাটেদের পরিবেশ থেকে বের করে আনতে। একইভাবে আল্লাহ তা'আলাও তাঁর প্রিয় বান্দাদের শয়তান ও নফসের আধিপত্য থেকে বের করে এনে নিজের হেফাজতে নিয়ে নেন। কেননা, ইতিমধ্যেই সেই যিকির ও ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে নিয়েছে।

তাসাউফ ও সুলুকের উদ্দেশ্য

তাসাউফ ও সুলুকের উদ্দেশ্য দুনিয়াবি ফায়েদা হাসিল করা নয়। মামলায় জেতা, দুশমনের উপর বিজয় অর্জন, দু'আ কবুল হওয়া, ইবাদাতে মজা পাওয়া বা এধরনের কোনো উদ্দেশ্য নয়। বরং তাসাউফ ও সুলুকের উদ্দেশ্য হলো, এস্তেকামতের সাথে শরীয়তের উপর আমল করে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন হওয়া। সালেক-এর (মুরিদ) যখন এই অবস্থাটি অর্জন হয়ে যায়, তখন শরীয়তের উপর আমল করে সে শান্তি পায় যেমন বাচ্চা তার মায়ের কোলে শান্তি পায়। বান্দা তখন জায়নামাযে এসেই শান্তি পায়। কারণ, এই অবস্থায় সে ইবাদাতে মজা পাচ্ছে।

'ফানা'র স্তর

مراقبة معيت মুরাকাবায়ে মাইয়্যত বা সান্নিধ্যের ধ্যান করলে মানুষ সব সময় আল্লাহকে মনে রাখতে পারে। আমাদের মাশায়েখে কেরাম এই কথাটিকে এই একটি বাক্যেই বুঝিয়ে দিয়েছেন,

اَلْفَانِيْ لَا يَرُدُّ

'ফানা প্রত্যাখ্যাত হয় না।'

ফানা অর্থ কী? ফানা অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুকেই ভুলে যাওয়া। আল্লাহর স্মরণে ডুবে যাওয়া। আল্লাহর রঙে নিজেকে রাঙানো। আল্লাহর স্মরণকে নিজের স্বভাব বানিয়ে নেওয়া। এরকম ব্যক্তিগণ যিকিরের মাধ্যমে ফানাহর স্তর অর্জন করে থাকে। এ কারণেই তাকে 'ফানী' বলা হয়।

'ফানী' পিছনে ফিরে আসে না এর অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে, যেমন কোনো মানুষ বালেগ হওয়ার পরে আর নাবালক অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। ফল পেকে যাওয়ার পরে আর কাচা হতে পারে না। একইভাবে ফানা ফিল্লাহ ব্যক্তিও যিকিরের মাধ্যমে নিজের আন্তরাত্মাকে এমন স্তরে উন্নীত করেন যে, তাকে আল্লাহ তা'আলা পিছনে ফিরে যেতে দেন না। তাকে আল্লাহ নিজের প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এই বিষয়গুলো আমাদের অর্জন করতে হবে।

ফানা অর্জন করার পদ্ধতি

ফানা অর্জন করার পদ্ধতি হলো নির্জনে বসে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ করা। সমস্ত দুনিয়াকে ভুলে শুধু আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে ডুবে যাওয়া। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আজকাল মানুষ নির্জনে বসতেই চায় না। কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকতেই তারা বেশি পছন্দ করে। একাকিত্বে ভয় পায়। অথচ আমাদের মাশায়েখে কেরামের উক্তি আছে যে, বাহ্যিক ইন্দ্রিয় বন্ধ করলে বাতেনী ইন্দ্রিয় চালু হয়ে যায়।

چشم بند و گوش بند و لب بہ بند

گر نہ بینی نور حق بر ما بخند

'চোখ বন্ধ করো, কান বন্ধ রাখো, মুখ বন্ধ রাখো (অশ্লীল কাজ থেকে)।'

তারপরও যদি আল্লাহর নূর দেখতে না পাও, তাহলে আমার উপর হেসো। কিন্তু আমাদের কাছে এটা যেন একটা কঠিন কাজ হয়ে গেছে।

আসল জিনিস মুরাকাবা

যদি প্রশ্ন করা হয়, আপনি কি মুরাকাবা করেন? তখন উত্তর দেয়, সময় হয় না। তবে দরুদ শরীফ আর ইস্তেগফারের তাসবীহ আদায় করে নেয়। কিন্তু মুরাকাবার জন্য সময় হয় না। এর অর্থ তো এরকমই হয়ে গেল যে, আমি তরকারি রান্না করার জন্য মরিচ, মসলা, লবণ ইত্যাদি মিশিয়ে নিলাম; কিন্তু আমার কাছে সবজি বা গোস্ত (বা যা রান্না করব) থাকে না। যার কাছে সবজি গোস্ত ইত্যাদি থাকে না, সে কি শুধু মরিচ-মসলা, লবণ ইত্যাদি মিশিয়ে নিলেই তরকারি তৈরি করতে পারবে? কক্ষনো না। আবার মরিচ-মসলা, লবণ ইত্যাদি না থাকলে শুধু সবজি বা গোস্ত থাকলেই কি তরকারি তৈরি করা যায়? না। যায় না। একইভাবে মুরাকাবা, যা আসল উদ্দেশ্য তা করাই হয় না আবার বলে, আছর (প্রভাব) হয় না।

হাজার বছরের পরীক্ষিত মেহনত

মনে রাখা উচিৎ, আমাদের মাশায়েখে কেরামের এই মেহনত কোনোও মামুলি বিষয় নয়। এটা অনেক বড় বড় ব্যক্তিদের বলে দেওয়া মেহনত। তারা আল্লাহর পছন্দনীয় পথে চলেছেন এবং বছরের পর বছর তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন তরিকা বলে দিন, যাতে আপনার স্মরণ আমাদের মনে সর্বদা জাগ্রত থাকে। তাদের তাক্ওয়া ও পবিত্রতায় আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের যিকিরের এই পদ্ধতি জানিয়ে দেন। হাজার বছর আগের মাশায়েখে কেরামও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এবং এই পদ্ধতির সত্যায়ন করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে মেহনত করবে, সে সেই নেয়ামত পাবে। মানুষ কোনো ওষুধ সেবন করে যখন উপকার পায়, তখন তা আরো দশজনকে বলে দেয়, আমি এই ওষুধে উপকার পেয়েছি। ঠিক একইভাবে আমাদের মাশায়েখে কেরামও যে তরিকায় মেহনত করে রূহানী রোগের শেফা পেয়েছেন, সেটা অন্যকে বলে গিয়েছেন। এই পদ্ধতিতে যে-ই মেহনত করবে, তার ভিতরের রোগসমূহ দূর হয়ে যাবে।

সবচেয়ে বড় মুসিবত

আজকাল সবচেয়ে বড় মুসিবত হলো গোনাহ থেকে তওবা না করা। ইল্লা মাশাআল্লাহ। হাতের সব আঙুল বরাবর হয় না। ভালো কিছু পবিত্র অন্তরের মানুষ অবশ্যই আছে। ধরা যাক গোনাহের সংখ্যা একশত। কেউ ৫০%

গোনাহ থেকে বেঁচে থাকছে, কেউ ৬০% গোনাহ থেকে বেঁচে থাকছে, কেউ ৭০% গোনাহ থেকে বেঁচে থাকছে আর কেউ ৮০% গোনাহ থেকে বেঁচে থাকছে। যাদের দীনদার মনে করা হয়, তারা হয় ৯০% গোনাহ থেকে বেঁচে থাকছে। আর যারা যিকির-আজকার করছে, তারাও ৯০% থেকে ৯৫% গোনাহ থেকে বেঁচে থাকছে। শেষের ৫% গোনাহের মধ্যে কোনো না কোনোভাবেই নফস ধোঁকা দিচ্ছে। কারো চোখ নিয়ন্ত্রণে নেই, কারো জিহা নিয়ন্ত্রণে নেই, কারো অন্তরে দুনিয়ার মহবত বাসা বেঁধেছে। কোনো না কোনো গোনাহ হয়েই যাচ্ছে। একারণে মানুষ আল্লাহ পাক থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

গোনাহের অপবিত্রতার ক্ষতি

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। গোনাহ অপবিত্র। একারণে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অপবিত্র বলেছেন।

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

মুশরিকরা অপবিত্র।[১]

কোনো মুশরিক সত্তরবার গোসল করলেও সে পবিত্র হয় না। কেননা, অপবিত্রতা দুই প্রকার। এক প্রকাশ্য অপবিত্রতা; দুই হুকমি (আইনত) অপবিত্রতা। মুশরিকরা শিরকের কারণে হুকমি অপবিত্র। তাই তারা যতক্ষণ শিরক ছেড়ে না ছাড়বে, ততক্ষণ তারা পবিত্র হতে পারবে না। গোনাহ অপবিত্র বস্তু। আমাদের কোনো একটি অঙ্গও যদি গোনাহে লিপ্ত হয়, তাহলে আমরা আল্লাহর সান্নিধ্য পাব না। আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে হলে নিজেকে গোনাহ থেকে পবিত্র করতে হবে।

মঞ্জিলের সামনে এসে হাল ছেড়ে দেওয়া মুসাফির

কালেমা পড়ার সাথে-সাথে গোনাহ ১০০% ছেড়ে দেওয়ার কথা ছিল। কেউ সেদিকে ৯০ কদম এগিয়ে গেল, কেউ ৯৫ কদম। কেউ আল্লাহ তা'আলা থেকে দশ কদম দূরে পড়ে আছে আর কেউ পাঁচ কদম দূরে আছে। আর যিনি ১০০% গোনাহ ত্যাগ করেছে, তিনি আল্লাহর সান্নিধ্য পেয়েছেন। কিন্তু আমাদের জীবনের উপর কতই না আফসোস যে, আমরা ৯৫ কদম এগিয়ে গেলাম, কিন্তু বাকি পাঁচ কদমের জন্য হাল ছেড়ে দিলাম। শেষের এই পাঁচ কদম এগিয়ে যাওয়ার হিম্মত না করার কারণেই আমরা সফল হতে পারছি না।

---

১. সূরা তাওবা, আয়াত- ২৮

حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر
جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے

'আফসোস সেই মুসাফিরের জন্য, যে মঞ্জিলের কাছে এসে হাল ছেড়ে দিয়েছে।'

মঞ্জিল সামনেই আছে। সব কাজ শরিয়তমতোই করা হচ্ছে। তবুও দু-একটি গোনাহ এমন হয়ে যাচ্ছে, যেকারণে আর সফলতা আসছে না।

গোনাহ থেকে কীভাবে বাঁচবেন?

সম্মানিত সুধী, অবশিষ্ট গোনাহগুলোও ছেড়ে দিয়ে তওবা করে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা পুরোপুরি ইসলামের মধ্যে দাখিল হয়ে যাও। আল্লাহ তা'আলা চান, তোমরা মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সম্পূর্ণ গোনাহের অপমান থেকে বের হয়ে যাও এবং ইবাদাতের পবিত্রতার দিকে আসো। আর গোনাহ থেকে বাঁচা তখনই সহজ হয়, যখন অন্তরে আল্লাহর স্মরণ সর্বদা জাগ্রত থাকে।

আমেরিকায় চুরি বন্ধ করা

ইউরোপ-আমেরিকাতে আমরা দেখেছি, ওখানকার বড়-বড় শপিংমলগুলোতে ক্যামেরা লাগানো থাকে। যেকারণে কোনো মাল-সামানা পড়ে থাকলেও কেউ হাত দিচ্ছে না। চুরি করে কোনো মাল কেউ পকেটে ঢুকিয়ে নিচ্ছে না। এর কারণ হলো, ওখানের ক্যামেরাগুলোতে সবকিছু রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে এই কথা সবাই জানে। ক্যামেরায় ধারণকৃত রেকর্ড দেখিয়ে চোর শনাক্ত করা যায় একথা জানার কারণে ওখানে দোকানগুলোতে চুরি হচ্ছে না। দু-একজন চোরকে ক্যামেরার সাহায্যে হাতে-নাতে ধরার পর অন্যসব লোক সতর্ক হয়ে গেছে। ধরা পড়ে যাবে এই কথা সবার অন্তরে বসে গেছে। যেকারণে ওখানে এখন আর চুরি হচ্ছে না। একইভাবে বান্দার অন্তরে যখন আল্লাহর স্মরণ সদা জাগ্রত থাকবে, সে যখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন, তাহলে সে কীভাবে গোনাহ করতে পারে।

মানুষের চিন্তায় পরিবেশের প্রভাব

মানুষ যে পরিবেশে থাকে, সেই পরিবেশের প্রভাব পড়ে তার চিন্তা-চেতনায়। যেমন– কোনো ব্যক্তি ফার্মেসীতে বসা অবস্থায় বলে, আমার মাথা

ব্যথা করছে, তাহলে ফার্মেসীওয়ালা তাকে প্যারাসিটামল (প্যানাডল) জাতীয় কোনো ট্যাবলেট দিয়ে বলবে, এটা খেয়ে নিন। অন্যদিকে মসজিদে বসা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি বলে, আমার মাথা ব্যথা করছে, তখন ওখানে উপস্থিত যে কেউ বলবে, ইমাম সাহেব হুজুরের কাছ থেকে একটু দম করে নিন। ফার্মেসীতে প্যারাসিটামলের দিকে মানুষের খেয়াল যাচ্ছে আর মসজিদে ইমাম সাহেবের দম করার দিকে খেয়াল যাচ্ছে। এটা পরিবেশের কারণেই হচ্ছে। যে রকম পরিবেশে মানুষ থাকে, সেরকম চিন্তা- চেতনা তার মাথায় ভর করে।

কার্যকারণের অন্তরালের (মুসাবিবুল আসবাব) স্মরণ

যেহেতু আমরা আলমে আসবাবের (কার্যকারণময় পৃথিবী) মধ্যে বসবাস করি, তাই কার্যকারণ আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের চিন্তা-ফিকির কারণসম্পর্কিত হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের উচিত কারণের পিছনের কারণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। এতে আমাদের চিন্তার গতি শুধু কারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে আরো উপরে উঠতে পারবে। তাহলে আমাদের চিন্তা আল্লাহ তা'আলার প্রতি যাবে। অন্যথায় শুধু কারণের মধ্যেই আমাদের চিন্তা ঘুরপাক খাবে।

হযরত যাকারিয়া (আ.) ও হযরত মারইয়াম (আ.)-এর উপর পরিবেশের প্রভাব

হযরত যাকারিয়া (আ.) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে বের হয়েছিলেন। মানুষজনের সাথে মেলামেশা করছেন, দাওয়াত দিচ্ছেন, মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকছেন। মানুষের সাথে মেলামেশার কারণে কার্যকারণের দুনিয়ায় জীবনযাপন করতে লাগলেন। যেহেতু মানুষের উপর পরিবেশের একটা প্রভাব পড়েই, তাই তিনি ফিরে আসার আগে ভাবতে লাগলেন, মারইয়াম-এর কাছে খানাপিনার সামান এমনিতেও কম ছিল। এত দিনে তা শেষ হয়ে গেল কিনা? তাকে খানাপিনা এনে দেওয়ার মতোও কেউ নেই। এদিকে আমারও ফিরতে দেরি হয়ে গেল। এসব ভেবে তিনি একটু জোরে চলতে লাগলেন, যাতে তাড়াতাড়িই মারইয়াম (আ.)-এর কাছে পৌঁছাতে পারেন। তিনি এসে দেখলেন, মারইয়াম (আ.) অসময়ের ফল খাচ্ছেন।

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

যাকারিয়া (আ.) যখনই মেহরাতে তার নিকট আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন।[১]

তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا

এগুলো কোথায় পেলে?[২]

যেহেতু মারইয়াম (আ.) নির্জনে আল্লাহর ইবাদাতে সময় কাটাচ্ছিলেন এবং আল্লাহর দিকে তার মনোযোগ ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের, তাই তিনি উত্তর দিলেন,

هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।'[৩]

মারইয়াম (আ.)-এর এই জবাব শুনে যাকারিয়া (আ.)-এর খেয়াল হলো, আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তখন তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ, তুমি তো মারইয়ামের কাছে অসময়ে ফল পৌঁছাতে পার; সুতরাং আপনি আমাকে নেককার সন্তান দান করুন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই দু'আ কবুল করে নিলেন।

হযরত যাকারিয়া (আ.) উচ্চ স্তরের মানুষ ছিলেন। তবুও তিনি যেহেতু দাওয়াতের কাজে সাধারণ মানুষের পরিবেশে কিছু দিন থেকে আসছিলেন, তাই তাঁর খেয়াল ছিল কার্যকারণের দিকে। আর মারইয়াম (আ.) যেহেতু একাকিত্বে আল্লাহর ধ্যান করছিলেন, তাই তাঁর খেয়াল ছিল আল্লাহর দিকে। আবার এই মারইয়াম (আ.)-ই যখন ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন, তখন তাঁর খেয়ালও কার্যকারণের দিকে চলে গেল।

একবার গোসল করার জন্য যখন তিনি বাড়ির পূর্ব দিকে গেলেন, সেখানে জিবরাঈল (আ.) কে যুবকের বেশে দেখে পর্দা করলেন।

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

'অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম। সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।'[১]

---

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩৭
২. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩৭
৩. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩৭

মারইয়াম (আ.) কোনো সাধারণ মেয়ে ছিলেন না যে, আজকালকার উশৃঙ্খল মেয়েদের মতো বেগানা পুরুষকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাবেন। তিনি যথারীতি ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন।

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا

'আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহভীরু হও।'[২]

জিবরাঈল (আ.) যখন দেখলেন, মারইয়াম (আ.) ভয় পেয়েছেন, তখন তিনি আসল কথা বলে দিলেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়ে এসেছি আপনাকে এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে একটি বাচ্চা দান করবেন।

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

'আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা পক্ষ থেকে প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করব।'[৩]

যেহেতু ইদানীং মারইয়াম (আ.) কার্যকারণের দুনিয়ায় বসবাস করছিলেন, তাই তিনি ভাবলেন, বাচ্চা তো দুই উপায়েই হতে পারে। হয়ত বিয়ে-শাদীর মাধ্যমে অথবা গোনাহের মাধ্যমে। আমি তো বিয়েও করিনি আর গোনাহও করিনি। তাহলে আমার বাচ্চা হবে কীভাবে?

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

'মারইয়াম বলল, কিরূপে আমার পুত্র হবে যখন কোনো মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না ?[৪]

জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি যা বলছেন তা সত্য। আপনি বিয়েও করেননি আর গোনাহও করেননি। তবুও আল্লাহ আপনাকে বাচ্চা দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন এবং এটা তাঁর জন্য অতি সহজ।

قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا

---

১. সূরা মারয়াম, আয়াত-১৭
২. সূরা মারয়াম, আয়াত-১৮
৩ সূরা মারয়াম, আয়াত-১৯
৪ সূরা মারয়াম, আয়াত-২০

সে বলল, এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজ সাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।[১]

এই আয়াত মারইয়াম (আ.)-এর পবিত্রতার উপর মোহর মেরে দিয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন মারইয়াম (আ.)-এর পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এরকম নেককার মেয়ে যেন ঘরে-ঘরে দান করেন।

ঈমানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার পদ্ধতি

আমাদের মাশায়েখে কেরাম বলে থাকেন, প্রতিদিন কিছুটা সময় আমাদের একাকিত্বে কাটানো উচিৎ। জায়নামাযে, মসজিদের কোনায় বা অন্য কোনো জায়গায় একাকিত্বে বসুন। দুনিয়াদারী থেকে আলাদা হয়ে নির্জনে বসে চিন্তা করুন। দুনিয়াবী যেসব চিন্তা-ফিকির আমাদের বুড়ো বানিয়ে দিয়েছে, সেগুলোকে মন থেকে বের করে দিয়ে শুধু আল্লাহর কথা স্মরণ করুন। যখন এভাবে প্রতিদিন কিছুটা সময় আল্লাহর ধ্যান করা হবে, তখন আস্তে-আস্তে ঈমান মজবুত হয়ে যাবে। এটা এমন কী কঠিন কথা যে বুঝে আসবে না?

হাত ধরে মঞ্জিলে পৌঁছানেওয়ালা

অনেক লোক বলে থাকে, বাই'আত করতে হবে কেন? পীর ধরার দরকার কী? ভাই, একারণে বাই'আত হয় যে, শায়েখগণ আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার তরিকা বলে দেন। আমাদের যে রাস্তায় যেতে হবে, তাঁরা সেই রাস্তা অতিক্রম করে গেছেন। তাই তাঁরা হাত ধরেই মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে দিয়ে থাকেন।

শ্রেষ্ঠ ঈমান

যে বান্দার অন্তরে আল্লাহর সান্নিধ্যের এস্তেহজার সৃষ্টি হয়, সে সব সময় আল্লাহর স্মরণেই থাকে। একে হাদীছে শ্রেষ্ঠ ঈমান বলা হয়েছে। হযরত উবাদা ইবনে ছামেত (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'শ্রেষ্ঠ ঈমান হলো এই যে, তুমি মনে করবে, আল্লাহ পাক তোমার সাথেই আছেন তুমি যেখানেই থাক না কেন?' এই শ্রেষ্ঠ ঈমান অর্জন করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১ সূরা মারয়াম, আয়াত-২১

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তুমি আল্লাহকে হেফাজত করো, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন; তাহলে আল্লাহকে তুমি তোমার সামনে পাবে'। অর্থাৎ সব সময় আল্লাহর ধ্যান তোমার সাথে থাকবে।

অশুভ চিন্তার চিকিৎসা

সাধারণ মানুষের কথা কী বলব? ওলামা-ছাত্ররাও আজকাল এই বিষয়টিতে ততটা মেহনত করছেন না, যতটা করা প্রয়োজন ছিল। এ কারণে খাহেশে নফসানী (মনষ্কামনা) থেকে পরিত্রাণ মিলছে না। ছাত্ররা প্রায়ই বলে, দৃষ্টি হেফাজত করতে পারছে না, ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচতে পারছে না, যা পড়ে তা ভুলে যায়। এসব নোংরা চিন্তা-ফিকিরের কারণে হয়ে থাকে। আর এই অশুভ চিন্তা দূর করতে পারে আল্লাহর যিকির। একটু ধ্যানের সাথে যিকির করে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা আপনার চিন্তা-ফিকিরকে কীভাবে পবিত্র করে দেন। যিকিরের দ্বারা চিন্তাও পবিত্র হয় আর মানুষের মনের খাহেশ (মনষ্কামনা)ও দূর হয়। দৃষ্টির হেফাজত হয় এবং আল্লাহ তা'আলা যিকিরকারীর মন শান্ত করে দেন। আমাদের মনষ্কামনা আজকাল আমাদের পেরেশান করে রেখেছে। যাদের বিবাহ হয়েছে, তারাও পেরেশান, যাদের হয়নি তারাও পেরেশান। এই অসুখ সারানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে ভালো চিকিৎসা করানো। আর এর চিকিৎসা হয় আল্লাহর যিকির দ্বারা : কেননা, হাদীছ শরীফে এসেছে,

ذِكْرُ اللهِ شِفَاءُ الْقُلُوْبِ

আল্লাহর যিকির অন্তরের ব্যাধির চিকিৎসা।

অন্তরের ব্যাধির আলামত

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজিদে বলেছেন, (সারমর্ম) হে নবীর স্ত্রীগণ, কারো সাথে যদি কথা বলার প্রয়োজন হয়, তাহলে পর্দার আড়াল থেকে বলো। আর খুব কোমল স্বরে বলো না। কেননা, কোমল স্বরে বললে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তাদের মনে কুবাসনা জন্মাতে পারে।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, পরপুরুষের সাথে বা পরনারীর সাথে কথা বললে মনে যে অনুচিত বাসনা তৈরি হয়, তা একটি অন্তরের রোগ। এজন্য মাশায়েখে কেরাম এই রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে যিকিরের সবক দিয়ে থাকেন, যাতে রোগ সেরে গিয়ে অন্তরে শান্তি আসে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ

যার কাছে আল্লাহর সান্নিধ্যের এস্তেহজার অর্জন হয়, তার জন্য গোনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যায়। যেকোনো কাজ করার সময় তার মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন। তাই সে যেকোনো কাজ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করে থাকে।

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী ও আল্লাহর সন্তুষ্টি

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী (রহ.) আমাদের আকাবিরের মধ্যে ছিলেন। তিনি একবার কোনো এক বাচ্চাকে তার ভুলের জন্য শাস্তি দিচ্ছিলেন। দু-চারটা থাপ্পর লাগিয়ে দিলেন। বাচ্চা ব্যথা পেয়ে কাঁদতে লাগল। বলল, হযরত আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিন। তখন মাওলানা সাহেব বললেন, আরে আল্লাহর বান্দা, আমি তো তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তেই শাস্তি দিচ্ছিলাম। এতে বোঝা যায় তাঁরা রাগের সময়ও আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা স্মরণ রাখতেন।

হযরত আলী (রাযি.) ও আল্লাহর সন্তুষ্টি

একবার হযরত আলী (রাযি.) একজন কাফেরের বুকের উপর চড়ে বসেছিলেন (কোনো কারণে) তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। তার গলায় চুরি চালাবেন, এমন সময় সেই ব্যক্তি হযরতের চেহারা মোবারকে থুতু নিক্ষেপ করল। এই ঘটনার পর আলী (রাযি.) তাকে ছেড়ে দিলেন। সে জিজ্ঞেস করল, আমি যখন আপনাকে থুতু দিলাম, আপনার তো আমাকে মেরে ফেলারই কথা; কিন্তু তা না করে আপনি আমাকে ছেড়ে দিলেন কেন? তখন হযরত আলী (রাযি.) বললেন, আমি তোমাকে হত্যা করতে ধরেছিলাম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কিন্তু তুমি যখন আমাকে থুতু দিলে, তখন আমার ব্যক্তিগত রাগও এসে সেখানে জমা হয়েছে। আমি আমার ব্যক্তিগত রাগের বশে কাউকে হত্যা করতে পারি না। তাই তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি।

এক রাখালের অন্তরে আল্লাহর সান্নিধ্যের এস্তেহজার

একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) এক জঙ্গলে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করছিলেন। সেদিক দিয়ে এক রাখাল তার ছাগলগুলোকে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই রাখালকে উদ্দেশ্য করে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন, আসো ভাই; কিছু খেয়ে নাও। তখন রাখাল বলল, আমি রোযাদার। রাখালের কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) অবাক হলেন।

জঙ্গলের নির্জনতায় তাকে কেউ দেখছে না, গরমের মধ্যেও ছাগল চরিয়ে এই রাখাল ছেলেটা রোযা রেখেছে, এখানে কেউ তার প্রশংসা করার মতো নেই। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) তাকে পরীক্ষা করার নিয়ত করলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) সেই রাখাল যুবককে কাছে ডেকে বললেন, একটা ছাগল আমাদের দিয়ে দাও। আমরা সেটা জবেহ করে খাব আর তুমিও ইফতারের সময় আমাদের সাথে খেয়ো। রাখাল বলল, এই ছাগলগুলো তো আমার নয়। এগুলো আমার মালিকের। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন, এতগুলো ছাগল থেকে একটি দিয়ে দিলে তোমার মালিক বুঝতে পারবে না। তখন রাখাল যুবক বলল, আমার মালিক বুঝতে না পারলেও আল্লাহ তা'আলা তো বুঝতে পারবেন।

এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলতেন, এই ছেলের অন্তরে আল্লাহর সান্নিধ্যের এস্তেহজার ছিল। তাই সে গভীর জঙ্গলেও আল্লাহকে ভয় করছিল।

এক মেয়ের অন্তরে আল্লাহর সান্নিধ্যের এস্তেহজার

একবার হযরত ওমর (রাযি.) রাতের বেলা টহল দিচ্ছিলেন। হাঁটতে-হাঁটতে এক ঘরের কাছে এলে তিনি শুনতে পেলেন, এক বৃদ্ধা তার মেয়েকে বলছে, ছাগল কি দুধ দিয়েছে? মেয়ে বলল, হ্যাঁ, দিয়েছে। বৃদ্ধা আবার জিজ্ঞেস করল; কত দুধ দিয়েছে? মেয়ে বলল, খুব অল্প দুধ দিয়েছে। বুড়ী বলল, দুধওয়ালা এসে তো পুরো দুধই চাইবে, তুমি একটা কাজ করো, দুধের সাথে কিছু পানি মিশিয়ে নাও। তখন মেয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন দুধে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন। আমি তা মিশাতে পারব না। তখন বুড়ী বলল, এখন তো আমাদের আমীরুল মুমিনীন দেখছেন না। মেয়ে বলল, আম্মা, আমীরুল মুমিনীন না দেখলেও তাঁর রব তো দেখছেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর তাদের কথা শুনে বাড়িতে চলে এলেন। সকাল বেলা তিনি সেই বুড়ী ও তার মেয়েকে ডেকে পাঠালেন। বুড়ীকে তিনি সতর্ক করে দিলেন আর মেয়েটির বয়স জিজ্ঞেস করলেন। যখন দেখলেন, মেয়ে বালেগা হয়েছে, তখন হযরত ওমর (রাযি.) এই মেয়ের সাথে নিজের ছেলের বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। মেয়ে রাজি হয়ে গেল। হযরত ওমর (রাযি.) এই মেয়েকে নিজের পুত্রবধূ বানিয়ে নিলেন। এটি সেই মেয়ে, যিনি পরে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর নানী

হয়েছিলেন। এটি-ই সেই ঈমান, যে ঈমানের প্রভাব আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন।

এক ছেলের অন্তরে আল্লাহর সান্নিধ্যের এস্তেহজার (আল্লাহর স্মরণ সর্বদা মনে জাগ্রত থাকা)

একব্যক্তি তার ছেলেকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। পথে একটা আঙুর বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাবার মনে আঙুর খাওয়ার ইচ্ছে জাগলে ছেলেকে বলল, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক দেখতে থাকো; আমি আঙুর নিয়ে আসি। কেউ আমাদের দেখছে (এদিকে আসছে) মনে হলেই তুমি আমাকে সতর্ক করে দেবে। বাবা যখন আঙুরের গাছের কাছাকাছি গেল, তখন ছেলে চিল্লাতে লাগল, আবা আমাদের কেউ একজন দেখছে। তখন বাবা দৌড়ে চলে এল। ছেলের কাছে এসে যখন কাউকে দেখল না, তখন জিজ্ঞেস করল, কৈ? কেউ তো নেই। ছেলে বলল, আবা, আমাদের কোনো মানুষ না দেখলেও আল্লাহ তো দেখছেন।

সাবধান! আল্লাহ তা'আলা দেখছেন

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজিদে বলেছেন,

أَلَمْ تَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى

'(কাফের, মুশরিক, গোনাহগারেরা) কি জানে না, আল্লাহ দেখছেন?'[১]

এই আয়াত পড়ার পড়ে চিন্তা করা উচিৎ, আল্লাহ তা'আলা আমাদের দেখছেন, তাঁর সামনেই আমরা গোনাহ করছি। তো কাল কিয়ামতের দিনে তাঁর সামনে দাঁড়াতে আমাদের কতখানি শরমিন্দা হতে হবে। আমাদের কতটা বেইজ্জতি হতে হবে। তাই বলছিল, এখনো সময় আছে। আমাদের উচিৎ আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজেদের গোনাহের ক্ষমা চেয়ে নেওয়া আর আল্লাহর সান্নিধ্যের স্মরণ মনের মাঝে সদা জাগ্রত রাখার চেষ্টা করা। আমাদের মেহনত করার জন্যই তো সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আল বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ

'নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।'[২]

---

১. সূরা আলাক, আয়াত-১৪

২. সূরা বালাদ, আয়াত-৪

হযরত খাজা বাহাউদ্দিন যাকারিয়া (রহ.) ও আল্লাহর সান্নিধ্য

হযরত শেখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি (রহ.)-এর কাছে হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (রহ.) এসে বাই'আত হলেন এবং তৃতীয় দিনই হযরত শিহাবুদ্দীন (রহ.) তাঁকে খেলাফত দিয়ে দিলেন। তখন সেখানকার স্থানীয় কিছু লোক হযরত শিহাবুদ্দীন (রহ.)কে বললেন, হযরত উনি অনেক দূর থেকে এলেন আর আপনি তৃতীয় দিনেই তাকে খেলাফত দিয়ে দিলেন। আমরাও তো অনেক দিন ধরেই আপনার কাছে আছি, আমাদের দিকেও একটু মেহেরবানির নজর দিলে ভালো হয়। তখন হযরত শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি (রহ.) বললেন, আচ্ছা, ব্যাপারটা তোমাদের সময়মত বুঝিয়ে দেব।

পরদিন তিনি অনেকগুলো মুরগী জোগাড় করে যারা আপত্তি করেছিল তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে মুরগী দিলেন। একটি মুরগী বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (রহ.)কেও দিলেন। সবাইকে বললেন, এমন জায়গায় গিয়ে মুরগী জবেহ করে নিয়ে এসো, যেখানে কেউ দেখবে না। সুতরাং কেউ গাছের আড়ালে গিয়ে জবেহ করে নিয়ে এলেন। কেউ নিজের রুমের ভিতর নিয়ে জবেহ করে নিয়ে এলেন। কেউ দেওয়ালের পিছনে নিয়ে জবেহ করে নিয়ে এলেন। প্রত্যেকেই মুরগী জবেহ করে নিয়ে এলেন আর হযরতকে দেখালেন। কিন্তু হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (রহ.) কিছুক্ষণ পর আস্ত মুরগীটি নিয়ে এসে কাঁদতে লাগলেন। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো ভাই! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হযরত, আপনি বলেছিলেন, এমন জায়গায় নিয়ে মুরগী জবেহ করে নিয়ে আসতে, যেখানে কেউ দেখে না। কিন্তু আমি যেখানেই জবেহ করতে গিয়েছি, সেখানেই আমার পরওয়ারদেগার আমাকে দেখছিলেন; তাই আপনার হুকুম আমি পালন করতে পারিনি।

তখন হযরত শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি (রহ.) তাঁর অন্যান্য মুরীদদের বললেন, দেখে; এই অবস্থার কারণেই আমি একে খেলাফত দিয়েছি।

তাসাওউফ অস্বীকারকারী ও এহসানের স্তর

সম্মানিত উপস্থিত ভাইয়েরা! আমাদের অন্তরে এই অবস্থা বিরাজমান থাকা উচিত যে, আমরা সব সময় আল্লাহর সামনেই আছি। একে 'মাকামে এহসান'-এর স্তর বলা হয়। যারা তাসাওউফের বিরোধিতা করেন, তারা বলুন, আপনারা এহসানের মাকাম কীভাবে অর্জন করেন? জিবরাইল (আ.) হযরত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'এহসান' কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভাই! আপনিই বলে দিন এহসান কী? তখন জিবরাঈল (আ.) বললেন, এহসান এই যে, আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন, যেন আপনি আল্লাহকে দেখছেন। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করুন, যেন আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। অর্থাৎ প্রথমে মুশাহাদার অবস্থা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করুন। তা নাহলে অন্তত মুরাকাবার অবস্থা সৃষ্টি করুন।

যারা তাসাওউফ অস্বীকার করে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করুন, যদি মুশাহাদার অবস্থাও না থাকে আর মুরাকাবার অবস্থাও না থাকে, তাহলে তারা নামায কীভাবে পড়ে? তারা বলে, তাসাওউফ বেদআত। এটি নাকি একটি আজমি (অনারব) জিনিস। ভাই! তাসাওউফ আজমি হলেও এহসান তো আরবি। বলুন, এহসান কীভাবে অর্জন করবেন? আপনাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন, যিনি দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন, আপনার কাছে এহসানের অবস্থা অর্জিত হয়েছে? আপনারা হাজারে একজন মানুষও দেখাতে পারবেন না। পক্ষান্তরে আলহামদু লিল্লাহ আমাদের মধ্যে অর্থাৎ যারা যিকির-আযকার করি, তাদের মধ্যে হাজার-হাজার মানুষ এমন আছেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানি করে গোনাহের মজা থেকে হেফাজত করেছেন।

আল্লাহওয়ালাদের উপর আল্লাহর স্মরণের প্রভাব

এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, কার কাছে ঈমানের সেই উচ্চ স্তরটি অর্জন হয়েছে? আল্লাহর সান্নিধ্যের এস্তেহজার কার সৌভাগ্য হয়েছে? যার কাছে এই নেয়ামত অর্জন হয়েছে, সে গোনাহ করার দুঃসাহস দেখাতে পারে না। ইমামে রাবানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) তো এও বলেছেন যে, এ রকম বান্দা যদি হাজার বছরও হায়াত পায় আর হাজার বছর ধরেও যদি তিনি আল্লাহকে ভুলে থাকার চেষ্টা করেন, তবুও তাঁর পক্ষে আল্লাহকে ভুলে থাকা সম্ভব হয় না। আল্লাহর স্মরণ অন্তরে এমনভাবে বসে যায় যে, যেমন অনেকেই বলে থাকেন, আত্মীয়তা হচ্ছে না; তবুও তাঁকে ভুলতে পারছি না। অনেকেই এও বলেন যে, ওর বাবা-মা আত্মীয়তায় রাজী নয়, তবুও আমি তাকে ভুলতে পারছি না। অন্তরে তার স্মরণ এমনভাবে জমে যায় যে, তাকে ভুলতে চাইলেও ভুলা যায় না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহর এক মাখলুখের সৌন্দর্যের যদি এতই প্রভাব হয় যে, তাকে ভুলতে চাইলেও ভুলা যায় না, তাহলে যার অন্তরে আল্লাহর অসাধারণ সৌন্দর্যের ছবি বসে গেছে, সে আল্লাহকে কীভাবে ভুলতে

পারে? সে আল্লাহকে কখনো ভুলতে পারে না। সে আল্লাহর পাগল হয়ে যায়। তার অন্তরের অবস্থা এরকম হয় যে, হাঁটতে-বসতে, শোওয়া অবস্থায় আল্লাহর কথা তার স্মরণ থাকে। একটি মুহূর্তের জন্যও সে আল্লাহকে ভুলে থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এরকম ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেন, তারা আমার সেইসব বান্দা, যাদেরকে তাদের বাণিজ্য আমার স্মরণ থেকে বিরত রাখতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

'যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।'[১]

যখন বান্দার কাছে এই অবস্থা অর্জিত হয়, তখন সে আল্লাহকে আর ভোলে না।

খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব (রহ.) ও আল্লাহর সান্নিধ্য

হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, একবার হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর খলীফা খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব (রহ.) ও খোদ মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)সহ আরো কয়েকজন আলেম এক জায়গায় সমবেত হয়েছিলেন। একপর্যায়ে খাজা আযীযুল হাসান (রহ.) এমন কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তা শুরু করলেন যে, সবাই হাসতে-হাসতে লুটে পড়ছিলেন। সত্য কথা বলেও মানুষকে হাসানো যায়। কৌতুক করতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। অনেক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কিছুটা হাসির কথা বলতেন। সাহাবায়ে কেরামও অনেক সময় একে অপরের সাথে হাসির কথা বলতেন। আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের কাছে এমন সত্য কৌতুক থাকে যে, কথাও সত্য হয় আবার শ্রোতারা হাসতেও বাধ্য হয়। হযরত মুফতী শফী (রহ.) বলেন, তিনি আমাদের অনেকক্ষণ ধরে হাসির কথাবার্তা বললেন আর আমরা হাসতে-হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছিলাম।

একটু পর আমি বললাম, ভাই! হাসতে-হাসতে আমার পেট ব্যথা হয়ে যাচ্ছে; এবার কৌতুক বন্ধ করলে ভালো হয়। একথা শুনে তিনি বললেন, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন, যিনি এসব কথাবার্তার সময়েও আল্লাহকে এক মুহূর্তের জন্যও ভোলেননি? মুফতী শফী সাহেব বলেন, হঠাত তাঁর এ ধররে প্রশ্নে আমরা অবাক হলাম। তারপর তিনি বললেন, আমি এতক্ষণ আপনাদের হাসির কৌতুক শোনাচ্ছিলাম; অথচ আমি সেই সময়েও

---

১ সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৯১

এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহকে ভুলিনি। যেসব লোকের অন্তরে আল্লাহর সান্নিধ্যের এই অবস্থা অর্জন হয়, তারা হাসি-তামাশার সময়েও আল্লাহকে ভোলেন না; বরং সব সময় তাদের অন্তরে আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত থাকে।

এক বাদশাহর শিক্ষণীয় ঘটনা

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বা অন্য কোনো ফকীহর (ফেকাহ শাস্ত্রবিদ) যুগের ঘটনা। সে যুগের বাদশাহ একবার তার স্ত্রীর সাথে একান্তে সময় কাটাচ্ছিলেন। বাদশাহের স্ত্রী কোনো কারণে বাদশাহর উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। বাদশাহ চাচ্ছিলেন, প্রিয়তমা স্ত্রীর সাথে আনন্দের সাথে কিছু সময় কাটাবেন। অন্য দিকে স্ত্রী গাল ফুলিয়ে বসে আছেন। তিনি বাদশাহকে এই মুহূর্তে দুচোখে দেখতে চাচ্ছেন না। এক দিক থেকে আবেদন আর অন্য দিক থেকে অস্বীকারের খেলা চলছে তো চলছেই। অনেক সময় এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর বাদশাহ আরও কিছু ভালোবাসার কথা বললেন। স্ত্রী আরও বেশি রেগে গিয়ে বললেন, জাহান্নামী কোথাকার, সরে যাও এখান থেকে। এরকম কঠোর কথা শুনে বাদশাহও রেগে গেলেন। বললেন, আমি যদি জাহান্নামী হই, তাহলে তোমাকে তিন তালাক। এ কথা বলার পর বাদশাহ ও তার স্ত্রী উভয়েই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, তালাক পড়ে যায়নি তো?

সকালে দুজনেরই মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে এল। ফতোয়া জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেলেন। স্থানীয় এক আলেমের কাছে গেলেন। বিস্তারিত বলে তালাক হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন। তিনি উত্তরে বললেন, এই মাসালার সমাধান আমরা দিতে পারব না। কারণ, আপনি জান্নাতী, নাকি জাহান্নামী তা আমরা জানি না। বাদশাহ আরো কয়েকজন আলেমের কাছে গেলেন। সবাই বললেন, এই মাসালার সমাধান আমরা দিতে পারব না।

বাদশাহও এমন সুন্দরী স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চাচ্ছিলেন না। আবার এই মাসআলার সমাধান কী তাও জানেন না। এই সমস্যার কথা পুরো দেশেই ছড়িয়ে পড়ল। এমনিতেও রাজা-বাদশাহদের এসব খবর দ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শেষে এক ফকীহকে ডেকে পাঠালেন। তাকে বিস্তারিত বলে তালাক হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, এই মাসআলার সমাধান আমি দেব ইনশাআল্লাহ। তবে তার আগে বাদশাহের সাথে আমার একান্তে কিছু কথা বলা দরকার। বাদশাহ রাজি হলেন। ফকীহ বাদশাহের সাথে একান্তে কথা বললেন। ফকীহ বাদশাহের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা আপনার জীবনে এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে যে, আপনি গোনাহ করার সুযোগ পেয়েও শুধু আল্লাহর ভয়ের কারণে গোনাহ থেকে বিরত ছিলেন?

বাদশাহ চিন্তা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললেন, হ্যাঁ, একবার এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। একদিন দুপুর বেলা আমি যখন শোওয়ার জন্য আমার রুমে ঢুকলাম, তখন দেখলাম সেখানে মহলের কাজের মেয়েদের মধ্যে একটি সুন্দরী মেয়ে কিছু গোছগাছ করছিল। তাকে একাকী পেয়ে এবং তার সৌন্দর্য দেখে আমার মনে খারাপ চিন্তা জাগল। আমি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম এবং তার দিকে অগ্রসর হলাম। সেই মেয়েটি সচ্চরিত্রবতী ও নেককার ছিল। সে যখন দেখল, একা ঘরে বাদশাহ ঘরের দরজা বন্ধ করে তার দিকে আসছেন, তখন সে ঘাবড়ে গেল এবং আমি যখন তার খুব কাছে গেলাম, তখন সে বলল, বাদশাহ নামদার, আল্লাহকে ভয় করুন। যখন সে একথা বলল, তখন আল্লাহর নাম শুনে আমার শরীরের পশম খাঁড়া হয়ে গেল। আমার অন্তরে আল্লাহর ভয় এসে গেল। আমি তাকে বললাম, ঠিক আছে; চলে যাও। আমি নিজেই দরজা খুলে তাকে বের করে দিলাম। সে চলে গেল। আমি সেদিন গোনাহ করতে পারতাম। কেউ আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু আল্লাহর ভয়েই সেদিন আমি গোনাহ থেকে ফিরে এসেছিলাম।

এই ঘটনা শুনে ফকীহ বললেন, এই ঘটনা যদি আপনার জীবনে ঘটে থাকে, তাহলে আমি ফতোয়া দিচ্ছি, আপনি জান্নাতী এবং আপনার স্ত্রীর উপর তালাক পড়েনি।

এই ঘটনা যখন অন্যান্য আলেমগণ শুনলেন, তারা বললেন, জনাব! আপনি এই ফতোয়া কীভাবে দিলেন? তিনি উত্তর দিলেন এই ফতোয়া আমি নিজের পক্ষ থেকে দেইনি। এটাতো কুরআন মজিদেই লেখা আছে।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।[১]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার সান্নিধ্যের এস্তেহজার নসীব করুন। আমাদেরকে গোনাহের মজা থেকে দূরে রাখুন। আগামীতে আমাদেরকে গোনাহ মুক্ত জীবন যাপনের তাওফীক দিন। আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

---

১. সূরা নাযিআত, আয়াত-৪০,৪১

ফাজায়েলে সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)

যখন সূর্য উদিত হয়, তখন সর্বপ্রথম সেই দালানেই সূর্যের কিরণ পড়ে, যেটি সবচেয়ে উচ্চ। একইভাবে নবুওয়াতের সূর্য যখন উদিত হয়, তখন তার কিরণ সর্বপ্রথম সেই ব্যক্তিত্বের উপর পড়ে, যিনি উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উচ্চ স্তরের। তিনি হলেন সাইয়্যিদুনা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)।

ফাযায়েলে সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. يٰا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

সাদেকীন বলতে যা বুঝায়

يٰا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।[১]

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য মাশায়েখে সুফিয়ায়ে কেরাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন সাহেবে নেসবত (সম্পর্কযুক্ত) লোকদের সাথে থাকার।

সাদেকীন সব সময় থাকবে

আজকাল অনেকেই বলে থাকেন, জুনায়েদ বাগদাদী আর বায়েজিদ (রহ.)-এর মতো ব্যক্তি তো এখন পাওয়া যায় না। সত্যবাদী তো এখন মিলছে না। কী করব? এখানে ভেবে দেখা দরকার, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের সত্যবাদীদের সাথে থাকার আদেশ দিয়েছেন। এই আদেশ তো কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। তাই যত দিন দুনিয়াতে ঈমানদার বেঁচে থাকবে, তত দিন সত্যবাদীও থাকবে। কেননা, যদি সত্যবাদী না থাকে, তাহলে আল্লাহর এই আদেশ পালন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে না। আর আল্লাহর যে আদেশ পালন করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, সেরকম কোনো আদেশ মানুষকে দিবেন না। আমরা যদি বিশ্বাস করি, কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত আমলের উপযুক্ত থাকবে, তাহলে আমাদের এটাও মানতে হবে যে, সাদেকীনের জামাতও প্রত্যেক যুগে পাওয়া যাবে।

সাদেকীন (সত্যবাদী)দের খোঁজ

সাদেকীনদের জামাতকে পেতে হলে অবশ্যই তাদের খুঁজতে হয়। তাদের খুঁজে নেওয়া আমাদের দায়িত্ব। দুনিয়াবী প্রয়োজনে আমরা কত

---

১ সূরা তাওবাহ, আয়াত- ১১৯

কিছুই তো খুঁজে নিচ্ছি। আর যেখানে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত বিষয়, সেখানে তো আমাদের আরো বেশি গুরুত্বের সাথে তাদের খুঁজতে হবে। এ কাজে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে। জীবনে যদি কখনো এরকম কোনো ব্যক্তির সাথে দেখা হয়, তাহলে তাঁকে খুব মূল্যায়ন করতে হবে। কেননা, বুজুর্গ ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে তিরয়াকের মতো প্রভাব থাকে। তাদের সুনজরের দ্বারা অন্তরের রোগমুক্তি মেলে।

বরকত শুধুই বরকত

সম্পর্ক (নেসবত) এক প্রকার নূর হয়ে থাকে। এই নূর যার অন্তরে প্রবেশ করে, তাঁকে আল্লাহ তা'আলা আগাগোড়াই নূর বানিয়ে দেন। তাঁর দেখাতে নূর থাকে। তাঁর কথায় নূর থাকে। তাঁর আমলে বরকত থাকে। তাঁর ফয়সালাতে বরকত থাকে। তিনি যেখানে বসেন, সেখানে বরকত এসে যায়। এমনকি অনেক সময় তিনি আগাগোড়াই বরকতময় হয়ে যান। তিনি যে শহর হয়ে যান, সেই শহরেও তাঁর বরকতের প্রভাব পড়ে।

বরকত অর্জনের একটি শর্ত

এসব বরকত অর্জন করার একটি শর্ত আছে। আর তাহলো নেসবতওয়ালা ব্যক্তিদের সাথে মহবত সৃষ্টি করা। মহবত যত বেশি হবে, তত তাড়াতাড়ি ফয়েজ জারি হবে। যতই সম্পর্ক মজবুত হবে, ততই এই ফয়েজের গতি বাড়বে। আবার কখনো এক মুহূর্তের তাওবা বান্দার সারা জীবনের গতি পাল্টে দিতে পারে। এর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার দরকার আছে।

বস্তুর অপর দিক দেখার মতো দৃষ্টি

আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিগণ নিজের ইচ্ছায় দৃষ্টি দেন না; বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের বিভিন্ন বিষয় জানিয়ে দেন। খাজা আব্দুল মালেক সিদ্দীকী (রহ.) বলতেন, যদি আমি দৃষ্টি দেই, তাহলে এক মুহূর্তের মধ্যেই পুরো মজমাকে আলোড়িত করে দিতে পারি, কিন্তু উপর থেকে তা করার অনুমতি নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে সেই দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। তাঁরা বস্তুর অপর পৃষ্ঠাও দেখতে পারেন।

তাকবীরে তাহরীমার আগে বাইতুল্লাহর জিয়ারত

খাজা আব্দুল মালেক সিদ্দীকী (রহ.) একবার আকুড়াখটক মাদ্রাসায় অবস্থান করছিলেন। সেখানে আলেমদের জন্য পনের দিনব্যাপী তারবিয়তী

প্রোগ্রাম চলছিল। এক আলেম হযরত আবদুল মালেক সিদ্দীকী (রহ.)কে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত আমি কদিন থেকে খেয়াল করছি, আপনি যখন ইমামতিতে দাঁড়ান, তখন একামত হয়ে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ দেরি করেন। তারপর নামাযের নিয়ত বাঁধেন। আপনি দেরিটা কেন করেন? এতে হেকমত কী? হযরত (রহ.) এই প্রশ্ন শুনে একটু হাসলেন। বললেন, আপনারা তো ওলামায়ে কেরাম। আপনাদের খেয়াল-ধ্যান সব সময় আল্লাহর দিকেই থাকে। আমি তো ফকীর মানুষ। নামায পড়ার জন্য যখন দাঁড়াই, তখন যতক্ষণ না খানায়ে কাবা আমার চোখের সামনে দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নামাযের নিয়ত বাঁধি না। নেসবতের সৌভাগ্য যাদের হয়েছে, তাঁরা এভাবেই নামায আদায় করেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দু'আ

এটি সেই নেয়ামত, যার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন,

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ كَمَا هِيَ

'হে আল্লাহ! আমাকে বস্তুর আসল হাকীকত দেখিয়ে দিন।'

আল্লাহ তা'আলা সেই বুজুর্গ ব্যক্তিদের বস্তুর হাকিকত দেখিয়ে থাকেন। তাঁদের সামনে মানুষের অন্তর পর্যন্ত খুলে যায়। তাঁরা মানুষের অন্তর সেভাবেই পড়তে পারেন, যেভাবে আমরা কিতাব পড়ি।

অভিসম্পাত সেইসব পীরের উপর

হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) একবার করাচীতে ছিলেন। এক ভদ্রলোক হযরতের সাথে সাক্ষাত করতে এলে অন্য এক লোক বললেন, হযরত! এই ব্যক্তি অন্তরে দুনিয়া নিয়ে আপনার কাছে এসেছে। একথা শুনে হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) তাঁকে বকা দিলেন আর বললেন, লানত হোক সেই পীরের উপর, যে জানতে পারে না, মুরিদ কী উদ্দেশ্যে এসেছে।

একটি ব্যক্তিগত ঘটনা

একবার এই অধম এক আলেমকে সাথে নিয়ে হযরত মুরশিদে আলম (রহ.)-এর কাছে ঢকওয়াল গিয়েছিলাম। আমি মনে-মনে ভাবলাম, এত বড় একজন আলেম আমার হযরতের কাছে এলেন; তাই তাঁর বিষয়ে হযরতকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। আমি বললাম, হযরত উনি বড় আলেম; আপনার

সাথে দেখা করতে এসেছেন। হযরত বললেন, 'চুপ করেন; আমি ওনাকে আগেই পড়ে নিয়েছি'। কথাটা হযরত মসজিদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন।

আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিগণ অন্তরের খবর জানেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সামনে অবস্থা খুলে দেন। এজন্য তাঁদের সামনে বসার সময় অন্তর ঠিক করে বসা উচিৎ। বলা হয়, যখন হাকিমের সামনে বসা হয়, তখন হাকিমের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। এদিক-সেদিক দেখলে পিটানো হয়। আর যখন আলেমদের সামনে বসবেন, তখন জবান ঠিক করে বসবেন। কেননা, যদি এদিক-সেদিকের কোনো কথা বের হয়ে যায়, তাহলে মুফতী হযরতগণ ফতোয়া দিয়ে দিবেন। আর যদি আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের সামনে বসেন, তাহলে অন্তর ঠিক করে বসবেন।

সমর্পণ ও স্নেহ

একাগ্র হয়ে বসলে তখন তাওয়াজ্জুহ তাঁদের উপর প্রভাব ফেলে। এজন্য যখন নিজের শায়খের সামনে বসবেন, তখন একাগ্রচিত্তে বসবেন। এক দিক থেকে মহবত ও সমর্পণ আর অন্য দিক থেকে স্নেহ হলে আল্লাহ তা'আলা বান্দার উদ্দেশ্য পূরণ করে দিয়ে থাকেন। তাই শায়খের সাথে নিজের মহবতের সম্পর্ক আরো গাঢ় করুন।

সিলসিলায়ে নকশবন্দিয়ার নামকরণের কারণ

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সৌভাগ্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর ইত্তেহাদের সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের এই সিলসিলায়ে নকশবন্দিয়া সিদ্দীকী সম্পর্কের সাথে যুক্ত। এই সিলসিলার নাম প্রথমে সিদ্দীকিয়া সিলসিলা ছিল। কিন্তু খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ বুখারী (রহ.)-এর পরে এর নাম সিলসিলিয়ায়ে নকশদন্দিয়া হয়ে যায়। কেননা, তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি যখন সালেকদের আল্লাহ আল্লাহ-এর যিকির করাতেন, তখন যেন তিনি সালেকদের অন্তরে আল্লাহর নামের নকশা তৈরি করে দিতেন।

সিদ্দীকি সম্পর্ক (নেসবত) একটি মজবুত সম্পর্ক

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি কামালাতে বেলায়ত অর্জন করেছেন হযরত আলী (রাযি.)। আর কামালাতে নবুওয়াত অর্জন করেছেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)। এজন্য

সাহাবায়ে কেরামের (রাযি.) মধ্যে সবচেয়ে বেশি মজবুত নেসবত ছিল হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর মতোই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যে, তাঁর জীবনী পড়লে সহজেই বোঝা যায়, হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর জীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সাথে অনেকখানিই মিল রয়েছে। আজকের বয়ানের মূল উদ্দেশ্য আপনাদের সামনে এই বিষয়টা তুলে ধরা যে, আমাদের নেসবত সিদ্দীকী নেসবত। এটি একটি মজবুত নেসবত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামালাত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর সিনা মুবারকে এবং তাঁর সিনা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মাশায়েখে কেরামের সিনাতে স্থানান্তরিত হতে থাকবে।

নেসবত ও খেলাফত

নেসবতকে আশা বানিয়ে দু'আ করা এবাদত। কারণ, নেসবত অর্জন হওয়ার পর ইবাদতের মধ্যে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। নামায ঠিক হয়ে যায়। কুরআন তেলাওয়াতের ধরন পাল্টে যায়। অবহেলা দূর হয়ে যায়। গোনাহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তবে খেলাফতের কামনা করা তাসাওউফের দুনিয়াতে শিরক মনে করা হয়। খেলাফত আলাদা জিনিস। সেটি একটি নিয়মতান্ত্রিক বিষয়। আর নেসবত অর্জনের আশা করা ভিন্ন বিষয়। নেসবতের জন্য আল্লাহর কাছে এভাবে দু'আ করা উচিৎ যে, হে আল্লাহ! আমাকে আপনি নেসবতের নূর দান করুন, যাতে আমি একাগ্রচিত্তে আপনার ইবাদত করতে পারি আর আমার জীবন থেকে যেন গোনাহ দূর হয়ে যায়।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মর্যাদার আসল কারণ

এই নেসবতের মাহাত্ত্ব সব সময় অন্তরে থাকা চাই যে, এটি সিদ্দীকি নেসবত। সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর কলব মোবারকে যে অবস্থা বিরাজিত ছিল, সেটিই পরবর্তী যুগের মাশায়েখে কেরামের কলবের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়ে আসছে। হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর সহধর্মিণী বলতেন, হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর ফজিলত তাঁর নামায-রোযার কারণে নয়, বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে যে ফিকির দিয়েছেন, তার কারণেই আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

ফাজায়েল ও মানাকিব (মর্যাদা ও সম্মান)

এখন সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর কিছু ফজিলত বর্ণনা করছি, যাতে তাঁর মহবত অন্তরে বসে যায় ও আমাদের এই নেসবত য়া মাশায়েখে কেরামের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে তা কত উচ্চ নেসবত সহজে বোঝা যায়।

বিনাদ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ

সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) ছিলেন সেই সাহাবী, যিনি বিনাদ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা তিনি একবাক্যে বিশ্বাস করেছেন। হাদীছে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যে কারো কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছি। প্রত্যেকেই কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করেছে। কিন্তু আবুবকর কোনো চিন্তা-ফিকির ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই একবাক্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এমনকি হযরত আলী (রাযি.)-এর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি পরামর্শ করে দেখি। আর হযরত ওমর (রাযি.) তো মারামারি-কাটাকাটি পর্যন্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন। একমাত্র সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর কপালে এই সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে যে, তিনি একবাক্যে কোনো প্রকার দ্বিধা ছাড়া-ই ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর উসিলায় আরো কয়েকজন বড় সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যাদের মধ্যে হযরত ওসমান বিন আফফান, হযরত ওসমান বিন মাজউন, হযরত তালহা বিন জুবাইর, হযরত সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস-এর মতো বড় সাহাবারাও আছেন। চিন্তা করুন, কত বড় নেসবত ছিল হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর, যার মাধ্যমে বড়-বড় সাহাবা ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

সাহাবায়ে কেরামের সবচেয়ে বড় গুণ

সম্মানিত উপস্থিতি! যে বিষয়টি ইতিহাস হয়ে যায়, সেটি শত্রু-মিত্র সবাই মেনে নেয়। কিন্তু যা ইতিহাস হওয়ার আগেই মানুষ মেনে নেয়, সেটি অবশ্যই বিস্ময়কর বিষয় হয়ে থাকে। এখন তো অনেক অমুসলিমও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্বের কথা মেনে নিয়েছে। অনেকে তাঁর শানে নাত-কবিতা, বই-পত্রও লিখছেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসময় দীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, সে সময় তা ইতিহাস হয়ে যাওয়ার আগেই সাহাবায়ে কেরাম মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত তখনই মেনে নিয়েছিলেন, যখন সেটি ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়নি। আল্লাহর কাছে সেসব ব্যক্তিত্ব অনেক বড় ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের সবচেয়ে বড় গুণটি হলো, তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতকে ইতিহাস হয়ে যাওয়ার আগেই মেনে নিয়েছিলেন।

উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব

যখন সূর্য উদয় হয়, তখন সর্বপ্রথম সেই দালানেই সূর্যের কিরণ পড়ে, যেটি সবচেয়ে উচ্চ। একইভাবে নবুওয়াতের সূর্য যখন উদয় হয়, তখন তার কিরণ সর্বপ্রথম সেই ব্যক্তিত্বের উপর পড়ে, যিনি উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উচ্চ স্তরের ছিলেন। তিনি হলেন সাইয়্যিদুনা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহবত ও সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)

একবার মক্কার কাফেররা হারাম শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মারধর করছিল। অন্য এক অমুসলিম ব্যক্তি এই খবর হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)কে জানাল। বলল, গিয়ে আপনার বন্ধুকে বাঁচান; কাফেররা তাঁকে মারধর করছে। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) দৌড়ে এলেন। লোকজনকে ঠেলে ভিতরে গিয়ে বললেন, তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে মারছ, যিনি বলেন, আল্লাহ আমার রব। একথা বলায় কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)কে মারতে লাগল। রেওয়ায়তে বলা হয়েছে, হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) শুধু মুখে বলছিলেন, তাবারাকতা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম। কাফেররা তাঁকে এতই মেরেছিল যে, তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। তাঁর বংশের লোকেরা তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে এল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান ফিরল না। রাত শেষ হয়ে এল।

যখন জ্ঞান ফিরল, তখন তাঁর মা বললেন, বাবা কিছু খেয়ে নাও। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? জবাবে মা বললেন, তোমার নিজের শরীরে আঘাতের কারণে জখম হয়ে গেছে আর তুমি এ অবস্থায়ও নিজের কথা না ভেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা জিজ্ঞেস করছ? তিনি

বললেন, হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা জানতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছুই খাব না। মা বললেন, তিনি কেমন আছেন আমি তো জানি না। তখন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) বললেন, ওম্মে জামিলের কাছে যান। তাঁর কাছে জানতে পারলেন, নবীজি দারুল আরকাম-এ আছেন। তখন আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) দারুল আরকাম-এ গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর অবস্থা দেখে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)কে আলিঙ্গন করলেন। সুবহানাল্লাহ!

হযরত হামযা (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ

যেদিন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর উপর এই অত্যাচার করা হলো, সেদিনই এর একটু পরেই হযরত হামযা (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেন। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন; তাই হযরত ওমর (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেন। আর আবুবকর (রাযি.) কোরবানী দিয়েছেন; তাই হযরত হামযা (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর কোরবানীও অনেক বড় ছিল। যে কারণে উচ্চমর্যাদাবান এক সাহাবী হযরত হামযা (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

জান্নাতের সুসংবাদ

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. উপস্থিত সাহাবাদের (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, আজ কে রোযা রেখেছ? তখন উপস্থিত সব সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) দাঁড়ালেন। বললেন, আমি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, আজ জানাযা পড়েছ কে? এবারও হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) দাঁড়ালেন। বললেন আমি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, আজ অভাবীকে খানা খাইয়েছ কে? তখনও হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) দাঁড়ালেন। বললেন আমি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, আজ রুগীর সেবা করেছ কে? তখনও হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) বললেন আমি। যখন চারবারই হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) দাঁড়ালেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার এই চারটি গুণ আছে, তাকে আমি জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছি।

সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর ফজিলত ও হাদীছে নববী

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ফজিলত সম্পর্কে একশ একাশিটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আবার হযরত আবুবকর ও ওমর (রাযি.)-এর ফজিলত সম্পর্কে ৮৮ টি হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে। আর তিন খলীফা হযরত আবুবকর, ওমর ও ওসমান (রাযি.)-এর ফজিলতে এসেছে ১৭টি হাদীছ। চার খলীফার ফজিলত এসেছে চৌদ্দটি হাদীছে। এ থেকে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মর্যাদা ও ফজিলতের আন্দাজ করা যেতে পারে।

'বকর' শব্দ এর তাহকীক

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, তাঁর নাম ছিল আবুবকর। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সব দিক দিয়ে এগিয়ে রেখেছেন। কীভাবে? আরবী ভাষার শিক্ষার্থীরা জানেন, যে শব্দের মূল ب.ك.ر হবে সেই শব্দের অর্থ হবে কোনো জিনিসের সামনের অংশ। যেমন بُكْرَة এর অর্থ হলো আগামী কাল সকাল। দিনের প্রথম অংশ। একইভাবে بُكُور বলা হয় সেই ফলকে যা মৌসুমের শুরুতে পাওয়া যায়। بِكْر বলা হয় কুমারী মেয়েকে, যার এখনো বিয়ে হয়নি। তো যে শব্দের মূল হবে ب، ك، ر، সেই শব্দের অর্থ তাঁর ময়দানে সেই প্রথম বা এগিয়ে থাকার অর্থ বোঝাবে। হযরতের নামও আল্লাহ তা'আলা আবুবকর রেখেছেন। তাই তিনিও প্রত্যেক ময়দানে সবার আগেই ছিলেন।

প্রথম হওয়া

দেখুন, পুরুষদের মধ্যে সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন কে? হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)। এখানেও তিনি সবার আগে। তিনিই সর্বপ্রথম কুরআন মজিদের নাম রেখেছেন মাছহাফ। এখানেও তিনি এগিয়ে। তিনি খলীফায়ে রাশেদা হয়েছেন। এখানেও তিনি সবার আগে। তিনিই সর্বপ্রথম খেলাফতে রাশেদার ওয়ালিয়ে আহাদ নির্ধারণ করেন। এখানেও তিনি সবার আগে। তাঁর লকব ছিল আতীক। এখানেও তিনি এগিয়ে। সিদ্দীক লকব তিনিই পেয়েছেন সবার আগে। তিনি সবার আগে কুরআন মজীদ সঙ্কলন করেছেন। এখানেও তিনি প্রথম। তিনি তাঁর বাবা-মার জীবদ্দশায় খেলাফত পেয়েছেন। এখানেও তিনি প্রথম। তিনি সর্বপ্রথম বায়তুল মাল গঠন করেছেন। এখানেও তিনি প্রথম। তিনি খলীফাতুর রাসূল উপাধি পেয়েছেন।

এখানেও তিনি প্রথম। হাদীছে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে আবুবকরই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। এখানেও তিনি প্রথম। তাঁকে আওয়ালিয়াতে সিদ্দীকী বলা হয়।

হিজরতের সফরের উপর কিছু আলোকপাত

তাঁর হিজরতের সফরের কিছু সূক্ষ্ম বিষয় শুনুন। আপনারা অন্তরের কানে শুনবেন বলে আশা করি।

সিদ্দীকে আকবরের দরজায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন

হিজরতের সময় যখন ঘনিয়ে এল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে দুপুরের সময় আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ঘরে এলেন। সফরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। পরে আবার চলে গেলেন। রাতে সফরে রওনা হওয়ার জন্য আবার এলেন। রাতে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুবকর (রাযি.)-এর বাড়ির উঠোনে পৌঁছলেন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের আওয়াজ পেয়েই আবুবকর (রাযি.) দরজা খুলে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সজাগই ছিলেন নাকি?। বললেন জি, আমি জেগেই ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ঘুমাননি? বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ঘুমাইনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, ঘুমাননি কেন? হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জানি, আপনি আসবেন। তাই ভাবলাম, আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তাহলে হয়ত এসে আপনাকে দরজায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হতে পারে। আপনার কষ্ট হবে। এই ভেবে আমার ঘুম আসছিল না। তাই আমি জেগেই আপনার অপেক্ষা করছিলাম।

একান্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, বাইরের কেউ বাড়িতে নেই তো? হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) উত্তর দিলেন, না, নেই; শুধু আমার দুই মেয়ে আর আমার স্ত্রী রয়েছে বাড়িতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে; এবার সফরের তৈরি শুরু করে

দিন। সামানা-পত্রের মধ্যে কিছু জিনিস বাঁধা প্রয়োজন হলো। তখন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর বড় মেয়ে হযরত আসমা (রাযি.) নিজের একটা ওড়না দুই টুকরা করে এক অংশ দিয়ে সামানা বাঁধলেন আর অপর অংশ মাথায় পেঁচিয়ে নিলেন।

ছাওর গুহায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত

তারপর হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) বাড়ির সবাইকে বিভিন্ন জিম্মাদারিতে লাগিয়ে দিলেন। ছেলে আব্দুর রহমানকে বললেন, তুমি সারা দিন মক্কার কুরাইশদের কথাবার্তা শুনবে আর রাতের বেলা এসে তা আমাদের জানাবে। স্ত্রীকে বললেন, তুমি বাড়ি থেকে খানা তৈরি করে আমাদের কাছে পাঠাবে। মেয়ে আসমাকে বললেন, তুমি ছোট আছ; এই খানা তুমি আমাদের কাছে পৌঁছে দেবে। আর গোলামকে বললেন, তুমি ছাগল চরানোর বাহানা করে আমাদের দুধ পান করিয়ে আসবে। এভাবে তিনি তাঁর পুরো পরিবারকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লাগিয়ে দিলেন আর নিজে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চললেন।

হযরত আসমা (রাযি.)-এর বুদ্ধি

হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর কাছে চল্লিশ হাজার দিনার-দিরহাম ছিল। খরচ বাদে ওখান থেকে পাঁচ হাজার অবশিষ্ট ছিল। সেগুলো তিনি সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, হয়ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কাজে লাগবে। সবগুলো দিরহাম ও দিনার নিয়ে চলে যাওয়ার পর হযরতের পিতা আবু কুহাফা এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আবুবকর কোথায়? ছোট মেয়ে হযরত আসমা জবাব দিলেন, আবা সফরে গিয়েছেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িতে দিনার-দিরহাম কিছু রেখে গেছে কি? হযরত আসমা বুদ্ধি করে বললেন, হ্যাঁ দাদাজান, রেখে গেছেন। বলেই তিনি একটি কাপড়ে কিছু পাথরের টুকরো ভরে তা আবু কুহাফার হাতে দিলেন। আবু কুহাফা অন্ধ ছিলেন। তাই তিনি হাতে ছুঁয়ে দেখে শক্ত কিছুর অনুভব করে দিনার-দিরহাম মনে করে খুশি হলেন। বললেন, অসুবিধা নেই। সে সফরে গেলেও আমাদের জন্য তো কিছু রেখে গেছেন। ছোট বাচ্চার বুদ্ধি দেখুন। নিজের দাদাকে সান্ত্বনাও দিলেন আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর আবার চলে যাওয়াতে ঘরে কিছু আছে কিনা তাঁর জন্য পেরেশান হলেন না। ভাবলেন, আল্লাহ আমাদের অবশ্যই সাহায্য করবেন।

এস্তেকামাত (দীনের উপর অটল থাকা) এরকমই হতে হয়

প্রথম দিন হযরত আসমা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খানাপিনা পৌঁছিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন যখন আবার খানা নিয়ে এলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেয়াল করলেন, আসমার কপালে আঘাতের চিহ্ন এবং চেহারায় পেরেশানির রেখা ফুটে উঠেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে আসমা? তোমাকে পেরেশান দেখাচ্ছে কেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই জিজ্ঞাসার জবাবে হযরত আসমা (রাযি.)-এর চোখে পানি এসে গেল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে আসমা? তুমি কাঁদছ কেন? আসমা বললেন, হে আল্লাহর মাহবুব, গতকাল আমি যখন আপনাকে খানা দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, তখন পথে আবুজাহল আমাকে দেখে ধরে ফেলল। বলল, হে আবুবকরের মেয়ে, তোমার বাবা আর তোমাদের নবী কোথায়? আমি বললাম, তাঁরা কোথায় আমি জানি; কিন্তু তোমাকে বলব না। সে আমাকে ধমকাল। বলল, যদি না বলিস তাহলে তোমাকে অনেক মারব, কঠিন শাস্তি দেব। আমি বললাম, আমি কখনো বলব না। হে আল্লাহর নবী! সে আমাকে খুব জোরে থাপ্পর মারল। আমি একটা পাথরের উপর পড়ে গেলাম। পাথরের আঘাতে আমার কপাল ফেটে গেল এবং রক্ত বের হয়ে এল। আমার চোখ দিয়ে পানি চলে এল। তারপর সে আমাকে তুলে দাঁড় করাল। বলল, তাড়াতাড়ি বল, নাহয় আরো মারব। হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাঁকে বললাম, তুমি আমার প্রাণ নিতে পার; কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় আছেন তা আমি তোমাকে বলব না।

সিদ্দীকে আকবরের এহসানের বদলা

এটি সেই দিন, যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আবুবকর! আমি দুনিয়াতে সবার এহসানের বদলা দিয়ে দিয়েছি; কিন্তু আপনার এহসানের বদলা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা দিবেন। সুবহানাল্লাহ!

যখন ছাওর গুহায় পৌঁছার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড় বেয়ে উঠছিলেন, পায়ের চিহ্ন যেন না থাকে তাই তিনি পুরো পা মাটিতে না রেখে শুধু পায়ের পাঞ্জার উপর ভর রেখে হাঁটছিলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) যখন এই অবস্থা দেখলেন, তখন বললেন, হে আল্লাহর মাহবুব! আবুবকর হাজির আছে। আপনি আমার কাঁধের উপর উঠুন;

আমি আপনাকে গারে ছাওরে পৌঁছিয়ে দেব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুবকর (রাযি.)-এর কাঁধে ছড়লেন আর আবুবকর (রাযি.) তাঁকে পৌঁছিয়ে দিলেন।

হযরত আলী (রাযি.)-এর অনুরোধ

মক্কা বিজয়ের সময় কাবা শরীফে তিন শত ষাটটা মূর্তি ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব মূর্তি ভেঙে ফেলার আদেশ দিলেন। কিছু মূর্তি ছিল একটু উপরে। সেগুলোকে ভাঙতে হলে উপরে উঠার প্রয়োজন দেখা দিল। হযরত আলী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি রুকুর অবস্থায় দাঁড়াচ্ছি; আপনি আমার পিঠের উপর উঠে মূর্তিগুলো ফেলে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নবুওয়াতের এই বোঝা তুমি তোমার পিঠের উপর উঠাতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ! আলী (রাযি.)-এর অনুরোধ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়ে দিলেন আর আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) যখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার পিঠের উপর উঠুন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর পিঠে উঠলেন আর তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গারে ছাওরে পৌঁছিয়ে দিলেন।

মাহবুবের হেফাজত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গারে ছাওরে পৌঁছলেন, তখন মাকড়শা এসে গুহার মুখে জাল বুনে দিল আর কবুতর তাঁর উপর বাসা বেঁধে ডিম পেড়ে দিল, যাতে দুশমনরা গুহার মুখে চলে এলেও যেন কেউ ভিতরে আছে বলে মনে না করে। বাস্তবেও হয়েছিল তা-ই। শত্রুরা গুহার মুখে এসে পরস্পর আলাপ করছিল যে, এখানে কেউ থাকতে পারে না। গুহার মুখে মাকড়শার জাল আর কবুতরের ডিম দেখা যাচ্ছে। তারা চলে গেল। এসব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মাহবুবকে রক্ষার কৌশল, যা আল্লাহ তা'আলা নিজেই পরিচালনা করছিলেন।

ইমাম বুসীরি (রহ.)-এর ভক্তি

উক্ত ঘটনাকে ইমাম বুসীরি (রহ.) একটি আরবী কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন।

فالصدق في الغار والصديق لم يربا + وهم يقولون ما بالغار من ارم

ظنور الحمام وظنوا العنكبوت على + خير البرية لم تنسج ولم تحم

وقاية الله اغنت عن مضاعفة + من الدروع وعن عال من الاطم

সিদ্‌ক আর সিদ্দীক গারে ছাওরে অবস্থান করছিলেন, কাফেররা দেখে বলল, এখানে কেউ থাকতেই পারে না। মাকড়শার জাল আর কবুতরের ডিম দেখে তারা ভাবতে লাগল, এখানে কারো থাকা অসম্ভব। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবের এমন হেফাজত করলেন যে, দালানের প্রয়োজন হলো না।

প্রিয়তম রাসূলের রূপ আর সিদ্দীকি ভালোবাসার চমৎকার সম্মিলন!

যখন তাঁরা হেরা পর্বতের গুহায় প্রবেশ করলেন, আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) গুহাটির চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলেন। দেখলেন, বেশ কিছু গর্ত আছে গুহার ভেতর। কাপড়ের টুকরো দিয়ে তিনি প্রত্যেকটি গুহার মুখ বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু আরও একটি গুহা রয়ে গেল আর এদিকে কাপড়ের টুকরো ফুরিয়ে গেছে। ব্যস! সায়্যিদুনা আবুবকর (রাযি.) ওভাবেই বসে পড়লেন আর যে গর্তটির মুখ কাপড়ের টুকরো দিয়ে বন্ধ করা যায়নি পা চাপা দিয়েই সেটি বন্ধ করলেন। আগাগোড়া আক্ষরিক অর্থে মাটির এ কুটিরে এখন কেবল দুজন মানুষ; আবুবকর আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এক অন্যরকম দৃশ্য! পৃথিবী এমন বিচিত্র দৃশ্য হয়তো আগে কখনও দেখেনি। যেখানে প্রেমিক আর তার প্রিয়তম ভালোবাসার মানুষটি পরস্পরের খুব কাছাকাছি। যেখানে কেবলই তারাই দুজন আর কেউ নেই; আছে কেবল নির্জনতা। যে নির্জনতা প্রেমিকদের একান্ত চাওয়া।

ہم ہی ہم ہوں تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو

'তোমার জলসায় আজ শুধু তুমি আর আমি'।

সুবহানাল্লাহ! সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবরকে আল্লাহ এ দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করেছেন। মহান আল্লাহ শুধুই তাকে মর্যাদার এমন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন যে, একদিকে প্রিয়নবীর ভূবনবিমোহিত রূপ, অন্যদিকে সিদ্দীকি ভালোবাসা। নবীজি সিদ্দীকে আকবরের কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছেন। অপূর্ব! কোনো কবি ঠিক এমন চিত্র তুলে ধরেছেন চমৎকার শব্দমালায়–

یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے

رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے

ভালোবাসার অন্তহীন অনুরাগে এমন রূপের জবাব নেই,
জীবন্ত রেহাল-এ যেন আল্লাহর কিতাব রাখা হলো তায়।

অর্থাৎ সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবরের শরীর যেন আজ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরূপী কুরআন মাজীদের জন্য রেহাল বনে গেছে। এটি আবুবকর সিদ্দীকের পরম সৌভাগ্য বৈ কি! জানা নেই তিনি সেই কুরআনকে কেমন পাঠ করেছিলেন! হয়তো প্রাণভরে প্রিয়তমের সান্নিধ্য উপভোগ করেছিলেন। প্রেমিক সম্রাটকে আল্লাহ কত বড় সম্মান দিলেন, এক পরম আকাঙ্ক্ষিত নির্জনতায় প্রিয়তমকে প্রিয়মুখ নিজের কোলে নিস্পলক নেত্র আর অতৃপ্ত দৃষ্টি সেই চেহারায় নিবদ্ধ। আজকের প্রেমিকরা বলে, 'যখন পড়তে বসি বইয়ের পাতায় শুধু তোমার ছবিই ভেসে ওঠে।' ওহে প্রেমিকসম্রাট! তোমায় সালাম। তুমি যে প্রেমিকের চেহারাকেই বইয়ের মতো গভীর অভিনিবেশে পাঠ করছিলে! এ শব্দচিত্র আঁকতে গিয়ে আরেকজন কথাশিল্পী বললেন–

کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے

ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے

কিতাব খুলে পড়তে বসি কাঁদে আমার আঁখি,
পাতায়-পাতায় কেবল আমি তোমার ছবি দেখি।

কেউ যদি কারো প্রেমে পড়ে সে তো বইপত্র খুললেও তাতে প্রিয়জনের চেহারাই দেখতে পায়। আর ওখানে তো নিখাঁদ অপার্থিব প্রেম তথা ইশকে হাকিকির ব্যাপার ছিল! তখন সিদ্দীকে আকবরের অবস্থা কী ছিল তা এককথায় অচিন্ত্যনীয়। তিনি সেদিন প্রিয়তমকে মন-প্রাণ জুড়িয়ে দেখেছেন। সুবহানাল্লাহ! সিদ্দীকে আকবরের অশ্রু যেন গোলাপের পাপড়ীরূপে আমার প্রিয়তম রাসূলের কপোলে ঝরে পড়ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার আবুবকর! তুমি কাঁদছ? আবুবকর (রাযি.) বললেন, যে গর্তটি পায়ের গোঁড়ালি দিয়ে বন্ধ করেছি, তাতে অবস্থানরত সাপটির বিষের তীব্র যন্ত্রণায় কাঁদছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখের সামান্য থুতু মুবারক দংশিত স্থানে লাগিয়ে দিলেন। মুহূর্তেই ব্যথা ও ক্ষত দু-ই সেরে গেল।

নবীপ্রেমের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর, সাক্ষাত লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিজন সাহাবীর মধ্যেই ছিল। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, একজন সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন; কিন্তু কোনো কথাবার্তা বলতেন না। চুপচাপ বসে থাকতেন এবং কোনো বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করতেন না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি লক্ষ করে খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং একদিন তাকে বললেন, ও আমার সাহাবী! তুমি মাহফিলে এসে চুপচাপ বসে থাক আর মাহফিল শেষ হলে আবার চলে যাও; কিন্তু কোনো কথাবার্তা বলছ না; ব্যাপার কী? উত্তরে সাহাবী বললেন, হে আমার মাহবুব! আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আসি। যখন আমার সেই উদ্দেশ্য পুরা হয়ে যায়, তখন চলে যাই।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী উদ্দেশ্যে আস? তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর নবী! আমি ঘর থেকে বের হতে-হতে মনে-মনে এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি যে, আমি সেখানে যাব এবং আল্লাহর মাহবুবের চেহারা দেখে আসব। এজন্য আমি যতক্ষণ আপনার সোহবতে বসি, ততক্ষণ শুধু আপনার নূরানি চেহারা দেখতে থাকি। আর এভাবেই আমার উদ্দেশ্য পুরা হয়ে যায়। আমি পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে ঘরে ফিরে যাই।

তাঁর একথা শুনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা! তুমি যদি এই উদ্দেশ্যেই এসে থাক, তাহলে শোনে রাখো, যে ব্যক্তি মহবতের সাথে আমার চেহারার দিকে তাকাবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।

নবীজির থুতুসম্পর্কিত মুজিযা বা কতিপয় অলৌকিক ঘটনা

আমার প্রিয়তম রাসূলের থুতু মুবারক যখন লবণাক্ত কূপে পড়ে, তার পানি তখন মিষ্টি হয়ে যায়। হযরত আলীর আঘাতপ্রাপ্ত চোখে পড়লে চোখের নিরাময় হয়ে যায়। চৌদ্দজন মানুষের খাবারে পড়লে তা চৌদ্দশত জনের খাবারে পরিণত হয়। আবু সুফিয়ানের কোঠর থেকে বেরিয়ে যাওয়া চোখে পড়লে তা আপন জায়গায় প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়। এ থুতু জিবরাইল যদি পেয়ে যান, তিনিও তা চোখের সুরমা বানিয়ে নিতে চান। আবুবকর! আপনি কত সৌভাগ্যবান! আপনার প্রিয়তম আপনার পায়ে তাঁর থুতু লাগাচ্ছেন।

নূরের সঙ্গী আর মানুষ সঙ্গীর বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠান

প্রিয়নবীর দুটি তাৎপর্যবহ সফরের একটি হলো মেরাজ, অপরটি হিজরত। মেরাজের সফরেও সঙ্গী ছিলেন, হিজরতেও একজন সঙ্গী ছিলেন। উভয় সফরসঙ্গীর মাঝে একটি বিস্ময়কর মিল হলো, একজন ফেরেশতাদের শীর্ষনেতা, অন্যজন নবীর পরেই মানুষদের মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ মেরাজে যে ফেরেশতা নবীকে সঙ্গ দিলেন, আল্লাহ তাঁকে ফেরেশতাদের নেতৃত্বের মুকুট আর হিজরতের সময় যিনি নবীকে সঙ্গ দিয়েছেন, তাকে মানবজাতির নেতার মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন।

মঞ্জিলে মকসুদ পর্যন্ত সঙ্গ

কিন্তু আরো একটি পার্থক্য আছে। যিনি মেরাজের সফরে সাথী ছিলেন, তিনি একটি জায়গায় পৌঁছার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আর সামনে যেতে পারব না। তিনি সেখানেই রয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাই সামনে গেলেন। কিন্তু যিনি হিজরতের সফরে সাথী ছিলেন, তিনি মঞ্জিলে মকসুদ পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নবীজিকে সঙ্গ দিয়েছিলেন।

আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয়

এখানে আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে। তাহলো, মেরাজের রাতে সফরের উদ্দেশ্যে তাশরীফ নেওয়ার জন্য সফরের সাথী নিজে হাজির হয়েছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হযরত উম্মে হানী (রাযি.)-এর ঘরে। কিন্তু হিজরতের সফরের সময় খোদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন সাথীর ঘরে তাঁকে ডাকার জন্য।

মর্যাদায় সবার উপরে

আরও একটি কথা মনে রাখুন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ছোট ছিলেন, হযরত হালিমা সাদিয়া (রাযি.) তাঁকে দুধ পান করানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত হালিমার বাহনটি এতই দুর্বল ছিল যে, আসার পথে সেটা সবার পেছনেই ছিল। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যাওয়ার সময় হুজুরকে তার উপর উঠানোর কারণে সেটি সবার আগে চলে গেল। হিজরতের সফরেও হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবুবকরের কাঁধের উপর উঠেছিলেন। এর বরকতে হযরত আবুবকরের (রাযি.) মর্যাদা অন্য সব সাহাবীর মর্যাদার চেয়ে বেড়ে গেল।

আল্লাহর আমানতের হেফাজত

হিজরতের রাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযি.)কে হুকুম দিলেন যে, আমার কাছে মানুষের কিছু আমানত আছে; তোমার কাছে তা রাখো। যার-যার আমানত মালিককে পৌঁছিয়ে দিয়ো। এখান থেকে ওলামায়ে কেরাম একটি সূক্ষ্ম বিষয় বের করেছেন যে, হযরত আলী (রাযি.)কে বেছে নিলেন মানুষের আমানত তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য আর হযরত আবুবকরকে (রাযি.) বেছে নিলেন নিজের আমানত মক্কা থেকে মদিনা পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য।

কবরের সাথী

হিজরতের রাতে হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে হুকুম দিলেন, তুমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়ো। তাই আধা রাত পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানায় শোয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। অন্য দিকে হযরত আবুবকর (রাযি.) ইন্তেকালের পর কিয়ামত পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে শোওয়ার সুযোগ পেলেন।

আল্লাহর সান্নিধ্যের সুসংবাদ

এটি আশ্চর্য বিষয় যে, গারে হেরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন আর হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) গারে ছাওরে আল্লাহর সান্নিধ্যের সুসংবাদ পেলেন।

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।[১]

অনেকে এখানে একটি প্রশ্ন করেন, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, হযরত আবুবকর দুর্বল হওয়ার কারণে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ওলামায়ে কেরাম এর উত্তর দিয়েছেন, তার পেরেশানি নিজের জন্য ছিল না; বরং প্রিয়নবীর জন্য

---

১ সূরা তাওবা, আয়াত- .

ছিল। এমন যাতে না হয় যে, কাফেররা এসে গেল আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো কষ্ট দিয়ে বসল। এর প্রমাণ কুরআন মজিদেও আছে। হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁর সন্তানদের বললেন, তোমরা চাচ্ছ, তোমরা তোমাদের সাথে ইউসুফকে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন–

إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ

'আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে আর আমি আশঙ্কা করি, বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে।'[১]

হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে তখন কিসের পেরেশানি ছিল? হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কারণে পেরেশানি ছিল। তাহলে বোঝা গেল, হযরত আবুবকরের পেরেশানিও ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য, যাতে হুজুরের কোনো কষ্ট না হয়।

আরো একটি উপমা দেখুন। হযরত মুসা (আ.) হযরত হারুন (আ.)কে বলেছিলেন,

إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

'আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন।'[২]

আর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবুবকরকে বললেন,

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

'বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।'

এর দ্বারা হযরত আবুবকর আল্লাহর সান্নিধ্যের সুসংবাদ পেলেন। একে মাইয়াতে কোবরা বলা হয়। এই সুসংবাদ আল্লাহ তা'আলা হযরত আবুবকরকে দান করেছেন। আর তা দিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান মোবারক দ্বারা।

ছানিয়াছনাইন (দুই এর দ্বিতীয়) এর উপাধি

হযরত আবুবকরকে (রাযি.)কে ছানিয়াছনাইন (দুই এর দ্বিতীয়) বলা হয়েছে। কেননা, যেখানে হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লা ২ আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১ সূরা ইউসুফ, আয়াত-.

২ সূরা শু'আরা, আয়াত- ৬২.

প্রথম ছিলেন, সেখানে দ্বিতীয় ছিলেন হযরত আবুবকর (রাযি.)। ঈমান আনতে দ্বিতীয়, গারে ছাওরে দ্বিতীয়, খেলাফতে দ্বিতীয়, তাবলীগ করতে দ্বিতীয়, রওজায়ে আকদাসে দাফন হতে দ্বিতীয়, হাশরের মাঠে দাঁড়াতে দ্বিতীয়, কিয়ামতের দিন জান্নাতে যেতে দ্বিতীয়।

হযরত ওমর (রাযি.)এর কাছে তিন রাতের মর্যাদা

হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর জীবদ্দশায় হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)কে বলতেন, আপনি আমার সারা জীবনের ইবাদাত নিয়ে নিন আর আপনার গারে ছাওরওয়ালা তিন রাতের ইবাদাত আমাকে দিয়ে দিন। কেননা, সেই তিন রাতের ইবাদাত আমার কাছে আমার সারা জীবনের ইবাদাতের চেয়ে বেশি মনে হয়।

তারকার চেয়েও বেশি নেকী

একবার হযরত আয়েশা (রাযি.) বিশ্রাম করছিলেন। আসমানে তারকাগুলো ঝলমল করছিল। তিনি মনে-মনে ভাবলেন, আসমানে যত তারা আছে, তত এবাদাত কি কারো হতে পারে? তিনি এই প্রশ্ন হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে করলেন যে, আসমানে যত তারা আছে তত নেকী কারো কি আছে? হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আছে। ওমরের নেকী আসমানের তারকার সমান হবে। একথা শুনে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা, তুমি মনে হয় ভাবছ, আমি তোমার পিতার নাম কেন নিলাম না। বললেন, হ্যাঁ; আমি তা-ই ভাবছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার কথা আর কী ভাববে; তার তো শুধু গারে ছাওরওয়ালা রাতের ইবাদাতই আসমানের তারকারাজির চেয়ে বেশি। সুবহানাল্লাহ!

হযরত আবুবকরের ঈমানের ওজন

বাইহাকী শরীফে আছে, হযরত ওমর (রাযি.) বলতেন, যদি সমস্ত উম্মতের ঈমান আর হযরত আবুবকরের ঈমানের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে সমস্ত উম্মতের ঈমানের চেয়ে হযরত আবুবকরের ঈমান বেশি হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এত মজবুত ঈমান দিয়েছিলেন।

হযরত আবুবকরের বুকে নবুওয়াতের নূর

এক হাদীছে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا صَبَّ اللهُ فِيْ صَدْرِيْ اِلاَّ وَقَدْ صَبَبْتُهُ فِيْ صَدْرِ اَبِيْ بَكْرٍ

'আল্লাহ আমার বুকে যা কিছু দিয়েছেন, আমি তা আবুবকরকে দিয়ে দিয়েছি।'

নেসবতের বরকত

এই নেসবতের কদর করুন। কেননা, এই নেসবত অনেক মজবুত নেসবত। একারণে অন্তর পরিবর্তনে এর প্রভাব খুব বেশি হয়। আপনারা দেখেননি, সিলসিলাতে বাই'আত হওয়ার আগে অনেক মানুষ গাফলতের মধ্যে পড়ে থাকত; কিন্তু বাই'আত হওয়ার পরে আল্লাহ তাদের সকাল-সন্ধ্যা কত পরিবর্তন করে দিয়েছেন? তাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ সব কিছুতেই পরিবর্তন এসে যায়। এটি নেসবতের কারণে হয়ে থাকে। যেমন– কোনো শুকনা জমিনে পানি দিয়ে বীজ বপণ করলে সেখান থেকে ফল-ফুল বের হয়ে আসে। এই নেসবতও সেরকম। যে বান্দার এই নেসবত নসীব হয়, তার মধ্য থেকেও নেক আমলের ফল-ফুল বের হয়ে আসে।

সিদ্দীকে আকবর-এর ফানা ফিল্লাহ হওয়া

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যদি জমিনের উপর চলন্ত লাশ দেখতে চায়, তাহলে আবুকাহাফার পুত্রকে দেখতে পারে। অর্থাৎ তাঁর ফানা ফিল্লাহ হওয়ার বিষয়টা এতই কামেল ছিল যে, তিনি মাখলুকাতের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। জমিনের উপর চললেও তাঁর অন্তরের সম্পর্ক ছিল আল্লাহর সাথে।

সিদ্দীকে আকবরের জন্য বিশেষ তাজাল্লী

হযরত স্যায়্যিদ জাওয়ার হোসাইন শাহ সাহেব (রহ.) বিভিন্ন সনদের সাথে রেওয়ায়ত বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اِنَّ اللهَ يَتَجَلّٰى لِلْخَلْقِ عَامَّةً وَّلٰكِنْ لِّاَبِيْ بَكْرٍ خَاصَّةً

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সবার জন্য সাধারণ তাজাল্লী দান করবেন আর আবুবকরের জন্য বিশেষ তাজাল্লী দান করবেন। একারণে যে

আবুবকর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঙ্গ দিয়েছিলেন। বিশেষ তাজাল্লীর অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আবুবকরের দিকে মুচকি হাসির সাথে মহবতের নজরে দেখবেন। সুবহানাল্লাহ!

নেসবতের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন

আমরা সকল নেসবতের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করি। যেহেতু যে নেসবতেরই মাশায়েখ হোক না কেন, তার ইহতেরাম বা তাকে সম্মান করা অপরিহার্য ও আবশ্যক। যেমন– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনার পরও আমরা সকল নবী-রাসূলের সম্মান ও ইজ্জত করি। যেহেতু, নবীদের কোনো একজনের সাথেও যদি কেউ বেয়াদবি করে, সে তখন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। তেমনিভাবে আমরা সকল নেসবতের মাশায়েখদের ইজ্জত ও সম্মান করি। তারপরও আমাদের মাশায়েখদের রংই কিন্তু অন্য রকম!

ہر گل را رنگ و بوئے دیگر است

প্রত্যেক ফুলের আলাদা রং আর আলাদা খোশবো !

নকশবন্দি সিলসিলার বৈশিষ্ট্য

আমাদের এই মহান সিলসিলার মাশায়েখদের সুন্নাতের অনুসরণ খুব বেশি হয়ে থাকে। সুন্নাতের এই অনুসরণের বরকতেই হয়তো আল্লাহপাক তাঁদের দান করেছেন অবিসংবাদিত জনপ্রিয়তা। তাই তো আপনি দেখে থাকবেন, বেশি-বেশি কবিতা আবৃত্তি করা ও নারায়ে তাকবীরের স্লোগান দেওয়া আমাদের মাশায়েখদের অভ্যাস নয়; নীরবতাই বরং তাদের অধিক প্রিয়। তবে এই নীরবতা অবলম্বন সত্ত্বেও হৃদয়ে এক প্রকার প্রবল জোশ্ উথলে ওঠে।

সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন

একবার আমাদের এ মহান সিলসিলার এক বুজর্গের কাছে জনৈক মুরিদ এসে বলল, নকশবন্দি সিলসিলার বুজুর্গরা অতিশয় ঠাণ্ডা প্রকৃতির। চুপচাপ বসে থাকেন। যিকির করলেও বোঝা যায় না। তখন ওই বুজুর্গ তার দিকে তাকালেন এবং পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করে শোনালেন,

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا

'ওই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের জন্যে আগুন বের করে দিয়েছেন সবুজ বৃক্ষ থেকে।'[১]

বুজর্গের উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহপাক যেমন সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন বের করতে পারেন, তেমনি শান্ত ও নীরব প্রকৃতির এসব বুজর্গের অন্তর থেকে বের করতে পারেন রূহানী ফয়যের আগুন! এসব বুজুর্গের অন্তর্দৃষ্টি হয় খুবই শক্তিশালী।

নেসবতের বরকতসম্পৃক্ত আশ্চর্য এক ঘটনা

হযরত মুরশিদে আলম (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা ইসমাঈল ওয়াডি দামাত বারাকাতুহুম, যিনি ইংল্যান্ডে বসবাস করেন। তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি যেহেতু সরাসরি আমাকে বলেছেন, সেই সুবাদে এই অধম ঘটনাটি আপনাদের সামনে বলার দুঃসাহস করছে। ঘটনাটি শোনার সময় নেসবতের বরকতের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

তিনি বলেন, আমার এক ছেলে আছে, যার নাম কাসেম (তার সাথেও এই অধমের সাক্ষাত হয়েছে) ইংরেজি পড়ালেখা করেছে। একপর্যায়ে সে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হলো। প্রফেসর হওয়ার পর সে নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ল। কেউ যখন এত দূর (নাস্তিকতা পর্যন্ত) পৌঁছে যায়, তখন তো নামায-রোযা পালন অনেক পরের কথা, আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারেও সে সন্দিহান হয়ে পড়ে। ধর্মও হয়ে পড়ে তার কাছে সন্দেহের বস্তু। আমল করা হয়ে পড়ে অসম্ভব এবং বহু পরের কথা।

ঘরের সব ছেলেই হাফেয, ক্বারী, আলেম এবং মেয়েরাও আলেমা, হাফেযা। তবু তাঁর এই ছেলেটা ছিল একটু ভিন্ন ধাঁচের। সে যেহেতু ভার্সিটির পরিবেশে শিক্ষার্জন করে এবং ডারউইনের থিউরির পেছনে পড়ে যায়, ফলে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে সে হয়ে পড়ল সন্দিহান এবং তার জীবনে নেমে এল নিদারুণ অলসতা। তিনি বলেন, আমি একদিন হযরত মুর্শিদ আলম (রহ.)-এর খেদমতে বিষয়টা উত্থাপন করে আরজ করলাম, হযরত, ঘরের সবাই আলেম। মেয়েরাও আলেমা-ফাজেলা। কিন্তু, পুরো ঘরে এ ছেলেটাই এমন হয়ে গেল যে, রহস্যঘেরা তার অবস্থা! এ কারণে আমার মনে সর্বদা হাহাকার ও দুশ্চিন্তা বিরাজ করে। তার মা ও আমি চোখের পানি ফেলি। দয়া করে এমন কোনো দু'আ দিন, যাতে আল্লাহপাক তার অবস্থা পরিবর্তন করে দেন।

---

১. সূরা ইয়াসীন, আয়াত-৮০

হযরত মুর্শিদ আলম (রহ.) উত্তরে বললেন, তাকে বলো, সে যেন আমার হাতে বায়আত গ্রহণ করে।' তখন তাকে তার পিতা বোঝাতে লাগলেন, বৎস, তুমি বায়আত হয়ে যাও। ছেলে বলল, আমি যখন নামাযই পড়ি না, তো বায়আত হয়ে কী লাভ? তখন মাওলানা সাহেব (ছেলের পিতা) হযরতের কাছে এসে আবার আরজ করলেন, 'হযরত, আমার ছেলে তো বলছে, আমি যখন নামাযই পড়ি না, কুরআনও পড়ি না; তখন বায়আত হব কোন উদ্দেশ্যে? হযরত বললেন, আমি কি বলেছি, তাকে নামায ও কুরআন পড়তে হবে? আমি তো বলি, সে শুধু বায়আত গ্রহণ করুক।

এ এক আশ্চর্য ঘটনা, সাধারণ মানুষের যা বুঝেই আসে না। পরে মাওলানা সাহেব ছেলেকে আবার বললেন, বাবা, এই বুজুর্গ আমাদের এখানে তাশরীফ আনেন, তোমার সব ভাই-বোন তাঁর কাছে বায়আত হয়েছে। আমিও তাঁর হাতেই বায়আত গ্রহণ করেছি। তো তুমিও বায়আত হয়ে যাও না! এমন হলে আমাদের ঘরের সবারই বায়আত গ্রহণ হয়ে যাবে। ছেলে বলল, আবু, আমি কিছুই করতে পারব না। পিতা বললেন, তোমার কিছুই করতে হবে না। তুমি শুধু বায়আতটা হয়ে যাও।

ছেলে তখন মনে-মনে ভাবল, যাক, বাবাকে খুশি করার জন্যে হলেও বায়আতটা হয়ে যাই। তখন কি আর ওই যুবকের জানা ছিল, কোনো আল্লাহওয়ালার হাতে হাত রেখে যে কয়েকটি শব্দ পড়ে নেওয়া হয়, সেই শব্দটা হৃদয়ের পৃথিবী সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। নিশ্চয়ই ছেলেটা এই রহস্য সম্পর্কে ছিল অজ্ঞাত। তাই সে বলল, আচ্ছা, আমি বায়আত গ্রহণ করব। পরে সে হযরতের হাতে বায়আত গ্রহণ করে নিল। বায়আত হওয়ার পর তার অন্তরের অনুভব বদলে যেতে শুরু করল। সে হযরতের সান্নিধ্যে বসা আরম্ভ করল। হযরতের প্রতি তার ভালোবাসা সৃষ্টি হতে থাকল। নামায আদায়ও শুরু হয়ে গেল। কুরআন তেলাওয়াতও চলতে লাগল। এমনকি এক পর্যায়ে সে দ্বীনি ইল্‌ম অর্জনে আগ্রহী হয়ে উঠল। তাহাজ্জুদ পড়া শুরু করল। সে এত বেশি যিকিরপ্রিয় ও ফিকিরব্যস্ত হয়ে গেল যে, কয়েক বছর পরেই আমাদের পীর মুরশিদে আলম (রহ.) তাকে খেলাফত দান করলেন। ওই নওজোয়ান, যে ছিল বস্তুবাদী ও নাস্তিক, তার ওপর বায়আতের কয়েকটি মাত্র শব্দ পাঠের এমন প্রভাব পড়ল যে, অন্তরে তার ইশকে ইলাহীর এমন স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হলো যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) তাকে ইজাযত ও খেলাফতে ভূষিত করলেন! অধমের সাথে তার সাক্ষাত হয়েছে

এবং সেখানকার লোকেরা বলেছে, তার অসিলায় শত-সহস্র যুবক খোদাদ্রোহিতা ও নাস্তিকতা থেকে ফিরে এসেছে পবিত্র ইসলামে।

প্রিয় বন্ধুগণ, যারা কালেমাই পড়েনি, তাদের অন্তরে যদি কালেমার এমন প্রভাব পড়ে, তাহলে যারা কালেমা পড়েছে এবং হৃদয়ে যারা খোদাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, যারা নিজের ঘর ছেড়েছে; তারা যদি সেই কালেমাটি পড়েন এবং এ সিলসিলার সাথে সম্পৃক্ততা অর্জন করেন, চিন্তা করে দেখুন, মহান আল্লাহ তাদের কেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন দান করবেন!

সুন্দর সমাপ্তির সুখবর

আমাদের পীরদাদা হযরত ফজল আলী কুরাইশী (রহ.) বলতেন, যে বুকের ওপর এ আঙুলের স্পর্শ পড়েছে, কালেমা নসীব হওয়া ছাড়া তার মরণ হতে পারে না। যেহেতু এটি সিদ্দীকী সিলসিলা, যার বরকত বহুমুখী এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে যার মর্যাদা অনেক অনেক উঁচুতে। আমার বন্ধুরা, এখনকার লোকেরা যখন বন্ধুবাড়ির কুকুরের প্রতি খুব যত্নবান থাকেন, তো আল্লাহপাক কি তাঁর প্রিয় বান্দাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারীদের প্রতি খেয়াল রাখবেন না? তাদের সুবিধা-অসুবিধা কি বিবেচনায় নিবেন না?

সিদ্দীকে আকবরের কথাটাই অন্য রকম

আমরা সকল সিলসিলার মাশায়েখদের সম্মান করি। কিন্তু সিদ্দীকী সিলসিলার রংই আলাদা। যেমন– সব ফুলই তো দেখতে সুন্দর হয়; তবু গোলাপের রূপটা একটু অন্য ধরনের। রুপা তো সুদৃশ্য হয়, কিন্তু স্বর্ণ তার চেয়ে আলাদা। সব মুক্তাই তো মূল্যবান; তবু লাল ইয়াকুতের কথা একেবারে ভিন্ন। সব দিনই তো ভালো; তবে জুমাবারের হিসাবটা পৃথক। মাস তো প্রত্যেকটাই ভালো; কিন্তু রমজান মাসের কথা আলাদা। সব রাতই তো আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার জন্যে; তবু কদরের রাতের কথা অন্য রকম। সব ফকীহই তো মহান; কিন্তু ইমাম আজম (রহ.)-এর কথাই তো ভিন্ন রকম। শহর তো প্রত্যেকটাই মনোরম; কিন্তু মক্কা ও মদিনার শহর তো একটু হলেও ভিন্ন ধাঁচের। সকল ফেরেশতা তো আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত; তবু জিবরীল আমীনের কথা-ই আলাদা। নবীদের প্রত্যেকেই তো ছিলেন শান ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ; তবু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা অবশ্যই আলাদা। তেমনিভাবে সাহাবারা সকলেই তো আল্লাহপাকের প্রিয়; তারপরও কিন্তু সিদ্দীকে আকবরের ব্যাপারটা অন্য রকম।

নেসবত উৎকৃষ্ট হওয়ার প্রমাণ

আমার বন্ধুগণ, যেসব যিকিরের কথা বলা হচ্ছে, তার প্রত্যেকটি খুব গুরুত্বসহকারে সময়মতো আদায় করবেন। আর খেয়াল রাখবেন, এ রূহানী ফয়েয আপনার অন্তরে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। হ্যাঁ, কেউ যদি ডাক্তারের কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন লিখিয়ে নিয়ে ওষুধ সেবন না করে বলে যে, তার কোনো উপকার হয়নি, তাতে তো ডাক্তারের কোনো দোষ নেই; বরং রোগীরই যতসব দোষ-ত্রুটি। আপনার হাজার থেকে নয়; বরং সহস্রজন থেকে এমন একজন আল্লাহর বান্দা দেখান তো, যে বলবে, আমি সমস্ত 'মা'মুলাত' আদায় করি; তবু আমার ভেতর কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না।

এ নেসবত উৎকৃষ্ট হওয়ার প্রমাণ এর চেয়ে বেশি আর কী হতে পারে? নিজের জীবনের সময়গুলো থেকে উপকৃত হোন। আপনারা এখানে এসেছেন। এখন যতটুকু সময় বাকী আছে, এই সময়েই আপন অন্তরের ধ্যান আল্লাহর দিকে রাখবেন। পাপাচার থেকে খাঁটি তাওবা করে আগামী দিনে ভালো কাজ করার প্রতিজ্ঞা করে যাবেন। তারপর দেখুন, নেসবতের বরকতধারা আপনার ওপর কীভাবে বর্ষিত হয় এবং আপনাদের হৃদয়কে কেমন করে আলোকিত করে তোলে।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.)-এর স্থান

একবার এক ভদ্রলোক হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)কে উদ্দেশ করে বলল, হযরত, হাজী সাহেবকে আল্লাহপাক এ জন্যেই এত মান-সম্মান দান করেছেন যে, আপনার মতো বড়-বড় ওলামায়ে কেরাম তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। কথাটা শুনেই হযরত থানবী (রহ.) খুব রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, তোমার বিচার-বুদ্ধি উল্টো হওয়ার কারণেই আবোল-তাবোল কথা বলছ। আরে বেটা, আমাদের কারণে হাজী সাহেবের মর্যাদা বাড়েনি; বরং হাজী সাহেবের অসিলায় আল্লাহপাক আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। নাহয়, কাসেম বা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীকে কে চিনত? এটা কেবল হাজী সাহেবের নেসবতের ফল, যার কারণে আল্লাহতা'আলা এঁদের মান-সম্মান দান করেছেন।

আনুগত্যময় জীবন গড়ে তোলা

আমাদের উচিত, আমরা নেসবত হাসিলের জন্যে দু'আও করব, তাক্ওয়াও অবলম্বন করব, পাপাচার থেকেও দূরে থাকব এবং আল্লাহর

আনুগত্যময় জীবন যাপন করব, যাতে আমরা জীবনের বাকি দিনগুলো আল্লাহর আনুগত্য এবং রাসূলের সুন্নতের অনুসরণের মধ্য দিয়েই পার করতে পারি।

নেসবত হাসিলের মাধ্যমসমূহ

আমাদের হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। আমলের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রে। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার আমলকে খুবই মূল্যায়ন করেন। এ নেসবত প্রভাবিত না করে থাকে না। হৃদয় যদি পাথুরেও হয়, তখনো সে পাথর ছিদ্র করেই এগিয়ে যায় এবং নিজের জন্য পথ তৈরি করে নেয়। আমি স্বচক্ষে এ নেসবতের অতুলনীয় ও আশ্চর্য বহু বরকত দেখেছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে প্রত্যক্ষ করার তাওফীক দান করুন। এর সহজ নিয়ম হলো, আমরা আমলগুলো নিয়মিত আদায় করব। নিজের নেসবত অক্ষুণ্ন রাখব এবং সুন্নতের অনুসরণ করব। এ তিনটি আমল করার বদৌলতে আল্লাহপাক বান্দার কলবে নেসবতের আলো ও নূর ঢেলে দেন। বান্দার আমলের রূপ-রং আগের চেয়ে উত্তম হয়ে যায়। স্বভাবে বিনয় সৃষ্টি হয় এবং বান্দা কেবল আল্লাহর জন্যেই ইবাদত করতে শুরু করে।

গোপন সেবা

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) তাঁর খেলাফতকালে গরিব, অসহায় ও বিধবাদের সেবা-সহযোগিতার জন্য কিছু লোক নিযুক্ত করেছিলেন। একদা হযরত ওমর (রাযি.) ওই তালিকাটা দেখলেন। দেখা গেল, এক বুড়ীর নামের পাশে সেবক হিসেবে কারো নাম লেখা নেই। ওমর (রাযি.) ভাবলেন, হয়তো বুড়ীর সেবার ভার কেউ গ্রহণ করেনি। তাই তিনি মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, এই বুড়ীর সকল কাজ আমি করে দেব। পরদিন ফজরের নামায পড়ে ওমর (রাযি.) ওই বুড়ীর ঘরে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, ঘরে ঝাড়ুও দেওয়া আছে এবং পাত্রে পানিও তোলা আছে। ওমর (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, আম্মা, এসব কাজ কে করে গেল? বৃদ্ধা বললেন, কে একজন এসে পাত্রে পানি ভরে দিয়ে যায় এবং ঘরে ঝাড়ুও দিয়ে যায়। আমি আজো জানতে পারলাম না, কী তার নাম। নামের ব্যাপারে না আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি, না সে কখনো নিজে থেকে বলেছে।

ওমর (রাযি.) পণ করলেন, ঠিক আছে, পরেরবার আমি ফজরের আগেই আসব। তিনি যখন ফজরের আগে গেলেন, তখনো দেখতে পেলেন, সব কাজই করা হয়ে গেছে। তারপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, এখন থেকে আমি

তাহাজ্জুদের সময় আসব। যখন তাহাজ্জুদের সময় গেলেন, তখনো দেখলেন, ঝাড়ু দেওয়াও শেষ, পানি তোলাও শেষ। তখন ওমর (রাযি.) প্ল্যান করলেন, ঠিক আছে, আমি আগামীকাল দেখব, কাজগুলো আসলে কে করে যায়!

পরের দিন তিনি এশার নামায পড়েই রাস্তার এক ধারে চুপচাপ বসে থাকলেন। যাতে জানা যায়, বুড়ীর ঘরে আসলে যায়টা কে? মধ্যরাতে যখন আঁধার গাঢ় হয়ে গেছে, তখন দেখা গেল, জুতো ছাড়া একটা লোক। খুব আস্তে-আস্তে সন্তর্পণে হেঁটে-হেঁটে বুড়ীর ঘরের দিকে যাচ্ছে। হযরত ওমর (রাযি.) লোকটিকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? উত্তর এল, আমি আবুবকর! ওমর (রাযি.) অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, রাতের অন্ধকার নির্জনতায় আপনি কি ওই বুড়ীর খেদমত করতে যাচ্ছেন? আপনার পায়ে জুতা নেই কেন? এভাবে খালি পায়ে কেন পথ চলছেন? আবুবকর (রাযি.) জবাবে বললেন, ওমর, আমি এ কারণে জুতো পরিনি যে, আমার জুতোর আওয়াজে হয়তো কোনো ঘুমন্ত মানুষের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটবে। অথবা কারো কাছে হয়তো আমার এ কাজের কথা জানা হয়ে যাবে!

প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের উচিত, আমরা যে কাজই করি না কেন, কেবল আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যেই করব। তারপর দেখবেন, মহান আল্লাহ আমাদের ওপর কেমন রহম করেন!

সিদ্দীকে আকবরের আশ্চর্য ওসিয়ত

আবুবকর (রাযি.)-এর ইন্তেকাল যখন ঘনিয়ে এল, তখন তিনি কন্যা আয়েশা (রাযি.)কে ডেকে বললেন, আমি যখন অনন্তে চলে যাব, আমার এই চাদরদুটি ধুয়ে কাফনের ব্যবস্থা করবে। কথাগুলো শুনে আয়েশা (রাযি.) বললেন, আবাজান, আমরা এতটা গরিব ও অসহায় নই যে, আপনার কাফনের কাপড়ও কিনতে পারব না! তখন আবুবকর (রাযি.) বললেন, নতুন চাদর তো মৃতদের চেয়ে জীবিতদেরই বেশি প্রয়োজন ও উত্তম।'

একটু ভেবে দেখুন তো, অন্তরে কতখানি বিনয় থাকলে নিজের কাফনের জন্যে পুরনো চাদরের ওসিয়ত করে যাওয়া যায়?

সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) ও খোদাভীতি

তাঁকে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তারপরও তিনি আল্লাহপাকের জালালিয়াত ও রুদ্রমূর্তিকে ভয় করতেন। কখনো বা বসে পড়ে বলতেন, হায়, আমায় যদি আমার মা প্রসবই না করতেন! আমি যদি কোনো মুমিন বান্দার দেহের লোম হতাম! পাখি হতাম অথবা হতাম শুকনো কোনো ঘাসের টুকরো!

আমাদের অন্তরেও খোদাভীতি থাকা জরুরি, যেন পাপাচার থেকে বেঁচে থেকে পুণ্যময় জীবন অতিবাহিত করতে পারি।

চিন্তাময় সময়

আমরা অতীত জীবন যেভাবে পার করেছি, সেভাবেই থাক। সে সময় কি আর ফিরে আসবে? তাই আসুন, সত্যিকার তাওবা করি। নিজের মালিকের অন্তরের অন্তস্তল থেকে এই অঙ্গীকার করি, হে আমাদের প্রতিপালক, আজ আমরা সকল প্রকারের পাপ থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি। তাওবা করছি। ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। হে আমার মালিক, মাথার পাপের বহু বোঝা বাড়িয়ে ফেলেছি। আল্লাহ! আজ আমরা সত্যিকারার্থে তাওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মালিক! আমরা ঘরের ভেতর পাপাচার সর্বস্ব জীবনযাপন করি। আর এটি তোমার প্রিয় বান্দাদের জলসা। কেউ তার জীবনের তাহাজ্জুদ নিয়ে এখানে এসেছে। কেউ মুরাকাবা নিয়ে। কেউ মৌখিক যিকির নিয়ে আর কেউ এসেছে গোপন যিকির নিয়ে। তাদের অসিলায় আমাদের সকল গোনাহ মাফ করে দাও।

হে আল্লাহ, এ মাহফিলে এমন বন্ধুও আছেন, যারা চিঠিতে লেখেন, সাতাশ বছর ধরে কখনো তাদের আওয়াবীন কাজা হয়নি। এমন ভাইও আছেন, এগারো বছর যাবৎ যাদের কখনো তাহাজ্জুদ কাজা হয়নি। এমন মানুষও আছেন, দৈনিক দশ হাজারবার কালেমার যিকির যাদের আমলে পরিণত হয়েছে। বরং এমন একজন ভাগ্যবান বান্দাও এখানে আছেন, যিনি চিঠিতে লিখেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাত ছাড়া আমার কোনো সপ্তাহই অতিবাহিত হয় না। হে দয়ালু প্রতিপালক, এই পুণ্যবানদের অসিলায় আমাদের যাবতীয় গোনাহকে সাওয়াব দিয়ে বদলে দাও। আমরা যদি আজকের এ মাহফিলে ক্ষমা পাই, তা তো আমাদের সৌভাগ্য। আর যদি ঘরে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তখন তো আমাদের ক্ষমা চাওয়া হবে অনিবার্যবশত। জানি না, আল্লাহপাক ক্ষমা করবেন কি করবেন না। কিন্তু এখানে তো পুণ্যবান আছেন। পুণ্যবানদের বসতিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যদি কেউ মারা যায়, তাকেও আল্লাহপাক ক্ষমা করে দেন। আর আমরা হেঁটে এখান (পুণ্যবানদের বসতি) পর্যন্ত এসে গেছি। হৃদয়ের গভীর থেকে আমাদের সবার বলা উচিত,

হে আমার মাওলা, আমাদের এ উপস্থিতিকে কবুল করো। আর আমাদের তাওবাকে কবুল করে পুণ্য ও পরহেজগারির ভবিষ্যত জীবন দান করো।'

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

আল্লাহপাক এ অধমকে চল্লিশটিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করার তাওফীক দান করেছেন। পাশ্চাত্যও দেখেছি, প্রাচ্যও দেখেছি। আমেরিকা যেমন দেখেছি, তেমনি আফ্রিকাও দেখেছি। এমন স্থানেও গিয়েছি, যেখানে প্রশাসনিকভাবে লিখে দেওয়া আছে, এটাই পৃথিবীর শেষ কর্নার। এমন এলাকাতেও গিয়েছি, ছয় মাস দিন আর ছয় মাস রাত হয়। এত ব্যাপক ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি, যেখানেই গিয়েছি, ওলামায়ে দেওবন্দের কোনো না কোনো রূহানী উত্তরাধিকারীকে দ্বীরে খেদমত করতে দেখেছি।

ওলামায়ে দেওবন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ. سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জ্ঞানের মোহনা

ওলামায়ে কেরামের এই জলসায় নিজের পূর্বসূরীদের ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলার ইচ্ছে আছে। আমাদের আত্মিক আত্মীয়তা যেমন সিনা থেকে সিনা হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে, যাকে 'শাজারাহ' বলা হয়, তেমনি আমাদের ইল্‌মি যে-ধারাবাহিকতাও ওলামায়ে দেওবন্দের সাথে বিদ্যমান, সেটিও গিয়ে পৌঁছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত। আমাদের পূর্বসূরী ওলামায়ে দেওবন্দ ইল্‌মি ও রূহানী উভয় ধারারই অধিকারী ছিলেন। যখন হাদীছের দরস দিতে বসতেন, আসকালানী ও কাসতা'আলানীর মতো মনে হতো। আর যখন আধ্যাত্মিক আসনে আসীন হতেন,তখন মনে হতো জুনাঈদ বাগদাদী ও বায়েজিদ বোস্তামীর মতো। আল্লাহপাক তাঁদেরকে উভয় ধারার জ্ঞান দিয়েই সম্মানিত করেছিলেন। বাস্তবিকই তাঁরা ছিলেন,

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

দুই নদীর মোহনার মতো।[১]

তাঁরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইল্‌মের মোহনা ছিলেন। তাঁদেরই ত্যাগের বিনিময়ে ইংরেজ আমলেও ইসলাম ছিল নিরাপদ। সেই সুবাদেই আমরা এখনো ধর্মের ওপর আমল করতে পারছি।

---

১ সূরা রাহমান, আয়াত-১৯

ইল্‌মি উত্তরাধিকারের সংরক্ষণ

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দিকে লক্ষ্য করুন। আলবেনিয়া, বসনিয়া, কসোভো যেখানেই অমুসলিমরা দখলদারিত্ব কায়েম করেছে, সেখানেই মুসলিমদের জীবন থেকে ইল্‌মের চর্চা সম্পূর্ণভাবে খতম হয়ে গিয়েছিল। এমনকি ওসব দেশের মানুষ কালেমাও পড়তে জানত না। অথচ আমাদের এ উপমহাদেশে দুশো বছরের ইংরেজ শাসনও কেড়ে নিতে পারেনি আমাদের ইল্‌মি উত্তরাধিকার। ফলে, ধর্মীয় এ নেয়ামত অক্ষত থেকেছে এবং আলহামদুলিল্লাহ এখনো আমরা এই ধর্মমতেই জীবনযাপন করছি।

পশ্চিমা সংস্কৃতির মোকাবেলায় কর্মকাণ্ড

ধর্মের এই হেফাজত বা সংরক্ষণ কীভাবে হলো? এর নেপথ্যে তো রয়েছে লাখো ওলামায়ে কেরামের ত্যাগ ও কুরবানি। কিছু ইসলামপ্রেমী এমন ছিলেন, যাঁরা জীবনের নজরানা পেশ করে গেছেন। আর কিছু তো ছিলেন এমন, যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার উল্টো স্রোতে জীবনযাপন করে বা ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ করে গেছেন শত কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যেও। কষ্ট সহ্য করেছেন; তবু বুকে আগলে রেখেছেন স্বীয় দীন ইসলামকে। চাটাইয়ে বসতে অভ্যস্ত এই মহান মনীষীগণ নিজেরা দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করেছেন এবং সন্তান-সন্ততির জন্যেও দারিদ্র্যই বেছে নিয়েছেন; তবু দ্বীনের হেফাজত করেছেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই আপন পূর্বসূরীদের এসব ইতিহাস জানা থাকা চাই। আলেমগণ তো আগে থেকেই জানেন, তারপরও নিজের পাঠ পুনঃস্মরণ করার উদ্দেশ্যে মহান পূর্বসূরীদের কিছু কথা তুলে ধরছি।

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠা

ভাস্কো দ্যা গামার মানচিত্রের সাহায্যে ১৬০১ খৃস্টাব্দে ইংরেজদের একটা দল বোম্বাই (এখনকার মুম্বাই) বন্দরে এসে পৌঁছল। তারা মোগল বাদশাহদের বলল, আমরা ব্যবসা করার জন্যে এখানে এসেছি। তাদের বস্তুবাদী উন্নতি তৎকালীন শাসকদের খুবই প্রভাবিত করল। তাই তারা প্রাণ খুলেই তাদের স্বাগত জানালেন। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি ফার্ম তৈরি হলো। বিভিন্ন এলাকায় খোলা হলো তার শাখা। একশো বছরের ব্যবধানে তাদের ব্যবসা এত সফল হলো যে, বেশির ভাগ বাণিজ্যিক লেনদেন চলে এল তাদের হাতের মুঠোয়।

প্রসাশনিক কর্মকাণ্ডে অনুপ্রবেশ

ইংরেজ গোষ্ঠী যখন দেখল, ব্যবসা খাত তারা খুব ভালোভাবেই কব্জা করতে পেরেছে, তখন তারা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডেও মাথা ঘামানো শুরু করে দিল। ১৭০১ সাল থেকেই যেহেতু হিন্দুস্তানের বিভিন্ন এলাকায় ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর পতাকা ওড়ছিল এবং ইংরেজরা ছোট-ছোট এলাকার প্রশাসন নিজেদের হাতে নিয়ে নিচ্ছিল। বাইরে ব্যবসা থাকলেও ভেতরে-ভেতরে তাদের অভিপ্রায় ছিল, শেষ পর্যন্ত আমরা একদিন এই দেশ দখল করে নেব। ফিরিঙ্গিরা তাদের এসব কাজ এত চালাকি, গোপনীয়তা আর ধূর্ততার সাথে করছিল যে, তখনকার শাসকগোষ্ঠী এদের কিছুই টের পায়নি। ফলে ১৭৪০ সালের মধ্যেই ইংরেজরা চারটি প্রদেশের গভর্নর হয়ে গেল এবং কুদরতিভাবে কিছু ফয়সালাও হতে থাকল।

শাহ ওলিউল্লাহ (রহ.)-এর জন্ম

একদিকে যখন এত প্রবল ছিল ফিরিঙ্গিদের অপচেষ্টা ও কূটচাল, তখন মেহেরবান আল্লাহ তাদের এসবের মোকাবেলার জন্য পাঠালেন তাঁর এক প্রিয় বান্দা। দিল্লির শাহ আব্দুর রহীম (রহ.) নামের এক বুজুর্গ আলেমের ঘরে জন্ম নিল একটি ছেলে সন্তান। ছেলেটির নাম রাখলেন ওলিউল্লাহ। ১৭০২ সালে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভীর জন্ম হয় এ দেশে ইংরেজদের আগমনের পুরো এক শতাব্দি পরে।

ইল্‌ম অর্জন

যখন যৌবনপ্রাপ্ত হলেন, তখন স্থানীয় ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে যে সমস্ত ইল্‌ম অর্জন করার ছিল তা অর্জন করে মদিনা চলে গেলেন এবং সেখানে ইল্‌ম হাসিল করেন শায়খ আবু তাহের মাদানী (রহ.)-এর কাছ থেকে। শাহ ওলিউল্লাহ (রহ.) সেই আলিমে দীন, সর্বপ্রথম যিনি ফারসি ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ করেন। যার রচিত কিতাব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, তাফহীমাতে ইলাহিয়া ও ফুয়ুজুল হারামাইন' বেশির ভাগ আলেমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি হারামাইন শরীফাইন থেকে হিন্দুস্তানে ফিরে এসে যথারীতি দরস-তাদরীস তথা পঠন-পাঠন শুরু করেন।

শাহ ওলিউল্লাহ (রহ.)-এর সন্তান

আল্লাহ পাক তাঁকে যোগ্য সন্তান দান করেছেন। শাহ আব্দুল আযীয (রহ.), শাহ আব্দুল কাদের (রহ.), শাহ আব্দুল গনী (রহ.) ও শাহ রফিউদ্দিন

(রহ.)-এর মতো চন্দ্র-সূর্য ছিলেন তাঁর সন্তান। 'এ ঘর যেন পুরোটাই সূর্যে ভরা'র মিসদাক ছিল তাঁর ঘর। শাহ রফিউদ্দিন ও শাহ আব্দুল কাদের (রহ.) উর্দু ভাষায় কুরআন শরীফ অনুবাদ করেন। ১৭৬২ সালে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.)-এর ওফাত হয়।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতোয়া

হযরতের ইন্তেকালের পরে তাঁর সন্তান শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। শাহ আব্দুল আযীয (রহ.)কে আল্লাহ তা'আলা মুমিনসুলভ দূরদর্শিতা দান করেছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, ইংরেজদের উদ্দেশ্য খুবই ভয়ানক। এরা আমাদের কাছ থেকে কেবল আমাদের দুনিয়া-ই কেড়ে নিতে চায় না, বরং আমাদের দীন-আখিরাতও কেড়ে নিতে চাইছে। তারই প্রেক্ষিতে ১৭৭২ সালে শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া দিয়ে বললেন, ওই ইংরেজদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও এবং স্বাধীনতা অর্জন করে নাও। এখন মুসলমানদের ওপর ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরজ হয়ে গেছে।

ফতওয়ার ফলাফল

১৭৭২ সালের এই ফতওয়ার পরে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যে সমস্ত আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে, সেসব ছিল আসলে এই ফতওয়ারই ফসল। রেশমি রুমাল আন্দোলন, আযাদী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন এবং বালাকোট প্রান্তরের লড়াই অথবা এ রকম আরো যত সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল, তার প্রত্যেকটাই ছিল শাহ আব্দুল আযীয (রহ.)-এর এই ফতওয়ার ফসল। মুসলমানদের মধ্যে একটা জাগরণ সৃষ্টি হওয়া শুরু হলো যে, পশ্চিমারা কেবল ব্যবসাই করতে চায় না, তারা বরং তাদের সংস্কৃতি আমদানি করে এখানকার জীবনযাত্রাকে তাদের মতো করেই সাজাতে চায়। এই অনুভূতি ও জাগরণ সৃষ্টি হওয়ার দরুন অন্যান্য ওলামায়ে কেরামও এই বাস্তবতা বুঝতে সক্ষম হলেন যে, ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তি অর্জন করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সারাঙ্গাপটমের লড়াই

এরই প্রেক্ষিতে ১৭৯২ সালে সারাঙ্গাপটমে হায়দার আলীর ছেলে টিপু সুলতান লড়াই করলেন ইংরেজ বাহিনীর সাথে। সুলতান টিপু ছিলেন

দীনদরদী মানুষ। তিনি নিজের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জীবনের বাজি লাগালেন; কিন্তু তাঁর বাহিনীতেও মীর সাদেক নামক এক মুনাফেক ছিল। ইংরেজরা মীর সাদেককে ৯০০ একর জমি দেওয়ার ওয়াদা করল। ফলে মীর সাদেকের মুনাফেকীর কারণে টিপু সুলতান শাহাদাত বরণ করলেন এবং মুসলমানরাও বিজয়ী হতে পারল না।

পলাশীর যুদ্ধ

ইংরেজরা যখন মহিশুর দখল করে নিল, তারা তখন আশান্বিত হলো, এবার সব বাধা সরে গেছে। কিন্তু তার কিছু কাল পরে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের সাথে লড়াই করলেন। তার বাহিনীতেও একজন মুনাফিক ছিল, যার নাম ছিল মিরজাফর। ইংরেজ আপন স্বভাব অনুযায়ী তাকেও ধন-সম্পদের টোপ দিল। সে সমস্ত গোপন তথ্য তাদের কাছে ফাঁস করে দিল। ফলে মাত্র বাইশ ঘণ্টার মধ্যেই তারা পৌঁছে গেল নিজেদের অনিবার্য পরিণামে। এ যুদ্ধেও জয়ী হলো ইংরেজ দল।

রঞ্জিত সিং এর সাহায্য-সহযোগিতা

ইংরেজরা যখন মহিশুর এবং পলাশীর যুদ্ধে জয় লাভ করল, তখন তারা চিন্তা করল, ভবিষ্যতে যেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আন্দোলন সংগ্রামের দানা না বাঁধতে পারে তাই একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। সুতরাং তারা মুসলমানদের উপর নির্যাতনের স্টীমরোলার চালাতে আরম্ভ করল। পাশাপাশি তারা এটাও চিন্তা করল যে, আমরা যদি সরাসরি মুসলমানদের উপর যুলুম-অত্যাচার করি, তাহলে তারা আরো বেশি ইংরেজবিদ্বেষি হয়ে উঠবে। এজন্য তারা ১৮২৪ সালে রঞ্জিত সিংকে পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত করল।

রঞ্জিত সিং-এর নির্মম নির্যাতন

ইংরেজদের ইশারায় রঞ্জিত সিং মুসলমানদের এমন অবস্থা করে ছাড়ল যে, তার ইতিহাস পাঠ করলেও মানুষের লোম খাড়া হয়ে যায়। অসংখ্য আলেমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। মুসলিম নারীদের বেআব্রু করেছে। মুসলমানদের জায়গা-জমি হস্তগত করে নিয়েছে। মোট কথা, তার পক্ষে সম্ভব সব পন্থাতেই সে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। তার অত্যাচারের সময়কাল ছিল দীর্ঘ দু-বছর।

সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর জিহাদ

অন্তরে ইসলামের দরদ পোষণ করেন এমন এক বুজুর্গ সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.) অনুভব করলেন, এসব আপদ থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য কাউকে না কাউকে ত্যাগ দিতেই হবে। অতএব তিনি ও তাঁর শিষ্য শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) – যাঁর সঙ্গে প্রায় ৯০০জন মুজাহিদ এবং দশ হাজার মুরিদ ছিল – উভয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারা ডেরা খাইবারের রাস্তা দিয়ে পেশোয়ারে প্রবেশ করলেন এবং প্রথম অভিযানেই সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.) পেশোয়ার বিজয় করে নিলেন।

শাহ ইসমাঈল (রহ.)-এর জিহাদ

এরপরে শাহ ইসমাঈল (রহ.) পেশোয়ারের চৌমুহনীতে দাঁড়িয়ে শরয়ী বিধান বাস্তবায়নের ঘোষণা দিলেন। নেশা ও মাদকদ্রব্য প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। দিনটি ছিল ১ মে রবিবার। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ১৯৭২ সালে হযরত মুফতী মাহমুদ (রহ.) – যিনি ছিলেন তাঁরই আধ্যাত্মিক সন্তান – তাঁকে যখন আল্লাহপাক ওখানকার মন্ত্রী বানালেন, তখন তিনিও ঠিক ওই জায়গাটিতে দাঁড়িয়েই মাদকদ্রব্য প্রতিরোধের ঘোষণা দিলেন। এটিও ছিল ১ মে রবিবার। পেশোয়ার বিজয়ের পর সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর এই কাফেলা সামনে অগ্রসর হয়ে শরকিয়ারি ও আকুড়া বিজয় করে বালাকোটের দিকে যাত্রা করেন।

সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর দুটি দাঁতভাঙা জবাব

পাঞ্জাবের গভর্নর রঞ্জিত সিং খবর পাঠাল, অটক থেকে ওদিকের এলাকা তোমরা নিয়ন্ত্রণ করবে আর এদিকের এলাকা আমি শাসন করব। সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.) উত্তরে বললেন, আমার জমিনের প্রয়োজন নেই; বরং আমি চাই মানুষের ধর্মপালনের অধিকার। আমি তো দ্বীনের হেফাজতের জন্যই এই অভিযানে নেমেছি। আমি সামনেই এগিয়ে যেতে থাকব। হয় আমার বিজয় নিশ্চিত হবে, নয় নসীব হবে শাহাদাত।

দুই সেনাপতির শাহাদাতবরণ

ইংরেজ-দোসর রঞ্জিত সিং মোকাবেলা করার জন্য তার সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলো। তখন বালাকোটের অদূরে তাঁবু ফেলেছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)। ওদিকে বৃটিশবাহিনী স্থানীয়দের বিভিন্ন

প্রলোভনে হাত করে নিল, তথ্য আদায় করল এবং তাহাজ্জুদ নামায আদায় অবস্থায় সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)কে শহীদ করে দিল। ৫ মে যখন আহমদ শহীদ (রহ.) শাহাদাত বরণ করলেন, তখন ইসমাঈল শহীদ (রহ.) পুনরায় লড়াই শুরু করে দিলেন। চার দিন চলল এই যুদ্ধ। এক পর্যায়ে ৯ মে শাহাদাত বরণ করেন শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)। এঁরা হলেন সেসব বীর পুরুষ, যাঁদের কবর এখনো আছে বালাকোট প্রান্তরে।

শাহ ইসমাঈল (রহ.)-এর কারামাত

ইতিহাসে একটি কাহিনী পাওয়া যায়। চারদিক থেকে যখন ইসমাঈল শহীদ (রহ.)কে ঘিরে ফেলা হলো, তখন এক শিখ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিশ্রি কয়েকটি শব্দ বলল এবং আরেকজন তলোয়ার ধরে ছিল হযরতের মাথার ওপর। ইসমাঈল (রহ.)-এর হৃদয়ে রাসূলপ্রেম এত প্রবল ছিল যে, ওই জঘন্য শব্দ শুনতেই তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন এবং এই বলে কসম খেলেন যে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মরব না, যতক্ষণ না আমি তোর ইহজীবন সাঙ্গ করি। এই বলেই তিনি তার দিকে খঞ্জর ছুড়ে আঘাত করলেন। কিন্তু অপর শিখ হযরতের ওপর তলোয়ার চালিয়ে দিল। হযরতের মস্তক শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল। অবাক হওয়ার কথা হলো, ইতোমধ্যে যেহেতু হযরতের দেহ নড়ছিল এবং খঞ্জরও হাতে ছিল, তাই মস্তকবিহীন ওই অর্ধেক দেহই ওই শিখকে ধাওয়া করতে লাগল। শিখ যখন দেখল, মস্তকবিহীন একটা দেহ তার দিকেই ধেয়ে আসছে, তখন ভয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল। হযরতও মস্তকবিহীন দেহ নিয়ে তার ওপর পড়লেন আর হযরতের খঞ্জর ওই শিখের সিনা ভেদ করে ঢুকে গেল। এভাবেই আল্লাহপাক হযরতের কসম পূর্ণ করার তাওফীক দিলেন।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, কিছু বান্দা এমন আছে, আল্লাহর কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা এত বেশি যে, তারা যখন কোনো বিষয়ে কসম খেয়ে ফেলে, তখন আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। যদি তারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে কসম খায়, তিনি তা পূর্ণ করার তাওফীক দান করেন।

শাহ ইসমাঈল (রহ.)-এর রচনাবলী

শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) রচিত গ্রন্থ 'তাকবিয়াতুল ঈমান' ও 'মানসাবে ইমামত' তাঁর পরিপূর্ণ ঈমানের স্মারক। তাঁর প্রশংসাকাব্য 'সুলুকে নূর' এখন ছাপা হয়েছে। সেটি পড়লেই তাঁর রাসূলপ্রেম কতখানি ছিল তার একটা ধারণা পাওয়া যায়।

ইংরেজদের বিপক্ষে ওলামায়ে দেওবন্দের পরামর্শসভা

এ লড়াইয়েও যখন ইংরেজরা বিজয়ী হয়ে গেল, তখন ইংরেজদের বিপক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হওয়া চাই, তা নিয়ে পরামর্শ করলেন ওলামায়ে কেরাম। ওই পরামর্শসভায় মাওলানা জাফর থানেশ্বরী (রহ.), হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.), মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) ও হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় এ কথাটি আলোচিত হলো যে, সংখ্যার বিচারে তো আমরা কম, তো ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ব কীভাবে? তখন মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) বললেন, আমাদের সংখ্যা কি বদরের মুজাহিদদের চেয়েও কম? হযরতের কথাটি শুনে অন্যান্য আলেমদের মধ্যেও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। তাঁদের সংখ্যা যেহেতু ৩১৩ জনের চেয়ে বেশি ছিল, তাই সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো, ফলাফল যা-ই হোক, ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ করতেই হবে।

আযাদী আন্দোলন

বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারা বছর ধরে জিহাদের প্রস্তুতি চলল। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৫৭ সালে সংঘটিত হয় আযাদী আন্দোলন। তার জন্য দুটি কেন্দ্রও নির্বাচন করা হলো। একটি আম্বালায়, যার নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা জাফর থানেশ্বরী (রহ.)। অপরটি শামেলীতে, যার সিপাহসালার ছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কি (রহ.)। লড়াই হলো, হাফেয জামেন শহীদ (রহ.) শাহাদাত বরণ করলেন। আহত হলেন হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)। ইংরেজদের সংখ্যা যেহেতু বেশি ছিল, তাই তাদেরই পাল্লা ভারী ছিল এবং বিজয় এবারো ধরা দিল না ওলামায়ে কেরামের হাতে।

شکست وفتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر

مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا

হে আমির, ভাগ্যের ব্যাপার যদিও জয়-পরাজয়
তারপরও তো ভালোই লড়ে গেছে ওই অসহায়!

তিনটি বড় প্রতিবন্ধকতা

যখন এসব ঘটনা ঘটল, বৃটিশরাজ ভাইসরয়ের কাছে জানতে চাইল, কিছু দিন পর-পর একেকটা আন্দোলন শুরু হওয়ার কারণটা কী আসলে?

তার কারণ ও উপসর্গগুলো স্পষ্ট করো, যাতে এসব আন্দোলনকে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে ভাইসরয় বৃটেন থেকে পরিদর্শকদল ও প্রতিনিধিদের আহান করলেন। পরিদর্শন শেষে তারা রিপোর্ট পেশ করল, যতদিন পর্যন্ত না তিনটা জিনিসের মূলোৎপাটন করা হবে, ততদিন এসব আন্দোলনের উদ্ভব হতেই থাকবে।

১. সর্বপ্রথম ধংস করা চাই পবিত্র কুরআন শরীফ।
২. আলেমদের হত্যা করা চাই।
৩. বিলুপ্ত করে দেওয়া চাই জিহাদের প্রেরণা।

নির্বিচার আলেমহত্যা

ইংরেজরাও সেমতে কাজ শুরু করে দিল। তিন বছরে তিন লক্ষ কুরআন শরীফ আগুনে ভস্ম করে দিল এবং ১৪ হাজার আলেমকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাল। থমসন তার জীবনীতে লিখেছেন, দিল্লি থেকে পেশোয়ারের মেইন রোডের দুপাশে এমন কোনো গাছ ছিল না, যার উপর আলেমের লাশ ঝুলতে দেখা যায়নি। থমসন তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন, আমি দিল্লি ক্যাম্পে অবস্থান করছিলাম। আমি সেখানে মানুষের মাংসপোড়া গন্ধ পেলাম। তাতে আমি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। এ কেমন কাণ্ড! এ কেমন বর্বরতা! কৌতূহলী হয়ে যখন ক্যাম্পের পেছনে গেলাম, দেখি কয়েকজন ইংরেজ অঙ্গার প্রজ্বালিত করছে আর চল্লিশজন আলেমকে উলঙ্গ করে ওই আগুনের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে বলছে, হয় সর্বদা আমাদের সহযোগী হয়ে থাকার অঙ্গীকার করো, নাহয় এই অঙ্গারের ওপর তোমাদের শুইয়ে দেব। ওই চল্লিশজন আলেম তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিলেন এবং তাঁদেরকে ওই জ্বলন্ত অঙ্গারে শুইয়ে দেওয়া হলো। আমি যে দুর্গন্ধ পাচ্ছিলাম, তা ছিল এই চল্লিশ আলেমের। তাঁবুর মধ্যেও যা পৌঁছে যাচ্ছিল। থমসন বলেন, এভাবে যখন চল্লিশজন আলেম শহীদ হয়ে গেলেন, তখন আরো চল্লিশ আলেমের সাথেও একই আচরণ করো হলো।

মাওলানা আহমদ উল্লাহ গুজরাটির উত্তর

মাওলানা আহমদ উল্লাহ গুজরাটি ছিলেন একজন বড় মাপের আলেম। এক ইংরেজ তাঁর কাছে কিছু আরবি শিখেছিল। ওই ইংরেজ তখন সেসব ইংরেজের অন্যতম ছিল, যারা কার্যকর করছিল আলেমদের ফাঁসি। সে ইংরেজ আহমদ উল্লাহ গুজরাটিকে উদ্দেশ করে বলল, 'আপনি আমার শিক্ষক। আপনি কেবল মুখে এ কথাটি বলে দিন, আযাদী আন্দোলনে আমি

শরিক ছিলাম না। আমি আপনাকে ফাঁসি কার্যকরকারীদের হাত থেকে মুক্ত করে দেব। তখন আহমদ উল্লাহ গুজরাটি (রহ.) উত্তরে বললেন, সেকথা বলে আমি আল্লাহ তা'আলার খাতা থেকে নাম কাটাতে চাই না! সুবহানাল্লাহ! ওই মহান পূর্বসূরীগণ নিজের জীবনের নজরানা পেশ করে গেলেন; তবু ইংরেজদের সহযোগী হতে সম্মত হলেন না।

সীমাহীন নির্যাতন

মাওলানা থানেশ্বরী (রহ.) তাঁর গ্রন্থ 'তারীখে কালাপানী'তে লিখেছেন, আমরা কয়েকজন আলেম ছিলাম, যাদের রাখা হয়েছিল অমৃতসর জেলখানায়। তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, আমাদের লাহোর পাঠিয়ে দেওয়া হবে। লাহোর পৌঁছার পর প্রশাসন তাদের শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিল, যাতে এদের পরিণাম দেখে অন্যরাও শিক্ষা নেয়। ওখানকার ইংরেজ শাসকরা এত অত্যাচারী ছিল যে, শাস্তি প্রদানের জন্য তৈরি করল লোহার শিকওয়ালা পিঞ্জর, যার চারপাশেও লাগানো ছিল লোহার কণ্টক। ওলামায়ে কেরামকে ওসব খানচায় ঢুকিয়ে দিয়ে রেলের বগিতে তুলে দেওয়া হলো। এভাবেই লাহোর থেকে মুলতান নিয়ে যাওয়া হলো তাদের।

তিনি বলেন, রেলের বগিতে ধাক্কা লাগলে আমরা একবার এদিকে পড়ে যেতাম, একবার ওদিকে পড়ে যেতাম। তখন কখনো আমাদের এপাশে লৌহকণ্টক বিদ্ধ হতো আর কখনো ওপাশে। শরীরের চারদিকেই লোহার কাঁটার আঘাতে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। তিন মাসে আমাদের লাহোর থেকে মুলতানে নিয়ে যাওয়া হয়। এসব বগি কখনো দুই কি তিন সপ্তাহ আটকে থাকত। আমাদের প্রতি কোনো খেয়ালই রাখা হতো না। গ্রীষ্মে আমরা ঘামের কারণে থাকতাম বিষণ্ন। কখনো গরমের চোটে ও তৃষ্ণার তীব্রতায় ছটফট করতাম। কখনোবা নিজেদের ক্ষতস্থানের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়তাম। ক্ষতে লাগানোর কোনো ওষুধ বা ব্যান্ডেজই পাওয়া যেত না। আসলে আমাদেরকে এত বেশি যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে রাখা হয়েছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করতে আমি অক্ষম।

দীর্ঘ তিন মাস ওই লৌহকণ্টকের খানচায় থাকার পর আমরা মুলতানে পৌঁছলাম। সেখানে ইংরেজরা বগি থেকে বের করে জানিয়ে দিল, আমাদের ফাঁসির আদেশ হয়ে গেছে। ফাঁসির আদেশের কথা শুনতেই আমাদের সবার চেহারায় সজীবতা এসে গেল এই ভেবে যে, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এখন আমাদের মনযিলে মকসুদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।

জিহাদের প্রেরণা ধ্বংস করার অপচেষ্টা

আলেমদের ফাঁসি দেওয়ার পর ইংরেজরা তৃতীয় যে কাজটা করল, তা হলো, তারা এ দেশে নামসর্বস্ব ধর্মীয় দল সৃষ্টি করল, যারা ফতোয়া দিল, ইংরেজদের বিপক্ষে জিহাদ করা হারাম। এ ইতিহাসের নেপথ্য বিশ্লেষণ করলেই ইংরেজদের সহযোগী কারা ছিল পরিষ্কার হয়ে যাবে? অর্থাৎ, মীর জাফর আর মীর সাদেক কারা ছিল, যারা পরে লাট হয়েছিল। আপনারা অনেক বড়-বড় জমিদার দেখতে পাবেন, ঐতিহাসিকভাবেই যাদের যোগসূত্র ইংরেজদের সাথে। আর যাদের ত্যাগী হিসেবে পাবেন, তাদের ঐতিহাসিক মেলবন্ধন হবে আমাদের মহান পূর্বসূরীদের সাথে। মোটকথা, ইংরেজরা এ তিনটি কাজ করল। কুরআন শরীফের কপি পোড়ানো, ওলামায়ে কেরামকে হত্যা করা এবং এ জাতির অন্তর থেকে জিহাদের প্রেরণা ধ্বংস করে দেওয়ার লক্ষ্যে জিহাদ হারামের ফতোয়া জারি করা।

বন্ধ হলো দশ হাজার মাদরাসা

তখনকার সময়ে বিভিন্ন মাদরাসা চলত ওয়াক্ফ সম্পত্তির ওপর ভিত্তি করে। এরই প্রেক্ষিতে ইংরেজরা ওয়াক্ফকৃত সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিল, যেন মাদরাসাগুলোর শাহ্রগই কেটে দেওয়া হলো! ফলে কেবল দিল্লি শহরেই বন্ধ হয়ে গেল দশ হাজার মাদরাসা। বন্ধ করে দেওয়া বড়-বড় মাদরাসারই সংখ্যা ছিল দশ হাজার। বুলডোজার দিয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হলো শাহ্ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভীর রহিমিয়া মাদরাসা। ইংরেজরা পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। এসব অপকর্মের বাস্তবায়ন করতে তাদের লেগে গেল কয়েক বছর।

যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো দারুল উলূম দেওবন্দ

১৮৬১ সালে আল্লাহর এক মকবুল বান্দা মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) ভাবলেন, মুসলমানদের দুনিয়া তো কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যেটা তেমন কোনো বড় ধরনের ক্ষতি নয়। আবার এখন দেখছি, তাদের দীনও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, মুসলমানদের জন্য অপূরণীয় এক ক্ষতি। তাই এর একটা বিহিত হওয়া চাই। হযরতের শ্বশুরবাড়ি ছিল দেওবন্দ। তখনকার দেওবন্দ ছিল ছোট্ট একটি গ্রাম। ১৮৬৭ সালে তিনি ওই ছোট্ট গ্রামটিতেই দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা করলেন। ছোট্ট গ্রাম নির্বাচন করার কারণ ছিল, যেকোনো বড় শহরের কর্মকাণ্ড খুব দ্রুত প্রশাসনের নজরে পড়ে যায়। ছোট গ্রাম থেকে

কাজ শুরু করলে কারো চোখে পড়ে না। বাস্তবেও প্রমাণিত হয়েছে তেমনই। হযরত যেদিন ১৮৬৭ সালে কাজটি শুরু করলেন, দিনটি ছিল ৩০ মে, ১০ মুহররম। যেদিন একটি আনার গাছের নিচে ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়েছিল দারুল উলূম দেওবন্দের একজন শিক্ষক ও একজনমাত্র ছাত্র দিয়ে। শিক্ষকের নাম ছিল মোল্লা মাহমুদ (রহ.) আর ছাত্রর নাম ছিল মাহমুদ হাসান (রহ.)। তাঁদের কারুরই জানা ছিল না, তাঁরা যে মিশনটি শুরু করলেন কালক্রমে তার আয়তন ও ব্যাপ্তি হয়ে পড়বে কত বিশাল ও বিস্তীর্ণ। নিবারণ করবে কত লক্ষ-কোটি মানুষের হৃদয়ের জ্ঞানপিপাসা। দারুল উলূম দেওবন্দের যখন ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হচ্ছিল, তখন মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) বলেন, আজ আমি এমন এক মহান ব্যক্তির হাতে দারুল উলূমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করব, জীবনে যিনি কোনো কবিরা গোনাহ করা তো দূরের কথা, কোনো কবিরা গোনাহ করার ইচ্ছেও পোষণ করেননি।

শাহ্ হুসাইন আহমদ (রহ.)-এর খোদাভীতি

মাওলানা আসগর হুসাইন (রহ.)-এর মামা শাহ হুসাইন আহমদ (রহ.), যিনি 'মেনা শাহ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর শারীরিক গঠন তেমন বড় ছিল না; কিন্তু আল্লাহপাকের কাছে ছিলেন অনেক উঁচু মর্যাদার অধিকারী। ঘাস কেটে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি প্রতিদিন কিছু-কিছু পয়সা বাঁচাতেন। বছর শেষে দারুল উলূম দেওবন্দের সমস্ত আসাতেজায়ে কেরামকে জমানো টাকাগুলো দিয়ে একবার করে দাওয়াত খাওয়াতেন। আসাতেযায়ে কেরাম লিখেন, আমরা সারা বছর তাঁর দাওয়াতের অপেক্ষায় থাকতাম। যেহেতু যেদিন আমরা তাঁর ঘরে দাওয়াত খেতাম, তার পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামাযে আমরা পরম একাগ্রতা অনুভব করতাম। এমন পরহেজগার মহান ব্যক্তিই রেখেছেন দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তিপ্রস্তর।

عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل
آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل

খোদাভীরুদের আস্থা-আলোয় আর সকলের আমল উজ্বল
চোখেরা কি আর দেখেছে কোথাও নিষ্ঠার এই তাজমহল!

এঁরা এখলাস ও নিষ্ঠার এমন তাজমহল তৈরি করেছিলেন, যার মতো কিছুই ছিল না এ পৃথিবীতে! এঁরা এমন মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, যাদের হাতে রাখা ইটে আল্লাহপাক এমন বরকত দান করেছেন যে, এই

দারুল উলূমকে আল্লাহপাক এমন এক ইউনিভার্সিটি করে দিলেন, যেটি এখন উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, প্রাচ্য, প্রতীচ্য মোটকথা পুরো পৃথিবীতেই ছড়াচ্ছে রূহানী আলো।

দারুল উলূম দেওবন্দের ফয়েজ ও ফল্গুধারা

আল্লাহ তা'আলা এ অধমকে ধর্মের বদৌলতে চল্লিশেরও বেশি দেশে ভ্রমণ করার তাওফীক দিয়েছেন। এমন জায়গাতেও গেছি, যেখানে ছয় মাস দিন আর ছয় মাস রাত। গেছি সাইবেরিয়ার মতো দেশে, পুরো বছর যেখানে বিরাজ করে শীতল হাওয়া আর সবকিছু ঢাকা থাকে বরফচাদরে। আমি বরফচাদরের ওপর নামায পড়েছি। এমন এলাকাতেও গেছি, যাকে বলা হয় End of the world বা 'পৃথিবীর শেষপ্রান্ত'। ওখানকার সরকারই এই কথা লিখে রেখেছে সেখানে। জুন মাসে সেখানে এমন একটা দিন আসে, যেদিন সেখানে প্রায় এক লাখ পর্যটকের সমাগম ঘটে। সেখানে হৃদয়কাড়া যে দৃশ্য দেখা যায়, তা হলো, সূর্য ডোবার জন্যে পানির কাছাকাছি এসে ডোবার পরিবর্তে আবার উদিত হয়ে যায়। এ কারণেই বিশ্বের বিজ্ঞানীরা জায়গাটাকে 'পৃথিবীর শেষপ্রান্ত' বলে অভিহিত করেন। আমি আফ্রিকার বন-জঙ্গল যেমন দেখেছি, তেমনি দেখেছি আমেরিকার জৌলুসপূর্ণ দুনিয়াও। কিন্তু একটি কথা বলছি, এই অধম যেখানেই গেছি, লোকালয় হোক বা জঙ্গল, পাহাড়ের শিখর হোক বা সমতল, সবখানেই দারুল উলূম দেওবন্দের কোনো না কোনো রূহানী সন্তানকে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত দেখেছি। এতই কবুলিয়তপ্রাপ্ত এই দারুল উলূম দেওবন্দ।

জ্ঞানের পাহাড়

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহপাকের মর্জিতে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে এই 'জ্ঞানজননী' প্রতিষ্ঠানের আত্মিক সন্তানেরা ইসলামের প্রচার করে যাচ্ছেন। আমজনতার হৃদয়কে করে তুলছেন আলোকিত। যাহোক, দেওবন্দি ওলামায়ে কেরাম যখন কাজ শুরু করলেন, এখানকার শিক্ষার্থীরা বের হলেন জ্ঞানের এক একটা পাহাড় হয়ে। প্রত্যেকেই ছিলেন সমকালের সূর্য ও চন্দ্রতুল্য। এই ধারাতেই শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি (রহ.) অক্ষুণ্ন রাখলেন স্বীয় পূর্বসূরীদের ইল্‌মি পরম্পরা। অব্যাহত রাখলেন ইংরেজবিরোধী কর্মসূচীও।

দারুল উলূম দেওবন্দ বনাম আলীগড় কলেজ

মাওলানা মামলুক (রহ.)-এর দুজন শিষ্য ছিলেন। একজনের নাম কাসেম নানুতবী (রহ.), যিনি প্রতিষ্ঠা করেন দারুল উলূম দেওবন্দ। আরেকজনের নাম ছিল আহমদ খান, পরবর্তীকালে যিনি প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান নামে। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি কলেজ। তিনি তার কলেজ আলীগড়ে ইংরেজি পড়ানোকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, অথচ দারুল উলূম দেওবন্দে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল কেবল ধর্মীয় বিষয়াবলীর পঠন-পাঠনকে। এ দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল তখনকার বড় শিক্ষালয়। আলীগড় সৃষ্টি করল ক্লার্ক বা লেখকশ্রেণি আর দেওবন্দ পয়দা করল মুহাদ্দিছ-মুফাস্সির, যাদের মাধ্যমে নিরাপদ রাখা হলো মুসলমানদের মসজিদের মেহরাবকে।

শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর আলীগড় আগমন

১৯২০ সালে শায়খুল হিন্দ (রহ.) আলীগড় আগমন করেন। সেখানে তিনি আপন পূর্বসূরীদের এসব ইতিহাস শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরলেন। এসব শুনে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে ইসলামের ভালোবাসা সৃষ্টি হলো। ফলে ওখান থেকেই বের হলেন মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার, মাওলানা শওকত আলী এবং আল্লামা শিবলী নুমানী (রহ.)-এর মতো মহান পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ। এটা ছিল আসলে শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর অন্তর্দহনের ফল, শিক্ষার্থীদের অন্তরকে যা দীনদরদী করে তুলেছিল। হযরতের বয়ান যখন শেষ হলো, তখন কয়েকজন শিক্ষার্থী আরজ করল, আপনারা ইংরেজ সরকারের সাথে সন্ধি করে ফেলেন না কেন? তখন শায়খুল হিন্দ (রহ.) আশ্চর্য একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন–

ہائے یہ صرف تمنا کی زبان سے دوریاں
اس قدر یہ سختیاں دشواریاں مجبوریاں
یادایام جفاآخر بھلائیں کس طرح
دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح

এসব তো হায় আশার ভাষায় দূরে সরে থাকা
এতই বীভৎস এ পাষণ্ডতা কাঠিন্য আর অপারগতা!
বেদনাবিধুর অতীতে কি আর সুখ পাওয়া যায়
ফিরিঙ্গিদের মনে কি গো আর মন সঁপা যায়?

ওই শিক্ষার্থীরা তখন বুঝতে পারল, আমরা অন্য পথের যাত্রী। পরস্পর এক হওয়া অসম্ভব। তাদের ধর্ম একরকম আমাদের ধর্ম আরেকরকম।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর ইল্‌মি ফয়েজ

অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর ইল্‌মি ফয়েজের খুবই প্রভাব ছিল দারুল উলূম দেওবন্দে। তখন শাহজাহানপুরে একটি মুনাজারা বা তর্কানুষ্ঠান হতো। যেখানে হিন্দু-খৃস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মানুসারী মানুষের সমাগম হতো। একবার ওখানে গিয়ে হযরত এমন এক আলোচনা রাখলেন, যেটি শুনে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা একেবারে লাজওয়াব ও হতবাক হয়ে গেল। এখন তো বাজারে 'শাহজাহানপুরের মুনাজারা' নামে পুস্তিকাও পাওয়া যায়। আল্লাহপাক তাঁকে দর্শন ও তর্কশাস্ত্রে এত গভীর পাণ্ডিত্য দান করেছিলেন যে, কেউই তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারত না।

শোরেশ কাশ্মিরি (রহ.)-এর আকিদার বহিঃপ্রকাশ

হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) সম্পর্কে শোরেশ কাশ্মিরি (রহ.) লিখেন,

شافع کون ومکان کی راہ دکھلاتا رہا
گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا
اس صدی میں عصر حاضر کا فقیہہ بے مثال
سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا
پرچم اسلام ابر درخشان کے روپ میں
بتکدوں کی چار دیواری پہ لہراتا رہا

পথ দেখিয়ে গেলেন পৃথিবী ও পরকালের সুপারিশওয়ালার
ভ্রান্ত মুশরিকদের শিক্ষা দিলেন অপূর্ব একত্ববাদ
এই শতাব্দীর তুলনাহীন ফিকাহবিশারদ তিনি
নবীর সুন্নতী গজল ও গান গাইলেন সদা যিনি
ইসলামের পতাকা সতেজ ও আপন মহিমায়
পতপত করে উড়িয়ে গেলেন মন্দিরে ওই মূর্তিচেলার!

মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহ.) ও ইশকে রাসূল

হযরতের অন্তরে রাসূলপ্রেম এতই প্রবল ছিল যে, নাতে রাসূল পড়া শুরু করার সাথে-সাথে অস্থির ও বেকারার যেতেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কী আশ্চর্য সুন্দর কবিতাই-না রচনা করেছেন,

سب سے پہلے مشیت کے انوار سے
نقش روئے محمد بنایا گیا
پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی
بزم کون و مکاں کو سجایا گیا
وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی
حسن فطرت کا شاہد بھی مشہود بھی
علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی
ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا

সবার আগেই মহান প্রভুর ইচ্ছে-নুরে
মুহাম্মদের মিষ্টি ও মুখ হলো বানানো
তারপর ওই নুর থেকে নিয়ে নুরের ধারা
এই পৃথিবীর জলসামহল হলো সাজানো
মুহাম্মদ, আহমদ ও মাহমুদ তিনি
মহা সত্তার দ্রষ্টা এবং দৃশ্য তিনি
জ্ঞান-প্রজ্ঞায় সীমাহীন তিনি তারপরেও
উম্মী করেই এ ধরায় তাঁকে হলো পাঠানো!

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে অসাধারণ কবিতা আবৃত্তি করতেন তিনি। যখন হজে গেলেন, পায়ের জুতো খুলে ফেললেন। তখন তিনি শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল ছিলেন। তাই একজন বলল, হযরত, এভাবে খালি পায়ে হাঁটলে তো আপনার পা আহত হয়ে পড়বে। বললেন, তা ঠিক; তবে আমি এজন্যে জুতো খুলে নিয়েছি, যাতে এমন না হয়ে যায় যে, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কদম মোবারক পড়েছে, ঠিক ওখানে যেন কাসেম নানুতবীর জুতাপরা পা পড়ে না যায়!

তাই তো তিনি বলেছেন,

امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ
کہ ہو سگان مدینہ میں نام میرا شمار
جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں
مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغ و مار

আকাঙ্ক্ষা তো লাখো আছে তবু পরম চাওয়া আমার
নামটা আমার ওই মদিনার কুকুরদলে হবে শুমার
বেঁচে থাকলে তব হারামের কুকুরের সাথে কাটাব কাল
মরে গেলে যেন খায় আমাকে মদিনার সাপ আর শেয়াল!

সুবহানাল্লাহ্! তাঁর হৃদয় ছিল রাসূলপ্রেমে পরিপূর্ণ।

একবার তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তখন দারুণ আশ্চর্য একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন–

دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر
چمکتی رہے تیرے روضے کا منظر
ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب ابوذر
ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی

জ্বলজ্বল করে ঝিলিক ছড়াক আপনার ওই রওযা-ছবি
চমকে-চমকে চমকাতে থাক আপনার রওযার জালি
আমারও যেন জুটে যায় সেই জযবা আবুযরের
আমারও তাওফীক হয় হৃদয়ময়তা বেলালের!

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা মোবারকে প্রবেশের সুযোগ হলো তাঁর। রওযায় প্রবেশের পরে ফিরে আসার সময় তাঁর অবস্থায় আশ্চর্য এক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হলো। উপস্থিত লোকদের বর্ণনা, তখর তাঁর চেহারা দেখাচ্ছিল খুবই ঝলমলে এবং তাঁর অবস্থা মনে হচ্ছিল একেবারেই অন্যরকম। এক শিষ্য যখন জিজ্ঞেস করল, হযরত, ভেতরের পরিবেশটা কী রকম মনে হলো? তখন তিনি তাঁর উত্তর দিলেন এই কবিতায়,

میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا
بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے

یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ تھا

نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے

আমার ওপর মোর মুনিবের ছিল এতই মেহেরবানি
বিছানোর আগেই দিলেন তিনি ভরে আমার আঁচলখানি
এ তো এমন অবাক করা কর্ম ছিল কর্মমালায়
পানের আগেই ধরল নেশা ছিল এমন মনমোহনী!

মদিনা মুনাওয়ারা থেকে চলে আসার সময় যখন রওযা মুবারকের দিকে দৃষ্টি দিলেন, তখন তিনি যে কবিতাটি আবৃত্তি করলেন, তা ছিল–

ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا

جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا

সহস্রবার কুরবান হতাম তোমার জন্যে হে মদিনা!
সুযোগ হলে মরেও আমি তোমায় ছেড়ে যেতাম না!

সত্যি তাঁর হৃদয়ে ছিল আল্লাহপাকের প্রিয়জন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ ভালোবাসা।

সুন্নাতের অনুসরণ

এই ভালোবাসার কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি সুন্নাতের ওপর ছিল তাঁর যথার্থ অনুসরণ। একবার কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর নামে পরোয়ানা জারি করা হলো। তা জ্ঞাত হওয়ার পরে তিনি আত্মগোপনে চলে গেলেন। আত্মগোপনের তিন দিন পার করেই আবার চলে এলেন স্বাভাবিক জীবন ও জনসমক্ষে। তখন একব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হযরত, ইংরেজরা তো আপনাকে খুঁজছে এবং আপনার নামে ওয়ারেন্টও জারি আছে। তখন বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন নিয়ে গবেষণা করে আমি তাঁর তিন দিনের আত্মগোপনের বিষয়টি জানতে পারলাম। তাই তাঁর অনুসরণে আমি তিন দিনের জন্য আত্মগোপনে গিয়ে চলে এসেছি। এখন যদি ইংরেজ বাহিনী আমাকে গ্রেফতারও করে ফেলে, তো আমার প্রাণ আমি আল্লাহর হাতেই সোপর্দ করব।

সুন্নাতের প্রতি এতই যত্নবান ছিলেন তিনি!

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর ইশকে রাসূল

হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.) ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের আরেক কৃতি সন্তান। ছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠ ফিকাহবিদ। তাঁর রচিত কিতাব 'ফতাওয়ায়ে রশীদিয়া' প্রায় সব আলেমেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। আল্লাহপাক তাঁকে কুতবুল ইরশাদ বানিয়ে দিলেন। একটানা চল্লিশ বছর যাবৎ হাদীছের দরস দিয়েছেন এবং তাঁর দরসদান এত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ ছিল যে, একদিন তিনি ছাত্রদের হাদীছের দরস দিচ্ছিলেন এবং ওই অবস্থায় আচমকা বৃষ্টি নামল। ছাত্ররা তড়িঘড়ি করে কিতাব নিয়ে কামরার দিকে দৌড় লাগাল। তাদের সেন্ডেল-জুতো বাইরেই রয়ে গেল। হযরত নিজের রুমালটি বিছিয়ে ছাত্রদের সব জুতো রুমালের ভেতর নিয়ে একটা পুটলি বানালেন এবং সেটা মাথায় করে নিয়ে এলেন কামরায়। ছাত্ররা যখন হযরতের এ অবাক কাণ্ড দেখল, তখন সবাই হৈ-চৈ ফেলে দিল! ছাত্ররা বলল, হযরত, আপনি কেন আমাদের জুতো নিয়ে এলেন, আমরা নিজেরাই তো আনতাম! হযরত তখন খুব সহজ কথায় উত্তর দিলেন, যারা ক্বালাল্লাহ-ক্বালার্‌রাসূল তথা কুরআন হাদীছ অধ্যয়ন করে, তাদের জুতা বইব না তো কী করব?

প্রিয় পাঠক, একটু ভেবে দেখুন, কী পরিমাণ ইশকে রাসূল ছিল হযরতের অন্তরে! জনৈক ব্যক্তি মসজিদে নববীর মাটি এনে হযরতের হাতে দিয়ে বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কামরা ঝাড়ু দিয়ে আমি এ মাটিগুলো নিয়ে এসেছি। তিনি তখন ওই মাটিগুলো একটি সুরমাদানিতে ভরে নিয়ে বললেন, আচ্ছা, এ মাটি যদি সত্যি মসজিদে নববীর হয়ে থাকে, তাহলে তা আমি আমার চোখের সুরমা হিসেবে ব্যবহার করব।

আরেকবার হযরতের কাছে মদিনার কয়েকটি খেজুর হাদিয়া এল। তখন তিনি এক শিষ্যকে নির্দেশ দিলেন, আমার সকল বন্ধুর একটা তালিকা তৈরি করো এবং খেজুরগুলোকে তত ভাগে ভাগ করো, যাতে সবাইকেই হাদিয়া হিসেবে পাঠানো যায়। শিষ্য বলল, হযরত, খেজুরের টুকরোগুলো তো খুবই ছোট হবে। তখন বললেন, শরীয়তে যদি অনুমতি থাকত, তোমার সাথে আমি কথা বলা-ই বন্ধ করে দিতাম। কারণ, মদিনার খেজুরের টুকরোকে তুমি 'ছোট' বলছ। এই 'ছোট' শব্দটাইবা কেন ব্যবহার করলে? এতই প্রবল ছিল তাঁর ভালোবাসা। তাই তো, যখন তিনি খেজুর খেতেন, তখন খেজুরের বিচিগুলোও গুঁড়ো করে খেয়ে ফেলতেন, যেন খেজুরের বিচিগুলোও শরীরের অংশ হয়ে যায়।

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) ও খোদাভীতি

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের সেই কৃতি সন্তান, যিনি ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর সম্পর্কে শোরেশ কাশ্মিরি লিখেছেন,

گردش دوراں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا

مالٹا میں نغمہ مہر و وفا گاتا رہا

কালের কঠিন বাস্তবতা-প্রস্তরের সঙ্গে লড়াই করে গেলেন
মাল্টার দ্বীপেও ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার গীত গেয়ে গেলেন!

হযরতকে যখন মাল্টায় বন্দি করে রাখা হলো, তখন তিনি বেড়িপরা অবস্থায় ছিলেন। তাঁর সাথে তাঁরই শিষ্য হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী, হযরত মাওলানা আযীয গুল প্রমুখও ছিলেন। ইংরেজ সরকারের নিদারুণ অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁরা অবিচল থাকলেন আপন মত ও পথে। কিতাবে এক আশ্চর্য কাহিনী পাঠ করেছি, তাঁরা যখন জানলেন, ইংরেজরা তাঁদের ফাঁসির রায় দিয়ে দিয়েছে, তখন শায়খুল হিন্দ (রহ.) খুব বেশি কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। হযরতের এ অবস্থা দেখে শিষ্যরা সবাই অবাক হয়ে গেল! তা দেখে হযরতের শিষ্যবৃন্দ ভাবতে লাগলেন, ফাঁসির রায় তো আমাদের জন্যে আনন্দের কথা। কিন্তু তারা যখন আপন শায়খের দিকে তাকাতেন, দেখতেন, তিনি সকাল-সন্ধ্যা খুব বেশিমাত্রায় কাঁদছেন। অঝোরে চোখের পানি ফেলছেন। তখন হযরতের মন এতই নরম ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, ছোট-খাট কথাতেও কান্না শুরু করে দিতেন। একপর্যায়ে হযরত মাদানী (রহ.) ও হযরত মাওলানা আযীয গুল (রহ.) সিদ্ধান্ত নিলেন, শায়খের কাছে এবার অবশ্য অবশ্যই জিজ্ঞেস করব, এত বেশি চোখের পানি ফেলার আসলে কী কারণ? ফাঁসির হুকুম যদি হয়েই থাকে, তা তো খুশির খবর। তাতে তো অস্থির হওয়ার কিছু নেই!

এরই প্রেক্ষিতে একদিন খানা খাওয়ার সময় তারা হযরতের কাছে আরজ করলেন, হযরত, ইদানিং আপনি খুব বেশি কাঁদছেন। চোখের পানি ফেলছেন! এর কারণ জানতে পারি কি? ফাঁসির হুকুম হওয়া তো আনন্দের বিষয়। এটা কান্না করার মতো কোনো বিষয় নয়। তারা যখন এসব কথা বললেন, তখন শায়খুল হিন্দ (রহ.) একটু গম্ভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালেন। তারা বলেন, হযরতের অগ্নিশর্মা রূপ দেখে আমাদের তো ঘামঝরা অবস্থা! হযরত বললেন, তোমরা কি মনে করো, মৃত্যু অথবা ফাঁসির

ভয়ে আমি কাঁদছি? আমার মনে তো অন্য বিষয়। তারা আবারো আরজ করলেন, হযরত, আমাদের যদি একটু জানাতেন! তখন হযরত বললেন, আমার মনে এই খেয়াল এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তো অমুখাপেক্ষী ও স্বয়ম্ভর। আমি আল্লাহপাকের এই বেনিয়াযির কথা ভেবেই এভাবে কাঁদছি। যেহেতু কখনো-সখনো তিনি বান্দার প্রাণ কেড়ে নেন; কিন্তু তা কবুল করেন না। আমি তো এজন্যে কাঁদছি, হে আল্লাহ! তুমি যদি আমার মৃত্যুর ফয়সালা করে থাক, তাহলে দয়া করে তা কবুলও করে নাও।

সীমাহীন নির্যাতন

হাকিম আজমল খান ছিলেন হযরতের মুরিদদের অন্যতম। হযরত অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্যে তাঁর কাছে অবস্থান করছিলেন। ওখানেই ১৯২০সালে হযরতের ইন্তেকাল হয় আর ওখানেই হযরতের নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। হযরতকে যখন গোসল দেওয়া হচ্ছিল, তখন গোসলদাতারা হযরতের পৃষ্ঠদেশে গভীর ক্ষত দেখতে পেলেন। তারা এ রকম পিঠ কখনো দেখেননি। তাই বিষয়টা নিয়ে সবাই খুবই পেরেশান ছিলেন। সবার একই প্রশ্ন, কী কারণে হযরতের পিঠে এমন গভীর গভীর ক্ষত সৃষ্টি হলো?

মাদানী (রহ.) তখন কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। হযরতের ইন্তেকালের খবর পেয়ে তিনিও জানাযায় উপস্থিত হলেন। তার কাছে যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি রহস্য উন্মোচন করে দিলেন। ব্যাপার হলো, মাল্টার বন্দিজীবনে হযরতকে জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুইয়ে রাখা হতো এবং ইংরেজরা বলত, তুমি আমাদের সাথে বিশ্বস্ত থাকার চুক্তি করে আমাদের সততার পক্ষে ফতওয়া দাও; না হয় আমরা তোমাকে জ্বলন্ত অঙ্গারে এভাবে শুইয়ে রাখব। হযরতের রক্তপ্রবাহে আগুন নিভে যেত! নিজে এত সব নির্যাতন সহ্য করে যেতেন; কিন্তু তারপরও ইংরেজদের উদ্দেশে বলতেন, হে ইংরেজ! তোমাদের নৈতিকতার পক্ষে আমি কক্ষনই ফতওয়া দেব না। আরে! আমি সেই বেলাল (রাযি.)-এর উত্তরসূরী, যাঁকে তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপর রাখা হতো ভারী প্রস্তরখণ্ড। আমি তো সেই খুবাইব (রাযি.)-এর উত্তরসূরী, যাঁর কোমরের উপরিভাগে নির্যাতনের বহু ক্ষতচিহ্ন ছিল। আমি সেই ইমাম মালিকের উত্তরসূরী, যার চেহারায় কালি মেখে দিয়ে প্রদক্ষিণ করানো হয়েছিল পুরো শহর। আমি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ওয়ারিস, যার লাশ বের করা হয়েছিল জেলখানা থেকে। আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর উত্তরসূরী, যাকে সত্তরটা বেত মারা

হয়েছিল। আমি মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)-এর ইল্‌মি ওয়ারিস। আমি শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.)-এর আধ্যাত্মিক সন্তান। তোমরাই বলো, এত কিছু সত্ত্বেও আমি কিভাবে তোমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি?

তিনি যাবতীয় জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে নিতেন; তবু মুখ দিয়ে ইংরেজের পক্ষে কোনো কথাই বলতেন না। এমনই ছিল হযরতের আত্মত্যাগ। শেষমেশ পিছু হটতে বাধ্য হলো জালেম ইংরেজ। ইংরেজরা প্রথমে হযরতকে ফাঁসি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পরে ওই সিদ্ধান্ত থেকে সরে গিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তাই ইংরেজদের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হলো। আল্লাহপাক হযরতের প্রতিজ্ঞা ও অবিচলতার বদৌলতে তাঁকে কামিয়াবি দান করলেন। কী আশ্চর্য কথা যে,

حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا
ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا
گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا
لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا

আল্লাহপ্রেমিকরা করে না যুগের চরণে মাথানত
যে তারা ছিঁড়ে যায়, মাটিতে এসে পড়ে না তো
সমুদ্রে গিয়ে মেশে খুব উৎসাহ-আগ্রহে নদী;
কিন্তু নদীতে গিয়ে মেশে না কোনো সমুদ্র!

হযরত তো ছিলেন সমুদ্র! তিনি কিভাবে নদীতে গিয়ে মিশবেন। হযরতের এই প্রতিজ্ঞা ও অবিচলতাকে সালাম করা চাই। তাই তো, আল্লাহপাক তাঁকে এমন সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন যে, হযরতের ইল্‌মি ওয়ারাসাত বা জ্ঞানীয় ফল্গুধারা বহু দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর ইল্‌মি মাকাম

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)ও ছিলেন এই জ্ঞানজননী দারুল উলূম দেওবন্দের কৃতি শিক্ষার্থী। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইল্‌মের এমন গভীরতা দান করেছিলেন যে, একাধারে তিনি ছিলেন মুফাসসির, ফকীহ এবং সুফী। দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহপাক তাঁকে দান করেছিলেন অনন্য যোগ্যতা ও মর্যাদা। ছাত্রজীবন থেকে হযরতের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছিল ইল্‌ম তথা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মণি-মুক্তা। তিনি যখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন সমাপণ

করলেন, তখন দারুল উলূম দেওবন্দের ব্যবস্থাপনা কমিটি তাঁদের জন্য দস্তারবন্দী অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ব্যাপারটা জানতে পেরে তিনি তাঁর কয়েকজন সহপাঠিসহ শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর কাছে গিয়ে আরজ করলেন, হযরত, আমরা একটি প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি। দয়া করে আমাদের ফরিয়াদটি পূর্ণ করে দিন।

শায়খুল হিন্দ (রহ.) জানতে চাইলেন, কী তোমাদের প্রয়োজন-ফরিয়াদ? তারা বললেন, হযরত, আমরা কিতাব সমাপণ করেছি। ইতোমধ্যে আমরা জ্ঞাত হয়েছি, মাদরাসার কমিটি নাকি আমাদের দস্তারবন্দি জলসা করতে চাচ্ছেন। তো আমরা আপনার কাছে এলাম এটা জানাতে যে, আমরা দস্তারের উপযুক্ত নই। আমাদের যদি পাগড়ি প্রদান করা হয়, তখন আমাদের মতো অনুপযুক্ত ছাত্রদের পাগড়ি দেওয়ার কারণে দারুল উলূমের বদনাম হতে পারে। দয়া করে আপনি এই দস্তারবন্দী অনুষ্ঠান বাতিল করে দিন।

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) যখন এসব কথা বললেন, তখন শায়খুল হিন্দ (রহ.) রাগান্বিত হয়ে বললেন, আশরাফ আলী! তোমরা তোমাদের শিক্ষকদের সামনে থাকার কারণে নিজেদের দেখতে পাচ্ছ না। আমরা যখন থাকব না, তখন তোমরাই হবে সবচেয়ে বড়। বাস্তবেও তা-ই হয়েছে। যখন এসব আসাতেযায়ে কেরাম অনন্তে যাত্রা করলেন, তখন হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর ইল্‌মের ডঙ্কা বাজতে শুরু করল।

সুবহানাল্লাহ! আধ্যাত্মিক শুদ্ধির ক্ষেত্রে থানাভনের খানকাহ ছিল অনুপম ও তুলনাহীন!

রচিত গ্রন্থাবলী

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর ওপর এক ব্যক্তি পিএইচডি করেছেন। তিনি থানভী (রহ.)-এর রচিত ২৮০০ (দুই হাজার আটশো) গ্রন্থের একটা তালিকা তৈরি করেছেন। যেসব গ্রন্থ তিনি নিজ হাতে লিখেছেন অথবা স্বীয় শিষ্যদের দিকনির্দেশনা দিয়ে লিখিয়েছেন।

হযরত কাশ্মিরি (রহ.)-এর অতুলনীয় স্মরণশক্তি

হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.) সম্পর্কে আপনারা জানেন, আল্লাহপাক তাঁকে এমন স্মরণশক্তি দান করেছিলেন যে, তাঁর সমসাময়িক যুগে যার কোনো তুলনাই নেই। কাদিয়ানীরা যখন ইংরেজদের আদালতে মামলায় লড়ল, তারা তখন একটা পত্র পেশ করল। যেটি পড়ে

মনে হয়, তারাই সঠিক। তখন ইংরেজ জজ কাশ্মিরি (রহ.)কে উদ্দেশ করে বলল, এরা যা দাবি করছে, তার পক্ষে দলিল-প্রমাণও উপস্থাপন করছে। তখন হযরত কাশ্মিরি (রহ.) বললেন, ওই কিতাবটি আমাকে একটু দেখতে দিন। হযরত কিতাবটি দেখার পর বললেন, এরা ধোঁকা দিতে চাচ্ছে। আমি ধোঁকায় পড়তে রাজী নই। আমি আজ থেকে সাতাশ বছর আগে কিতাবটি পড়েছি। এখনো কিতাবটির রিডিং আমার মুখস্থ আছে। এরা মাঝখান থেকে একটি লাইন বাদ দিয়ে দিয়েছে। তাই আমার মত হলো, এই কিতাবের আরেকটি কপি আনা হোক। যখন ভিন্ন একটি কপি আনা হলো, প্রমাণিত হলো এখানে আরো একটি লাইন ছিল। যে লাইনটির মর্মার্থ ছিল মুসলমানদের সঠিকতার পক্ষে। এভাবেই খুলে গেল কাদিয়ানীদের ধোঁকার নেকাব। সাতাশ বছর আগে পড়া কিতাবের মতন এখনো মনে আছে দেখে উপস্থিত সবাই অভিভূত ও অবাক হয়ে গেল।

আল্লাহপাক তাঁকে অনন্য ধীশক্তি দান করেছিলেন।

হিন্দুদের ইসলামগ্রহণ

হযরতের হাতে কয়েকজন হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। লোকেরা ওই হিন্দুদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা ইসলাম কবুল করলে কেন? তারা কাশ্মিরি (রহ.)-এর দিকে ইশারা করে বলল, এই চেহারাটি কোনো মিথ্যুক বা ভণ্ডের হতে পারে না। আমরা এই চেহারাটি দেখেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এত বেশি কামালিয়াত দান করেছিলেন।

হযরত মাদানী (রহ.) ও ইশ্‌কে রাসূল

আল্লাহপাক হযরত মাদানী (রহ.)-এর হৃদয়ে পরিপূর্ণ রাসূলপ্রেম দান করেছিলেন। তাঁর জীবনীতে লেখা আছে, জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন তাঁর প্রকৃতিতে একটা অস্থির ভাব পরিলক্ষিত হতো। জিলহজের প্রথম দশ দিন তার দেহ যেন থাকত এখানে আর দিল্ থাকত ওখানে (মদিনায়)। সারা দিন ওখানকার বিষয় নিয়েই ভাবতেন। এমনকি রুটি খাওয়ার সময়েও। মাঝে-মধ্যে এমন হতো যে, রুটি খাওয়ার জন্যে দস্তরখানে বসার পর হঠাৎ উঠে গিয়ে বলতেন, জানি না, নবীপ্রেমিকেরা কী করছেন এখন! কেউ হয়তো কাবার গেলাফ ধরে দু'আ করছেন। কেউ হয়তো মাকামে ইবরাহীমে সিজদাবস্থায় আছেন। হযরত তাঁদের ওইসব ছবি কল্পনা করে-করে বলতেন, জানি না, আশেকগণ এখন কী করছেন! এভাবে হযরতের খাওয়া-দাওয়া

ভালো লাগত না। কখনোবা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন, জানি না অ-আশেকগণ কী করছেন!

আল্লাহপাকের কাছে তাঁর এই অস্থিরতা পছন্দ হলো। তাই তাঁর জন্যেও খুলে দিলেন হারামাইন শরীফাইনের দ্বার। একদা হযরত মদিনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি হিন্দুস্তানের সেই মহান আলেমদের অন্যতম, যাঁদের মসজিদে নববীতে দরসদানের তাওফীক হয়েছিল। তিনি মসজিদে নববীভে একটানা ১৮ বছর হাদীছের দরস প্রদান করেছিলেন।

সেখানে হাদীছ পড়ানোর সময় সবুজ গম্বুজের দিকে ইশারা করে বলতেন, قَالَ هٰذَا النَّبِيُّ ﷺ বা এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন।

এমন সাহসই কাম্য

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন সাহস দান করেছিলেন যে, ইংরেজরা যখন তাঁকে করাচীর ওইনা হলের আদালতে হাজির করল এবং জনৈক ইংরেজ বলল, হে হুসাইন আহমাদ! তুমি কি জান, আমাদের বিরুদ্ধে তুমি যে ফতওয়া দিয়েছ, তার পরিণাম কী হতে পারে? হযরত বললেন, হ্যাঁ, আমার জানা আছে। ইংরেজ জিজ্ঞেস করল, কী জান তুমি? হযরত তখন নিজ কাঁধের সাদা চাদরখানা ওই ইংরেজকে দেখিয়ে বললেন, এটিই আমার কাফনের কাপড়, যেটি আমি কাঁধে নিয়ে ঘুরছি। বড়জোর আমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হবে। আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। তখন কারো কাছ থেকেই আমার কাফনের জন্যে কাপড় চাইতে হবে না।

فنا فی اللہ کی تہہ میں بقا کا راز مضمر ہے
جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا

ফানা ফিল্লাতেই গোপন রয়েছে অমর হওয়ার রহস্য
যেজন মরতে জানে না, সে কি বাঁচতে পারে কখনো?

এঁরাই সেই সব মহান মানুষ, যাঁরা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যথার্থ অনুসারী।

পূর্বসূরীদের কাফেলা

ওলামায়ে দেওবন্দ সম্পর্কে শাহ্জি (শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) বলতেন, 'সাহাবায়ে কেরামের একটি কাফেলা যাচ্ছিল। ওখান থেকে

কয়েকটি রূহকে আল্লাহপাক থামিয়ে দিলেন। এরাই হলো, সেই কয়েকটি রূহ, যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে এই যুগে। পরবর্তী প্রজন্ম যাতে পূর্ববর্তী প্রজন্মকে স্বচক্ষে দেখতে পারে'। বাস্তবেও তাঁদের সুন্নাতের ওপর আমল, তাঁদের খোদাভীতি ও তাক্ওয়ার দিকে তাকালে মনে হয়, মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের নখ পর্যন্ত এঁরা হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের সাজে সজ্জিত।

আল্লাহপাকের চয়ন

এগুলো কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। বরং মনে হয়, এসবই ছিল পূর্ব নির্ধারিত। এক বর্ণনায় আছে, প্রতিটি শতাব্দির শেষদিকে আল্লাহপাক এমন একজন বান্দা পৃথিবীতে পাঠান, যিনি হন মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক। যিনি ধর্মের সংস্কারের কাজ আঞ্জাম দেন। যিনি সমাজ থেকে শিরক-বিদআত-কুসংস্কার ইত্যাদি নির্মূল করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতকে পুরুজ্জীবিত করেন। তো একশ বছর বা শতাব্দি সম্পর্কে হাদীছ শরীফেও বর্ণনা আছে। অতএব, ওলামায়ে দেওবন্দ ছিলেন নির্বাচিত ও চয়নকৃত ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের জীবন নিয়ে গবেষণা করলে আশ্চর্যজনক অনেক কিছু বেরিয়ে আসে। আপনাদের সামনে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

আপনারা একটু ভেবে দেখুন, শাহ আব্দুল আযীয (রহ.)-এর ইন্তেকাল হয় ১২৩৯ হিজরিতে আর শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর ওফাত হয়েছে ১৩৩৭ হিজরিতে। দুজনের মাঝখানে প্রায় এক শতাব্দির পার্থক্য। শাহ আব্দুল আযীয (রহ.)ও ছিলেন মুজাহিদ আর শায়খুল হিন্দ (রহ.)ও মুজাহিদ। শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া দিয়েছিলেন আর সেই ফতওয়ার বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছিলেন শায়খুল হিন্দ (রহ.), প্রায় একশ বছর পরে এসে যাঁর ইন্তেকাল হয়। একশ বছরের এই ব্যবধান বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; এটি বরং মহান আল্লাহর কুদরতি কারিশমা!

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)-এর ইন্তেকাল হয় ১২৪৬ হিজরিতে আর শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর ইন্তেকাল ১৩৪৬ হিজরিতে। হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) শিরক-বিদআতকে খতম করেছেন আর শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) 'তাকভিয়াতুল ঈমান' লিখে করেছেন শিরকের মূলোৎপাটন। মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)ও শিরক-বিদআতের মূলোৎপাটন করেছিলেন। এই দুজনের ইন্তেকালের ব্যবধানও ছিল এক শতাব্দি বা একশ বছরের। তেমনি আল্লামা

শামী (রহ.)-এর ইন্তেকাল হয় ১২৫২ হিজরিতে আর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.)-এর ইন্তেকাল হয় ১৩৫২ হিজরিতে। আল্লামা শামী (রহ.) ও আল্লামা কাশ্মিরি (রহ.) দুজনেই জ্ঞানের মহাসাগর ছিলেন। কেন জানি মনে হয়, এই ব্যবধান ও ব্যাপারগুলো আল্লাহকর্তৃক নির্ধারিত। একজন যখন দুনিয়া থেকে চলে যেতেন, আল্লাহপাক তখন পাঠিয়ে দিতেন আরেকজন এবং পরবর্তী শতাব্দিজুড়ে ওই দ্বিতীয়জন সমস্ত কাজ আঞ্জাম দিয়ে যেতেন।

আল্লাহ তা'আলা যে ওলামায়ে দেওবন্দের দ্বারা দ্বীনের কাজ নিয়েছেন, তাঁদের সাথে রয়েছে আমাদের আত্মার আত্মীয়তা। আলহামদুলিল্লাহ, এখনো সেই মহামানবদের ইল্‌মি উত্তরসূরী আছেন, যাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি সুন্নাতের ওপর আমল করেছেন এবং যাঁরা স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করেছেন, যাঁরা জালিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, যাঁদের অবদানে আমরা এখন স্বাধীনতার শ্বাস ফেলতে পারছি, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছি। আমাদের ইল্‌মি আত্মীয়তার লতা এই ওলামায়ে দেওবন্দ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বিস্তৃত।

আমরা নাম-পরিচয়হীন আম নই

আমরা নাম-পরিচয়হীন কোনো আম নই। আপনারা হয়তো আগেও শুনে থাকবেন, আমবাগানে বিভিন্ন প্রজাতির আম থাকে। বাগানের মালী যে গাছ থেকে আম পাড়ে, ঝুড়িতে রাখার পর ঝুড়ির গায়ে ওই আমের প্রজাতি-নামটা লিখে দেয় এভাবে যে, 'এটি এই প্রজাতির আম'। তাই তো, বাজারে আনার পর নাম ধরে-ধরেই বিক্রি হয় আম। কিন্তু কিছু আম এমন থাকে, যেগুলো পাখিরা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। ফলে একটা আরেকটার সাথে মিলে যায়। তখন আর জানার উপায় থাকে না কোনটা কোন্ প্রজাতির। বাগানের মালিক ওই আমগুলোকে একটা ঝুড়িতে রেখে ঝুড়ির গায়ে লিখে দেন, 'এগুলো নাম-পরিচয়হীন আম'। এসব আমের জাত সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। নাম-পরিচয়হীন বা ঝরেপড়া এসব আম কেনার জন্য কেউ প্রস্তুত থাকে না।

পবিত্র ইল্‌মি পরম্পরা

আমরা রাতের আঁধারে নয়; বরং দিনের আলোতে বলছি, 'আমরা নাম-পরিচয়হীন আম' নই। আমাদের ইল্‌মি আত্মীয়তা বা পরম্পরা বরং পৌঁছে যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত। আল্লাহ তা'আলা ওলামায়ে দেওবন্দকে যে ইল্‌মি নেয়ামত দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ তার

ধারাবাহিকতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছে যায়। এই ওলামায়ে দেওবন্দের পথিকৃৎ হলেন হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)।

০ হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) দীন শিখেছেন হযরত শাহ্ আব্দুল গনী (রহ.)-এর কাছে।

০ হযরত শাহ আব্দুল গনী (রহ.) ইল্‌ম অর্জন করেছেন শাহ ইসহাক (রহ.)-এর কাছে।

০ হযরত শাহ ইসহাক (রহ.) দীন শিখেছেন শাহ আব্দুল আযীয (রহ.)-এর কাছে।

০ হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) ইল্‌মে দীন অর্জন করেছেন শাহ্ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.)-এর কাছে।

০ হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.) দীন শিখেছেন আবু তাহের মাদানী (রহ.)-এর কাছে।

০ হযরত শায়খ আবু তাহের মাদানী (রহ.) দীন শিখেছেন হুসামুদ্দীন (রহ.)-এর কাছে।

০ হযরত শায়খ হুসামুদ্দীন (রহ.) দীন শিখেছেন রবী' ইবনে সাঈদ (রহ.)-এর কাছে।

০ হযরত রবী' ইবনে সাঈদ (রহ.) দীন শিখেছেন আবু ইসহাক মাদানী (রহ.)-এর কাছে।

০ হযরত আবু ইসহাক মাদানী (রহ.) দীন শিখেছেন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রহ.)-এর কাছে।

০ হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রহ.) দীন শিখেছেন ইমাম ও মুহাদ্দিছ ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রহ.)-এর কাছে।

০ হযরত ইমাম মুহাদ্দিছ ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রহ.) দীন শিখেছেন ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর কাছে।

০ হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) দীন শিখেছেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছে।

০ হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) দীন শিখেছেন ইমাম হাম্মাদ (রহ.)-এর কাছে।

০ হযরত ইমাম হাম্মাদ (রহ.) দীন শিখেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর কাছে।

০ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) দীন শিখেছেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে।

আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের এই ইল্‌মি পরম্পরা গিয়ে পৌঁছেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত।

যিকিরের মৌলিক উদ্দেশ্য

হযরত থানবী (রহ.) বলতেন, যিকিরের মূল উদ্দেশ্য হলো, মানুষের রগ ও লোম থেকে পাপের আবর্জনা বের হয়ে যাওয়া। যেসব যিকির দেওয়া হয় এবং আত্মশুদ্ধির যে সাধনা করানো হয়, তার মূল উদ্দেশ্যই হলো যিকিরের মাধ্যমে ভেতরে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা, যাতে অন্তর আলোকিত হয়ে যায়। এ অবস্থা হাসিল হলেই আল্লাহ তা'আলা ইল্‌ম ও মারেফাত তথা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বৃষ্টিধারা

হযরত থানবী (রহ.) নিজের ব্যাপারে বলেন, আমরা শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর কাছে জালালাইন শরীফ পড়তাম। আমি ছিলাম তাকরারের দায়িত্বশীল। আমার অধীনেই তাকরার হতো। একবার তাকরারের সময় এমন একটা প্রশ্ন সৃষ্টি হলো, যার নিরসন কোনোমতেই সম্ভব হচ্ছিল না। শিক্ষার্থীরা সবাই অনেক ভাবল; কিন্তু কারো মনেই প্রশ্নটার উত্তর উদয় হলো না। পরিশেষে সহপাঠীরা আমাকে উদ্দেশ করে বলল, তুমি যেহেতু তাকরারের জিম্মাদার, তাই আগামিকাল ঘণ্টার আগেই হুজুরের কাছ থেকে উত্তরটি জেনে নেবে। আমি বললাম, ঠিক আছে।

পরের দিন জালালাইন শরীফ বগলে নিয়ে আমি ফজরের নামায পড়তে মসজিদে চলে গেলাম। শীতের দিন ছিল। ফজরের নামায শেষ করেই শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। মসজিদের পাশেই ছিল হযরতের কামরা। আমি তাঁর কাছে যাওয়ার আগেই তিনি কামরায় চলে গেলেন এবং দরজার কপাট বন্ধ করে দিলেন। আমি একটু দেরিতে পৌঁছি। মনে-মনে বললাম, আশরাফ আলী, তোমার মনের শান্তি হওয়া চাই। বের হতে দেরি করলে কেন? অতঃপর শীতের মওসুমে আমি দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। ইশরাক পড়ার পর হযরত বের হলেই যেন আমি ইশকাল বা প্রশ্নের উত্তরটা জেনে নিতে পারি।

থানভী (রহ.) বলেন, ঠাণ্ডার তীব্রতায় আমি কাঁপছিলাম। কিন্তু একটু যখন কান লাগিয়ে দেখলাম, দেখি, ভেতরে বসে হযরত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকির করছেন। তিনি বলেন, যিকির তো করছিলেন হযরত; কিন্তু শুনে-শুনে প্রশান্তি ও মজা অনুভব করছিলাম আমি। আল্লাহপাক হযরতকে এমন যওক দান করেছিলেন যে, তাঁর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকিরে শ্রোতাদের দিলেও জোশ পয়দা হয়ে যেত!

ইশরাক পড়ে দরজা খুললেন হযরত। আমি অবাক চোখে দেখলাম, এই শীতের দিনেও হযরতের কপালে ঘামের বিন্দু! যিকিরের উষ্ণতা ঘামের আবরণে দেখা যাচ্ছিল হযরতের ললাটে। আমাকে দেখতেই বললেন, আশরাফ আলী! এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ তুমি? বললাম, হযরত, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে। আমি কিতাব খুলে দিলাম। হযরত একটুখানি দেখার পরেই ওই বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন। থানবী (রহ.) বলেন, হযরত যে তাকরীর বা আলোচনা করছেন, তার শব্দগুলোও আমার অচেনা। কোনো অর্থই বুঝে আসছিল না। তাকরীর শেষ করে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আশরাফ আলী! তুমি কি বুঝে ফেলেছ? আমি বললাম, হযরত! কিছুই তো বুঝতে পারলাম না। হযরত আবার তাকরীর শুরু করলেন। দ্বিতীয়বার যখন তাকরীর করলেন, তার শব্দগুলো তখন কিছুটা পরিচিত ছিল। কিন্তু তারপরও উদ্দেশ্য ও অর্থ পূর্ণরূপে বোধগম্য হলো না। তাকরীর শেষ করে হযরত আবার জিজ্ঞেস করলেন, আশরাফ আলী! এখন কি বুঝতে পেরেছ? বললাম, হযরত! এখনো তো বুঝতে পারলাম না। তখন হযরত আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, আশরাফ আলী! আমার এখনকার কথাবার্তা তোমার বোধশক্তির অনেক ঊর্ধের। তাই অন্য কোনো সময়ে এসে জিজ্ঞেস করে নিয়ো ।

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সেই সব আসাতেযায়ে কেরাম বা সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের ছাত্র, যাঁরা আল্লাহপাকের যিকির শুরু করলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এমন বারিবর্ষণ শুরু হতো যে, একই কথাকে ভিন্ন-ভিন্ন আঙ্গিকে বয়ান করতেন, যা হতো শ্রোতাদের বোধশক্তিরও অনেক অনেক ঊর্ধের ব্যাপার।

أُولَئِكَ آبَائِي فَجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ

إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيرُ الْمَجَامِعُ

তাঁরাই আমার পিতৃপুরুষ; পারলে দেখাও তাঁদের মতো

হাজির যদি করতে পার গোত্রপ্রধান আছ যত!

আল্লাহপাক আমাদের এসব পূর্বসূরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমাদের প্রত্যেককে আত্মশুদ্ধি ও স্বীয় ইল্‌মের ওপর আমল করার, নিজের ভেতর থেকে মুনাফেকি ও পাপপ্রবণতা দূর করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

যে ব্যক্তি আকাশ ও জমিনের মাঝখানে জীবনযাপন করে, সে সত্যিকার অর্থে মানুষ হতে পারবে না অথবা আত্মশুদ্ধিও সাধনা করবে না এবং প্রকৃত মানুষ না হয়েই আল্লাহপাকের দরবারে পৌঁছে যাবে, সেখানে গিয়েও তাঁর আত্মা শুদ্ধ হবে না। যেহেতু জমিন-আসমানের মধ্যবর্তী পেট তথা পৃথিবী হলো আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্র। তাই আমাদের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবারই আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।

শুদ্ধিকথন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ. اِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا. سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

জমিন আর পাহাড়ের অপারগতা

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজিদে বলেন, আমি এই কুরআনকে আকাশ, জমিন ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছি; কিন্তু তারা সবাই আমানতের এই ভার বহন থেকে অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করেছে আর ভীত হয়ে পড়েছে এই ভেবে যে, আমানতের এ বোঝা অনেক বড় বোঝা। তা বহন করতে আমরা অক্ষম। কিন্তু মানবজাতি এই ভার বহনের দায়িত্ব নিয়ে নিল।

اِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا

(মানুষ) বড় জালেম এবং জাহেল ছিল।[১]

মানুষের গোপন দুটি গুণ

এখানে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি ظلوما অপরটি جهولا। দুটিই মুবালাগার সিগাহ। ظَلُوْمًا বাবে ضرب يضرب. থেকে আর جَهُوْلًا বাবে منع يمنع থেকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এই শব্দদুটি ব্যবহারে মানবজাতির বদনাম করা হয়েছে। কিন্তু শব্দ দুটির ভেতর দুটি গুণ সুপ্ত আছে। যে মানুষ জালেম বা অবিবেচক হতে পারে, সে যদি নিজেকে নিজে সাজিয়ে নেয় বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করে নেয়, তখন সে ইনসাফগার এবং ন্যায়বানও হতে পারে। আর যে মানুষ জাহেল বা মূর্খ হতে পারে, সে যদি

---

১. সূরা আহযাব, আয়াত-৭২

আত্মশুদ্ধি করে, তখন সে আলেম 'বা শিক্ষিত হতে পারে। এই আয়াতে যেন মানুষের মধ্যে যে ইনসাফ ও শিক্ষা অর্জনের যোগ্যতা বা গুণ রয়েছে, তারই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পরিশুদ্ধ আত্মা তৈরির ক্ষেত্র

কোনো মানুষই মায়ের পেট থেকে পরিপূর্ণ যোগ্য হয়ে আসে না। বরং পৃথিবীতে আসার পরই তাকে অর্জন করে নিতে হয় সকল যোগ্যতা ও গুণ। মায়ের পেট মানুষের শরীর গঠনের ক্ষেত্র আর আসমান-জমিনের মধ্যকার পেট মানুষের শুদ্ধ আত্মা গঠনের ক্ষেত্র। মায়ের গর্ভ থেকে কোনো শিশু চোখদুটি নষ্ট অবস্থায় আগমন করলে যেমন পৃথিবীতে আসার পর ঠিক করা আর সম্ভব হয় না; চিকিৎসক যতই চেষ্টা করুক না কেন; পরিশেষে তিনি এটাই বলবেন যে, এটা একটা জন্মগত ত্রুটি হওয়ার কারণে চিকিৎসায় এটা ঠিক করা সম্ভব নয়, তেমনি যে ব্যক্তি জমিন-আসমানের পেট পৃথিবীতে জীবনযাপন করার পরও প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠতে পারে না, অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির জন্যে সাধনা করে না অথবা নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করে না, প্রকৃত মানুষ না হয়েই যদি সে আল্লাহর দরবারে চলে যায়, তাহলে সেখানে যাওয়ার পর কেয়ামতের দিনও তার শুদ্ধ আত্মা তৈরি হবে না। অতএব, জমিন-আসমানের পেট বা পৃথিবী যখন শুদ্ধ আত্মা তৈরির ক্ষেত্র, তাই আমাদের ছোট-বড়, পুরুষ-নারী প্রত্যেকেরই আত্মশুদ্ধি বা শুদ্ধ আত্মা তৈরির সাধনা করে যাওয়া অপরিহার্য।

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

আল্লাহপাক আমানতের বোঝা বান্দার ওপর রাখলেন, বান্দা তা বহন করল। প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, বোঝাবহনকারীরও কিছু অধিকার থাকে। যেমন– বোঝা বহনের জন্যেই আল্লাহপাক গাধা সৃষ্টি করেছেন। তাই তো, গাধার গোশত খাওয়া হারাম করে দিলেন। মানুষ যাতে গাধার গলায় ছুরি চালাতে না পারে। তেমনি কারো বাঁদী বা ক্রীতদাসী গর্ভবতী হয়ে যায়, তখন মনিবের জন্যে আর ওই বাঁদিকে বিক্রি করার অধিকার থাকে না। সে যেহেতু বোঝা বহন করেছে এমতাবস্থায় এ উম্মে ওয়ালদ বা ছেলের মায়ের একটা অধিকার সৃষ্টি হয়ে যায়, যার ভিত্তিতে মনিব তাকে নিজের কাছে রাখবে অথবা আযাদ করে দেবে। কোনোমতেই মনিব তাকে বিক্রি করতে পারবে না। মোটকথা, বোঝা বহন করার কারণে গাধার যেমন অধিকার স্বীকার করে

নেওয়া হলো, বাঁদীর যেমন অধিকার মেনে নেওয়া হলো, তেমনি যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে আমানতের ভার বহন করবে, আল্লাহপাক তাঁরও অধিকার বাস্তবায়ন করবেন এবং তাকে দোজখের ইন্ধন বা জ্বালানী বানাবেন না।

রহমতের ফয়সালা

আমরা যদি বাড়িতে কাজ করার জন্যে কোনো দিনমজুর আনি, সারাটা দিন যে ঘাম ঝরাবে, সন্ধায় সে চলে যাওয়ার সময় আমরা অবশ্যই তার প্রাপ্য বা মজুরি আদায় করে থাকি। অথচ আমাদের অন্তরে রোগ ও বদ-অভ্যাস বিদ্যমান। লোভও আছে, লালসাও আছে, আছে কৃপণতাও; কিন্তু এসব সত্ত্বেও অন্তরে কিছুটা আভিজাত্য অবশিষ্ট থাকার কারণে আমাদের মন সায় দেয় না, সারা দিন যে দিনমজুর আমার জন্যে ঘাম ঝরাল, তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেই। অতএব, ওই বান্দা সম্পর্কে কী ধারণা করেন, যে সারা জীবন বহন করে চলল আমানতের এই বোঝা? কেয়ামতের দিন কি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রতিদান দিবেন না? এ কারণেই বলা যায়, যে ব্যক্তির জীবন শরীয়ত ও সুন্নাত অনুযায়ী হয়ে যাবে, আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে সে বান্দার অধিকারও বাস্তবায়ন করা হবে।

একটি অমূল্য বাণী

একথা মনে রাখা দরকার যে, শাস্তি দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা এই সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেননি। বরং প্রতিদান ও পুরস্কার দেওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। শাস্তি তো আমরা নিজেরাই কিনে নেই। নিজেদের মূর্খতার কারণে আমরা আমাদের পাপের মধ্যে ধসিয়ে দেই। ফলে আমাদের ওপর এসে পড়ে বালা-মসিবত। আমরা যদি জীবনটাকে আপন স্বভাব-প্রকৃতি আর শরীয়ত ও সুন্নাত অনুযায়ী পরিচালিত করি, তখন আল্লাহপাক দুনিয়াতেও আমাদের সম্মান দান করবেন এবং আখিরাতেও সম্মান দান করবেন। এজন্যেই আল্লাহপাক বলেছেন-

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

'তোমাদের অলস হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমাদের পেরেশান হওয়ারও কোনো কারণ নেই। তোমরাই তো হবে শ্রেষ্ঠ ও বিজয়ী। যদি তোমরা হতে পারো মুমিন।'[১]

---

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৩৯

অতএব, আমরা যদি আত্মসংশোধনের সাধনা করি, তো এই পৃথিবীতেও আমরা রাজত্ব পাব নিঃসন্দেহে।

অধীন করে দেওয়ার অর্থ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

'আসমান-জমিনে যা কিছুই আছে, সবকিছুই আমি তোমাদের অধীন করে দিয়েছি।'[১]

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (রহ.) 'মুফরাদাতুল কুরআন' গ্রন্থে লিখেন, অধীন করে দেওয়ার অর্থ এই যে, মানুষ যেকোনো প্রাণীর লাগাম ধরে নিজের ইচ্ছেমতো তাকে পরিচালনা করতে পারবে। যেন আসমান-জমিনের সকল কিছুর লাগাম আল্লাহপাক মানুষের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন। এখন আমরা যদি সত্যিকার মানুষ হয়ে যাই এবং আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যদি আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম জারি হয়ে যায়, তখন অবশ্যই আমরা সৃষ্টিজগতের সকল কিছুকে নিজেদের অধীন ও অনুগত করে নিতে পারব।

দেহের ওপর মনের হুকুম

মানুষের মনের হুকুম তার দেহের ওপর চলে। যেমন– এক ব্যক্তি কারো দিকে দৃষ্টিপাতই করে না। কেউ যদি তাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি তো আমার দিকে দৃষ্টিপাতই করেন না? তখন সে উত্তর দেয়, আমার মন চায় না, তাই। অথচ দৃষ্টিপাত করাটা চোখের কাজ। তবু উত্তর পাওয়া যায় যে, আমার মনে চায় না। তেমনি কোনো ব্যক্তি কারো কথাই শোনে না। কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে, ভাই! তুমি আমার কথা শুনো না কেন? তখনো সে বলে, আমার মন চায় না। তাই বোঝা গেল, মন সায় দিলেই চোখ ও কান কাজ করে আর মন না চাইলে তখন চোখও কাজ করে না, কানও কাজ করে না। এ যেন দেহের ওপর মনের রাজত্ব! এজন্যেই, যে হৃদয়ে আল্লাহপাকের কর্তৃত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়, আল্লাহপাক তাকে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী সকল কিছুর ওপর কর্তৃত্ব ও রাজত্ব দান করেন।

---

১. সূরা জাছিয়াহ, আয়াত-১৩

অধীনকরণের পর্যায়

অধীনকরণের পর্যায় এমন হয় যে, মুখ দিয়ে যে কথাই বের হয়, আল্লাহ তা'আলা তা পূর্ণ করে দেন। হাঁ, ঠিকই বলছি। যে ব্যক্তি আক্ষরিক অর্থে মানুষ হয়ে যায়, আল্লাহপাক তার মান-সম্মান রক্ষা করেন। তবে আল্লাহপ্রেমিকগণ অবশ্য লক্ষ্য রাখেন আল্লাহ তা'আলার মর্জির প্রতি। তাই তো, তাদের মুখ দিয়ে এমন কোনো কথা তাঁরা বের করেন না, যা আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিপরীত হয়।

খাজা আব্দুল মালেক সিদ্দীকী (রহ.) ও তাস্‌খীরের পর্যায়

ইমামুল ওলামা ওয়াস্‌সুলাহা খাজা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক সিদ্দীকী (রহ.) সভা-সমাবেশে বলতেন, আমি চাইলে মুহূর্তেই এই সমাবেশকে অস্থির ও সন্ত্রস্ত করে দিতে পারি। কিন্তু আমার প্রতি ওপরওয়ালার নির্দেশ এমন নয়।

তাস্‌খীরের স্তর এবং সোপর্দকরণ ও সন্তুষ্টি

যখন তাতারদের সন্ত্রাস শুরু হলো, তখন খাজা ফরিদউদ্দিন আত্তার (রহ.)-এর কাছে খবর এল, তাতাররা তার শহরে হামলা করতে আসছে। তিনি তখন দাঁড়িয়ে এই দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ, এই সন্ত্রাস থেকে আমাদের রক্ষা করো।' যে সৈন্যবাহিনী শহর অভিমুখে যাচ্ছিল, এই দু'আর বরকতে পথ ভুলে তারা অন্যদিকে চলে গেল। আর এভাবেই আল্লাহ তা'আলা পুরো শহরকে রক্ষা করলেন। পরের বছর আবারো তাতাররা ওই শহরের দিকে রওনা দিল। এবার খাজা ফরিদউদ্দিন আত্তার (রহ.) আপনমনে ভাবলেন, ওদের হামলা থেকে বাঁচার জন্য আমি দু'আ করে দেব। কিন্তু এবার ইলহামের (অন্তরে ভাবের উদ্রেক করা) মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হলো, 'হে আমার বান্দা, এটা আমার ইচ্ছে, এবার তোমাকে মাথানত করতেই হবে। তুমি প্রথমবার দু'আ করেছিলে, আমি তা কবুল করেছি। এবার কিন্তু আর হাত তুলো না। এটাই যে তাকদিরের ফয়সালা, যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।' ফলে তিনি আর দু'আ করলেন না। তাতার বাহিনী এল এবং সারা শহর তছনছ করে দিল। এই সময়ে ফরিদউদ্দিন আত্তার (রহ.)ও তাতারদের হাতে শাহাদাত বরণ করলেন।

সাইয়্যেদ আহমাদ দরবন্দী (রহ.) ও তাসখীরের স্তর

তাতার সৈন্যবাহিনী গিয়ে পৌঁছল দরবন্দ নামক এক শহরে। যেখানে বাস করতেন সাইয়েদ আহমাদ দরবন্দী নামে এক বুযুর্গ। তাতার বাহিনী

আসছে শুনেই মুসলমানরা পুরো শহর খালি করে দিল। রয়ে গেলেন কেবল আহমাদ দরবন্দী (রহ.) আর তাঁর এক খলীফা। তাঁরা ছিলেন একটি মসজিদে। তাতার রাজপুত্র হুকুম দিল, যাও, গোটা শহরে কোনো মানুষ রয়ে গেছে কি-না দেখে এসো। রাজপুত্রকে অবহিত করা হলো, দুজন মানুষই কেবল মসজিদে বসে আছে। রাজপুত্র বলল, তাদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো।

আদেশ অনুযায়ী ওই দুজনকে গ্রেফতার করে রাজপুত্রের সামনে নিয়ে আসা হলো। তখন তাতার রাজপুত্র তাদের জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কি জানা ছিল না, আমি আসছি? তারা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমরা জানতাম। রাজপুত্র বলল, সকল মুসলমান শহর ছেড়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও তোমরা কেন রয়ে গেলে? তারা বললেন, আমরা আমাদের প্রতিপালকের বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। আর ওই ঘর থেকে কেউই আমাদের বের করতে পারবে না। রাজপুত্র বলল, এসব কী বলছ তোমরা? আমি তোমাদের বেড়ি পরালাম এবং অপরাধীর মতো আমার সামনে এনে দাঁড় করালাম। শায়খ আহমাদ দরবন্দী (রহ.) তখন বললেন, এই বেড়ি কি একটা ব্যাপার হলো? এটুকু বলার পর যখন শায়খ আহমাদ দরবন্দী (রহ.) উচ্চস্বরে 'আল্লাহ' বলে ডাক দিলেন, সাথে-সাথেই পায়ের বেড়ি ও শেকল ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

তাতার রাজপুত্রের ইসলামগ্রহণ

এটা দেখেই তাতার রাজপুত্রের বুকে ভয় ধরে গেল। তখন সে বলল, আমি আপনাকে এ শহরে থাকার অনুমতি দিচ্ছি। শায়খ আহমাদ দরবন্দী (রহ.) ওই শহরেই বসবাস শুরু করলেন। তাতার রাজপুত্র মাঝে-মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষা করে তাঁর সাথে দেখা করতে আসত। আত্মিক আলোর মাধ্যমে আল্লাহপাক শায়খ আহমাদ দরবন্দী (রহ.)কে জানিয়ে দিলেন , এমন একটা সময় আসবে, যখন এই রাজপুত্র পুরো দেশের শাসক হবে। শায়খ (রহ.) রাজপুত্রকে বললেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। রাজপুত্র বলল, আমি যদি মুসলমান হয়েও যাই, আমার ঈমান তো প্রকাশ করতে পারব না! করলে তো আমাকে জবাই করে দেওয়া হবে। শায়খ (রহ.) বললেন, তুমি তোমার ঈমান আনয়নের কথা তখনই প্রকাশ করো, আল্লাহপাক যখন তোমাকে সারা দেশের শাসক বানিয়ে দেবেন।

রাজপুত্র অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, পুরো দেশের রাজত্বও কি জুটবে আমার কপালে? শায়খ বললেন, হ্যাঁ, আমার অন্তরের আলো তা-ই নির্দেশ

করছে। তখন রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করল, যেদিন আমি সারা দেশের শাসক হয়ে যাব, সেদিনই আমার ঈমান আনয়নের কথা প্রকাশ করে দেব। আল্লাহ তা'আলার খেলা দেখুন, ত্রিশ বছরের মাথায় এসে ওই রাজপুত্র হয়ে গেল সারা দেশের শাসক। তখন সে ইসলাম গ্রহণের কথাও প্রকাশ করে দিল। এভাবেই সারা দুনিয়ার শাসনভার আবারো এসে গেল মুসলমানদের হাতে।

এ কথাই তো বলেছেন আল্লামা ইকবাল–

ہے عیاں شورش تاتار کے افسانے سے
پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

তাতারদের জুলুমে রচিত উপাখ্যান
মন্দিরেই পাওয়া গেল কা'বার পাসেবান!

মুখনিঃসৃত কথার মর্যাদা

প্রিয় শ্রোতৃবৃন্দ, আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম বা আদেশ-নিষেধ যে বান্দার কয়েক ফুট দৈর্ঘের শরীরের লোগো হয়ে যায়, আল্লাহপাক ওই বান্দার মুখ থেকে বের হওয়া শব্দের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করেন। আমরা যার সাথে বন্ধুত্ব থাকে, তার কথা ফেলে দেই না। স্বামী ভালোবাসার কারণেই তো স্ত্রীর কথা ফেলে না। মা-ও তো স্নেহের কারণেই সন্তানের কথা ফেলে দেন না। তেমনি যেসব বান্দার সাথে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলাও ওই বান্দার কথা ফিরিয়ে দেন না। এমন জীবন আমরা নিকট অতীতে প্রত্যক্ষ করিনি বলে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে।

চাটাইয়ে বসার সুখ

আপনারা হয়তো এমন কাহিনী পড়েছেন যে, কেউ সিংহাসন ছেড়ে চাটাইয়ে উপবেশনকারী হয়ে গেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনারা হয়তো এমন একটি কাহিনীও পড়েননি যে, কোনো চাটাইওয়ালা গ্রহণ করে নিয়েছেন সিংহাসন বা ক্ষমতার গদি। অতএব বোঝা গেল, এই চাটাই-উপবেশনে অবশ্যই এমন কোনো সুখ-আনন্দ সুপ্ত আছে, যা ওই সিংহাসনেও পাওয়া যায় না।

ক্ষুধার তৃপ্তি

একবার ইবরাহিম ইবনে আদহাম (রহ.) ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের উপকারিতা বর্ণনা করছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, আপনি এসব কী বলছেন?

ক্ষুধা-দারিদ্র্যও কি মর্যাদার বস্তু হতে পারে? হযরত বললেন, হে ভাই, এ সম্পর্কে তোমরা কী জানবে? জানতে চাইলে আমাকে জিজ্ঞেস করো, যে কিনা বলখ শহরের বাদশাহী ছেড়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য ক্রয় করেছে।

অন্তরে এতই প্রশান্তি

আরেকবার তিনি বললেন, রাজারা যদি জানতে পারত, আমাদের অন্তরে কী পরিমাণ প্রশান্তি বিরাজমান, তা হলে তারা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আমাদের ওপর হামলা শুরু করে দিত। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, এই আল্লাহওয়ালাদের পোশাক-আশাক খুবই সাধারণ। এরা চাটাইয়ে বসে থাকেন এবং দুনিয়াতে তাদের কোনো কদর নেই; কিন্তু জেনে রেখো, আল্লাহ তা'আলার কাছে এদের জন্যে রয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর স্তর

একদা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) জনৈক নরসুন্দরের কাছে চুল কাটাতে গেলেন। নরসুন্দর লক্ষ্য করল, হযরতের পোশাক জীর্ণ ও অপরিষ্কার। এমন সময় সুন্দর পোশাক পরা এক ব্যক্তি চুল কাটাতে এল। নরসুন্দরের আশা ছিল, এ ব্যক্তির কাছ থেকেই টাকা বেশি পাওয়া যাবে। এই ভেবে সে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর চুল কাটতে মানা করে দিল এবং বলল, প্রথমে আমি এই ব্যক্তির চুল কাটব। শাফেয়ী (রহ.) তখন নিজের গোলামের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি কোনো টাকা-পয়সা আছে? গোলাম বলল, হ্যাঁ, তিন শ দিনার আছে। শাফেয়ী (রহ.) বললেন, দিনারগুলো একে এমনিতেই দিয়ে দাও। অথচ চুল কাটার জন্যে লাগত দুই কি তিন দিনারমাত্র। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এমনিই তিনশ দিনার দিয়ে দিলেন এবং চুলও কাটালেন না, তখন ওই নরসুন্দর খুব অবাক হয়ে গেল। নরসুন্দর বলল, আমি তো মনে করেছিলাম, আপনার দেহে কেবল ছেঁড়া আলখেল্লাই আছে। এখন তো দেখছি, পুরনো জামার ভেতরে লুকিয়ে ছিল মণি-মাণিক্য! নরসুন্দরের কথা শুনে শাফেয়ী (রহ.) বাইরে চলে এলেন এবং বিখ্যাত এই কবিতাটি আবৃত্তি করলেন–

على ثياب لو يباع جميعها

بفلس لكان الفلس منهن اكثرا

তুমি যদি হিসাব কর দাম কত এই পোশাকের

তখন তো ভাই হবে না তা অধিক দু-এক দেরহামের

তবে যদি হিসাব কর এই বান্দার মূল্য কত
মূল্য তো তার হবে না এই ভুবন করলেও একত্রিত!

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (রহ.)-এর হৃদয়ের মূল্য

একবার শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.) দিল্লির শাহী জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, হে মোগল বাদশারা, তোমাদের সিন্দুক হিরে আর মুক্তো দিয়ে ভরা; কিন্তু ওলিউল্লাহর বুকে এমন একটি হৃদয় আছে, তোমাদের সমস্ত ধন-দৌলত মিলেও যার মূল্য বা বিনিময় হতে পারবে না। তার হৃদয়ে আছেন মহান প্রভু আল্লাহ; বরং তাঁর হৃদয়ে আল্লাহ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। সুবহানাল্লাহ!

কেবলই আনুগত্য

মানুষের দেহে যখন আল্লাহ পাকের আদেশ-আহকাম জারি হয়ে যায়, তখন আল্লাহপাক ওই বান্দার হুকুমকে সৃষ্টিকূলের মধ্যে জারি করে দেন। এমন বান্দার অনুসরণ করা হয়। এমন বান্দার আনুগত্য পানি করে। এমন বান্দার আনুগত্য জমিন করে। এমন বান্দার আনুগত্য বনের জীব-জন্তুরা করে। আরে! মানুষ তো আছেই। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতকেই ওই বান্দার অনুগত করে দেন।

সাইয়্যেদুনা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) ও তাসখীরের স্তর

সাইয়্যেদুনা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে يَا سَارِيَةَ الْجَبَلَ বলতেই বাতাস ওই সংবাদটি হাজারো মাইল দূরে নিয়ে যায়। তিনি যখন নীলনদকে চিঠি লিখলেন, অমনি নীলনদ বইতে শুরু করল। এখনো সেই নীলনদ বহমান থেকে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর মহান ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। মদিনা মুনাওয়ারায় একবার ভূমিকম্প শুরু হলো। হযরত ওমর (রাযি.) আপন পা দ্বারা আঘাত করে জমিনের উদ্দেশে বলেন, হে জমিন, তুমি কাঁপছ কেন? ওমর কি তোমার ওপরে ইনসাফ-সাম্য প্রতিষ্ঠিত করেনি? তখন জমিনের কম্পন থেমে যায়। মদিনার নিকটবর্তী এক পর্বত থেকে এক ধরনের আগুন বের হতো, যেটি মদিনার দিকে ধেয়ে আসত এবং বিস্তৃত হতো। হযরত ওমর (রাযি.) এই বলে হযরত তামিমদারী (রাযি.)কে পাঠালেন যে, যাও, ওই আগুন নিভিয়ে দাও। তিনি দুই রাকাত নফল নামায আদায় করলেন এবং নিজের পোশাককে এমনভাবে তৈরি

করলেন, যেন কোনো প্রাণীকে মারার জন্য চাবুক। ওটি দিয়ে আগুনকে পিটাতে থাকলেন এবং আগুনও পিছু হটতে থাকল। শেষ পর্যন্ত ওই আগুন যে গুহা থেকে বের হয়েছিল, ওই গুহাতেই ঢুকে গেল।

বর্বর জাতির ইসলামগ্রহণ

সাহাবায়ে কেরাম যখন আফ্রিকার জঙ্গলে পৌঁছলেন, তখন বর্বর জাতি বলল, এখানে তো হিংস্র ও ভয়ঙ্কর প্রাণীরা রয়েছে। তারা রাতের আঁধারে তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে পারে। তখন এক সাহাবী (রাযি.) দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, হে জঙ্গলের জীব-জন্তুরা, আজ এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কেরাম নিশি যাপন করবেন। তাই তোমরা জঙ্গল খালি করে দাও। এই ঘোষণা শেষ হতে না হতেই সাহাবায়ে কেরাম দেখলেন, বাঘিনীরা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে চলে যাচ্ছে। হাতিরাও চলে যাচ্ছে দল বেঁধে। জঙ্গল ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে সমস্ত পশু-প্রাণি ও হিংস্র জন্তু-জানোয়ার। স্থানীয় বাসিন্দারা যখন জিজ্ঞেস করল, এই কাজ কীভাবে শিখেছ তোমরা? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এমন জীবন-প্রণালি শিক্ষা দিয়েছেন। তারা বলল, আমাদেরও তোমাদের মতো করে নাও। এভাবেই আফ্রিকার সেই জঙ্গলি মানুষ জন্তু-জানোয়ারের আনুগত্য দেখে বিনা রক্তপাতে মুসলমান হয়ে গেল।

সাহসের সংকীর্ণতা

আল্লাহপাক প্রত্যেক মুমিনকেই তাস্‌খীরের দৌলত দান করার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু আমার পথচলায় আমাদের ছয় ফুটি শরীরটাই মূল বাধা। মাওলানা রুমী (রহ.) এক জায়গায় লিখেছেন, 'হে বন্ধু, তোমার রাস্তায় প্রতিবন্ধক কেবল তোমার ছফুটি দেহটা। অর্থাৎ তোমার কুপ্রবৃত্তি। তারপর বলেন, এই ছফুটি শরীরটা এত বেশি উঁচু প্রাচীর নয় যে, একটু সাহস করে দেওয়ালটা পার হয়ে যাও।'

হক কথা এই যে, সারা জীবনেও আমরা এই ছফুটি দেওয়ালটা টপকাতে পারি না। এটাই আমাদের এবং আমাদের প্রতিপালকের মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। আমরা তার ওপর পা রেখে সামনে এগিয়ে যেতে পারি না।

نہ شاخ گل ہی اونچی تھی نہ دیوار چمن بلبل!
تیری ہمت کی کوتاہی تیری قسمت کی پستی ہے

হে বুলবুল! ফুল গাছের ডাল অথবা প্রাচীর ছিল না উঁচু অতি
তোমার সাহসের সংকীর্ণতাই তোমার ভাগ্যের এই অধঃগতি!

আসলে সংকীর্ণ হয় আমাদের সাহস; কিন্তু আমরা বলি ভাগ্য অপ্রসন্ন বা খারাপ। মনে রাখবেন, যার সাহস উঁচু হয়, আল্লাহপাক তার জন্য অভীষ্ট লক্ষ্য সাধনের পথ খুলে দেন।

আমানতের ভার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এই পৃথিবীতে সাধনা করতে হবে আমাদের। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। আমানতের এই বোঝা আমাদের মাথার ওপর রেখে দেওয়া হয়েছে। পুরুষ কিংবা মহিলা আমাদের প্রত্যেককে তা আদায় করতে হবে। কেউ যদি আমানতের ভার বহনে কোনো ধরনের কৃপণতা বা অলসতা করে, তো কিয়ামতের দিন তার ব্যাপারে আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে। আর যে ব্যক্তি আমানতের এই জান্নাতি ভার বহন করবেন, আল্লাহ পাক তাকে দান করবেন উত্তম বদলা ও অভাবনীয় প্রতিদান।

তিনটি বুনিয়াদি পাপ

মানুষের জীবনে তিনটি পাপ বুনিয়াদি ভূমিকা পালন করে, তার বিশদ বর্ণনা নিচে করা হলো–

প্রথম পাপ : প্রথম পাপ شهوت বা প্রবৃত্তির অনুসরণ। شهوت শব্দটি নির্গত হয়েছে ইশ্‌তেহা শব্দমূল থেকে। আরবী ভাষায় ইশ্‌তিহা বলা হয় কোনো বস্তুর কামনা, লোভ ও তৃষ্ণাকে। মানুষ যখন ক্ষুধার্ত থাকে, তখন যেমন তার রুটির ক্ষুধা সৃষ্টি হয়। যেমন তৃষ্ণার্ত মানুষের পানির প্রতি শাহওয়াত সৃষ্টি হয়। কিছু মানুষের লোভ থাকে ভালো খাবারের প্রতি। কিছু মানুষের লোভ থাকে উন্নততর পোশাক পরিধানের প্রতি। তেমনি মানুষ যখন যৌবনে পৌঁছে, তখন তার স্ত্রীর প্রয়োজন হয়। এর জন্যও শাহ্‌ওয়াত শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শিশুদের মধ্যে মিষ্টান্ন খাওয়ার প্রতি লোভ থাকে। বাবা-মা তাদের চুইংগাম আর চকোলেট খেতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা গোপনে লুকিয়ে খায়। যেহেতু তাদের মধ্যে মিষ্টান্নের প্রতি আসক্তি দান করা হয়েছে। কিছু-কিছু মানুষের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি এতই আগ্রহ থাকে যে, তারা যেন খাবারের পাহাড় হয়ে থাকে। সর্বদা তাদের চিন্তা থাকে খাবারের প্রতি।

কোনো দিন ভালো ও সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায়, তখন ওই খাবারের তালাশেই পড়ে যায়। কিছু মানুষের আগ্রহ থাকে পৃথিবীতে নেতৃত্বদানের। নেতৃত্বের জন্যে তারা জীবনটাও উৎসর্গ করে দেয়। কেউ তো নেতৃত্বপ্রাপ্ত হয় আর কেউ বঞ্চিতই থেকে যায়।

সৌন্দর্য ও সম্পদের ফাঁদ

যুবক পুরুষদের মধ্যে নারীআসক্তিই অধিক হয়। পক্ষান্তরে নারীদের বেশি আগ্রহ থাকে কাপড় ও অলংকারের প্রতি। প্রত্যেকের মধ্যেই আলাদা-আলাদা ব্যাধি বিদ্যমান। এখনকার পুরুষদের তো সৌন্দর্য আসক্তি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। আর নারীদের নষ্ট করে ফেলেছে সম্পদের মোহ। যেন মাল আর সৌন্দর্য-মোহই পুরো মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। পুরুষ নেককার হোক অভিজাত হোক কিংবা হোক সুফি; সৌন্দর্য তার দুর্বলতা। তাই চক্ষুদ্বয় নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সাধনা করতে হয়। কিতাবাদিও পড়ে নেয়। অন্যান্য ভালো কাজও করতে থাকে। তবু চোখের নিয়ন্ত্রণ শক্তি লাভের জন্য কারো কাছে এসে আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য। কোথাও এসে কানমলা খেতে হয়। তখনই কেবল দূরীভূত হয়ে যায় চিন্তার নষ্টামী।

খানকাহ্‌র মূল উদ্দেশ্য

মনে রাখবেন, যিকিরের মাধ্যমে চিন্তার দুর্গন্ধ ও নষ্টামী দূর হয়। আমরা যদি যিকির না করি, তো চিন্তা পবিত্র হবে না। এ অবস্থায় আমরা দুনিয়াবী বা দ্বীনি যে কাজই করি না কেন, আমাদের বাইরে হবে একরকম, আর ভেতরে হবে আরেক রকম। আমরা তখন দুমুখী জীবনই যাপন করব। আমরা যদি চাই, এই দ্বিমুখিতা দূর হয়ে যাক অথবা কথা ও কাজের এই ফাঁক ও ব্যবধান দূর হয়ে যাক, তার জন্য কারো না কারো সান্নিধ্য-ছায়ায় থেকে দীক্ষা অর্জন করতে হবে। এই খানকাহগুলোর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এটিই।

যিকিরের পরিবেশের আবশ্যকতা

কেউ যখন বিস্কুট বানায়, তখন সমস্ত উপাদান এক করে বিশেষ পর্যায়ের তাপে রেখে দেয়। এভাবেই বিস্কুট তৈরি হয়ে যায়। আপনারা জানেন বিস্কুট কত মজাদার জিনিস। তেমনি যখন মানুষের হৃদয়কে কিছুক্ষণ যিকিরের উষ্ণতায় রাখা যায়, তখন তার হৃদয়ও বিস্কুটের মতো মজাদার হয়ে যায়

এবং আল্লাহ পাকের কাছে মনোনীত হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক আধ্যাত্মিক পথিকেরই উচিত যিকিরের পরিবেশে থেকে সাধনা করা, যাতে নিজের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ এসে যায় এবং শরীয়ত ও সুন্নাতের বিধি-বিধান তার জীবনের লোগো হয়ে যায়।

অন্তরের জাগৃতি

এ অবস্থাকেই কোনো-কোনো শায়খ বলেছেন, অন্তরের জাগৃতি। কিছু সালিক অন্তর জাগ্রত হওয়া বলতে বোঝেন অন্তরের বাহ্যিক কোনো স্পন্দন। হ্যাঁ, অন্তরের আল্লাহ-আল্লাহও অনুভূত হয়। তবে শুধু আল্লাহ-আল্লাহ শব্দ উদ্দেশ্য নয়, যতক্ষণ না অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার সাক্ষ্য দেয়। কোনো আধ্যাত্মিক পথিক যদি বলে, আমার তো আল্লাহ আল্লাহ যিকিরের অবস্থা অর্জিত হয়েছে; কিন্তু সে শারীকিকভাবে শরীয়ত ও সুন্নাতের বিরোধিতা করে, তাহলে, তার এই আল্লাহওয়ালা অবস্থার কোনোই গুরুত্ব নেই। তাসাউফের প্রাথমিক পর্যায় হলো, মানুষ স্বীয় অন্তরে আল্লাহ আল্লাহ যিকির অনুভব করবে এবং উচ্চ পর্যায় এই যে, বান্দার শরীরে আল্লাহর আহকাম বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। মোটকথা, তার শরীর তার মনের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। এ অবস্থা অর্জনের পরেই কেবল বলা যাবে, ওই মানুষটির অন্তর জাগ্রত হয়েছে। অর্থাৎ ওই বান্দার কলবের হুকুম তার শরীরের অঙ্গসমূহের ওপর জারি ও বাস্তবায়িত হয়েছে।

ওযিফার গুরুত্ব

হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন, যিকিরের আসল উদ্দেশ্য বান্দার রগ ও শিরা-উপশিরা থেকে পাপের আবর্জনা বের হয়ে যাওয়া। এখনকার বেশির ভাগ সালিক দৈনন্দিন আমল পালনে অলসতা করেন। মুরাকাবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলেন, জি, পাঁচ-দশ মিনিট করে করি। চিন্তা করে দেখা দরকার, যে অন্তর নষ্ট হতে পুরো জীবন লেগেছে, সেটা তো পাঁচ বা দশ মিনিটে ঠিক হবে না। এ কারণেই প্রত্যেক সালিকের আপন আমলসমূহের ওপর গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য। আমাদের মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, যার ওযিফা নেই, তার জন্য কোনো খোশখবরি ও অবস্থার পরিবর্তনের খবর নেই। সালিকবৃন্দ মুরাকাবা তো করেন এবং মনে করেন, শায়খের দু'আতেই অন্তর জাগ্রত ও পবিত্র হয়ে যাবে। আশ্চর্যের কথা হলো, দুনিয়ার যাবতীয় কাজ আমরা নিজে নিজেই করি; কিন্তু ধর্মীয় কাজগুলো ছেড়ে দেই অপরের দায়িত্বে!

সালিকের অবস্থার ওপর শায়খের দৃষ্টি

শায়খের এটা ফরজ দায়িত্ব যে, সালিকের ওপর যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে সালিককে দিক-নির্দেশনা দেওয়া। খুব ভালোভাবে স্পষ্ট করে দেওয়া যে, তোমার এই অবস্থা রহমানী আর এই অবস্থা শয়তানী। যেহেতু শয়তানও তো বিভিন্ন অবস্থার অবতারণা করে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে যায়।

শয়তানের ভ্রমণ

একদা জঙ্গলে মোরাকাবা করছিলেন শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.)। হঠাৎ একটি আলো প্রকাশ পেল, যা চারিদিক আলোকিত করে দিল। হযরত (রহ.) যখন ওদিকে তাকালেন, তখন গায়েবী একটা আওয়াজ এল, 'হে আব্দুল কাদির জিলানী, আমি তোমার ইবাদতের ওপর এতই সন্তুষ্ট যে, তোমার ওপর থেকে আমি হিসাবের কলম ওঠিয়ে নিয়েছি। এখন তুমি যা চাও করতে পার। তোমার গোনাহ তোমার আমলনামায় আর লেখা হবে না।' আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) যখন এই কথাটি শুনলেন, তখন তিনি এই কথাকে কুরআন আর হাদীছের সামনে রাখলেন। তাঁর একটি আয়াত মনে পড়ল, যেটিতে আল্লাহ পাক আপন প্রেমাস্পদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

'হে নবী আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদত করতে থাকুন, যতক্ষণ না আপনি এই ইবাদত অবস্থাতেই লোকোত্তর হয়ে যান।'[১]

শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) ভাবলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন এমন আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তো আব্দুল কাদিরের জন্যে এটা কিভাবে সম্ভব যে, তার থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হবে! তাই তিনি বুঝে গেলেন, এটা শয়তানী চক্কর। তিনি সাথে-সাথে পড়লেন, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ শব্দগুলো শয়তানের জন্য কামানের গোলার মতো ভয়ঙ্কর। তাই যখন গোলা লাগল, শয়তান তখন পালিয়ে যেতে লাগল, কিন্তু পালানোর সময় দ্বিতীয় ফায়ার করে গেল, সে যে চরম শত্রু! সে বলল, আব্দুল কাদির জিলানী! আমি এই যুদ্ধে অসংখ্য আউলিয়াকে ধোঁকা দিয়েছি, কিন্তু তুমি বেঁচ গেলে নিজের ইল্‌মের কল্যাণে। তখন আব্দুল কাদির

---

১. সূরা হিজর, আয়াত-৯৯

জিলারী (রহ.) আবার পড়লেন, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه হে বিতাড়িত শয়তান আমি নিজের ইল্‌মের জোরে বাঁচিনি, আমি বরং রক্ষা পেয়েছি আপন প্রতিপালকেরই মেহেরবানিতে।

প্রিয় শ্রোতৃবৃন্দ, শয়তান যখন এত বড়-বড় ওলির ওপরও হামলা করতে পিছপা হয় না, তো আমরা সাধারণরা কিভাবে যিকিরে সময় দেওয়া ছাড়া শয়তানের ওপর জয়ী হতে পারব। আজ একথাটি হৃদয়ে এঁকে নিন যে, সকাল-সন্ধ্যা আমাদের মহান প্রভুর যিকির করা চাই। যেহেতু আল্লাহপাক বলেন,

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ

সকাল-সন্ধ্যা স্বীয় পালনকর্তাকে স্মরণ করতে থাক আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়।[১]

আল্লাহর যিকিরকে সেভাবেই আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নেওয়া আবশ্যক, যেভাবে আমরা খাওয়া-দাওয়া করাকে প্রয়োজনীয় মনে করি। আমি বলি, আপনি খাওয়া-দাওয়াকে ত্যাগ করুন; তারপরও কিন্তু মোরাকাবা বাদ দিবেন না।

শোওয়া অবস্থায় মোরাকাবা করা

আল্লাহপাক সহজ করে দিয়েছেন। মানুষ যদি অফিস থেকে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং বসতে কষ্ট হয়, তখন সোফায় হেলান দিয়ে মোরাকাবা করা যায়। যদি এভাবেও মোরাকাবা করা সম্ভব না হয়, তো শোওয়া অবস্থায়ও মোরাকাবা করা যায়। কেউ-কেউ বলেন, শুয়ে মোরাকাবার নিয়ত করলে চোখে ঘুম এসে যায়। আমাদের মাশায়েখবৃন্দ লিখেছেন, যে ব্যক্তি শোওয়ার পর মোরাকাবার নিয়ত করবে, যতক্ষণ পর তার ঘুম আসবে, তাকে ততক্ষণের জন্য মোরাকাবা করার সওয়াব দান করা হবে।

আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তির গোপন দরজা

সিলসিলায়ে আলিয়া নকশবন্দিয়ায় কল্‌ব স্থিরকরণের যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার মূল লক্ষ্য এটাই। আমাদের মাশায়েখবৃন্দ বলেছেন, কল্‌বের স্থিরতা আল্লাহপাক পর্যন্ত পৌঁছার গোপন দরজা। কল্‌বের স্থিরতা হলো সর্বদা বান্দার খেয়াল আল্লাহপাকের দিকে হওয়া।

---

১. সূরা আ'রাফ, আয়াত-২০৫

ইল্‌মেরও পুরস্কার, যিকিরেরও পুরস্কার

এখানে একটি ছোট্ট কথা বোঝা দরকার। আলিম ও তালিবে ইল্‌মরা মনে করে, আমরা কিতাবাদী অধ্যয়ন করতে থাকি; আমাদের পক্ষে তাই যিকির করার জন্য সময় পাওয়া যায় না। হযরত খাজা মুহাম্মদ মাসুম (রহ.) মাকতুবাতে মাসুমিয়াতে লিখেছেন, কোনো তালিবে ইল্‌ম যখন মুতা'আলাআর উদ্দেশ্যে বসবে, বসার একটু আগে সে যেন তার ধ্যান আল্লাহমুখী করে নেয়। এরপর সে যতক্ষণ মুতা'আলাআ করবে, ইল্‌মের সওয়াবও পাবে এবং তাকে যিকিরের সাওয়াবও দান করা হবে।

আল্লাহর যিকির, সর্বদা অপরিহার্য

আমাদের সর্বদা যিকির করা চাই। আনন্দে থাকি অথবা বেদনায়। যদি খুশি আর বেদনার অপেক্ষায় থেকে বলি, আনন্দের সময়টা পার করেই আবার যিকির শুরু করব। অথবা কেউ যদি বলে, জি, এখন একটু সময় খারাপ যাচ্ছে। কাজকর্মেও খুব পেরেশানিতে আছি। এসব পার হয়ে গেলেই যিকির করব। মনে রাখবেন, আপনি নিজে শেষ হয়ে যাবেন, কিন্তু আনন্দ ও বেদনার সময় শেষ হবে না। সর্বাবস্থাতেই আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত। বাস্তবতা হলো, বান্দা যদি প্রতিজ্ঞা করে নেয়, প্রতিটা মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করব, তখন তার জন্য সময় হয়ে যাবেই।

শয়তানের আশ্চর্য এক চাল

প্রায় সময় শয়তান মনে এই ধোঁকা দেয় যে, মোরাকাবা তো করবে, কিন্তু অমুক কাজটা করে নিয়েই করো। অর্থাৎ সে কাজ করতে নিষেধ করে না, বরং কাজে বাধা সৃষ্টি করে। বান্দা ওই সময়ের অপেক্ষায় থাকে। অথচ, আল্লাহপাক তার আগেই মৃত্যুদূত পাঠিয়ে দেন। এজন্যেই প্রতি মুহূর্তেই আমাদের মহান আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত।

الجھے سلجھے اسی کاکل کے گرفتار رہو

উস্কো-খুস্কো হয়ে বন্দী থাকব ওই জুলফিতেই!

আমরা যে অবস্থাতেই থাকি, যেন আল্লাহ তা'আলার স্মরণ রাখি।

گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار

لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا

আমি আছি আছে আমার এই জীবনের যন্ত্রণা

তবু তোমার স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে থাকি না!

অভিজ্ঞতালব্ধ একটি কথা

আল্লাহ্ তা'আলার যিকির অন্তরে প্রোথিত করার জন্যে শায়খের সাথে সম্পর্ক রাখা খুবই জরুরি। আমার অভিজ্ঞতা এমন যে, বান্দা যদি নিয়মমাফিক যিকির-মোরাকাবা করে যায়; তারপর যদি পুরো বছরে শুধু একদিন সে শায়খের সান্নিধ্য পায়, তার হৃদয় জাগ্রত করার জন্যে ওই এক দিনের সান্নিধ্যই যথেষ্ট।

এক ঘণ্টার সান্নিধ্যের ফয়েজ

এ অধমের প্রথম বায়আত ছিল হযরত মাওলানা সাইয়েদ যাওয়ার হোসাইন শাহ্ সাহেব (রহ.)-এর হাতে। হযরত (রহ.) ছিলেন করাচীর অধিবাসী। আর আমি তখন পড়তাম লাহোরের ফুকারা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে। পুরো বছরে মাত্র একবার মিসকিনপুর শরীফের ইজতেমায় হযরতের জিয়ারতের সুযোগ হতো। ওখানে ইজতেমাসংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যস্ততা থাকত হযরতের। সে কারণে ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের কেবল এক ঘণ্টা সময় দিতেন। এই এক ঘণ্টায় যদি কোনো ছাত্র কোনো একটি প্রশ্ন করত, তো সেই প্রশ্নের এত বিশদভাবে উত্তর দিতেন যে, পুরো ঘণ্টাই শেষ হয়ে যেত। ওই একদিনের সান্নিধ্যের প্রভাব এত কার্যকর হতো যে, পুরো বছরই আমাদের হৃদয় জাগ্রত রাখত। হ্যাঁ, আগে থেকেই যদি হৃদয়-ভূমি তৈরি করে রাখা যায়, তখন একদিনের সান্নিধ্যও যথেষ্ট হয়। আর যদি হৃদয়-ভূমি প্রস্তুত করা না থাকে, তখন কয়েক দিনের সান্নিধ্যেও কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না।

বায়আতের সাথে-সাথেই এজাযত ও খেলাফত দান

শায়খ শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দি (রহ.)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি এলেন। হযরত (রহ.) ওই ব্যক্তিকে একটা দিন নিজের কাছে রাখলেন। তাওয়াজ্জুহ্ দিলেন। তার পরের দিনই তাকে এজাযত ও খেলাফতও দিয়ে দিলেন। যারা হযরতের সান্নিধ্যে বহু বছর যাবৎ অবস্থান করছিলেন, তারা বললেন, হযরত! আমরা তো কয়েক বছর ধরে আপনার খেদমতে আছি। কিন্তু আপনার শুভদৃষ্টি পড়ল ওই ব্যক্তির ওপর! হযরত (রহ.) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। সে নিজের তেল-বাতি ঠিক করে এসেছিল। আমি কেবল তার বাতিটা জ্বেলে দিলাম। এখনকার সালিকরা তো এমন যে, তারা বলে, তেলও ঢালবেন পীর সাহেব আর বাতিও আনবেন পীর সাহেব। আমাদের জন্যে বায়আত হওয়াটাই কেবল যথেষ্ট!

শায়খের ইহসানের বদলা

মনে রাখবেন, আপনি যদি সারা জীবন শায়খের খেদমত করতে থাকেন, তবু তাঁর ইহসানের বদলা দিতে পারবেন না। তিনি যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে আপনার যোগসূত্র ও মাধ্যম। আদাবুল মুরিদীন কিতাবেও এমনই লিখেছেন। এবং বা আদব বা নসীব বে আদব বে নসীব-এও এমন লিখিত হয়েছে আমাদের মাশায়েখদের বরাতে। আমরা যার মাধ্যমেই হোক মাত্র এক কদম হলেও যদি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত হতে পারি, তার কোনো মূল্য বা বদলা হতে পারে? না, তার কোনো বিনিময় হতে পারে না।

সালিকদের ওপর শায়খের তাওয়াজ্জুহ্‌র প্রভাব

যিকিরের মাধ্যমে মানুষের চিন্তার দুর্গন্ধ ও নষ্টামী দূর হয়ে যায় এবং আহওয়াল ও বিশেষ অবস্থার প্রাপ্তি ঘটে। সূর্য তো একটাই; তারপরও সূর্যের তাপের মাধ্যমেই ফলের স্বাদ বাড়ে। ফুলের ভেতর সুন্দর রঙ তৈরি হয় এবং সবজির আকৃতি বৃদ্ধি পায়। সূর্য তো একটাই; তবু ফল তার নির্দিষ্ট অংশ পেল। ফুল আর সবজিও পেল নিজ-নিজ অংশ। তেমনি শায়খের তাওয়াজ্জুহ সকল সালিকের ওপর একসাথে পড়লেও প্রত্যেকে নিজ-নিজ আগ্রহ ও নিষ্ঠা অনুপাতেই আপন অংশ পেয়ে থাকে।

عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں
ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے

ইশ্‌কের আঘাত সবার ওপরে পড়ে তো একইভাবে
আওয়াজ তবু হয় না রে একই পাত্রের ফারাকে!

বিশ্বাসগত ব্যাধি

আমাদের সিলসিলায়ে আলিয়া নকশবন্দিয়ার অন্যতম বুজুর্গ খাজা আহমদ সাঈদ (রহ.) বলতেন, মাঝে-মধ্যে আমি আমার শহরের বন্ধুদের উদ্দেশ্যে তাওয়াজ্জুহ দেই। কিছু-কিছু হৃদয়ে ওই তাওয়াজ্জুহ পৌঁছেও যায়; কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ থাকেন, যাদের হৃদয়ে ওই নুর ও ফয়েজ টক্কর খেয়ে ফিরে আসে এবং আমি শুনতে পাই, 'আমাদের জন্যে ওই হৃদয়ে কোনো জায়গা নেই। এ মানুষগুলো আসলে আকিদাগত ফাসাদ তথা বিশ্বাসের ব্যাধিতে আক্রান্ত।

অপরাধ কার?

আমরা যদি দিলের জমিন ঠিক করে নেই, তখন আমরা যেখানেই থাকি না কেন, শায়খবৃন্দের ফয়েজপ্রাপ্ত হব। লাভ করব বিশেষ অবস্থা। আর নসীব হবে আল্লাহপাকের নৈকট্য। আপনারা সবাই একই শায়খের সাথে সম্পর্ক রাখেন। কারো বা এগারো বছর যাবৎ তাহাজ্জুদ কাজা হয়নি, কারো বা হয়নি আট বছর যাবৎ। যদি কোনো বান্দার তাকবীরে উলা নসিব না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, দোষ তার নিজেরই। না হয় আল্লাহ তা'আলা অন্যদের যেমন ইসতিকামাত বা আমলে অবিচলতা দান করেছেন, আপনি তা পেতে পারতেন। দুঃখের বিষয়, এরা সাধনাই করে না। ওযিফা ইত্যাদিকেও মনে করে খুবই মামুলি বিষয়।

শাস্তির বিভিন্ন স্তর

আমাদের মাশায়েখে কেরাম লিখেছেন, সাধারণ মুমিন শাস্তি ভোগ করে তখন, যখন সে কবিরা গোনাহয় লিপ্ত হয়। সালিকদের শাস্তি দেওয়া তখন, তারা যখন ওযিফা ইত্যাদি ছেড়ে দেয়। আর নৈকট্যপ্রাপ্তদের তখনই শাস্তি দেওয়া হয়, তাদের হৃদয়ে যখন অন্যের জন্যে সামান্য পরিমাণ হলেও আসক্তি তৈরি হয়ে যায়। তাই তো বলা হয়,

حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْن

পুণ্যবানদের পুণ্য নৈকট্যপ্রাপ্তদের পাপের মতোই!

দ্বিতীয় পাপ

দ্বিতীয় বুনিয়াদি পাপ হলো রাগ। এ পাপ প্রায় মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়। রাগ আগুনের মতো। এক ব্যক্তি জনৈক বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বলল, বুড়ো মিয়া, একটুখানি আগুন দেন না! বুড়ো মিয়া বলল, আমার কাছে নেই। সে আবার বলল, কেবল একটুখানি আগুন নিতে এসেছি। বুড়ো মিয়া তখন অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল, আরে! তুমি কি কানে শুনতে পাও না? সে আবারো বলল, বুড়ো মিয়া, আমি তো দেখছি ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকাচ্ছে। বুড়ো মিয়া বলল, আমার কথা কি বিশ্বাস হয় না তোমার? সে বলল, আমি আগুনও জ্বলতে দেখছি। তখন বুড়ো মিয়া বলল, তুমি বোকা, গণ্ডমূর্খ। তুমি আমার কথা বুঝতেই পারছ না। সে আবার বলল, এখন তো কয়লাও হতে দেখা যাচ্ছে। বুড়ো মিয়া রেগে গিয়ে বললেন, বের হও এখান থেকে। দূর হয়ে যা। তখন ওই ব্যক্তি বলল, এটাই হলো ওই আগুন, যার খবর দেওয়ার জন্যে আমি আপনার কাছে এসেছি।

তৃতীয় পাপ

তৃতীয় বুনিয়াদি পাপটা হলো মনের দাসত্ব। এই তিন পাপেরই আলাদা আলাদা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই তিন পাপের ক্ষতিকর দিকসমূহ

০ প্রবৃত্তির কারণে মানুষ তার প্রাণের ওপর জুলুম করে।

০ রাগের কারণে মানুষ অপরের ওপর অবিচার করে।

০ আর মনের দাসত্বের কারণে মানুষ ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় এবং কুফরি ও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এজন্যেই তো–

০ যার মধ্যে প্রবৃত্তিপূজা থাকবে, তার মধ্যে কৃপণতা ও লোভ বেড়ে যাবে।

০ যার স্বভাবে রাগ থাকবে, তার মাঝে আত্মশ্লাঘা কাজ করবে। অর্থাৎ, কাউকেই সে নিজের মতো মনে করবে না। নিজেকেই নিজেই বরং বড় মনে করবে।

০ যার মধ্যে মনের দাসত্বের অভ্যাস থাকবে, কুসংস্কারের প্রতি তার ঝোঁক বেড়ে যাবে। সে স্বভাবগত কুসংস্কারপূর্ণ কর্মকাণ্ড পছন্দ করতে শুরু করবে। কুসংস্কারের প্রতিনিধি হয়েই বরং জীবন যাপন করবে সে। তার সামনে কুসংস্কারের মূল উৎপাটন করা হলে সে ব্যথিত হবে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন বেদআতী বা কুসংস্কারীকে আসতে দেখবে, তখন রাস্তা পরিবর্তন করে তাকে এড়িয়ে যেও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বেদআতিকে সম্মান প্রদর্শন করল, সে যেন ইসলামের প্রাচীর ভাঙতে সাহায্য করল। আরো বলেছেন, যখন কোনো গোত্র কোনো একটা বিদআত তথা কুসংস্কারের ওপর আমল করে ফেলে, তখন তার বদলায় আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্য থেকে একটি সুন্নত উঠিয়ে নেন। কিয়ামত পর্যন্ত যে সুন্নতটি তাদের আর দেওয়া হয় না।

পাপ তিনটার পরিণাম

এই তিন পাপের পরিণাম দেখে নিন। শাহওয়াত বা প্রবৃত্তির কারণে যে সমস্ত পাপ করা হয়, তা তাড়াতাড়ি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যেহেতু প্রবৃত্তি যখন বৃদ্ধি পায়, তখন আর আকল-বুদ্ধি কাজ করে না। কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ

'সেসব মানুষের তাওবা কবুল করা আল্লাহর মর্জি ও দায়িত্ব, যারা মূর্খতার কারণে পাপ করে এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে।'[১]

তাফসীরবিদগণ এখানে লিখেন, কোনো মানুষের যখন জযবা বা শাহওয়াত বেড়ে যায়, তখন তাকে ওই সময়ের জন্যে জাহেল বা মূর্খ বিবেচনা করা হবে। তাই শাহওয়াতের কারণে যেসব পাপ হয়ে থাকে, বান্দা তার জন্যে তাওবা করে, তো আল্লাহপাক খুব তাড়াতাড়ি তা মাপ করে দেবেন।

রাগের কারণে হওয়া পাপসমূহ যেহেতু প্রায়ই বান্দার অধিকারসম্পৃক্ত হয়ে থাকে, তাই শুধু তাওবা করলেই এ প্রকারের পাপ ক্ষমা করা হবে না। বরং যার বা যাদের অধিকার হরণ করা হয়েছে, তাদের কাছ থেকেও মাফ চাইতে হবে। অথবা তাদের প্রাপ্য আদায় করে দিতে হবে। তখনই মাফ করা হবে এই প্রকারের পাপসমূহ।

আর মনের দাসত্বের কারণে হওয়া পাপগুলোকে ক্ষমার অযোগ্য বলে পরিগণিত করা হবে। এ কারণেই যেসব লোক কুফরি ও শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে, পরকালে সে অনন্তকাল ধরে জ্বলতে থাকবে জাহান্নামের আগুনে।

হিংসা এক ভয়ঙ্কর বিপদ

এই তিন পাপের সম্মিলনে যে পাপটা হয়ে থাকে, তার নাম হিংসা। এমন প্রকৃতির লোকদের মাঝে হিংসা হয়ে থাকে খুব বেশি। প্রতিটি কাজেই চলে আসে হিংসা। হিংসা এত খারাপ মসিবত যে, কারো সম্পর্কে যদি একবার তা সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন তার ভালো কাজগুলোও আর ভালো লাগে না। তার সুনাম-সুখ্যাতিও হয়ে পড়ে অসহ্য। সে যদি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যলাভের কাজ করে, তা-ও আর এর কাছে ভালো লাগবে না। মনে হবে, সে কেন এমন ভালো কাজ করছে! আল্লাহপাক মানুষের প্রকৃতিতে যত প্রকারের খারাপ অভ্যাস দিয়েছেন, তার সবকিছুর মিলিত রূপ হলো হাসাদ বা হিংসা। আল্লাহ তা'আলা সূরা ফালাকে এই হাসাদ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এভাবে,

---

১ সূরা নিসা, আয়াত-১৭

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

'আমি আশ্রয় চাই হিংসুকের হিংসা থেকে।'[১]

এভাবেই আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে হিংসা থেকে পরিত্রাণ চাওয়া শিক্ষা দিয়েছেন।

শয়তানের কুমন্ত্রণা

শয়তানের পক্ষ থেকে যে সকল আক্রমণ আসে, ওসবকে বলা হয় 'শয়তানী ওসওসা' বা শয়তানের কুমন্ত্রণা। শয়তানের মধ্যে যত ধরনের নষ্টামী আছে, তার পরিণাম বের হয় কুমন্ত্রণার আকারে। কুরআন মজিদের শেষ সূরায় আল্লাহপাক এ বিষয়টিও উল্লেখ করে দিয়েছেন। হিংসা আর কুমন্ত্রণা এমনদুটা জিনিস, যেগুলো ডেকে নিয়ে আসে মানবজাতির ধ্বংস। কুমন্ত্রণা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে আর হিংসা সৃষ্টি হয় মানুষের ভেতর থেকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই উভয় শত্রু থেকেই রক্ষা করুন। আমীন।

হিংসা থেকে সৃষ্ট খারাবি

বর্তমানে যত কারবার পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং আদালতে যত ধরনের ভিড় দেখা যাচ্ছে, তার নেপথ্য কারণ কিন্তু হিংসা-ই। এরা (বাদী-বিবাদী) প্রত্যেকেই পরস্পরে হিংসা দ্বারা আক্রান্ত। যাবতীয় কেইস-মামলাও কিন্তু করা হয় এই হিংসার কারণেই।

দৃষ্টির হেফাজত

একটি সূত্র মনে রাখবেন যে, আত্মার হেফাজতের জন্যে চোখের হেফাজত অত্যাবশ্যক। ইমামে রবানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) বলেন, মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, মনের মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে এবং পরিশেষে গুপ্তাঙ্গ তা বাস্তবায়ন করে। এজন্যেই একথাটি হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বসিয়ে নিন যে, প্রবৃত্তিজাত পাপের জন্ম চোখ থেকেই হয় সর্বদা। তাই যে ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখতে এবং বেগানা কাউকে দর্শন থেকে নিজের চোখকে হেফাজত রাখতে অভ্যস্ত হবে, সে আল্লাহ তা'আলার নিরাপত্তাবলয়ে চলে যাবে। অর্থাৎ. আল্লাহপাক তাকে কবিরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করবেন।

---

১ সূরা ফালাক, আয়াত- ৫

যিনা-ব্যভিচারের প্রথম ধাপ

মনে রাখবেন, চোখের পাপই প্রথম ধাপ। তারপরেই খুলে যায় যিনার রাস্তা। এজন্য এই প্রথম ধাপটাকেই রুখে দিতে হবে। কেউ যদি এমন বলে যে, আমি তো শুধু এদিক-ওদিক দেখিমাত্র, কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করি না। এমন হওয়াটা সম্ভবই নয়। যেহেতু চোখ যখন দেখবে, মন তখন অবশ্যই কামনা করবে। অতঃপর শরীর সে অনুযায়ী কাজ করা শুরু করে দেবে। তাই আধ্যাত্মিক পথিকের জন্যে জরুরি হলো, নিজের দৃষ্টিকে বেগানা মহিলা দর্শন থেকে বাঁচিয়ে রাখা। আমাদের মাশায়েখে কেরাম এই পর্যন্ত বলে দিয়েছেন যে,

چشم بند و گوش بند ولب بہ بند

گر نہ بینی سر حق بر ما بخند

বন্ধ রেখো চোখ বন্ধ রেখো কান বন্ধ রেখো মুখ

এরপরও যদি না দেখো গোপন রহস্য হয়ো দুর্মুখ!

আমরা এ কাজ তিনটি কিন্তু করি না। না চোখ সংযত থাকে, না কান নিয়ন্ত্রণে থাকে আর না মুখ বন্ধ থাকে। আমাদের মধ্যে যখন এই কাজ তিনটি নেই-ই, তো আমরা কিভাবে মহান আল্লাহর গোপন রহস্যভাণ্ডার প্রাপ্ত হব।

ইউসুফ (আ.) ও জোলেখা এবং দৃষ্টির হেফাজত

হযরত ইউসুফ (আ.) দৃষ্টির হেফাজত করেছিলেন বলেই আল্লাহপাক তাঁকে কামিয়াব করেন। আর জোলেখা স্বীয় দৃষ্টি সংযত রাখতে পারেনি বিধায় শয়তান তাঁকে পাপে লিপ্ত করে দিল।

মা হাওয়া (আ.)-এর ভুলের কারণ

আদিমাতা হাওয়া (আ.) যদি নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে না যেতেন, তাহলে কক্ষনো তাঁর দ্বারা ভুল হতো না। তিনি ওই বৃক্ষের দিকে গিয়েছিলেন বলেই শয়তান তাঁকে ধোঁকা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

শায়খের দৃষ্টি

জানা গেল, দৃষ্টিই হলো মানুষের অধঃপতনের কারণ। অপরপক্ষে শায়খের সুদৃষ্টিই হলো মানুষের উন্নতির সোপান।

تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

তোমার চিকিৎসা দৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়!

আমরা যখন গায়রে মাহরামদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ থেকে বিরত থাকব, তখন শায়খের দৃষ্টি আমাদের ওপর কাজ করতে শুরু করবে। আমরা যদি চোখজোড়া হেফাজতে না রেখে ওদিক-ওদিক ফেরাতে থাকি, তখন শায়খের দৃষ্টিও কিন্তু কোনো কাজ করবে না।

রূপ ও ধন-সম্পদ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ

ছাত্র ভাইয়েরা! খেয়াল করো, আল্লাহপাক দুটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দিতে আমাদের নিষেধ করেছেন। প্রথমটা হচ্ছে বেগানাদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ। এটা তো তোমরা প্রায়ই শুনে থাকো। দ্বিতীয়টা হলো, আল্লাহ যেমন তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

'হে আমার হাবীব, আপনি কাফেরদের ওই বাহ্যিক চাকচিক্য ও ধন-দৌলতের দিকে ভ্রূক্ষেপও করবেন না। যেহেতু তাদের কেবল পার্থিব জীবনের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে।'[১]

বোঝা গেল, দুটো জিনিস থেকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া চাই, এক. রূপ থেকে। দুই. সম্পদ থেকে। এগুলোই মানুষের ধংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষের দৃষ্টি রূপ ও সৌন্দর্য থেকে সরতে চায় না আর নারীদের দৃষ্টি সরতে চায় না সম্পদ থেকে। এ দুটা বিষয় খুবই আশ্চর্যজনক ফেতনা। সত্য কথা হলো, শয়তান প্রত্যেক মানুষকেই উৎসাহিত করছে। মাশায়েখে কেরাম এসব পাপকে স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যাতে এসব পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারে এবং তাওবা করা যাতে সহজ হয়।

সাধারণ নারীদের মধ্যে ইহুদিদের তিনটা বৈশিষ্ট্য

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, সাধারণ নারীদের মধ্যে ইহুদিদের তিনটা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

০ প্রথমটা হলো, নিজে জুলুম করে; কিন্তু জনসমক্ষে মজলুম সেজে যায়।

০ দ্বিতীয়টা হলো, অপরাধী হওয়ার পরেও অন্যদের বিশ্বাস করানোর জন্যে অযথা কসম খেতে থাকে।

---

১ সূরা তোয়া-হা, আয়াত- ১৩১

০ তৃতীয়টা হলো, কোনো জিনিসের জন্য অন্তরে অভিলাষ থাকার পরেও মুখে না-না করতে থাকে। মনে-মনে কামনা করে, স্বামী অমুক কাজটা করে নিক। কিন্তু মুখে না-না বলতেই থাকে। এ যেন, কাজটা যদি সঠিক হয়ে যায়, আমি চুপ থাকব। আর যদি উল্টো বা ভুল হয়ে যায়, তখন বলব, দেখলে, এজন্যেই তো কাজটার জন্য আমি কোনো পরামর্শ দেইনি।

এ অভ্যাস তিনটা ইহুদিদের মধ্যে পাওয়া যেত, যা এখন সাধারণ নারীদের মধ্যে চলে এসেছে।

নেককার মহিলার প্রতিদানে বৃদ্ধি

এই মহিলারাই যদি আবার যিকির-ফিকিরের মাধ্যমে নেককার ও সাধবী হয়ে যায়, আল্লাহপাকের কাছে তখন তাদের সম্মান অনেক অনেক বেড়ে যায়। হাদীছ শরীফে নেককার মহিলার বহু ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি এ-ও বলা হয়েছে যে, কোনো মহিলা যদি ঘরে এলোমেলো করে রাখা কোনো জিনিস বিন্যাস বা পরিপাটি করে রাখে, তার বদলায় আল্লাহপাক তাকে একটি নেকী দান করেন এবং তার একটা গোনাহ মাফ করে দেন। মহিলারা কত কত জিনিস প্রতিদিন পরিপাটি করে রাখে!

চরকার আওয়াজে আল্লাহু আকবার বলার সাওয়াব দান

সাইয়েদা আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বর্ণনা করেন, কোনো মহিলা চরকায় সুতো কাটে। আল্লাহপাক ওই চরকার আওয়াজের বদলায় ওই মহিলার আমলনামায় আল্লাহু আকবার বলার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করান। এরকম যতক্ষণ ধরে সুতো কাটবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহু আকবার বলার সাওয়াব লিখিত হবে তার আমলনামায়। আগেকার দিনে তো চরকা ছিল, এখন তো মেশিনের যুগ এসে গেছে।

স্বামীকে পোশাক ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিদান

সাইয়েদা আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) থেকে এ-ও বর্ণিত আছে , যে মহিলা নিজের কাটা সুতো দিয়ে কাপড় তৈরি করে স্বামীকে পোশাক বানিয়ে দেয়, আল্লাহপাক তাকে প্রতি সুতোর বদলায় এক লক্ষ নেকী দান করবেন। বর্তমানে ঘরে তো আর কাপড় তৈরি হয় না। তবে কাপড় কিনে এনে তো ঘরেই সেলাই করে দেওয়া যায়। অথবা যে সব স্ত্রী সেলাই কাজ জানে না, তারা যদি ভালোবাসার জোরে আনাড়ি হাতেও স্বামীকে একটি পোশাক সেলাই করে দেয়, তারাও এই প্রতিদান ও সাওয়াবের ভাগী হবে।

দেখুন, ঘরোয়া জীবনে ভালোবাসা ও প্রীতিপূর্ণ জীবন যাপন করলে কত পুণ্যের ভাগিদার হতে পারে মানবজাতি!

একটি আশ্চর্য কথা

ফকীহ আবুল্লাইছ সমরকন্দি (রহ.) একটি আশ্চর্য কথা লিখেছেন যে, যে মহিলা নামায আদায় করে; কিন্তু নিজের স্বামীর জন্য দু'আ করে না, তার নামায আল্লাহ কবুল করেন না। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, যে মহিলা নামায পড়ে তার স্বামীর জন্য দু'আ করে আল্লাহ তার নামায কবুল করে নেন।

অনেক বড় একটি ভুল ধারণা

এরকম কাজ শুধু মেয়েরা করবে তা নয়। পুরুষদের জন্যেও অনেক কাজ আছে। আজকালকার ছুফিদের মধ্যে বড় একটি রোগ দেখা যায়। তাহলো, কিছু যিকির আজকার করার পরে বাড়ি-ঘরের সব কাজ-কর্ম ত্যাগ করে দেয়। আর কাজকর্মকে তাওয়াক্কুলের বিপরীত মনে করে বসে। এটা এদের ভুল ধারণা।

ঘরের কাজ করে দেওয়া

হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর পয়গাম্বর ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্য আগুন খুঁজতে বের হলেন। তাঁর স্ত্রী অপেক্ষায় আছেন। মুসা (আ.) বলে গিয়েছিলেন,

اٰتِيْكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

'আমি তা থেকে তোমার নিকট কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা আগুনে পৌছে পথের সন্ধান পাব; [১]

যুগের পয়গাম্বর পর্যন্ত যখন নিজ স্ত্রীর জন্য আগুন খুঁজতে বের হচ্ছেন, তখন বোঝা-ই যাচ্ছে, স্ত্রীর কাজ করে দেওয়া পুরুষের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এবং এর জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও বিনিময় পাওয়া যায়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঘরের কাজ করে দিতেন। কখনো ছাগলের দুধ দোহন করে দিতেন আর কখনো আটা পিষে দিতেন।

---

১. সূরা তোয়া, আয়াত-১

দেখুন, ঘরোয়া জীবনে ভালোবাসা ও প্রীতিপূর্ণ জীবন যাপন করলে কত পুণ্যের ভাগিদার হতে পারে মানবজাতি!

একটি আশ্চর্য কথা

ফকীহ আবুল্লাইছ সমরকন্দি (রহ.) একটি আশ্চর্য কথা লিখেছেন যে, যে মহিলা নামায আদায় করে; কিন্তু নিজের স্বামীর জন্য দু'আ করে না, তার নামায আল্লাহ কবুল করেন না। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, যে মহিলা নামায পড়ে তার স্বামীর জন্য দু'আ করে আল্লাহ তার নামায কবুল করে নেন।

অনেক বড় একটি ভুল ধারণা

এরকম কাজ শুধু মেয়েরা করবে তা নয়। পুরুষদের জন্যেও অনেক কাজ আছে। আজকালকার ছুফিদের মধ্যে বড় একটি রোগ দেখা যায়। তাহলো, কিছু যিকির আজকার করার পরে বাড়ি-ঘরের সব কাজ-কর্ম ত্যাগ করে দেয়। আর কাজকর্মকে তাওয়াক্কুলের বিপরীত মনে করে বসে। এটা এদের ভুল ধারণা।

ঘরের কাজ করে দেওয়া

হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর পয়গাম্বর ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্য আগুন খুঁজতে বের হলেন। তাঁর স্ত্রী অপেক্ষায় আছেন। মুসা (আ.) বলে গিয়েছিলেন,

آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

'আমি তা থেকে তোমার নিকট কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা আগুনে পৌঁছে পথের সন্ধান পাব; [১]

যুগের পয়গাম্বর পর্যন্ত যখন নিজ স্ত্রীর জন্য আগুন খুঁজতে বের হচ্ছেন, তখন বোঝা-ই যাচ্ছে, স্ত্রীর কাজ করে দেওয়া পুরুষের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এবং এর জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও বিনিময় পাওয়া যায়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঘরের কাজ করে দিতেন। কখনো ছাগলের দুধ দোহন করে দিতেন আর কখনো আটা পিষে দিতেন।

---

১. সূরা তোয়া, আয়াত-১

সত্তর বছরের গোনাহ মাফ

হাদীছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি ঘরের জন্য কোনো জিনিস কিনে ঘরের এনে রাখে তাঁর উপর আল্লাহ এতই খুশি হয় যে, তাঁর সত্তর বছরের গোনাহ মাফ করে দেন।

মধ্যপন্থা

শরিয়ত থেকে জানা যায়, আল্লাহর দিকে যে রাস্তা গিয়েছে, সেটা বন-জঙ্গল হয়ে নয়, বরং বাজার ও গলি হয়ে সেটা গিয়েছে। মনে রাখবেন, যিকির-আযকার কাউকে লুলা-ল্যাংড়া বানায় না যে, হাত-পায়ে কাজ করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাশায়েখদের যাজায়ে খায়র দান করুন; তাঁরা আমাদের এরকম মধ্যপন্থা দেখিয়েছেন, যেটা কঠোরতা আর নম্রতার মাঝামাঝি সোজা আল্লাহর দিকে পৌঁছে গেছে।

উল্টা কাজ

গোনাহ থেকে বাঁচা এবং যিকির করা দুটোই আমাদের জন্য জরুরি। আজকাল আমরা উল্টা কাজ করে বসি। যেটা করার নয় সেটা করি আর যেটা করার সেটা করি না। আমাদের উপমা সেই রুগীর সাথে দেওয়া যায়, যার সর্দি আর নাক ভাঙার রোগ হয়েছে আর সে ওষুধ তো খায়ই না বরং আচার খায়। তার অসুখ ভালো হবে কীভাবে? নিয়মিত যিকিরের অভ্যাস করুন আর গোনাহ ত্যাগ করুন। তারপর দেখুন আল্লাহর রহমত কীভাবে আসে।

একটি ইল্‌মি সূক্ষ্ম বিষয়

একটি ইল্‌মি সূক্ষ্ম বিষয় মনে রাখুন। কুরআন মজিদে মানুষের জন্য তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এক জালেম। দুই জলুম, তিন জাল্লাম। এই তিনটির বিপরীতে আল্লাহ তা'আলার তিনিটি নাম আছে। জালেম এর বিপরীতে গাফের, জলুম এর বিপরীতে গফুর, আর জাল্লাম এর বিপরীতে গাফফার। বোঝা গেল, আমরা জুলুমের যে স্তরেই হই না কেন, আমাদের গোনাহ আল্লাহ তা'আলার রহমতের চেয়ে অধিক নয়। পালনকর্তার রহমতই বেশি। যিনি প্রত্যেক স্তরের বিপরীতে নিজের নাম বলে দিয়েছেন যে, বান্দা! তুমি যদি জালেম হও, তাহলে আমি গাফের। তুমি যদি জলুম হও, তাহলে আমি গফুর। আর তুমি যদি জাল্লাম হও, তাহলে আমি গাফফার। এসো; তওবা করো। আমি তোমার গোনাহ ক্ষমা করে দেব।

রাবেয়া বসরি ও আল্লাহর ভয়

একবার হযরত রাবেয়া বসরি (রহ.) এক জায়গায় বসা ছিলেন। পাশে এক লোক ভুনা গোস্ত খাচ্ছিল। রাবেয়া বসরি তা দেখে কান্না শুরু করে দিলেন। সেই লোক মনে করল, হয়ত ওনার খুব ক্ষিদে পেয়েছে; তাই কাঁদছেন। সে বলল, আপনিও এখান থেকে খেতে পারেন। রাবেয়া বসরি বললেন, আমি ক্ষিদের জন্য কাঁদছি না। আমি অন্য কারণে কাঁদছি। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কী কারণে কাঁদছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি এই কথা ভেবে কাঁদছি যে, আমরা এখানে যে গোস্ত ভুনা করার জন্য প্রথমে প্রাণীকে জবেহ করি। তারপর তার গোস্ত ভুনা করি। কিন্তু কিয়ামতের দিন জীবন্ত মানুষকে আগুনে ভুনা করা হবে। ভুনা মুরগি দেখে আমার কিয়ামতের দিনের কথা মনে পড়ে গেছে। সেই রাতের কথা আমার মনে পড়ে গেছে, যে রাতের সকাল হবে কিয়ামতের দিন। হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কাবাব আর ভুনা গোস্ত খেতে অভ্যস্ত। চিন্তা করুন, এখানে আমরা যে ভুনা গোস্ত খাই, তা জবেহ করার পরেই ভুনা করা হয়েছে। আমরা যদি গোনাহ করি, তাহলে ফেরেশতারা আমাদের জীবন্ত ভুনা করবে। তাই আমাদের উচিৎ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

পুরস্কার হিসেবে দুটি জান্নাত

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে বলেন,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

'আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে যে ভয় করে, তার জন্য দুটি জান্নাত।'[১]

এই দুটি জান্নাতের বর্ণনাও বড় আশ্চর্য ধরনের। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জন্য জান্নাত ও জাহান্নামে একটি করে ঘর বানিয়েছেন, মুসলমান হোক বা কাফের। মুসলমান হলে জান্নাতের ঘরে যাবে আর কাফের হলে জাহান্নামের ঘরে যাবে। তাই কাফেরদের মৃত্যুর সময় জান্নাতের ঘর দেখানো হয়। আর বলা হয়, তুমি যদি ঈমানদার হতে, তাহলে তোমার জন্য এই ঘরটি ছিল। কিন্তু তোমাকে এখন এই ঘর দেওয়া হবে না। তারপর তাকে জাহান্নামের ঘর দেখানো হয়। যেহেতু কাফেরদের জাহান্নামের ঘর দেওয়া হবে আর মুমিনদের জান্নাতের ঘর দেওয়া হবে, তাই কাফেরদের

---

১ সূরা রাহমান, আয়াত- ৪৬

যেঘরগুলো জান্নাতে অবশিষ্ট থেকে যাবে, তা মুমিনদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে ঈমানদারদের দুটি করে ঘর দেওয়া হবে। দুনিয়াতেও যদি কারো কাছে দুটি কুঠির হয়, তাহলে সে খুব খুশি হয়। একইভাবে জান্নাতেও যখন ঈমানদারদের দুটি করে ঘর হবে, তারাও খুব খুশি হবে।

ক্ষমার অপূর্ব দৃষ্টান্ত

ইয়াহয়া ইবনে আকতাম (রহ.)কে তার ইন্তেকালের পর এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল। জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কী রকম ব্যবহার করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমাকে আল্লাহর রাব্বুল ইয্যতের সামনে হাজির করা হলে আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়াহয়া, তুমি আমার কাছে কী নিয়ে এসেছ? আমি বললাম, হে আল্লাহ, আমার কাছে আমলের কোনো গাট্টি নেই; তবে আমি একটি হাদীছ শুনেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা বললেন, কোন হাদীছ? আমি বললাম, হে আল্লাহ, আমি আমার ওস্তাদ মুয়াম্মার এর কাছে শুনেছি, তিনি জুহরির কাছে শুনেছেন, তিনি উরওাহ-এর কাছে শুনেছেন, তিনি সাইয়্যিদাহ আয়েশা (রাযি.)-এর কাছে শুনেছেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন, তিনি জিবরীল (আ.)-এর কাছে শুনেছেন, তিনি আপনার কাছে শুনেছেন যে, আপনি বলেছেন, আমার যে বান্দা কালেমা পড়নেওয়ালা হবে এবং তার দাড়ি সাদা হবে, এই অবস্থায় সে আমার সামনে হাজির হবে, তার সেই সাদা দাড়ি দেখে আমার হায়া হয় (লজ্জা করে), সেই বান্দাকে আমি আজাব দেই না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি ঠিকই শুনেছ। মুয়াম্মারও ঠিক শুনেছে। জুহরিও ঠিক শুনেছে। উরওয়াও ঠিক শুনেছে। আয়েশাও ঠিক শুনেছে। আমার প্রিয়নবীও ঠিকই বলেছে। জিবরিলও ঠিক বলেছে। আমিও সত্য বলেছি। সাদা দাড়ির মুমিন দেখলে আমি সত্যিই লজ্জা পাই। ইয়াহয়া, তোমার সাদা দাড়ি দেখে আমি জাহান্নামের আগুন তোমার উপর হারাম করে দিলাম।

আল্লাহর রহমতের আশ্চর্য ঘটনা

হযরত মুসা (আ.)-এর যুগে এক বড় গোনাহগার ব্যক্তি ছিল। সে কখনো ভালো কাজ করেনি। সব সময় নফসানী খাখেশাতের মধ্যে পড়ে থাকত। দিন-রাত শয়তানের মতো শুধু গোনাহের কাজই করত। তার মনে কখনো আল্লাহর দিকে ধ্যানই যেত না। খাখেশাতে নফসানীর মধ্যেই ডুবে

থাকত। আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ.)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন, হে আমার নবী! অমুক বান্দার কাছে গিয়ে আমার সংবাদ জানাও, আমি তোমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলাম আমার বন্দেগী করার জন্য; কিন্তু তুমি আমার নাফরমানি করছ, তুমি এতই গোনাহ করেছ যে, গোনাহ তোমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, এখন আমি তোমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেছি, আমি তোমাকে ক্ষমা করব না এবং তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব।

হযরত মুসা (আ.) সেই ব্যক্তির কাছে গিয়ে বললেন, তুমি এতই গোনাহ করেছ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, হে আমার বান্দা! আমি তোমার উপর রাগ করেছি। তুমি কদমে-কদমে আমার আদেশ অমান্য করেছ এবং আমার নবীর সুন্নাত তরক করেছ। সুতরাং আমি তোমার উপর ক্ষুদ্ধ হয়েছি, আমি তোমাকে ক্ষমা করব না এবং তোমাকে আমি জাহান্নামে প্রেরণ করব।

সেই ব্যক্তি এ কথাগুলো শোনার পর তার অন্তরে আশ্চর্য ধরনের এক অবস্থার সৃষ্টি হলো। সে ভাবতে লাগল, আহ, আমি এত বড় গোনাহগার যে আল্লাহ আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং তার পয়গাম্বরকে আমার কাছে পাঠিয়ে খবর দিলেন যে, আল্লাহ আমার উপর নারাজ হয়ে গেছেন এবং আমাকে জাহান্নামে দিবেন।

এসব ভাবতে-ভাবতে সে বনের দিকে চলে গেল। একাকী বসে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করতে লাগল, হে আল্লাহ! আমি গোনাহগার তা আমি স্বীকার করছি, আমি অনেক বড় গোনাহগার, রাত দিন শুধু তোমার নাফরমানি করেছি। হে আল্লাহ! আমি অনেক বেশি গোনাহ করে ফেলেছি। কিন্তু হে আল্লাহ! আমার গোনাহ তো আপনার রহমতের চেয়ে বেশি নয়। আমার কাছে গোনাহের গাট্টি আছে ঠিক, কিন্তু আপনার কাছে তো রহমতের অসীম সাগর আছে। হে আল্লাহ! আমার গোনাহ কি আপনার রহমতের ভাণ্ডারের চেয়ে বেশি হয়ে গেল? হে আমার মাওলা! আপনি কাউকে দূরে ঠেলে দিলে তাকে কাছে টানার মতো আর কে আছে? হে অসহায়কে সাহায্যকারী! আমি আপনার দরবারে ফরিয়াদ করছি, আমাকে যেন নিরাশ না করেন। আপনার রহমত আমার গোনার চেয়ে অবশ্যই বেশি। আর আমার গোনাহ আপনার রহমতের তুলনায় কম।

শেষ পর্যন্ত সে মোনাজাতে এও বলে ফেলল যে, হে আল্লাহ! আমার গোনাহ যদি এতই বেশি হয় যে, তা ক্ষমা করা যায় না, তাহলে আমার একটি দরখাস্ত আপনি কবুল করুন যে, আপনার যত মাখলুকাত আছে

তাদের সব গোনাহ আমার মাথায় তুলে দিয়ে আমাকে জাহান্নামে দিন আর তাদের সবাইকে জান্নাতে দিন।

তার এই দু'আ আল্লাহর কাছে পছন্দ হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ.)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন, আবার যান সেই বান্দার কাছে, গিয়ে আমার বার্তা দিয়ে আসুন যে, তুমি আমার রহমতের উপর যেহেতু ভরসা করেছ; আমি তো হান্নান, মান্নান, রহীম, কারীম সুতরাং আমি তোমার সব গোনাহ ক্ষমা করে দিলাম। এমনকি তোমার সব গোনাহকে সাওয়াব দিয়ে বদলে দিলাম।

বন্ধুগণ! যে পরওয়ারদেগার এতই মেহেরবান তার মেহেরবানি আমরা এই মাহফিলে বসে পাব না কেন? নিজের গোনাহ-খাতা মাফ চেয়ে নিন। আগামীতে গোনাহ না করার পাক্কা নিয়ত করেন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে খাঁটি তাওবা করার তাওফীক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সাধারণ মানুষ আজকাল এই ভুল ধারণায় লিপ্ত আছে যে, তারা মনে করে, আধিক্যে আমার সমস্যার সমাধান আছে। সরকারে যারা আছে, তারা মনে করছে, অধিকাংশ জনগণ আমার সাথে থাকলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মালদার মনে করছে, আমার আয়ের পথ আরো বৃদ্ধি পেলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ফ্যাক্টরিওয়ালা মনে করছে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আধিক্যে সমস্যার সমাধান হয় না, বরং বরকতেই সমস্যার সমাধান হয়।

বরকত আর কাছরত। কাছরত বলা হয় আধিক্যকে। যেমন– কারো কাছে টাকা বেশি, বয়স বেশি, সন্তান বেশি হলে একে টাকা, বয়স আর সন্তানের (সংখ্যা) আধিক্য বোঝায়। আর বরকত বলা হয়, যা প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট। শব্দদুটির তাৎপর্য বোঝা দরকার।

বরকত নাকি আধিক্য (কসরত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ. سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

একটি ভুল ধারণা দূরীকরণ

আজকাল আমরা মনে করি, আমাদের সমস্যার সমাধান কাছরতের (বৃদ্ধি) মধ্যে, আমাদের কাছে মাল বেশি হলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, বয়স বেশি হলে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, সন্তান বেশি হলে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সমস্যার সমাধান আমরা দেখছি কাছরতের (বৃদ্ধি) মধ্যে, অথচ এটা আমাদের বড় একটি ভুল ধারণা। যদি বৃদ্ধিতে সমাধান থাকত, তাহলে লাখপতি-কোটিপতিদের কোনো সমস্যাই থাকত না। তারা সবচেয়ে বেশি শান্তির জীবনযাপন করতে পারত। আমরা দেখি, একজন সাধারণ কৃষক গাছের ছায়ায় আরামে ঘুমাচ্ছে অথচ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত রুমেও ধনী লোকের ঘুম আসছে না। গরীব মানুষ মাটির উপর শুয়েও আরামের ঘুম ঘুমায়, অথচ খাট-পালঙ্কেও ধনী লোকের ঘুমা আসছে না। যে ব্যক্তি শাক-ডাল দিয়ে ভাত খাচ্ছে, সে শান্তির জীবন যাপন করছে আর ইচ্ছেমতো খানা খেয়েও ধনীরা ডাক্তারের পেছনে ঘুরছে।

সমস্যা যেই সেই

বৃদ্ধি কামনা করা আজকাল সবার কাছেই যেন রুটিনে পরিণত হয়েছে। যার বেতন পাঁচ হাজার সে মনে করছে, বেতন ছয় হাজার হলে সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। যার ছয় হাজার, সে মনে করছে, সাত হাজার হলে সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। দশ হাজার হলে মনে করছে, পনেরো হাজার হলে সমস্যা দূর হয়ে যেত। যার বেতন বিশ হাজার সে মনে করছে পঁচিশ হাজার হলে দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যেত। এর জন্য দু'আও করায়। বলে, আমার বেতন বাড়ার জন্য একটু দু'আ করুন। প্রমোশন হওয়ার জন্য একটু দু'আ করুন। মনে করে, এভাবে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অথচ সমস্যা যেই

সেই থেকেই যায়। কেননা, বেতন বাড়ার সাথে-সাথে খরচের খাতও বাড়তে থাকে। এর কারণ কী? আমাদের মাশায়েখগণ এই কথাটি খুব ভালোভাবেই বুঝিয়েছেন। তাঁরা বলেন, কাছরতের (বৃদ্ধি) মধ্যে সমস্যার সমাধান নেই। আল্লাহ তা'আলা যাকে যত বেশি টাকা দেন, তাকে পেরেশানিও সেই অনুযায়ী বাড়িয়ে দেন। যেকারণে বেচারা সবসময় পেরেশানির মধ্যে থাকে।

এক ভদ্রমহিলার পেরেশানি

একবার ফায়সলয়াবাদ থেকে এক ভদ্র মহিলা এলেন। আমার স্ত্রী আমাকে বললেন, বেচারি খুব পেরেশানির মধ্যে আছেন এবং আসার পর থেকেই কাঁদছেন। তার কথা একটু মন দিয়ে শুনবেন। আমি পর্দার আড়ালে থেকে তার কথা শুনছিলাম। তিনি বলতে লাগলেন, আমার স্বামী মিল-কারখানার মালিক। ধনী লোক। অনেক টাকা-পয়সার মালিক। আমাদের বিয়ের আট বছর চললেও আমাদের ঘরে কোনো সন্তান নেই। তবে এটা আমার পেরেশানির কারণ নয়। কেননা, আমার স্বামী আমাকে নিয়ে খুশি আছেন। সন্তান না হওয়াতে তারও পেরেশানি নেই। আল্লাহ যদি কপালে রাখেন, তাহলে সন্তান হবে। আর যদি না থাকে, তাহলে আল্লাহর যা ইচ্ছা। স্বামী আমাকে অনেক পছন্দ করেন। আমাদের জীবনে ভালোবাসা আছে। ঘরের সমস্ত খরচ তিনিই বহন করেন। চাকর, বাবুর্চি, দারোয়ান, মালি সবার বেতন তিনিই দেন। টেলিফোন, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সব কিছুর বিল তিনিই দেন। গাড়ি আছে, ড্রাইভার আছে, বাগান আছে, খানা-পিনারও অভাব নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সব কিছুই দিয়েছেন। কিন্তু আমার পেরেশানির কারণ হলো, আমার স্বামী আমার ব্যক্তিগত খরচের জন্য প্রতি মাসে শুধু পঞ্চাশ হাজার টাকা দেন। তা দিয়ে আমার চলে না। এই বলে আবার কাঁদতে লাগলেন। আমার মতো পেরেশানিতে দুনিয়াতে আর কেউ হয়ত নেই। তিনি এমনভাবে কাঁদছেন, যেন কোনো নিকটাত্মীয় এন্তেকাল করেছে।

সেই মহিলাকে অধম একথা বোঝালাম যে, আপনার পেরেশানি কখনো যাবে না। আপনার স্বামী যদি আপনাকে মাসে পঞ্চাশ হাজারের পরিবর্তে এক লাখও দেন, তবুও আপনার পেরেশানি যাবে না। দুই লাখ দিলেও না। প্রতিমাসে পাঁচ লাখ করে দিলেও আপনার পেরেশানি যাবে না। তিনি খুব অবাক হয়ে বললেন, পীর সাহেব, আমার তো কিছুই বুঝে আসছে না। একটু বুঝিয়ে বলুন। অধম বললাম, আপনি যেপথে পেরেশানি দূর করতে চাচ্ছেন, সেটা সঠিক পথ নয়। সেই পথে পেরেশানি দূর হয় না। তিনি বললেন, আমি

তো চাই আমার পেরেশানি দূর হয়ে যাক। আমি বললাম, আপনার পেরেশানি দূর হোক তাই যদি আপনি চান, তাহলে শরিয়তমতো চলুন। গোনাহ ত্যাগ করুন। গোনাহের কারণে আল্লাহ নারাজ হয়ে গেলে বান্দাকে পেরেশানির মুখোমুখি হতে হয়। আগামীতে সুন্নাতমতো চলুন। আল্লাহকে রাজি করুন। আপনার সম্পদে আল্লাহ বরকত দিবেন। তখন আপনার পেরেশানি এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। আপনি চাচ্ছেন, পঞ্চাশ হাজারের পরিবর্তে আপনাকে মাসে এক লাখ টাকা করে দেওয়া হোক। কিন্তু তাতেও আপনার পেরেশানি যাবে না।

অধম একথা বলে দিলাম আর আল্লাহ তা'আলা কথার মধ্যে বরকত দিলেন। তিনি বললেন, আমি সত্যভাবে তাওবা করতে চাই। আমি তাঁকে তাওবা পড়িয়ে বিদায় দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ চার মাস পরে তিনি টেলিফোন করলেন। বললেন, আমি নামায ঠিকমতো পড়ি, বোরকা পরি, টেলিভিশন ছেড়ে দিয়েছি। আরো বললেন, বলতে গেলে এখন আমি যেন মৌলবি হয়ে গেছি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখন আমার মাসের খরচ শুধু পনের হাজার টাকা দিয়েই হয়ে যায়। বাকি টাকাগুলো আমি এতিম-অসহায়দের মধ্যে বন্টন করে দেই।

বরকতের দ্বারা সমস্যার সমাধান

সাধারণ মানুষ আজকাল এই ভুল ধারণায় লিপ্ত আছে যে, তারা মনে করে, আধিক্যে আমার সমস্যার সমাধান আছে। সরকারে যারা আছে, তারা মনে করছে, অধিকাংশ জনগণ আমার সাথে থাকলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মালদার মনে করছে, আমার আয়ের পথ আরো বৃদ্ধি পেলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ফ্যাক্টরিওয়ালা মনে করছে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আধিক্যে সমস্যার সমাধান হয় না, বরং বরকতেই সমস্যার সমাধান হয়।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর রিযিকে বরকত

আমাদের আসলাফদের (পূর্বসূরী) জীবনে বরকত ছিল। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) মাদ্রাসা থেকে মাসে তিন রুপি বেতন পেতেন। সেই যুগে ভাওয়ালপুরের নবাব সাহেব জামেয়া বানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়েছেন। তিনি ওলামায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করলেন। ওলামায়ে কেরাম বললেন, আপনি বিল্ডিং বানিয়ে দিন, তারপর আমরা আপনাকে এক

ব্যক্তির কথা বলব, যাকে এখানে নিয়ে এলে এই বিশ্ববিদ্যালয় খুব তাড়াতাড়ি আবাদ হয়ে যাবে। তিনি বললেন, ঠিক আছে, হিরা আপনারাই পছন্দ করুন; দাম আমি দেব। সম্পদের উপর অনেকটা ভরসা ছিল নবাব সাহেবের।

যখন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়ে গেল, তখন তিনি ওলামায়ে কেরামকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোন আলেমকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক বানাতে চান? তাঁরা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর নাম বললেন, যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা। নবাব সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তিনি ওখানে বেতন কত পান? ওলামায়ে কেরাম বললেন, তাঁর বেতন তিন রুপি। নবাব সাহেব বললেন, আপনারা সবাই ওনার কাছে যাবেন। আমার পক্ষ থেকে বলবেন, ওনাকে আমি এখানে থাকার সুব্যবস্থা করে দেব আর একশত রুপি বেতন দেব, ৩৩ গুন বেশি। মনে করুন, কারো বেতন আগে তিনশত ছিল এখন তাঁকে বলা হলো যে আপনার বেতন তিন লাখ করে দেওয়া হলো।

আলেমগণ বললেন, নবাব সাহেব! আমরা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যেকোনোভাবে ওনাকে এখানে নিয়ে আসব। তারা অনেক উৎসাহ ও খুশি মনে ওখানে গেলেন। মনে-মনে ভাবলেন, আমরা বলার সাথে-সাথেই উনি চলে আসবেন। তারা হযরত মাওলানা কাসেম সাহেবের কাছে গেলেন, বসলেন। বললেন, হযরত! আমরা এক বড় উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী সেই বড় উদ্দেশ্য? তাঁরা বললেন, নবাব সাহেব একটি বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়েছেন। ওখানে লাইব্রেরীর জন্য তিনি এক লাখ কিতাব সংগ্রহ করবেন। এলমের সাথে আপনার খুব মহবত আছে। এতগুলো কিতাব একসাথে অন্য কোথাও পাওয়াও যায় না। তাছাড়া ওখানে আপনাকে একশত রুপি বেতন দিবেন।

হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) তাদের কথা শুনে বললেন, আমি ওখানে কোনোভাবেই যেতে পারব না। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হযরত, কেন? হযরত জবাব দিলেন, এখন দারুল উলুমে আমার বেতন তিন রুপি। এই তিন রুপির মধ্যে আমি স্ত্রী-বাচ্চার জন্য দুই রুপি খরচ করি আর এক রুপি আমি এতিম, অসহায় ও গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেই। এই এক রুপির হকদার খুঁজতে আমাকে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। আমি যদি ভাওয়ালপুর যাই, আমার বেতন হবে একশত রুপি। তো আমার ঘরের খরচ তো দুই রুপিই থাকবে। বাকী ৯৮ রুপি গরীবদের মাঝে বণ্টন করার জন্য আমাকে তাদের খুঁজতে হবে। তাদেরকে খুঁজতেই তো আমার পুরো মাস চলে যাবে। তাই

আমি ওখানে যাব না। এমন জবাব দিলেন যে, আগত ওলামায়ে কেরাম আর কোনো কথাই বলতে পারলেন না। সুবহানাল্লাহ!

আমাদের অবস্থা

যখন আমরা কেঁদে-কেটে দু'আ করি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুটি পয়সা বাড়িয়ে দিন, তখন কী কারণ ছিল যে, একশত রুপি বেতনের চাকরী হযরত নানুতবী (রহ.) প্রত্যাখ্যান করলেন? আমাদের বেতন বাড়ানোর জন্য আমরা কান্নাকাটি করি। এভাবে পয়সাও মিলে না আর সমস্যারও সমাধান হয় না। কোথাও না কোথাও ফারাক অবশ্যই আছে। আমাদের চিন্তায় এ কথা বসে গেছে যে, কাছরতে (আধিক্যে) সমস্যার সমাধান হয়। এটা ভুল ধারণা। যতক্ষণ এই ভুল ধারণা অন্তর থেকে বের না হবে, ততক্ষণ আল্লাহর রহমত আসবে না।

একটি রুটি খাওয়ার বিনিময়

এক ধনী লোকের স্ত্রী অসুস্থ ছিল। ডাক্তার তাকে রুটি খেতে নিষেধ করেছিল। বাড়িতে রুটি তৈরি হয় কিন্তু সে খেতে পারে না। মেহমান আসে, চোখের সামনে রুটি তৈরি হয়; কিন্তু খেতে পারে না। একবার সে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিল, যে ডাক্তার আমার এরকম চিকিৎসা করতে পারে যে, আমি যেন দিনে অন্তত একবার রুটি খেতে পারি, তাহলে তাকে আমি কোটি টাকা দেব।

অপরের মুখাপেক্ষিতা

আমরা প্রত্যেক জিনিসের কাছরত (আধিক্য) কামনা করি। মনে করি, আহ যদি একশত বছর পর্যন্ত বয়স পেতাম। আচ্ছা, আল্লাহ তা'আলা যদি একশত বছর বয়স দেন আর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই যদি হাঁটুর ব্যথা শুরু হয়, তাহলে বাকি পঞ্চাশ বছর কীভাবে কাটবে? অনেকের তো পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই এমন অবস্থা হয় যে, রুকু থেকে উঠতে ছামিয়াল্লাহু এর স্থানে ওহ আল্লাহ! চলে আসে। তিনি বয়স চেয়েছিলেন ১০০ বছর। কিন্তু পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই জোড়ায়-জোড়ায় ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। বাকি পঞ্চাশ বছরের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে গেল। কেউ বয়স চাইলেন একশত বছর; কিন্তু সত্তর বছরের মধ্যে প্যারালাইসিস হয়ে গেল। নিজের ছতর ঢাকতেও অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তো একশত বছর দিয়ে কী করবে? বোঝা গেল, আধিক্যে সমস্যার সমাধান হয় না; বরং বরকতেই সমস্যার সমাধান হয়।

হযরত মুরশিদে আলম (রহ.)-এর স্বাস্থ্যে বরকত

হযরত মুরশিদে আলম (রহ.)কে আল্লাহ তা'আলা এমন স্বাস্থ্য দিয়েছিলেন যে, আমাদের মতো মানুষ তাঁর সামনে যেন অনেক দুর্বল। নবই বছর বয়সেও চোখের দৃষ্টি এত ভালো ছিল যে, যখন চিঠি পড়ার প্রয়োজন হতো, তখন চোখ থেকে চশমা খুলে পড়তেন। কাছে দেখার দৃষ্টি খুবই ভালো ছিল। নবই বছর বয়সেও শোনার জন্য কানে কোনো মেশিন ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়নি। রুমের কোনায়ও যদি কেউ চুপে-চুপে কথা বলত, তাহলে তাও হযরত শুনে ফেলতেন। নবই বছর বয়সেও হযরতের একটি দাঁতও পড়েনি। শরীরে শক্তি এমন ছিল যে, কখনো আমাদের ঘাড়ের উপর হাত রাখলে আমরা ভারী মনে করতাম এবং বসে যেতাম। মাঝে-মাঝে মজমাতে বলতেন, আমার বয়সের কেউ কি আছেন? অধিকাংশ সময় তাঁর বয়সী কাউকেই পাওয়া যেত না। আর কখনো পাওয়া গেলেও খুব দুর্বল, চোখে দেখেন না বা কানে শোনেন না, কোমরের ব্যথায় কুঁজো হয়ে গেছেন এমন লোক পাওয়া যেত। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, হযরতের ডায়াবেটিস রোগ ছিল।

অজুর হেফাজত

আমাদের হযরত (রহ.) রমজান মাস মিরাতেই কাটান। একবার তিনি ইফতার করলেন, খানা খেলেন। খাওয়ার পর মসজিদে গেলেন। এশার নামাযও মসজিদে পড়লেন, লম্বা তারাবী পড়লেন। নামাযের পর কয়েকজন কারী সাহেব এসেছিলেন। তাদের কেরাত শুনলেন। একটি জায়নামাযের বিষয়ে এমন কথা সেখানে প্রচলিত আছে যে, সেই জায়নামাযে ৩৬ বছর পর্যন্ত কোনো দিন কেরাত আটকেনি। অনেক কারী সাহেব কেরাত শোনাতে আসতেন। হযরত তো কুরআনের আশেকই ছিলেন। তিনি নফলের নিয়তে পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। এই অবস্থাতেই সাহরীর সময় হয়ে গেল।

মসজিদেই সাহরীর ব্যবস্থা হলো। হযরত সবার সাথেই খানা খেলেন। খানার পর আমরা অজু করতে চলে গেলাম। অজু করে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। আমরা হযরতকে বললাম, হযরত এখনো ফজরের আযানের সময় আধা ঘণ্টা আছে। আপনি কি অজু তাজা করবেন? বললেন, আমার অজু এত কাচা নয়। ডায়াবেটিসের রুগী হয়েও মাগরিবের পরে খানা খেয়ে অজু করে ফজরের সময়ও বলছেন, আমার অজু এত কাচা নয়। একই অজুতে ফজরের নামায আদায় করেছেন। তারপর একই অজুতে কুরআনের দরস দিলেন।

এশরাকের সময় হলে একই অজু দিয়ে এশরাক আদায় করলেন। তারপর হোটেলে এসে অজু তাজা করলেন।

স্বাস্থ্যের মধ্যে বরকত

এই অধম একবার হযরত মুরশিদে আলম (রহ.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হযরত আপনার এই বয়সেও এরকম স্বাস্থ্যের বিষয়টা আমার মাথায় আসে না। এই বিষয়ে কি একটু আমাদের বলবেন? তিনি বললেন, একবার আমি শবেকদর পেয়েছিলাম, আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ, আমার হায়াতে বরকত দিন। এটি সেই দু'আর বরকত যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে শেষ বয়সেও এরকম স্বাস্থ্যবান রেখেছেন।

সম্মানিত শ্রোতৃবৃন্দ, আপনারাই বলুন, আমাদের কি কাছরত (আধিক্য) দরকার, নাকি বরকত দরকার? যদিও সত্তর বছরের হায়াত হোক, তা এমন হোক যেন কারো সাহায্যের প্রয়োজন না হয় এবং আল্লাহর এবাদতে কষ্ট না হয়।

হায়াতে বরকতের আশ্চর্য ঘটনা

একবার আমরা কাজাকিস্তান গিয়েছিলাম। আমাদের সাথে আমেরিকার কয়েকজন বন্ধুও ছিল। এক বাড়িতে আমাদের দাওয়াত ছিল। সেখানে আমাদের জন্য খাসি ভুনা করা হয়েছিল। ভুনা খাসিস তো খেতে ভালোই লাগে; কিন্তু চর্বিযুক্ত ছিল। আজকাল তো যুবকরা পর্যন্ত চর্বি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। তাছাড়া ডাক্তারও নিষেধ করেন চর্বি খেতে। আমরা বেছে-বেছে চর্বি বাদ দিয়ে শুধু গোস্ত খাচ্ছিলাম। আমাদের সাথে এক বয়স্ক আলেম এসে বসলেন। তাঁর বয়স সম্ভবত ৯৫ বছর। তিনি বেছে-বেছে শুধু চর্বিই খাচ্ছিলেন। আমরা যে চর্বি বেছে-বেছে রেখে দিচ্ছিলাম, তিনি তাও খেয়ে ফেলছেন। আমরা তা দেখে অবাক হচ্ছিলাম, তিনি এত চর্বি কেন খাচ্ছেন? তিনি চামচ দিয়ে ঝোল থেকেও বেছে-বেছে চর্বি তুলে-তুলে খেতে শুরু করলেন। ভুনা খাসির চর্বিও খাচ্ছেন আবার ঝোলের মধ্যে থাকা চর্বিও চামচ দিয়ে তুলে খাচ্ছিলেন। হায় আল্লাহ, এখন তো আমাদের ছবরের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি তাঁর সাথে সালাম-কালাম আগেই করেছিলাম; এখন একটু কথা বাড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বয়স কত হয়েছে? তিনি বললেন, ৯৫ বছর। আমি বললাম, আশা করি শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক থাকে? তিনি

বললেন, এই ৯৫ বছর বয়সে আমি কোনো দিন একটি ট্যাবলেটও খাইনি আর কোনো দিন ডাক্তারের কাছেও যাইনি। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এটিই হায়াতের বরকত।

কোটিপতি মানুষদের ঋণ

আল্লাহ তা'আলা যখন সম্পদের মধ্যে বরকত দেন, তখন সম্পদ বেশি হোক বা কম হোক তা দিয়ে প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। আপনারা দেখে থাকবেন, অনেক গরীব মানুষ অল্প বেতনে চাকরি করে। পাঁচ সাতজন সন্তান নিয়েও আরামে চলছেন। কারো কাছে দেনা নেই। আবার অনেক কোটিপতি আছে, ব্যাংক এর কাছে যারা অনেক টাকা ঋণ আছে।

হযরত আবুহুরাইরা (রাযি.)-এর স্মৃতিশক্তিতে বরকত

আজকাল স্মৃতিশক্তি আছে; তবে তাতে বরকত নেই। আমাদের আসলাফদের (পূর্বসূরী) স্মৃতিশক্তিতে আল্লাহ তা'আলা বরকত দিয়েছিলেন। একবার মারওয়ান ইবনে হাকাম ভাবলেন, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বেশি হাদীছ বর্ণনা করেন; তাঁর কাছ থেকে কিছু হাদীছ শোনা যাক। তিনি এই উদ্দেশ্যে হযরত আবুহুরাইরা (রাযি.)কে দাওয়াত করলেন। যেখানে বসে হযরত হাদীছ বর্ণনা করবেন, তার পাশে পর্দার আড়ালে দুই ব্যক্তিকে কাগজ আর কলম দিয়ে বসিয়ে দিলেন আর বললেন, আমরা কিছু হাদীছ শুনব, তোমরা তা লিখে ফেলবে। আরও দুই ব্যক্তিকে তাদের সহযোগিতা করার জন্য ঠিক করে দিলেন, যাতে ভুল লেখা না হয়। হযরত আবুহুরাইরা (রাযি.) সেই মজলিশে ১০০ হাদীছ শোনালেন। তারপর চলে গেলেন।

এক বছর পর হযরতকে তিনি আবার দাওয়াত দিলেন। খাওয়ার পরে আবার আগের মতো বসালেন। গত বছর যে দুই ব্যক্তিকে লিখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাদের এবারও বললেন যেন লিখে নেন। তারপর হযরত আবুহুরাইরা (রাযি.)কে বললেন, আমরা সেই হাদীছগুলো শুনতে চাই, যেগুলো গত বছর শুনিয়েছিলেন। হযরত আবুহুরাইরা (রাযি.) সেই একশত হাদীছ শোনালেন, যেগুলো গত বছর শুনিয়েছিলেন। লেখকদুজন তাদের আগের লেখার সাথে মিলিয়ে দেখলেন, কোথাও একটি অক্ষরও বেশ-কম হয়নি।

এটি স্মৃতিশক্তির বরকত। অথচ তিনি মুসলমান হয়েছিলেন খায়ববারের যুদ্ধের পরে এবং প্রথম-প্রথম তিনি ভুলে যেতেন। একবার তিনি হযরত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে প্রিয় নবী! আমি তো ভুলে যাই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চাদর বিছাও। তিনি চাদর বিছালেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে ইশারা করলেন, যেন তাতে কিছু ঢেলে দিচ্ছেন। তারপর কাপড়টাকে এমনভাবে গুটালেন, যেন গাট্টি বাঁধা হয়। হযরত আবুহুরাইরা (রাযি.) বলতেন, আমি মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুই বরতন (প্লেট) ইল্‌ম অর্জন করেছি। এটি সেই বরকত, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্মৃতিশক্তিতে দিয়েছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আবি দাউদ (রহ.)-এর স্মৃতি

স্মৃতিশক্তির এই বরকত আল্লাহ তা'আলা মুহাদ্দিছীনে কেরামকে দান করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আবি দাউদ (রহ.) একবার স্পেন গিয়েছিলেন। একজন মুহাদ্দিছের ছেলে হিসেবে সেখানকার ওলামায়ে কেরাম তার কাছ থেকে হাদীছ শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মাহফিল চলছিল আর তিনি হাদীছ শোনাচ্ছিলেন। সেই মাহফিলে তিনি ৩৫ হাজার হাদীছ শুনিয়েছিলেন।

ইমামুল আছাল (রহ.)-এর স্মৃতি

ইমাম আছাল (রহ.) রেজালুল হাদীছ-এর অন্তর্ভুক্তদের মধ্যে গণ্য হতেন। তিনি বলেন, কুরআনে কারীমের কেরাত ও তাজবিদ সম্পর্কে আমার ৫০ হাজার হাদীছ মুখস্থ আছে।

হযরত আবু জুর'আহ (রহ.)-এর স্মৃতিশক্তি

আবু জুর'আহ (রহ.) একজন মুহাদ্দিছ ছিলেন। তাঁর মাহফিলে একজন শাগরেদ নিয়মিত আসতেন। তাঁর নতুন শাদি হয়েছে। একদিন মাহফিল একটু লম্বা হওয়াতে তার বাড়ি পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। দেরি হওয়ার কারণে তার স্ত্রী তার উপর রেগে গেল। বলল, আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। তুমি এত দেরি করলে কেন? তিনি বললেন, আজ মাহফিল একটু বেশি সময় চলছে। তাই আসতে দেরি হলো। সময় তো আর ব্যর্থ নষ্ট করিনি; আমার হযরতের কাছেই ছিলাম। স্ত্রী তো এমনিতেই রাগের মধ্যে ছিল। বলল, তোমার হযরত কিছুই পারেন না আর তুমি কী পারবে? ওস্তাদ সম্পর্কে এরকম কথা শুনে যুবকেরও রাগ উঠে গেল। নওজোয়ানেরা তো এমনিতেই গরমের মধ্যে থাকে। একটুতেই আগুন ধরে যায়,

দেয়াশলাইয়ের মতো। একটু ঘষা দেওয়ার সাথেই-সাথেই জ্বলে ওঠে। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়ও যুবতী মেয়েদের দিকে তাদের চোখ যায় আর শাহওয়াতের আগুন জ্বলে ওঠে।

মূল কথায় আসি। স্ত্রীর কথা শুনে যুবকের মাথায় রাগ উঠে গেল। বলল, আমার ওস্তাদের যদি এক লক্ষ হাদীছ মুখস্থ না থাকে, তাহলে তুমি তিন তালাক। দুজনই রাগের অবস্থায়। চিন্তা না করেই বলে ফেললেন কথা। সকালে যখন রাগ কমেছে, তখন ভাবলেন, আমরা তো অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি। স্ত্রী বললেন, তালাক তো শর্তসাপেক্ষে দিয়েছিলেন, তালাক হয়েছে কিনা বলুন। তিনি বললেন, এটা তো ওস্তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে। স্ত্রী বললেন, যান; তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে আসুন। যুবক তার ওস্তাদের কাছে গেলেন। রাতের ঘটনা খুলে বলে জিজ্ঞেস করলেন, এখন বলুন তালাক হয়ে গেছে, নাকি হয়নি। ওস্তাদ শুনে হাসলেন। বললেন, যাও; স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করো। এক লক্ষ হাদীছ আমার কাছে এমনভাবে মুখস্থ আছে যেমন মানুষ সূরা ফাতেহা পড়ে। সুবহানাল্লাহ! এটি স্মৃতিশক্তিতে বরকতের কারণে হয়ে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ইবাদাতের প্রতি আগ্রহ

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন, একবার আমি মিনা বাজারে ছিলাম। তখন আমি যুবক। এক বৃদ্ধ আমাকে দেখে বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার দাওয়াত কবুল করুন। আমি দাওয়াত কবুল করলাম। বৃদ্ধ লোকটি সাথে-সাথেই তার গাড়ি থেকে কিছু খানা বের করে দস্তরখানে রাখলেন, বললেন খান। আমি খেতে লাগলাম। বুড়া মিয়া কিছুক্ষণ আমাকে দেখলেন। তারপর বললেন, মনে হচ্ছে, তুমি কুরাইশ বংশের? আমি বললাম, হ্যাঁ। আপনি কীভাবে বুঝলেন? বললেন, কুরাইশরা দাওয়াত দিতে আর গ্রহণ করতে নিঃসঙ্কোচ হয়ে থাকে। আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন।

আহারের মাঝে আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, আপনার বাড়ি কোথায়? তিনি বললেন, আমার বাড়ি মদিনা। হজ্জ করতে এসেছি। ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমি তার কাছে ইমাম মালেক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বুড়ো ইমাম মালেক সম্পর্কে অনেক কিছু শোনালেন। ইমাম মালেক সম্পর্কে আমার এত আগ্রহ দেখে তিনি বললেন, আপনি কি ইমাম মালেক-এর সঙ্গে দেখা করতে চান? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এই যে হলুদ রঙের উটটি দেখছ, তুমি চাইলে এটিতে চড়ে মদিনা যেতে পার। আমিও আগামী

কাল যাব বলে ভাবছি। তিনি উটটি আমাকে দিলেন। পরদিন আমরা রওনা দিলাম। মদিনা পৌঁছতে আমাদের ষোল দিন লেগেছে। এই ষোল দিনে আমি ষোলবার কুরআন মজীদ খতম দিয়েছি। আজকাল অনেকেই বলেন, এক দিনে এক খতম কীভাবে দিলেন?

দৈনিক ত্রিশ পারা তেলাওয়াত

মাত্র কিছু দিন আগের কথা শুনুন। হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহ.) 'ইয়াদে আইয়ামে'-এ নিজে লিখেছেন, যখন আমি তারাবীহ পড়াতাম, তখন তারাবীতে যে পারাটি পড়া হবে সেটি আমি দিনের বেলা ত্রিশবার পড়তাম। এভাবে দিনে একবার কুরআন খতমের বরাবর পড়া হয়ে যায়। এটা তো মাত্র কিছু দিন আগের কথা। তাঁকে আমি গোনাহগার নিজের এই চোখে দেখেছি।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নজিরবিহীন স্মৃতিশক্তি

আজকাল তো হাজী সাহেবগণ আট দিন মসজিদে নববীতে কাটিয়ে আসেন। কিন্তু একটি কুরআন খতম দিয়ে মাহবুবকে হাদিয়া দিয়ে আসেন না। গাফলতের আজ এই অবস্থা। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যখন আমি মসজিদে নববীতে পৌঁছলাম, তখন দেখলাম এক বৃদ্ধ নামাযের পরে একটু উঁচু জায়গায় বসেছেন। তিনি একটি চাদর পরেছেন আরেকটি চাদর শরীরে জড়িয়েছেন। তিনি যখন قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ বলতে লাগলেন, তখন আমি বুঝে নিলাম, ইনিই মালেক (রহ.)। সেদিন মালেক (রহ.) হাদীছ লেখাচ্ছিলেন। আমার কাছে এমন কিছুই ছিল না, যাতে আমি লিখব। আমি হাদীছ শুনছিলাম। আমার সামনে খড়কুটার মতো কিছু একটা আমি পেলাম আর তা দিয়ে আমার হাতের তালুতে লেখার মতো করছিলাম। অন্যরা কাগজ-কলমে লিখছিল। মাঝে-মাঝে আমি সেই খড়টাকে নিজের মুখের সাথে লাগাতাম, যেন কলমে কালি লাগানো হয়।

ইমাম মালেক (রহ.) ১২৭টি হাদীছ সেই মজলিসে লেখালেন। আগামী নামাযের সময় হলে তিনি হাদীছ লেখানো বন্ধ করলেন। আমি যেহেতু তাঁর কাছেই ছিলাম, তাই আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল। তিনি আমাকে ইশারায় ডাকলেন। আমি কাছে এলে তিনি বললেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি বললাম, মক্কা মুকাররমা থেকে। আমার নাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি হাতের মধ্যে কী লিখছিলেন? বললাম, হাদীছ

শরীফ লিখছিলাম। বললেন, দেখান। তিনি আমার হাত দেখলেন, কিন্তু তাতে কিছুই দেখা গেল না। বললেন, এখানে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমি বললাম, আমি তো মুখে আঙুল ভিজিয়ে তা দিয়ে লিখছিলাম। তিনি বললেন, এটা তো হাদীছে আদবের পরিপন্থী। আমি বললাম, হযরত, আসলে আমি মুসাফির মানুষ। আমার কাছে কাগজ-কলম নেই। আমি প্রকাশ্যে লেখার একটি আমল করছিলামমাত্র। আসলে আমি হাদীছগুলো আমার অন্তরে লিখছিলাম।

ইমাম মালেক (রহ.) বললেন, আপনার কথা তখনই সত্য হতে পারে, যখন আপনি সেই হাদীছগুলো থেকে দশটি মতন আর ছনদসহ শোনাতে পারবেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আমি প্রথম হাদীছ থেকে শোনাতে শুরু করলাম। একে-একে আমি ১২৭টি হাদীছ মতন, ছনদ আর সেই ধারাবাহিকতার সাথে শোনালাম। এটি স্মৃতিশক্তিতে বরকতের কারণে হয়ে থাকে। একবার শুনেই হাদীছ মুখস্থ হয়ে যেত।

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর স্মৃতিশক্তি

নিকট অতীতেও আমাদের পূর্বসূরী ওলামায়ে দেওবন্দের স্মৃতিশক্তিতে আল্লাহ তা'আলা অনেক বরকত দিয়েছিলেন। একবার শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদ হাসান (রহ.) তাঁর শাগরেদ বললেন, বর্ষার মৌসুম শেষ হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির আর্দ্রতা কারণে কিতাবের মধ্যে কখনো-কখনো পোকা আসতে পারে। তাই কিতাবগুলো একটু রোদে শুকালে ভালো হয়। ভালোভাবে শুকানোর পরে আবার ভিতরে রেখে দেব। কিতাবের কোনো পাতা যদি নষ্ট হয়েছে দেখা যায়, তাহলে তাও ঠিক করে দিতে হবে। শাগরেদ কিতাব শুকানোর কাজে লেগে গেল।

সেযুগে অনেক বেশি কিতাব সংরক্ষণ করা হতো। শাগরেদ একটি কিতাব বের করে বলল, হযরত, এই কিতাবের পাঁচ-ছটি পৃষ্ঠা পোকা খেয়ে ফেলেছে। হযরত বললেন, সেই স্থানে পাঁচ-ছটি সাদা কাগজ লাগিয়ে দাও। শাগরেদ তাতে পাঁচ-ছটি সাদা কাগজ লাগিয়ে দিল। শুকানোর পরে জিজ্ঞেস করল, হযরত এখন কী করব? হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) বললেন, যে লেখাগুলো নেই সেখানে তা লিখে দাও। শাগরেদ বলল, হযরত এই কিতাব তো আমি এক বছর আগে পড়েছি। এখন মুখস্থ নেই। হযরত বললেন, এক বছর আগের পড়া কিতাব মুখস্থ নেই? আচ্ছা বলো কোন কিতাব? শাগদের বলল, মাইবুজি। এই কিতাবটি ছোট হলেও অনেক শক্ত কিতাবগুলোর মধ্যে

একটি। হযরত বললেন, কোথায় থেকে নষ্ট হয়েছে বলো। শাগরেদ একটি শব্দ পড়ে বলল, এর পর থেকে আর নেই। হযরত (রহ.) তার পর থেকে বলে গেলেন আর শাগরেদ তা লিখে নিল। এটা ইল্‌মের বরকত। কিতাব পড়ে অনেক বছর আতিবাহিত হয়ে গেলেও তা মুখস্থ থাকত।

এক দিনারের বরকত

জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) এর এক মুরিদ পেরেশান হয়ে হযরতকে বললেন, হযরত, আমার হজ করার খুব ইচ্ছা; কিন্তু সম্বল কিছুই নেই। হযরত তাঁকে বললেন, হজে যাও, আমার কাছ থেকে এই দিনারগুলো নিয়ে যাও। সে বলল, ঠিক আছে। হযরতের কাছ থেকে দিনার নিয়ে সে হজের উদ্দেশ্যে বের হলো। গ্রামের শেষ মাথায় যখন পৌঁছল, তখন একটি কাফেলার সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। সালামের পর কথা বলে জানতে পারল, তারাও হজে যাচ্ছে। সে বলল, আমিও হজে যাচ্ছি। তবে আমি হেঁটেই যাব। কারণ আমার কাছে বাহন নেই। তাঁরা বলল, আমাদের এক সাথী পথে অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে সে পেছনে রয়ে গেছে, তার উটটি আমাদের সাথে খালি আছে। তুমি তাতে চড়ে আমাদের সাথে আসতে পার।

সে উটের উপর বসে আমাদের সাথে চলতে লাগল। এখন যেখানেই কাফেলা থামে, খানা- পিনা খায়, সেখানে মেহমান হিসেবে তাকেও খাওয়ায়। এভাবে তাদের সাথে তাদের খরচেই সে পুরো হজ করে তাদের সাথেই গ্রামে ফিরে এল। কোথাও তার একটা পয়সাও খরচ করার প্রয়োজন হয়নি। শায়েখের সামনে হাজির হয়ে বলল, হযরত! আশ্চর্য এক হজ করেছি। মেহমান হয়ে হজ করেছি আবার গ্রামে পৌঁছেও গেছি। হযরত (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি টাকা-পয়সা খরচ হয়েছে? সে বলল, না; আমার এক টাকাও খরচ হয়নি। শায়েখ বলেলন, আমার দিনার ফিরিয়ে দাও।

আল্লাহওয়ালাদের এক টাকাও খরচ হয় না। এমনভাবে বরকত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা টাকা খরচ না করিয়েই কাজ সমাধা করে দেন। এটা মালের বরকত, যা আল্লাহ তা'আলা দিয়ে থাকেন।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত খাজা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক (রহ.) চৌক কুরাইশী নিজেকে বকওয়াল বলতেন। অনেক বড় শায়েখ ছিলেন। তিনি এই ঘটনা মসজিদে

বসে অজুর সাথে শুনিয়েছিলেন আর এই অধম মসজিদে বসে অজুর সাথে শুনেছি। এখন মসজিদে বসে অজুর সাথে আপনাদের শোনাচ্ছি পুরোপুরি দায়িত্ব নিয়ে। শব্দে একটু পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু মর্মে একটুও পরিবর্তন হবে না। এটি রেওয়ায়েত বিল মাফহুম, তবে শব্দ নিজের।

তিনি বলেছিলেন, আমি শায়েখের ছাগল চরাতাম আর আল্লাহ আল্লাহ করতাম। ছাগলগুলো নিজেরাও চরতো আর আমিও ঘাস কেটে সেগুলো খাওয়াতাম। সন্ধ্যায় যখন ছাগলগুলো নিয়ে আসতাম, তখনো কিছু ঘাস আমি মাথায় করে আনতাম। আমার বন্ধুবান্ধবরা শায়েখের মজলিসে বসতেন আর আমি ছাগল চরাতাম।

একবার হযরত খাজা ফজল আলী কুরাইশীর কাছে আল্লাহর ইশারা হলো, তুমি আব্দুল মালেককে খেলাফত দিয়ে দাও। তিনি বললেন, যখন খেলাফত দিয়ে দেওয়া হলো, তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম যে, আমি তো এর উপযুক্ত নই। এক-দুই ঘণ্টা শুধু কাঁদতেই ছিলাম। অন্যান্য খলীফাগণ এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন একটি দায়িত্ব দিয়েছেন, তখন তা বহন করার শক্তিও দিবেন। তিনি বলেন, আমি মনে-মনে সংকল্প করে ফেললাম যে, আমি তো এর উপযুক্ত নই, তবুও যেহেতু হযরত আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন, আর কাউকে সেটা দেওয়ার মতো যোগ্যতা রাখিনা, তাই আমি কাউকে বাই'আত করব না। এভাবে হযরতের খেদমতে এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল।

একবার শীত মৌসুমে তিনি আগুন পোহাচ্ছিলেন। আমার দিকে গোস্বার সাথে দেখলেন। হযরতের এরকম দৃষ্টি দেখে আমার অবস্থা তো কাহিল, যেন আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হযরত সব ঠিকঠাক আছে তো? তিনি বললেন, এইমাত্র কাশফের মাধ্যমে আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেছি। তিনি বলেছিলেন, আব্দুল মালেককে বলো, সে যেনো তাকে দেওয়া নিয়ামত মানুষের মধ্যে বণ্টন করে। তা নাহলে আমি তার নিয়ামত ছিনিয়ে নেব। এই আদেশ যেহেতু মাহবুবের পক্ষ থেকে এসেছে, তুমি আর দেরি করো না। রাতের আঁধার শেষ হওয়ার আগে-আগে বিছানাপত্র নিয়ে বাড়িতে চলে যাও। সেখানে গিয়ে মানুষজনকে আল্লাহ-আল্লাহ শিখাও। আমি তো কাঁদতেই ছিলাম, হযরত নিজেই আমার ছামানপত্র এনে আমার মাথায় রেখে বললেন,

যাও; বাড়িতে চলে যাও। আমি বললাম, হযরত আমি এখন কোনো কাজের নই। এত বছর যিকির-আযকারে কাটিয়ে দিয়েছি। দুনিয়ার কোনো কাজই শিখিনি। আমার জন্য আপনি রিযিকের দু'আ করুন। তিনি বললেন,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।[১]

আমার আত্মীয়-স্বজনেরা আগে থেকেই আমাকে বিয়ে করাবেন বলে এক আত্মীয়র মেয়ে ঠিক করে রেখেছিলেন। সুতরাং বাড়িতে আসতেই তাঁরা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন। বিয়েও আশ্চর্য ধরনের হয়েছে। বিয়ে তো হয়েছে, তবে খাওয়ার জন্য কোনো কিছুই আমাদের ঘরে প্রায় সময় থাকত না। স্ত্রীও আলহামদুলিল্লাহ খুব ধৈর্যশীলা ছিলেন। সে বলত, আপনি গাছের পাতা নিয়ে আসুন; সেটাই খাব। আমি গাছের পাতা নিয়ে আসতাম আর দুজনে তা খেয়ে কাটিয়ে দিতাম।

একদিন আমার এক পীরভাই আমাদের বাড়িতে এলেন। তিনি হযরত (রহ.)-এর ওখানে গিয়েছিলেন। যখন সে ওখান থেকে ফিরছিল, তখন হযরত (রহ.) তাঁকে দশ কিলো ওজনের একটি গমের থলে দিয়েছিলেন। সাথে একটি চিঠি দিয়ে বলছিলেন, এগুলো আব্দুল মালেকের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ো। তিনি দুপুরের সময় আমাদের বাড়িতে পৌঁছলেন। দরজার কড়া নাড়লেন। আমি খুলে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলাম। তারপর বললাম, কোথায় যাবেন। তিনি বললেন, খানকা শরীফে। আসলে তিনি মনে করেছেন কোথা থেকে আসছেন তা আমি জিজ্ঞেস করেছি। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম একটা আর তিনি উত্তর দিলেন অন্য। আমি তাঁকে বসতে দিলাম। ভাবলাম, খানকা শরীফ যাচ্ছেন আর ওখানের জন্য এই গম নিয়ে যাচ্ছেন। ঘরে এসে স্ত্রীকে বললাম, মেহমানের জন্য কিছু খানাপিনা দাও। সে বলল, ঘরে তো কিছুই নেই।

স্ত্রীও বুদ্ধিমতী ছিলেন। বললেন, ওনি খানকা শরীফের লঙ্গরখানার জন্য গম নিয়ে যাচ্ছেন, তার অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে কিছু নিয়ে আসেন, আমি তা পিষে রুটি বানিয়ে দিচ্ছি। এতে শরমের কী আছে? যান; গিয়ে বলে দেখুন। আমি তার কাছে এসে বললাম, ভাই! যদি অনুমতি হয়, তাহলে এই

---

১ সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৩

গম থেকে কিছু গম নিয়ে আপনাকে রুটি বানিয়ে দেই। তিনি মনে করেছেন, গম এ বাড়িতেও আছে; তবে হযরতের দেওয়া গম তাই আমি বরকতের জন্য এই গম থেকেই রুটি বানাতে চাচ্ছি। তিনি বললেন, ঠিক আছে নিন। আমি সেখান থেকে কিছু গম নিয়ে স্ত্রীকে দিলাম। সে তা পিষে রুটি বানিয়ে দিল।

খানার পরে মেহমানকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। ঘুম থেকে উঠে তিনি আমাকে একটি চিঠি দিলেন। বললাম, এটা কী। তিনি বললেন, এটাও হযরত দিয়েছেন। তখন ব্যাপার কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। ভাবলাম, হযরত এই গম এই অধমের জন্য দিয়েছেন। স্ত্রীকে ঘটনা বললে সে বলল, আগে চিঠি পড়েন, কি লিখেছেন একটু শুনি। আমি চিঠি পড়লাম, তাতে লেখা ছিল, 'আব্দুল মালেক, তুমি আল্লাহ আল্লাহ কর, আর আল্লাহ আল্লাহ করাও। এই গমগুলো শক্ত করে কোনো বন্ধ পাত্রে রেখে দাও। এই চিঠিও সেখানে রেখে দাও। নিচের দিকে ছিদ্র করে সেখান থেকে গম ব্যবহার করো। এটা তোমার লঙ্গরখানার জন্য। নিচে লেখা ছিল

إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

'নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন।'

আমার স্ত্রী গমগুলো একটি বন্ধ পাত্রে রেখে দিল। ভালোভাবে ঢাকনা বন্ধ করে দিল আর নিচের দিকে একটি ছিদ্র করে নিল। প্রয়োজনমতো সেখান থেকে গম নিয়ে রুটি বানাত। আলহামদুলিল্লাহ! এই গম আমরা এখনো চল্লিশ বছর যাবত ব্যবহার করছি। এখনো আমার খানকাতে দুই তিনশত মানুষ সব সময় থাকে। সবার খানা সেই গম থেকেই হয়। বছর শেষে হাজারের চেয়ে বেশি মানুষ হয়। তাদের খানাও সেই গম থেকে ব্যবস্থা করা হয়। চল্লিশ বছর ধরে এভাবেই সেই গম আমরা ব্যবহার করে আসছি।

বরকতের অভাব

ইদানীং বরকতের অভাবেই আমাদেরকে দ্বারে-দ্বারে ঘুরতে হচ্ছে। আমাদের আমল আর মালের মধ্যে বরকত নেই। অনেক মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে বলে থাকে, হযরত! টাকা আসতে দেখা যায় তবে যেতে দেখা যায় না। এর কারণ বুঝতে পারি না। আগে তো মাটি ধরলে স্বর্ণ হয়ে যেত আর এখন স্বর্ণ ধরলে মাটি হয়ে যায়। এক সময় ছিল যখন লাখ টাকা মানুষের কাছে পাওনা ছিলাম। এখন লাখ টাকা মানুষের কাছে দেনা আছি।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা এত সম্পদ দিয়েছিলেন যে, তিনটি রেলওয়ে ষ্টেশন তার জমিনের উপর ছিল। অর্থাৎ প্রথম রেলওয়ে ষ্টেশন তার জায়গায় দ্বিতীয় ষ্টেশনও তার মালিকানা জমিতে এবং তৃতীয় ষ্টেশনও তার জায়গায় ছিল। এত বেশি ছিল তার জায়গা-সম্পত্তি। কোটিপতি ছিল। একবার শহরের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে সে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা বলছিল। বন্ধুরা বলছিল, আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে খুব পেরেশানির মধ্যে আছি। সে কিছুটা ভাব নিয়ে বলল, আরে ভুখার দল, তোদের আর আছে কী?' কখনো-কখনো মানুষ যখন একটু পেট ভরে খেতে পায়, তখন বান্দা খোদার সুরে কথা বলতে শুরু করে। সে বন্ধুদের বলল, তোমরা পেরেশানিতে আছ এই ভেবে যে, মাল কোথা থেকে আসবে আর আমি পেরেশানিতে আছি এই ভেবে যে, মাল কোথায় লাগাব।

তার এই অহংকারমিশ্রিত কথা আল্লাহর কাছে অপছন্দ হলো। সে অসুস্থ হয়ে গেল। কয়েক মাস পরে সে এক ছেলে রেখে মারা গেল। যুবক ছেলে। বাপ নেই। কোটি টাকার সম্পদ হাতে পেয়েছে। এই অবস্থায় উল্টাপাল্টা অনেক বন্ধু-বান্ধব তার কাছে জুটে গেল। তারা তাকে শরাব আর যৌবনতাড়িত বিষয়াদির সাথে জড়িয়ে ফেলল। যৌবনের তাড়নায় গা ভাসিয়ে দিল আর সম্পদ লুটে-পুটে খরচ করতে লাগল। কেউ তাকে লাহোরের পথ দেখাচ্ছে আবার সেখান থেকে কেউ দেখাচ্ছে করাচীর পথ। কেউ নিয়ে যাচ্ছে জুয়াখানায় আর কেউ বলছে এই দেশে আর কত পড়ে থাকবে; চলো ব্যাংকক যাই। পানির মতো টাকা খরচ করছে আর জুয়াতে হারছে কোটি-কোটি টাকা। এমনকি ব্যাংকে যা ছিল তাও শেষ। এবার জমি বিক্রি করতে শুরু করেছে। একে-একে সব জমিন এক সময় শেষ হয়ে গেল। তারপর একদিন থাকার ঘরটাও বিক্রি করতে হলো। এখন তার কাছে থাকার ঘরও নেই। খাবার বলতেও কিছু নেই। যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তার বাপ বড় কথা বলেছিল, সেই জায়গায় এসে ছেলে মানুষজনের কাছে ভিক্ষা করতে শুরু করল। আল্লাহু আকবার কাবীরা।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا

'হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে আমাদের নফসের খারাবি থেকে, আমাদের খারাপ আমল থেকে আশ্রয় কামনা করছি।'

রিযিকের বরকতের একটি আশ্চর্য উদাহরণ

ভালো করে জেনে রাখুন, আমাদের সমস্যার সমাধান বরকতের মধ্যেই নিহিত। মালের বরকত, রিযিকের বরকত, হায়াতের বরকত, সময়ের বরকত, ইল্‌মের বরকত। মোটকথা যে জিনিসে আল্লাহ্ বরকত দিবেন, সেই জিনিস আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। আমাদের এক বুজুর্গ ছিলেন। তার ছেলে একদিন তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করল, আবু! বরকত শব্দ তো অনেক শুনি। আমাকে একটু ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন, আসলে বরকত কী? বুজুর্গ বললেন, আমার সাথে এসো। ছেলেকে সাথে নিয়ে বুজুর্গ ঘরের চুলাটা দেখালেন। বললেন, এটা বরকত। ছেলে বলল, আবু! এটা বরকত কীভাবে হলো? বাবা বললেন, তোমার বয়স বিশ বছর। তোমার জন্মের আগে এই চুলা বানিয়েছি। এখনো নষ্ট হয়নি। এটাই বরকত। একে বলা হয় রিযিকের বরকত। ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত জিনিস নষ্ট হয় না। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা মনেও পড়ে না। কখনো মাথাব্যথাও হয় না। এটি রিযিকের বরকত।

পূর্বসূরীদের জীবনে বরকত

আমাদের পূর্বসূরীদের জীবনে বরকত ছিল। তাই দুই টাকাতেই তাদের যথেষ্ট হতো। আর তৃতীয় টাকাটি তাঁরা গরিবকে দিয়ে দিতেন অথবা মাদ্রাসায় ফেরত দিতেন। আর আজকাল আমরা তো সোলায়মান (আ.)-এর মাছের মতো মুখ খুলে দিয়েছি। তাতে রিযিক ঢালা হচ্ছে আর আমরা বলছি

هَلْ مِنْ مَّزِيْد؟

'আর আছে? আর আছে?' [১]

সাহাবায়ে কেরামের রিযিকে বরকত

সাহাবায়ে কেরামের জীবনে আল্লাহ্ তা'আলা এত বরকত দিয়েছিলেন যে, তাঁরা সারা দিন রাস্তায় যাকাতের হকদার খুঁজে বেড়াতেন; কিন্তু দিন শেষে তেমন কাউকে পাওয়া যেত না। তাঁদের সবার জীবনে আল্লাহ্ বরকত দিয়েছিলেন। সবাই দাতা ছিলেন; কিন্তু নেওয়ার কেউ ছিলেন না।

---

১. সূরা কা-ফ, আয়াত-৩০

হযরত আনাস (রাযি.)-এর রিযিক আর সন্তানে বরকত

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য রিযিকে আর সন্তানে বরকতের দু'আ করেছিলেন। প্রিয় নবীর দু'আর ফল এমন হয়েছিল যে, আমার কাছে এত মাল থাকত যে, স্বর্ণ কাটতে আমি লাকড়ি কাটার কুড়াল ব্যবহার করতাম। মাশাআল্লাহ। তিনি বলেন, আমার ঘরে দিরহাম আর দিনারের বস্তা এত ছিল যে, এর পেছনে দাঁড়ালে আমাকে দেখা-ই যেত না। আল্লাহ তোমার শান! সন্তান এত বেশি ছিল যে, আমি আমার জীবনে একশতের চেয়ে বেশি ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী দেখেছি। সুবহানাল্লাহ!

বরকত কীভাবে অর্জন করতে পারি?

এখন মনে প্রশ্ন আসছে যে, আমাদের জীবনে এই বরকত আমরা কীভাবে অর্জন করতে পারি? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

আর যদি সেই জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।[১]

এর দ্বারা বোঝা গেল, তাক্ওয়া-পরহেজগারির দ্বারা মানুষের জীবনে বরকত আসে। আর যখন মানুষ তাক্ওয়া-পরহেজগারির জীবন ছেড়ে গোনাহের জীবন অবলম্বন করে, তখন বরকতের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এখন এই দরজা খোলার চাবি আমাদের হাতেই আছে। যদি আমরা গোনাহের সাথে জীবন যাপন করি, তাহলে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে আর যদি পরহেজগারির জীবন যাপন করি, তাহলে দরজা খুলে যাবে।

ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

'অপবাদ তাকে দিতাম, অথচ দোষ ছিল নিজের।'

আল্লাহর প্রতি অভিযোগ দিয়ে থাকি অথচ বরকতের দরজা আমরা নিজেরাই বন্ধ করে দিয়েছি। আল্লাহ তো বরকত দেন, কিন্তু গোনাহ সেই বরকতকে দূরে ঠেলে দেয়।

---

১. সূরা আরাফ, আয়াত-৯২

পেরেশানির বৃষ্টি

মনে করুন, পেরেশানির বৃষ্টি হচ্ছে আর আল্লাহর রহমত চাদর হয়ে সেই পেরেশানিকে আমাদের থেকে দূরে রাখছে। আল্লাহর রহমত চাদর হয়ে সেই পেরেশানি আর আমাদের মধ্যে ঢাল হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু আমরা যখন গোনাহ করি, তখন সেই চাদরে একটি ছিদ্র হয়। যত গোনাহ করি তত ছিদ্র হতে থাকে। তত ছিদ্র দিয়ে পেরেশানি আমাদের কাছে আসতে থাকে। অনেক মানুষ তো সেই চাদরকে চালনি বানিয়ে ফেলেছে আবার বলে, পেরেশানির বৃষ্টি খুব বেশি হচ্ছে, আল্লাহ আমাদের দু'আ শোনেন না। আমরা পেরেশানির ভিতরে ডুবেই আছি।

বরকত কামনা করার পদ্ধতি

সত্য তাওবা করা, গোনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়া, আল্লাহর দরবারে এসে কান্নাকাটি করা যে, হে রাবে কারীম, আমি গোনাহ করে ফেলেছি। আপনাকে ভুলে গিয়েছি। হে আমার মালিক! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি অনেক পেরেশানিতে পড়ে গেছি। আমি কার কাছে গিয়ে দুঃখ বোঝাব? হে আমার পরওয়ারদেগার! মানুষের সামনে আমাকে অপমান করো না। আপনার দরবার থেকে আমাকে সব কিছু দান করুন। যখন বান্দা এভাবে মন দিয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে দু'আ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর পেছনের সব গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর জীবনে বরকত দান করবেন।

আমরা আজকের এই মাহফিলেই আল্লাহর দরবারে সত্য তাওবা করব। গোনাহের ক্ষমা চাইব, যাতে আমরা দীনের কাজ করতে পারি। নেকীর কাজ করতে পারি এবং পবিত্র জীবন যাপন করতে পারি। আল্লাহর স্মরণ যেন আমাদের সবসময় থাকে আর এদিক-সেদিকের ধাক্কা যেন আমাদের খেতে না হয়।

দু'আর শর্ত

দু'আ করারও কিছু শর্ত আছে। যদি কোনো মানুষের কাছে কেউ কিছু চেয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় আর সে সেদিকে না দেখে অন্য দিকে চেয়ে থাকে, তাহলে সে কিছু পাবে? না। পাবে না। বরং তাঁর মুখে একটি থাপ্পর দেওয়া হবে। আমাদের অবস্থাও সেরকম। মুখে দু'আ পড়ি; কিন্তু মন থাকে অন্য দিকে। মনে রাখবেন, দু'আ পড়লে কবুল হয় না বরং দু'আ করলে কবুল

হয়। আজকাল আমাদের মধ্যে অধিকাংশই দু'আ পড়ছি – করছি না। দু'আ করা তাকেই বলা হবে, যখন দু'আ অন্তর থেকে করা হবে। মনে রাখবেন-

إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ

'নিশ্চয় আমার রব দু'আ শুনেন'।[১]

শুধু মুখের বলা কথা নয় – তিনি অন্তরের কথাও শোনেন। কিন্তু অনেক মানুষ অন্তর দিয়ে দু'আ করে না। যদি অন্তর দিয়ে দু'আ করে, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয় শুনবেন।

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

অন্তর থেকে যে কথা বের হয়, তার ভালো প্রভাব পড়ে
পালক না থাকলেও সে উড়ার শক্তি রাখে।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

১. সূরা ইবরাহিম, আয়াত-৩৯

'কুরআন' কিতাবকে বলা হয়, যা বারবার পড়া হয়। আর কিতাব বলা হয় কাগজে লেখা বইকে। কুরআন মজিদের সংরক্ষণও এই দুই পদ্ধতিতে হবে। প্রথমত বারবার পড়ার দরুন এটি সীনার মধ্যে সংরক্ষণ হবে আর দ্বিতীয় লিখিত আকারে কুরআন কিতাবের জাহাজে সংরক্ষিত থাকবে।

হেফাজতে কুরআন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اِنَّانَحْنُ نَزَّلْنَاالذِّكْرَ وَاِنَّالَهُ لَحَافِظُوْن . سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

কুরআন মজিদের দুটি আসল নাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'আমি স্বয়ং এ উপদেশগ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।'[১]

ওলামায়ে কেরাম কুরআন মজিদের ৫৫টি ছিফাতি নাম বলেছেন। তবে কুরআন মজিদের দুটি আসল নাম আছে, যা কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। একটি হলো কুরআন।

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ

আর দ্বিতীয় নাম কিতাব

ذٰلِكَ الْكِتَابُ

এই দুটি কুরআনের আসল নাম। আশ্চর্যের কথা হলো, এই দুটি নাম আল্লাহ তা'আলা কুরআনে একই আয়াতে নিয়ে এসেছেন।

إِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ

কুরআনের এই দুটি নাম আমাদেরকে এই কথা বলছে যে এই কুরআন এর হেফাজতও দুই পদ্ধতিতে হবে।

দুই পদ্ধতিতে কুরআন মজিদের হেফাজত

কুরআন এমন কিতাবকে বলা হয়, যা বেশি বেশি পড়া হয়, যা বারবার পড়া হয়। যার সম্পর্ক পড়ার সাথে হয়। আর কিতাব এমন বইকে বলা হয়,

---

১ সূরা হিজর, আয়াত-৯

যা কাগজে লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয়। কুরআন মজিদের হেফাজতও এই দুই পদ্ধতিতে হবে। এক. বারবার পড়ার দরুন তা সীনার মধ্যে হেফাজত থাকবে। দুই. লিখিত কুরআন কিতাবের জাহাজে সংরক্ষিত থাকবে।

তাতারী ফেতনার সময় মুসলমানদের গণহত্যা

এই উম্মতের মধ্যে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কুরআন মজীদ হেফাজত আছে। এর মধ্যে মুসলমানদের উপর এমন অনেক দুর্যোগ এসেছে, যখন সারা দুনিয়ার মধ্যে কোথাও মুসলমানদের রাজত্ব ছিল না। তাতারী ফেতনার সময় বাগদাদে এক দিনেই দুই লাখ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের রক্তে নদীর পানি পর্যন্ত লাল হয়ে গিয়েছিল। ফোরাত আর নীল নদীতে এত বেশি কিতাব নিক্ষেপ করা হয়েছিল যে, এক মাস পর্যন্ত নদীর পানি কালো ছিল। এত বেশি কিতাব নদীতে ঢেলে নষ্ট করা হয়েছে যে, নদীর উপর চলার মতো রাস্তা হয়ে গিয়েছিল, যার উপর দিয়ে তাতারদের ঘোড়াগুলো চলত। নদীতে রাস্তা হয়ে যাওয়া যেনতেন কথা নয়। কত বেশি কিতাব নদীতে ফেলা হয়েছিল চিন্তা করে দেখুন।

নূরের খাযানা

সেই যুগে কাফেররা খুব চেষ্টা করেছিল মুসলমানদের কিতাবটি (আল কুরআন) তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে । এজন্য তারা কাগজে লেখা কিতাব নদীতে ফেলে দিল। কিন্তু যখন সাত বছরের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে মুখস্থ কুরআন পড়তে শুরু করল, বিসমিল্লাহ থেকে শুরু করে সূরা নাস-এ শেষ করল, তখন তারা অবাক হলো, চিন্তিত হলো। ভাবতে লাগল, সীনা থেকে কিতাব কীভাবে বের করে দেওয়া যায়? হাফেযে কুরআনের সীনা তো নূরের খাযানা।

ইহুদি আর খৃষ্টান আলেমের পরাজয়

এই অধমকে বিদেশে মাঝে-মাঝে এমন অনেক বৈঠকে বসতে হয়, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতগণ উপস্থিত থাকেন। খৃস্টানদের পাদ্রী, ইহুদির রুবাঈ, হিন্দুদের পণ্ডিত সবাই থাকেন। প্রত্যেককে নিজের ধর্ম সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে হয়।

একবার এক ইহুদি জিজ্ঞেস করল, আগামীতে আমরা যখন আবার একত্রিত হব, তখন আমাদের কী বিষয়ে আলাপ করা উচিৎ? আমি বললাম,

প্রত্যেকের কাছে আল্লাহর যে কিতাব আছে, তা পাঠ করা আর পড়ার পরে তা বুঝিয়ে দেওয়া উচিৎ। সবাই আমার এই কথা সমর্থন করলেন।

যখন পরবর্তী বৈঠকে আমরা একত্রিত হলাম, তখন আমাকে বলা হলো, যেন শুরুটা আমিই করি। আমি সূরা ফাতেহা পড়ে তার ব্যাখ্যা করলাম। আমার পরে খৃস্টানের পালা এল। তিনি বাইবেল পড়তে শুরু করলেন। তিনি যখন পড়ে শেষ করলেন, আমি বললাম, একটি বিষয় আমাকে একটু ব্যাখ্যা করুন। তিনি বললেন, কোন বিষয়? আমি বললাম, আপনি বাইবেল কোন ভাষায় পড়েছেন? তিনি বললেন, ইংরেজি ভাষায়। আমি বললাম, বাইবেল তো ইংরেজি ভাষায় নাযিল হয়নি। যে ভাষায় নাযিল হয়েছে, সেই ভাষায় আসল কালাম পড়ুন। কেননা, আগেই ঠিক করা হয়েছিল, প্রত্যেকের কাছে আল্লাহর যে কালাম আছে তাই যেন পড়া হয়।

তিনি বললেন, আমাদের কাছে তো সেটি নেই। আমাদের কাছে তো শুধু ইংরেজি অর্থই আছে। এটি মানুষের শব্দ। ইহুদি বললেন, আমাদের অবস্থাও তো একই। আমাদের কাছেও তো তাই। আসল আল্লাহর কালাম আমাদের কাছেও নেই। আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন, যে ভাষায় আমাদের কিতাব নাযিল হয়েছে, সেই ভাষাও তো এখন পৃথিবীতে নেই। সেই ভাষার পাঠকও নেই আর বুঝবার মানুষও নেই। সেই কিতাব এখন পড়ব কীভাবে?

শেষ পর্যন্ত সবাই একথা স্বীকার করে নিলেন যে, সারা দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র মুসলমানদের কাছেই আল্লাহর আসল কিতাব আছে, অন্য কারো কাছেই নেই। যখন আমি বললাম, আমাদের কাছে তো এই কিতাবের হাফেযও আছে। তখন তাঁরা অবাক হলেন। আমি বললাম, আপনাদের কাছে একে তো আসল কিতাবই নেই, তারপর যা আছে তার একটি পৃষ্ঠারও হাফেয কেউ নেই। এই মর্যাদা শুধু ইসলাম ধর্মকেই আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।

এক পাদ্রীর আগ্রহ

একজন পাদ্রী ছিলেন। তার আগ্রহ হলো, তিনি কুরআনের হাফেয দেখবেন। আল্লাহর শান দেখুন, আমার ছেলে হাবীবুল্লাহও ওখানে পৌঁছে গিয়েছিল। আমি পাদ্রীকে বললাম, এই ছেলেটা সবে অর্ধেক কুরআন হেফয করেছে। বাকি অর্ধেকও করে নিবে ইনশাল্লাহ। পাদ্রী খুব আশ্চর্য হয়ে দেখতে

লাগলেন। তিনি বললেন, আমি শুনতে চাই, সে কীভাবে কুরআন পড়ে। আমি হাবীবুল্লাহকে বললাম, তুমি দুই রাকাতে এক পারা পড়ে শোনাও। সে দুই রাকাতের মধ্যে এক পারা পড়ল।

পাদ্রীর স্ত্রীও সাথে ছিলেন। তাঁরা দুজনই আশ্চর্যের সাথে দেখতে লাগলেন, একেবারেই না দেখে কুরআন পড়ছে। হাতেও কোনো কিতাব নেই। তারপরও কোনো আটকানো ছাড়াই পড়ে যাচ্ছে। তাঁরা বুঝতেই পারছিল না, নামাযের মধ্যে না দেখে এভাবে কুরআন কীভাবে পড়ছে? তখনই আমার মনে হলো, এটি দীন ইসলামের বরকত। ইহুদি পাদ্রী ইসলামের সামনে নত হতে বাধ্য হলো।

পাঁচ বছর বয়সি হাফেযে কুরআন!

বাদশাহ হারুনুর রশিদের যুগে পাঁচ বছরের এক হাফেযে কুরআন বাচ্চাকে বাদশাহর সামনে পেশ করা হয়েছিল। ছেলের বাবা বলল, আমার এই ছেলে হাফেযে কুরআন। বাদশাহ নিজেও হাফেযে কুরআন ছিলেন। তিনি বললেন, আমি এই বাচ্চার কুরআন শুনব। ছেলের বাবা বলল, আবু তুমি একটু কুরআন মজীদ পড়ে শোনাও দেখি? বাচ্চা এত ছোট ছিল যে সে জিদ করে বসল। বলল, আগে আপনি ওয়াদা করুন, আমি কুরআন শোনালে আপনি আমাকে সুইংগাম কিনে দিবেন। সে যুগে গুড়ের চুইংগাম পাওয়া যেত। ছেলের জিদের কারণে বাপ ওয়াদা করতে বাধ্য হলেন, সে কুরআন শোনালে তাকে চুইংগাম কিনে দিবে। তখন সে কুরআন মজীদ পড়ে শোনাল। বাদশাহ হারুনুর রশিদ পাঁচ জায়গা থেকে তার কাছে প্রশ্ন করেছেন আর সে সব পাঁচ জায়গা থেকেই কুরআন মজীদ শুদ্ধভাবে শোনাল। সুবহানআল্লাহ!

নবই বছর বয়সে কুরআনের হেফয

আমার সাথে এক ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল। তিনি কিছু দিন আগে কুরআন মজিদের হেফয শেষ করেছেন। তিনি আমাকে বললেন, তার দস্তারবন্দী যেন আমি করি। অধম তার আদেশে ওখানে গেলাম। যখন তাঁর দস্তারবন্দী করছিলাম, তখন তাঁর চুল, দাড়ি, গোঁফ, হাতের কেশ দেখলাম যে কোথাও একটি চুলও সাদা হয়নি। নবই বছর বয়সে তো মানুষ অনেক দুনিয়াবী কথাও ভুলে যায়, কিন্তু তিনি এই বয়সে কুরআন মজীদ হেফয করে ফেলেছেন।

নগদ বদলা

যিনি কুরআন মজিদের হেফয করেছেন, তিনি যেন অহংকার না করেন। কেননা, আল্লাহর কাছে অহংকার খুবই অপছন্দের বিষয়। অন্য কোনো গোনাহের বদলা আল্লাহ তা'আলা তাড়াতাড়ি দেন বা না দেন, কোনো হাফেযে কুরআন অহংকার করলে আল্লাহ তাড়াতাড়ি বদলা দিয়ে থাকেন।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

মুফতী মুহাম্মদ তকী ওসমানী (দা.বা.) নিজের কিতাব 'তারাশে'র মধ্যে একটি আশ্চর্য ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, একজন আলেম ছিলেন, যিনি বলতেন, আমার দ্বারা দুটি কাজ এমন হয়েছে, যা অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়। একটি ভালো আরেকটি মন্দ। ভালো কাজটিও এমন যে, অন্য কেউ করতে পারে না, আবার মন্দ কাজটিও এমন যে, অন্য কেউ করতে পারে না। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, কাজ দুটি কী কী? তিনি উত্তর দিলেন, একবার ওলামাদের মজলিসে আলোচনা হচ্ছিল, অমুক হাফেয, অমুক হাফেয, অমুক হাফেয। আমার কথা এলে তাঁরা বললেন, তিনি আলেম তো অনেক বড়; কিন্তু হাফেয নন। আমার কানে যখন একথা এল, তখন ভাবলাম, আজ থেকেই কুরআন মজীদ হেফয শুরু করব। সুতরাং শুরু করে দিলাম কুরআনের পারাগুলো মুখস্থ করা। তিন দিনেই আমি পুরো কুরআন শরীফ হেফয করে ফেললাম।

এটি এমন ভালো কাজ, যা সাধারণত মানুষ করতে পারে না। আরেকটি খারাপ কাজও আমার দ্বারা হয়েছে, যা সাধারণত মানুষ করতে পারে না। তাহলো একটি মজলিসে কথার মাঝখানে আমার আলোচনা এল। আমার খুব প্রশংসা করা হলো। জ্ঞানী, এমন, এমন অনেক কথা। আমার মনে হলো, সত্যই তো আমি জ্ঞানী। আমার মতো জ্ঞানী আর কে আছে? আমার মধ্যে অহংকারের যে অবস্থাটা দেখা গেল, তার শাস্তি আমি এভাবে পেয়েছি যে, জুমার দিন আমি নামাযের তৈরি করছিলাম। নখ আর চুল কাটব। নখ কাটার পরে ভাবলাম, দাড়ি তো অনেক লম্বা হয়ে গেছে। সুন্নাতমতো এক মুষ্টি রেখে বাকিটা কেটে ফেলব। কেননা, এক মুষ্টির চেয়ে দাড়ি বেশি লম্বা হলে এক মুষ্টি রেখে বাকিটা কাটা জায়েয আছে। তিনি বলছিলেন, আমি এক মুষ্টি রেখে দাড়ির বাকি অংশ কাটার জন্য দাড়িগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে ধরলাম। কিন্তু কাটার বেলায় ভুলে হাতের নিচের দিকে না কেটে উপরের দিকে কেটে ফেললাম। যখন মসজিদে এলাম, তখন অনেক লজ্জা পেলাম। প্রত্যেকেই

জিজ্ঞেস করছিল আর আমি জবাব দিচ্ছিলাম যে, ভুলে উপরের দিকে কেটে ফেলেছি। যে ব্যক্তি তিন দিনে কুরআন মজীদ হেফয করেছে, তার এরকম বেকুবির কথা সবখানে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক বদনাম হলো।

অহংকারের শাস্তি

আমার জীবনে দেখা একটি ঘটনা। আমাদের গ্রামের মসজিদে একজন ডাক্তার ছিলেন। তার একটি দোকান ছিল এক কোনায়। তার নাম ছিল আহমদ বখশ। কুরআন মজিদের খুব ভালো হাফেয ছিলেন তিনি। পড়াও ছিল সুন্দর। আমি তখন ছোট ছিলাম। রমযান মোবারকের দিন ছিল। কেউ একজন তাঁকে বলল, আজ রমজানের ২৭ তারিখ। আপনি যদি কুরআন মজীদ শোনাতেন, তাহলে খুব ভালো লাগবে। তাঁর হেফযও ছিল খুব ভালো। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আমি আসব। মসজিদে কাওছারে তিনি এলেন। আমিও সেখানে গেলাম। আমার বয়স তখন ৯ বছরের মতো। হাফেয সাহেব দুই রাকাতের নিয়ত বাঁধলেন। এক রাকাতে তিনি ২৯ পারা পড়লেন। এই ২৯ পারায় তাঁর কোনো ভুল হলো না। পেছনে আট-দশজন হাফেয ছিলেন। তাঁরা সবাই চুপ করে আছেন। কোথাও কোনো জায়গায় আটকায়নি; তাই লোকমাও দিতে হয়নি। তিনি পড়েই গেলেন। ২৯ পারার পরে তিনি রুকু করলেন। এক রাকাত শেষ করে দ্বিতীয় রাকাত শুরু করলেন। আল্লাহর শান দেখুন, তিনি শেষ পারাটিও প্রায় ঠিকমতো পড়ছেন। যখন সূরা এখলাস قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়ছেন, তখন তিনি আটকে গেলেন। মোশাবাহ লেগে গেল। তিনি পড়তে চাচ্ছেন; কিন্তু ঠিকমতো পড়তে পারছেন না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি যখন তিনবার একই সূরায় ভুল পড়ছেন, তখন তাঁকে একজন লোকমা দিলেন, যিনি হাফেযে কুরআন নন। তিনি তাঁর লোকমা পেয়ে সূরা শেষ করলেন।

নামাযের পরে মানুষ তো বেশ খুশিই হলো, কিন্তু হাফেয সাহেবের শরীর থেকে ঘাম বের হচ্ছিল। যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন, তখন কেউ একজন জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! ব্যাপার কী হয়েছিল? তিনি উত্তর দিলেন, আর বলবেন না। যখন আমি ২৯ পারা শেষ করলাম, তখন মনে-মনে খুব খুশি হলাম। আর যখন সূরা লাহাব পড়ছিলাম, তখন আমার মনে অহংকার দেখা দিল। মনে-মনে বললাম, এই সময় আমার চেয়ে ভালো হাফেয কেউ নেই। দুই রাকাতে পুরো কুরআন মজীদ শেষ করে ফেললাম। কোথাও আটকালাম

না। আমার মনে এই অহংকার আসার কারণেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে সূরা ইখলাসের মধ্যেই আটকে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, এটা তোমার যোগ্যতা নয়, আমার যোগ্যতা।

এটা আল্লাহর এহসান যে, তিনি হাফেযের জন্য কুরআন মুখস্থ করা সহজ করে দেন। তাই হাফেযদের উচিৎ আল্লাহর এহসান স্বীকার করা।

একটি আদর্শ মাদ্রাসার ভালো ছাত্র

পাকিস্তানের একটি তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসার পরিচালকের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল। তাঁরা আমাকে তাঁদের ওখানে দাওয়াত করলেন। তাঁদের মাদ্রাসা সম্পর্কে একটি কথা প্রচলিত আছে, যে ছেলে সেখানে হেফয করে, সে সারা জীবনেও আর কুরআন শরীফ ভোলে না। তাঁদের ওখানে কুরআন মজীদ হেফয করার আলাদা পদ্ধতি আছে। সেখানে গিয়ে দেখলাম, সত্যই বাচ্চাদের চেহারায় কুরআনের নূর আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা বাচ্চাদের পরীক্ষা কীভাবে নেন? উত্তর দিলেন, আমাদের এখানে তো পরীক্ষার সাদাসিধা পদ্ধতি। আমরা পাঁচজন শিক্ষক বসিয়ে দেই। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে খাতা-কলম থাকে। তাঁরা বাচ্চাকে বলেন, পুরো কুরআন মজীদ আমাদের শুনিয়ে দাও। বাচ্চা পড়তে থাকে আর তাঁরা কোথাও ভুল হলো কিনা, আটকালো কিনা, কয়টা ভুল হয়েছে, কোথায়-কোথায় হয়েছে সব লিখে রাখেন। এমনকি কত সময়ে কুরআন মজীদ পড়া শেষ করেছে, তাও লেখা হয়। কুরআন মজিদের রেকর্ডও করা হয়। আমি বললাম, আমাকে কিছু রেকর্ড দেখান। তাঁরা আমাকে দেখালেন। তারপর তাঁরা আমাকে একটি বাচ্চা দেখালেন, যার বয়স আট-নয় বছর হবে। তাঁরা বললেন, এই বাচ্চা কদিন আগে পুরো কুরআন মজীদ শুনিয়েছে। আল্লাহর শান দেখুন, সে পুরো কুরআন মজীদ ৪ ঘন্টা ৩৫ মিনিটে শেষ করেছে এবং পুরো কুরআন মজিদে তাঁর একটিও ভুল হয়নি। পাঁচজন শিক্ষক বসা ছিলেন। কেউ একটা ভুলও বের করতে পারলেন না। সুবহানাল্লাহ!

বিশ্বরেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত

গিনিসবুকে এক বাচ্চার নাম আছে, যে ছয় ঘন্টা আর কয়েক মিনিটে পুরো কুরআন মজীদ শুনিয়েছে। এই ছেলে তো আগের রেকর্ড ভঙ্গ করে ৪ ঘন্টা ৩৫ মিনিটে পুরো কুরআন শুনিয়েছে। তবে এই বাচ্চার নাম সেখানে আসেনি। আসা উচিৎ।

আল্লাহর সৈনিক

এটা আল্লাহ তা'আলার কত বড় মেহেরবানি যে, তিনি এই উম্মতের মধ্যে এরকম বাচ্চা তৈরি করে দিয়েছেন। এরা আল্লাহর সৈনিক। হিজবুর রহমান। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

'অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদের আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি।'[১]

কুরআনের হাফেয এই বাচ্চাগুলো আল্লাহর সৈনিক, যারা নিজেদের সিনার মধ্যে আল্লাহর কুরআনকে হেফাজত করছে।

হাফেযে কুরআনের সুপারিশ

কুরআনের হাফেযকে কিয়ামতের দিন এমন মানুষের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে, যারা নিজের গোনাহের কারণে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে। হাফেযে কুরআনের সুপারিশে আল্লাহ তা'আলা তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দিয়ে দিবেন।

একটি উপমা

একে এভাবে বুঝতে পারেন যে, আপনি হজে যাওয়ার জন্য সব প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। টাকা-পয়সাও দিয়ে দিয়েছেন। পরে জানতে পারলেন, জাহাজে সিট খালি নেই। এদিকে শুধু একদিন মাত্র বাকি আছে। জাহাজও আছে শুধু একটাই। এই অবস্থায় আপনার মনে খুব দুশ্চিন্তা এসে ভর করেছে। ম্যানেজার আপনাকে বললেন, শেষ চেষ্টা হিসেবে আপনি বড় অফিসারের সাথে দেখা করতে পারেন, তাঁর কাছে দশটা সিট বাড়তি থাকে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পারেন। এ অবস্থায় আপনি নিশ্চয় তাঁর কাছে খুব মিনতি করবেন একটা সিটের জন্য। পা ধরতেও রাজি থাকবেন। পরে যখন আপনি জানতে পারবেন, সেই বড় অফিসার আপনারই ছেলে, তখন আপনি নিশ্চয় খুব খুশি হবেন। আমার ছেলের কাছে দশটি সিট আছে; তাহলে তো আমি খুব সহজেই হজে যেতে পারব।

এবার কিয়ামতের দিনের অবস্থা কল্পনা করুন। মানুষ যখন দেখবে, তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর সামনে আমলনামা খোলা হবে।

---

১ সূরা ফাতির, আয়াত-৩২

বাঁচার কোনো পথ দেখা যাচ্ছে না। জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব চোখে দেখা যাচ্ছে। এই অবস্থায় তাকে যদি বলা হয়, আপনার ছেলের কাছে দশজন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করার সুযোগ আছে। তখন তাঁর কাছে কেমন খুশি লাগবে? তখন বাচ্চার কদর কেমন হবে তাঁর কাছে? হাফেযে কুরআনের কদর তখনই বুঝে আসবে। জিনিসের কদর তখনই বোঝা যায়, যখন প্রয়োজন পড়ে। যখন প্রয়োজন পড়ে না, তখন কদর বোঝা যায় না।

যখন জাহান্নামের আগুন দেখা যাবে, জাহান্নামীদের সেখানে জ্বলতে দেখা যাবে, সামনে ফেরেশতাদের দেখা যাবে, তারা তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তখন যদি সেই হাফেযে কুরআন ছেলেকে দেখা যায়, যাকে আল্লাহ তা'আলা দশজনের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিয়েছেন। সে সুপারিশ করবে, ইনি আমার আব্বু; একে যেন জান্নাতে দেওয়া হয়। তখন পেরেশানি দূর হয়ে যাবে। মুছিবত কেটে যাবে। তখন বান্দা আকাঙ্ক্ষা করবে, আমার সবগুলো বাচ্চা যদি হাফেযে কুরআন হতো!

এক ডক্টরের পেরেশানি

এক ডক্টর নিজের বাপের জানাযা পড়ছিলেন আর খুব কাঁদছিলেন। কেউ একজন জিজ্ঞেস করলেন, এত কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমার বাবা আমাকে পিএইচডি বানিয়েছেন ঠিক; কিন্তু আমি আবার জানাযা পড়াতে জানি না। যারা বাচ্চাকে পিএইচডি বানাচ্ছেন, তারাও চিন্তা করে দেখুন, আপনার বাচ্চা যদি আপনার জানাযা পড়াতে না পারে, তাহলে লাভ কী?

দ্বিগুণ আযাব আর লানতের বৃষ্টি

যে বাচ্চাদের আপনারা দুনিয়ার দিকে পাঠাচ্ছেন, দীন শেখাচ্ছেন না, তারা কাল কিয়ামতের দিন আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে মামলা করবে। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, যেসব বাচ্চাকে দুনিয়া শিখানো হয়েছে; কিন্তু দীন শিখানো হয়নি, তারা আল্লাহর কাছে বলবে,

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا

'হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম; অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল।'[১]

---

১ সূরা আহযাব, আয়াত-৬৭

তারা আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছে, ডাক্তার বানিয়েছে, পাইলট বানিয়েছে, আমরা তা হয়েছি; কিন্তু তারা আমাদের দীন শিক্ষা দেয়নি। দীনের প্রতি তারা আমাদের পথ দেখায়নি। হে আল্লাহ! এটা তাদের দোষ। তারা যদি আমাদের দীন শিখাতেন তাহলে আমরা শিখতাম।

رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا

'হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের মহা অভিসম্পাত করুন।'[১]

এভাবে সন্তান তার মাতাপিতার বিরুদ্ধে নালিশ করবে। হে আল্লাহ! তারা আমাদের গোমরাহ করেছে। তারা যদি আমাদের দীনের কাজে লাগাতেন, তাহলে আমরা দীনের পথে থাকতাম। কিন্তু তারা আমাদের দুনিয়া কামানোর পথে লাগিয়েছেন। এখন আপনি তাদের দ্বিগুণ আযাব দিন এবং তাদের উপর লানতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আল্লাহ তা'আলা জবাব দিবেন, তোমাদের সবাইকে দ্বিগুণ আযাব দেওয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের আখেরাতের আযাব থেকে হেফাজত করুন আর আমাদের সন্তানদের ইংরেজ সভ্যতা থেকে দূরে রাখুন। তাদেরকে দীনের পথে পরিচালনা করুন। দীনের খেদমতে থাকার তাওফীক দিন। আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

১ সূরা আহযাব, আয়াত-৬৮

আমরা যদি আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক মজবুত করি, তাহলে রাবে কারীম আমাদেরও সাহায্য করবেন। তখন দুনিয়ার কোনো শক্তিই আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। কাফেরদের ধমকিতে ভয় পাওয়া মুসলমানদের শান নয়। ভয় তো তখনই লাগবে, যখন মনের ভিতর চোর থাকবে। ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমান সংখ্যায় কম ছিল বা বেশি, ধনী ছিল বা গরীব, সাদা ছিল বা কালো, পাহাড়ের চূড়ায় ছিল বা সমতলে যে অবস্থায়ই ছিল না কেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাদের সফলতা দিয়েছিলেন।

গায়েবি সমর্থন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. وَقَالَ اللّٰه تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ. سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

বিপরীত জিনিসের সমষ্টি

আল্লাহ তা'আলা তাঁর গুণাবলিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বান্দা তাদের গুণাবলিতে অসম্পূর্ণ। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে বানিয়েছেন, যেগুলো একটা আরেকটার বিপরীত। যেমন-- চোখে দেখা যায়, অন্য কোনো অঙ্গ দিয়ে দেখা যায় না। চোখের সাথে অন্য সব অঙ্গের বৈপরীত্য আছে। কানে শোনা যায়, অন্য কোনো অঙ্গ দিয়ে শোনা যায় না। কান অন্য সব অঙ্গের বিপরীত। জিহা দিয়ে কথা বলা যায়, অন্য কোনো অঙ্গ দিয়ে কথা বলা যায় না। জিহা আর অন্য অঙ্গ বিপরীত। মগজে চিন্তা করা যায়, অন্য কোনো অঙ্গ দিয়ে চিন্তা করা যায় না। মগজ আর অন্য অঙ্গের মধ্যেও বৈপরীত্য আছে। তাহলে বোঝা গেল, মানুষ বিপরীতধর্মী বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর সমষ্টি। মানুষ এমন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে তৈরি, যেগুলো প্রত্যেকে তাদের গুণাবলিতে একে অপরের বিপরীত। এরকম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো মিলে মানুষ হয়।

রূহ-এর গুরুত্ব

এরকম বিপরীতধর্মী জিনিসগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি জিনিস বানিয়েছেন, যাকে রূহ বলা হয়। এই রূহের কারণেই এই অঙ্গগুলো সব এক হয়ে কাজ করে। এই অঙ্গগুলো প্রত্যেকে তার গুণাবলিতে বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও রূহের কারণে সবাই এক হয়ে কাজ করছে। যদি কারো মাথাব্যথা হয়, তাহলে ডাক্তারের কাছে যেতে পা অস্বীকার করে না। একথা বলে না যে, এটা তো মাথার সমস্যা; আমি কেন যাব? চোখ বলে না, আমি ঘুমচ্ছি; যেতে পারব না। জীবিত মানুষের যেকোনো একটি অঙ্গে ব্যথা করলে অন্য সব অঙ্গ অশান্তি অনুভব করে।

যদি কখনো দুশমন কারো মাথায় বাড়ি দিতে চায়, তখন হাত তাড়াতাড়ি তা প্রতিরোধ করার জন্য তৈরি হয়ে যায়। পা দৌড়ে বাঁচার চেষ্টা করে। পা কখনো মাথাকে একা ছেড়ে যায় না। বলে না, এটা আমার সমস্যা নয়, তোমার সমস্যা। যদি অঙ্গগুলো আলাদা ও বিপরীতধর্মী, তবুও রূহ তাদের এক করে দিয়েছে। সব মিলেই একটা মানুষ হয়েছে।

রূহের উপমা

এই উপমাটি খেয়াল করুন। আমাদের ঘরের দিকে দেখলে সহজেই বুঝে আসবে, আমরা অনেক সদস্য ঘরে থাকি, যারা একে অন্যের বিপরীত গুণের অধিকারী। যেমন– কেউ বাপ, কেউ ছেলে, কেউ মা, কেউ মেয়ে। বাপের মর্যাদা অন্য কারো কাছে নেই। ছেলের স্থানে ছেলে। সে তার বাপের জন্য বাপ হতে পারে না। এখানে একে অন্যের বিপরীত। যে স্থান বাপের আছে, তা ছেলের নেই, যা ছেলের আছে, তা বাপের কাছে নেই। যে স্থান মায়ের আছে, তা মেয়ের নেই। বোনের স্থানে ভাই হতে পারে না। প্রত্যেকের মান-মর্যাদা আলাদা। প্রত্যেকে একে অপরের বিপরীত। তারপরও প্রত্যেকের ভিতর রূহ থাকার কারণে সবাই এক হয়ে কাজ করছে। যে রূহের কারণে আমরা সবাই এক হয়ে কাজ করছি, সেটা হচ্ছে ইসলাম।

রূহ ছাড়া শরীরের অবস্থা

শরীর থেকে যদি রূহ বের হয়ে যায়, তখন অঙ্গগুলো আর এক হয়ে কাজ করে না। তার শরীরের কোনো অঙ্গে আঘাত করলেও তার চোখ থেকে আর পানি বের হবে না। পা দৌড়ে বাঁচার চেষ্টা করবে না। কারণ, যে রূহের কারণে সব অঙ্গ এক হয়ে কাজ করত, সেই রূহ এখন আর নেই। তাই কোনো অঙ্গ কোনো অঙ্গের সাহায্যে এগিয়ে আসছে না। একইভাবে যে ঘরে ইসলাম জিন্দা থাকবে, সেই ঘরের অবস্থা হবে জীবিত শরীরের মতো। অন্তরে মহবত থাকবে। ঘরে কেউ অসুস্থ হলে অন্যরা রাত জেগে তার সেবা করবে। একের পেরেশানি সবার পেরেশানি হবে। একের খুশি সবার খুশি হবে। সবাই এক শরীরের মতো হবে। আর যদি ইসলামকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়, তাহলে মৃত শরীরের মতো সবাই যার-যার স্থানে থাকবে। অপরিচিতের মতো হয়ে যাবে।

ইসলামমুক্ত ঘরের অবস্থা

কোনো ব্যক্তির শরীরে যদি রূহ না থাকে, তার নাক বন্ধ করে মুখে যতই বাতাস পাম্প করা হোক না কেন সে জীবিত হবে না। সে পচে যেতে থাকবে; কিন্তু জীবিত হবে না। একইভাবে যে ঘরে ইসলাম নেই, বরং ইসলামের পরিবর্তে অন্য কোনো ইজম-বিধান ঘরে ঢোকানো হয়, তাহলে সেই ঘরের সদস্যদের মধ্যে মহবত থাকতে পারে না। একেবারেই সম্ভব নয়। কেননা, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো বিধান মহবত সৃষ্টি করতে পারে না, যা শুধু আল্লাহর দীন ইসলামই পারে। এটি আল্লাহর বড় একটি অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী! আপনি সারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ খরচ করেও অন্তরের মহবত সৃষ্টি করতে পারতেন না, এই মহবত শুধু আল্লাহই সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

কুরআন মজীদের মোজেজা

আমাদের সমাজের প্রত্যেক ঘরের জন্য দীন হচ্ছে রূহের মতো। যে ঘর থেকে দীনের বিধান বের হয়ে গেছে, অন্য কোনো বিধান ইজম ঘরে ঢুকেছে, সেই ঘর থেকে মানবতার রূহ বের হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠালেন। তিনি হেদায়তের কিতাব নিয়ে এলেন, রোগের চিকিৎসা নিয়ে এলেন, এমন কিতাব আনলেন, যা সত্যের সমষ্টি, বাস্তবতার গোডাউন, সত্যে ভরপুর। Ultimate realities of the Univers এই কিতাবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সত্য ভরে দিয়েছেন। এই কিতাবকে কুরআন বলা হয়। এটি বাস্তবসম্মত কিতাব, যা মানুষকে পথ দেখানোর জন্য এসেছে।

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

'এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন।'[১]

এটি এমন কিতাব, যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনে, পথভোলাদের পথ দেখায়। এটি এমন কিতাব, যা অপমানিতদের সম্মানিত করে। আল্লাহকে ভুলে যাওয়া বান্দাদের আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়।

আমার শায়খ বলতেন, এটি মানুষের জন্য জীবনবিধান, মানুষের জন্য জীবনচলার পদ্ধতি, মানুষের জন্য আবেহায়াত।

---

১ সূরা ইবরাহিম, আয়াত- ১

এই কিতাব দেখাও ইবাদত। একে ছোঁয়াও ইবাদত। পড়াও ইবাদত। শোনাও ইবাদত। বোঝাও ইবাদত। এর উপর আমল করাও ইবাদত। এটি আশ্চর্য কিতাব। চুম্বক যেভাবে লোহাকে নিজের দিকে টানে, ঠিক একইভাবে এই কিতাব মানুষের দিকে আল্লাহর রহমত টেনে আনে।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখো এবং নিশ্চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়।'[১]

বোঝা গেল, এই কুরআন যেখানে পড়া হয়, সেখানে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। একে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছেন এবং এর উদ্দেশ্যও নিজে বলে দিয়েছেন।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

'তিনি তাঁর রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।'[২]

এই দীনকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে অন্যসব দীনের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য।

দীন ইসলামের বিজয়

শুরুর দিকে কাফেররা মুসলমানদের খড়কুটোর মতো মনে করত যে, যখন ইচ্ছে উপড়ে ফেলে দেব। মোমের মতো জ্বলছে, তবে যখন ইচ্ছা নিভিয়ে দেব। নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ও বুদ্ধিমত্তার জন্য খুব অহংকার ছিল তাদের। তারা মনে করত, আমরা কিছু দিন তাদের সাথে নরম আচরণ করছি, যখন ইচ্ছা তাদের দাবিয়ে দেব। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

'তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেনই যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।'[৩]

কিন্তু আল্লাহর নূরকে কেউ ফু দিয়ে নিভিয়ে দিতে পারে না।

---

১ সূরা আরাফ, আয়াত- ২০৪

২ সূরা সফ, আয়াত- ৯

৩. সূরা সফ, আয়াত- ৮

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের উপর নিজের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন–

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'আর স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে অল্প; পরাজিত অবস্থায় পড়ে ছিলে দেশে; ভীত-সন্ত্রস্থ ছিলে যে, তোমাদের না অন্যেরা ছো মেরে নিয়ে যায়। অতঃপর তিনি তোমাদের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদের শক্তি দান করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছেন, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর।'[১]

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থাও শুরুর দিকে দুর্বল ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের দুর্বলতাকে সবলতায় পাল্টে দিলেন। কাফেররা বড়-বড় ষড়যন্ত্র করল। রূপ পাল্টে এল। রঙ বদলে এল। বারবার যুদ্ধের ময়দানে এল। তারা চাচ্ছিল মুসলমানদের শেষ করে দিতে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সবখানে মুসলমানদের সাহায্য করলেন। কাফেরদের ষড়যন্ত্রও ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। এ বিষয়ে কুরআন মজিদে বলা হয়েছে–

وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ

'যদিও তাদের চক্রান্ত এমন যে, তার দ্বারা পাহাড়গুলো টলে যায়।'[২]

আল্লাহ তা'আলার হেফাজত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলায়ও কাফেররা চক্রান্ত করেছিল। তারা সব গোষ্ঠী থেকে একজন করে নিয়ে সবাই মিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের বেলা ঘিরে ফেলার চক্রান্ত করল। ভাবল, সব গোষ্ঠী থেকে একজন করে শরিক হয়ে সবাই মিলে যদি তাকে শহীদ করা হয়, তাহলে প্রতিশোধ নিতে পারবে না। এই চিন্তা করে তারা রাতের বেলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের চারপাশ ঘিরে

---

১. সূরা আনফাল, আয়াত- ২৬
২. সূরা ইবরাহিম, আয়াত- ৪৬

ফেলল। সকাল হতেই যখন হুজুর ঘর থেকে বের হবেন, তখন তারা হামলা করবে। কাফেররা ভাবছিল, তারা উত্তম প্ল্যান করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার মাঝখান দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বের করে নিলেন, তারা জানতেও পারল না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.

'আর স্মরণ করো, যারা অবিশ্বাস পোষণ করে, তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে, তারা তোমাকে আটক করবে অথবা তোমাকে হত্যা করবে অথবা নির্বাসিত করবে। তারা ষড়যন্ত্র করেছিল আর আল্লাহ্ও পরিকল্পনা করেছিলেন। পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ।'[১]

দেখুন, আল্লাহর তদবীরের সামনে কাফেরদের তদবীর কীভাবে অকেজো হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

'তাদের পূর্ববর্তীরাও নিশ্চয় চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেছিলেন বুনিয়াদ থেকে, ফলে ছাদ তাদের উপরে ভেঙে পড়েছিল তাদের উপর থেকে আর তাদের উপরে শাস্তি এসে পড়েছিল এমন দিক থেকে, যা তারা জানতে পারেনি।'[২]

কাফেরদের চক্রান্ত সব সময়ই অকেজো হবে যদি আমাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকে। আল্লাহ কাফেরদের চক্রান্তকে জিরো বানিয়ে দেবেন।

আহযাব যুদ্ধের ঘটনা

এক সময় মক্কা আর মদিনার ত্রিশ হাজার কাফের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৈরি হলো। তারা মনে করছিল, মুসলমানদের সংখ্যা তো শুধু তিন হাজার। আমরা ত্রিশ হাজারের সামনে আর কতক্ষণ ঠিকতে পারবে।

---

১. সূরা আনফাল, আয়াত- ৩০

২. সূরা নাহাল, আয়াত- ২৬

এবার মুসলমানদের একেবারেই শেষ করে দেব। তারা এক মাস পর্যন্ত মুসলমানদের অবরুদ্ধ করে রাখল। ফলাফল কী হয়েছিল আপনারা জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا

'আর আল্লাহ প্রতিহত করেছিলেন তাদের, যারা আক্রোশবশত অবিশ্বাস পোষণ করেছিল। তারা ভালো কিছুই লাভ করতে পারেনি।'[১]

মনে বড় আশা নিয়ে এসেছিল তারা। কিন্তু ভালো কিছুই নিয়ে যেতে পারল না। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাদের দুশমনদের জানেন। আল্লাহর ভালোভাবেই জানা আছে মুসলমানদের দুশমন কারা। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, আল্লাহ কাফেরদের মুসলমানদের পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ কখনই দেবেন না।

আল্লাহ মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে আয়াত নাযিল করেছেন। বলেছেন, তোমাদের পর্যন্ত কেউ পৌঁছতেই পারবে না। একথাটিকে যদি আমাদের ভাষায় বলা হয়, তাহলে এভাবেই বলা হবে যেমন আমরা বলে থাকি, তোমার কাছে কেউ ঘেঁষতে চাইলে আমার লাশের উপর দিয়ে যেতে হবে। ঠিক আল্লাহর এই কথারও একই অর্থ হয়। 'নিশ্চয় কখনো আল্লাহ কাফেরদের মুসলমানদের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে দিবেন না।' আল্লাহ কত বড় সাহায্যের ওয়াদা করেছেন দেখুন।

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي

'নিঃসন্দেহ আমরা অবশ্যই আমাদের রসূলগণকে ও যারা ঈমান এনেছে তাদের সাহায্য করে থাকি এই দুনিয়ার জীবনে আর সেইদিন যখন সাক্ষীরা দাঁড়াবে।'[২]

আল্লাহর উপর কোনো কিছুই ফরজ নয়। তবে আমাদের ভাষায় আমরা যখন কথা বলি, তখন এই আয়াতের অর্থ এমনই হয় যে, আল্লাহর রাসূলদের আর মুমিনদের সাহায্য করা আমার জন্য ফরজ।

এবার চিন্তা করুন, যখন আল্লাহ তা'আলা এরকম ওয়াদা করেছেন, তখন মুসলমানদের ভয় পাওয়ার দরকার কী? এজন্যই বলেছেন,

---

১. সূরা আহযাব, আয়াত- ২৫

২. সূরা মুমিন, আয়াত- ৫১

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

'অতএব দুর্বলচিত্ত হয়ো না ও অনুশোচনা করো না। কারণ, তোমরাই হবে বিজয়ী যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।'[১]

মুমিনদের বিজয়ের ওয়াদা আছে কুরআনে। তুমি যদি বিজয়ী না হও, তাহলে বুঝতে হবে তোমার ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে।

দেখলেন তো, আল্লাহ এভাবে মুসলমানদের সাহায্যের ও বিজয়ের ওয়াদা করেছেন। কাফেরদের সংখ্যাধিক্য দেখো না, তাদের শক্তি দেখো না, তোমাদের দৃষ্টি থাকবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি। তোমাদের ঈমান পাকা হলে তিনি তোমাদের প্রত্যেক জায়গায় বিজয়ী করবেন।

কুরআন দ্বারা সাক্ষী

কুরআন মজিদের এই আয়াতটি শুনুন। একটু মন দিয়ে শুনুন।

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

'কতবার ছোট দল আল্লাহ্‌র হুকুমে বড় দলকে পরাজিত করেছে আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।'[২]

যদি বুঝবার জন্য এই আয়াতের অর্থ আমাদের কথায় করা হয়, তাহলে এমন হয় যে, কতবার এমন হয়েছে যে ছোট্ট বাবুই পাখি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ঈগল পাখিকে শেষ করে দিয়েছেন। আল্লাহ যখন বাবুই পাখি দ্বারা ঈগল পাখি ধংস করেন, তখন মুসলমানদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। কেননা, আল্লাহ মুসলমানদের সাথেই আছেন। সুবহানআল্লাহ! যেদিন কুরআন মজিদের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ করলাম আর তোমাদের উপরে আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম ইসলাম।'[৩]

একই দিন এই আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে,

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ

---

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৩৯

২. সূরা বাকারাহ, আয়াত- ২৪৯

৩. সূরা মায়েদা, আয়াত- ৩

'যারা অবিশ্বাস পোষণ করে, তারা আজকের দিনে তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে হতাশ হয়ে গেছে।'[১]

প্রথমে তাদের মনে বড় আশা ছিল, আমরাই জিতব এবং মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে দেব। ইতিহাসে তাদের নাম পর্যন্ত থাকবে না। কিন্তু আজ কাফেররা একথা খুব ভালোভাবেই বুঝে গেছে যে, মুসলমানরা তো লোহার জিনিস। এদের চিবিয়ে খাওয়া সম্ভব নয়। তারপরই বলা হয়েছে–

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ

'কাজেই তাদের ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো।'[২]

যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে এবং হেদায়তের পথে তার পা থাকবে, তার ভয় পাওয়ার কী দরকার? আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করে থাকেন। তিনি তার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ওয়াদা করেছেন–

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

'নিঃসন্দেহ যিনি তোমার উপরে কুরআন বিধান করেছেন, তিনি তোমাকে ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তনস্থলে।'[৩]

আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় নবীকে সেখানে প্রত্যাবর্তন করিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। আর যখন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান কেমন ছিল? সাওয়ারিতে বসা ছিলেন, বিনয় এত বেশি ছিল যে, বাহন সাওয়ারের গর্দানের সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থুতনি লেগে যাচ্ছিল আর মুখে ছিল এক আশ্চর্য তারানা (সঙ্গীত)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ نَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'আলার, যিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং এক আল্লাহই সমস্ত দুশমনকে পরাজিত করেছেন।'

আল্লাহর সাহায্যের ওয়াদা

আমাদের জন্যও সেই একই সুসংবাদ। আমরা যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাহায্য করবেন।

---

১. সূরা মায়েদা, আয়াত- ৩
২. সূরা মায়েদা, আয়াত- ৩
৩. সূরা কাসাস, আয়াত- ৮৫

তখন দুনিয়ার কোনো শক্তিই আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। কাফের শিয়ালগুলোর চিৎকার শুনে মুসলমানদের ভয় পাওয়া সাজে না। ভয় তো তখনই লাগে, যখন মনের ভিতর চোর থাকে। যখন আমল ঠিক থাকে না, নামের মুসলমান হয় আর মুখে ইসলামের দাবি করে, তখন কাফেরদের সাহস বেড়ে যায়। অপর দিকে ঈমান আমল যদি ঠিক থাকে, তাহলে আল্লাহর সাহায্য আসবে। যেদিকেই যাবে, সেদিকে সফল হবে। ইতিহাস সাক্ষী যে, ঈমানদার সংখ্যায় কম হোক বা বেশি হোক, গরীব হোক বা ধনী, সাদা হোক বা কালো, পাহাড়ের চূড়ায় থাকুক বা সমতলে যে অবস্থায় থাকুক না কেন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সফল করেছেন।

আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে মুসলমানদের জন্য। আমাদের উচিৎ অন্তরের নূরকে আল্লাহর যিকির আর নেক আমলের দ্বারা বাড়িয়ে নেওয়া, নিজেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে সাজানো। অন্তরকে নূরে পরিপূর্ণ করা। তখন আল্লাহর সাহায্য ও তার হেফাজত আমাদের সাথে থাকবে। আর যখন রাবে করীমের সাহায্য আসে, তার চিহ্ন এভাবে দেখা যাবে যেমন নৌকা সব সময় পাড়ের কাছাকাছি চলবে। মাঝদরিয়ায় হাবুডুবু খাবে না।

হযরত মুসা (আ.) ও আল্লাহর সাহায্য

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা যখনই তাঁর বান্দার সাথে সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, তা বিস্ময়করভাবে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। একটি উপমা দেখুন। একসময় মুসা (আ.) আর হারুন (আ.)-এর সামনে কুফরের অনেক বড় শক্তি ছিল ফেরাউন। তার শক্তি-সামর্থ্য অনেক বেশি। আল্লাহ মুসা ও হারুন (আ.)কে ফেরাউনের কাছে পাঠাচ্ছেন।

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

'ফেরাউনের কাছে যাও; সে নিশ্চয়ই বিদ্রোহ করেছে।'[১]

তখন মুসা (আ.)-এর মনে এল, আমরা শুধু দুজন মানুষ এত বড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন,

قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرٰى

১. সূরা নাযিআত, আয়াত- ১৭

'তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, আমি শুনছি ও দেখছি।'[১]

ফেরাউন যা বলবে, আমি শুনব; সে যা করবে আমি দেখব। আমি যখন তোমাদের সাথে আছি, তখন আর ভয় কিসের? তোমরা যাও; বিজয় তোমাদেরই হবে। তারপর কী হলো? হযরত মুসা (আ.) তাঁর কওমকে নিয়ে একজায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে পানির নদী, পিছনে ফেরাউনের সৈন্য। মুসা (আ.)-এর সাথীরা ভয় পেয়ে গেল।

قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

'মুসার সঙ্গীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়েই গেলাম।'[২]

তখন মুসা (আ.) পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে চিৎকার দিয়ে বললেন–

قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

'কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন।'[৩]

আল্লাহ মুসা (আ.) ও তাঁর কওমকে নিলদরিয়া পার করে দিলেন আর ফেরাউন ও তার সৈন্যদের তিনি নিলনদীতে ডুবিয়ে মারলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহর সাহায্য

দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনা যাচ্ছিলেন। সমস্ত মক্কাবাসী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে একটি গর্তে পৌঁছে দিলেন। কোনো-কোনো রেওয়ায়েতে এসেছে, সেই গর্তের মুখে মাকড়শা জাল বুনে দিয়েছিল। মাকড়শার জাল হয় সবচেয়ে দুর্বল। কুরআনেও তা বলা হয়েছে।

إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ

'নিশ্চয় ঘরের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ঘর মাকড়শার ঘর।'[৪]

দেওয়াল হিসেবে সবচেয়ে দুর্বল হয় মাকড়শার জাল। গর্তের মুখে সেই দুর্বল মাকড়শার জাল বুনে দেওয়া হলো। সমস্ত মক্কাবাসী মিলেও সেই দুর্বল

---

১. সূরা তোয়াহা, আয়াত- ৪৬
২. সূরা শুআরা, আয়াত- ৬১
৩. সূরা শুআরা, আয়াত- ৬২
৪ সূরা কাসাস, আয়াত- ৪১

জাল ভেদ করতে পারল না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরত দেখালেন যে, হে লোকসকল, আমি যদি সবচেয়ে দুর্বল ওয়ালও দাঁড় করিয়ে দেই, তাহলে সব মানুষ মিলেও সেই ওয়াল ভেদ করতে পারে না। রাবে কারীম যখন মুসলমানদের সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, তখন এত ভয় পাওয়ার দরকার কী? শুধু আল্লাকে ভয় পাওয়ার সবক আমাদের শিখতে হবে।

কাফেরের ইসলাম গ্রহণ করা

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নিচে ঘুমাচ্ছিলেন। এক কাফের দেখল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাচ্ছেন আর তাঁর তলোয়ার পাশের গাছে ঝুলানো আছে। সে ভাবল, এটাই তো সুযোগ। এসময় কিছু একটা করে দেখিয়ে দেব। সে এগিয়ে এসে তলোয়ার হাতে নিল আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম ভেঙে গেল। কাফের জিজ্ঞেস করল, হে মুহাম্মদ! এখন আপনাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ। এই আল্লাহ শব্দের মধ্যে এমন প্রভাব ছিল যে, কাফের এমনভাবে কাঁপতে লাগল যে, তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল।

এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলোয়ারটা নিজের হাতে নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? সে কাঁপতে লাগল। বলল, আপনি দয়াবান মানুষ। খুব ভালো মানুষ। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। প্রমাণ রাখলেন, তিনি রাহমাতুল লিল আলামীন। সে বলতে লাগল, হুজুর আপনি তো আমাকে ক্ষমা করে দিলেন, এবার মেহেরবানি করে আমাকে কালেমাও পড়িয়ে দিন, যাতে আল্লাহও আমাকে ক্ষমা করে দেন। আমি মুসলমান হতে চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে নিলেন।

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা এভাবে বান্দার সাহায্য করে থাকেন। যখন আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করে বান্দা এগিয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সব সময় সফল করেন।

বাহ্যিক উপকরণ যোগাড় করার আদেশ

একটি বিষয় মনে রাখবেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের বলে দিয়েছেন, আমার আদেশ-নিষেধ মেনে চলো। আবার যেহেতু তোমরা দারুল আসবাবে

(কার্যকরণের দুনিয়ায়) বসবাস কর, তাই যথাসম্ভব উপকরণ যোগাড় করার চেষ্টা করো। দুটিরই আদেশ তিনি দিয়েছেন। ঈমানের উপর মেহনত করো, ঈমান মজবুত করো আর উপকরণ যথাসম্ভব যোগাড় করার চেষ্টা করো। কারণ, দুনিয়া দারুল আসবাব। এখানে তোমরা উপকরণ যোগাড় করতে অলসতা করো না। এই মাহফিলের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াতে কারী সাহেব পড়েছেন-

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ

'যে তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো শক্তি অর্জন করো।"[১]

এখানে কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। বলা হয়েছে, তোমাদের সাধ্যমতো। অর্থাৎ যত বেশি জোর লাগানো যায় লাগাও। তার অর্থ হলো, শুধু জমিনে চেষ্টা করবে তা নয়, আকাশেও যদি চেষ্টা করা যায়, তাহলে তাও করো। তোমাদের পক্ষে যদি চাঁদে যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে সেখানেও যাও। মঙ্গলে যাওয়া সম্ভব হলে সেখানেও যাও। যত বেশি চেষ্টা করা যায় করো। তারপরই আল্লাহ তা'আলা আয়াতের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছেন। বলেছেন, এমন শক্তি অর্জন করো, যাতে আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমন ভয় পেয়ে যায়।

কাফেরদের আবদার

হে মুসলমানগণ, তোমরা এমন শক্তি অর্জন করো, যাতে কাফেররা তোমাদের ভয়ে কাঁপতে থাকে। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, মুসলমানদের হাতে শক্তি থাকুক তা কাফেররা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। তারা ভয় পায়। আবদার করে, মুসলমানদের হাতে শক্তি থাকার প্রয়োজন নেই। আমাদের উপর ভরসা করে নাও। আমরা তোমাদের হেফাজত করব। আমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য উজাড় করে দেব। শুধু আমাদের উপর ভরসা করো। আমাদের কাছেই ভিক্ষা চাও। সমস্যা দেখা দিলে আমাদের কাছে আসো। আমাদের খোদা বানিয়ে নাও। কাফেররা পেরেশান হয়ে এসব আবদার করতে থাকে।

---

১ সূরা আনফাল, আয়াত- ৬০

পরাশক্তির পূজা

একসময় মানুষ পাথরের দেব-দেবীর পূজা করত। আজকাল দেব-দেবীর রূপ পরিবর্তন হয়ে গেছে। আজকাল বড়-বড় পরাশক্তিগুলো মানুষের জন্য দেব-দেবীর রূপ ধারণ করেছে। তাদেরকে মানুষ আজকাল এমনভাবে পূজা করছে, যেমন একসময় লাত-মানাতের পূজা করত।

কাফেরদের আযাব

আল্লাহর শক্তির কাছে অন্য কোনো শক্তি কিছুই নয়। আল্লাহর আযাব যখন আসে, তখন মানুষকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। অতীতে বড়-বড় ফেরাউন অতিবাহিত হয়েছে। তাদের কাছে নিজের শক্তির বড় অহংকার ছিল। বলেছিল–

مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে?[১]

আল্লাহ তাদের অবস্থা এমন সূচনীয় করে দিলেন যে, তাদের পাজামা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কুরআন মজিদের আয়াত

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا

'অতঃপর আমি তাদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আযাব আস্বাদন করানোর জন্যে তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু।'[২]

বাতাসও এমন ছিল যে, তা ঈমানদারের জন্য রহমত আর কাফেরের জন্য আযাবে পরিণত হয়েছিল। পরদিন তাদের লাশ জমিনের উপর এমনভাবে পড়েছিল যে,

كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

'তারা অসাড় খর্জুরকাণ্ডের মতো ভূপাতিত হয়ে রয়েছে।'[৩]

এত বড় শক্তিশালী কওমকে আল্লাহ তা'আলা খেজুরের ডালের মতো জমিনের উপর বিছিয়ে দিলেন। তাদের শক্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, তারা পাহাড় খোদাই করে তাতে বাস করত। তাদের মতো শক্তিধর আল্লাহ অন্য কাউকে সৃষ্টি করেননি। এরকম শক্তিশালী কওম যখন আল্লাহর নাফরমানি করল, তখন আল্লাহ তাদের নাম-নিশান পর্যন্ত মুছে দিলেন।

---

১. সূরা হা-মীম সাজদাহ, আয়াত- ১৫

২. সূরা হা-মীম সাজদাহ, আয়াত- ১৬

৩. সূরা হা-ককাহ, আয়াত- ৭

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

'আপনি কি তাদের কারও সাড়া পান অথবা তাদের ক্ষীণতম আওয়াজও শুনতে পান?'[১]

আল্লাহর উপর ঈমানদারদের ইয়াকীন

হে মুসলমানগণ! তোমরা এমনসব কাফেরকে ভয় করছ, যারা অন্ধকারকে ভয় পায়। আজকাল মুসলিম দেশগুলোকে কাফেররা ভয় দেখায়, তোমরা যদি শরিয়তের বিধিবিধান চালু কর, তাহলে তোমাদের উপর অবরোধ দিয়ে দেব। তোমরা না খেয়ে মারা যাবে। তারা তো জানে না, রিযিকের মালিক আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তো রিযিক পৌঁছাবেনই। তারা যদি অবরোধ দিতে চায়, তাহলো দিক। ভালো কথা। আমাদের শিক্ষা হয়ে যাবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করার যোগ্যতা আমাদের মধ্যে এসে যাবে। এত দিন আমরা তাদের উপর ভরসা করে ভুলের মধ্যে ছিলাম। আল্লাহর শুকরিয়া যে, এত দিন পর তাদের উপর থেকে আমাদের ভরসা চলে গেছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা এসে গেছে। আল্লাহর কাছে দু'আ করি, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সাহায্য করুন। আপনার দুর্বল বান্দাদের সফলতা দিন। আল্লাহ দুর্বলদের সাহায্য করেন। তাঁর ওয়াদার উপর আমাদের ভরসা আছে। সুবহানআল্লাহ!

হযরত মুসা (আ.)-এর ঘটনা

হযরত মুসা (আ.)-এর মায়ের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। আর তিনি আল্লাহর ওয়াদার উপর ভরসা করে নিয়েছেন। ফলাফল কী হয়েছে? সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনাটি শুনুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ

'আমি মুসাজননীকে আদেশ পাঠালাম, তাকে স্তন্য দান করতে থাকো। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো।'[২]

---

১. সূরা মারয়াম, আয়াত- ৯৮

২ সূরা কাসাস, আয়াত- ৭

আপনি যদি ভয় পেয়ে যান, ফেরাউনের সৈন্যরা তাঁকে দেখলে জবেহ্ করে দিবে, তাহলে (তাহলে তাঁকে পানিতে ফেলে দিন) তাঁকে তাঁর ও আমার শত্রু উঠিয়ে নেবে।

এখন বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করুন; সে তো চিল্লাবে। সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার, আপনি যদি এই বাচ্চাকে হেফাজত করেন, তাহলে তো এমনভাবে করতে হবে যাতে সৈন্যরা না দেখে। এজন্য আমাকে বলে দিন, আমি কোনো গর্তে তাঁকে লুকিয়ে রাখি। বাচ্চাকে গর্তে রাখলেও পানি এসে গর্ত পুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। আবার কোনো পাত্রে রেখে মুখ বন্ধ করে দিলেও নিঃশ্বাস নিতে পারবে না। মাথায় তো কিছুই আসছে না কী করব। বাতাসের জন্য পথ রাখলে পানি আসতে পারে আবার পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিলে বাতাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিবেক এসব কথা-ই বলবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কী বলছেন দেখুন। আপনি ভয় পাবেন না, চিন্তিত হবেন না। আমি এই বাচ্চাকে আবার আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব। আমি তাঁকে রাসূল বানাব।

হযরত মুসা (আ.)-এর মা আল্লাহর কথার উপর ইয়াকীন করেছেন। বাচ্চাকে দরিয়ার পানিতে ভাসিয়ে দিলেন। তাঁকে ফেরাউনের কর্মচারীরা তুলে আনল। খুলে দেখল, সেখানে সুন্দর একটি বাচ্চা। ফেরাউন আর তার স্ত্রী বাচ্চাকে দেখে এতই পছন্দ করল যে, তাঁকে নিজের ছেলের মতো করে লালন-পালন করার সিদ্ধান্ত নিল।

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي

'আমি তোমার প্রতি মহবত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে।'[১]

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, মুসা (আ.)-এর চোখদুটো এতই সুন্দর আর আকর্ষণীয় ছিল যে, ফেরাউন আর তার স্ত্রী তাঁকে পছন্দ করে ফেলল। ফেরাউনের স্ত্রী বললেন–

لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا

এই বাচ্চাকে খুন করো না। হয়ত এই বাচ্চা আমাদের কোনো উপকারে আসবে। আর আমরা একে আমাদের ছেলেও বানিয়ে নিতে পারি।[২] ফেরাউন

---

১. সূরা তোয়া-হা, আয়াত- ৩৯

২. সূরা কাসাস, আয়াত- ৯

বলল ঠিক আছে। এই বাচ্চাকে আমাদের সন্তান বানিয়ে নিলাম। শাহি ফরমান জারি করা হলো। এই বাচ্চাকে আমরা আমাদের সন্তান বানিয়ে নিয়েছি। আল্লাহর কুদরত দেখুন, যে বাচ্চা দুনিয়াতে না আসার জন্য হাজার-হাজার বাচ্চাকে ফেরাউন খুন করছে সেই বাচ্চার মহবতে সে এখন কাবু হয়ে গেছে।

এদিকে সেই বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন হয়েছে। সেই বাচ্ছা তো কোনো মহিলার দুধই পান করছে না।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ

'পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদের মুসা থেকে বিরত রেখেছিলাম।'[১]

মুসা (আ.) দুধ পান করছে না দেখে ফেরাউনও পেরেশান হয়ে গেল। এখন কী হবে? অনেক মহিলাকে ডাকা হলো। কিন্তু বাচ্চা কারো দুধই পান করে না। এভাবে রাত চলে গেল। এদিকে মুসা (আ.)-এর মায়ের অবস্থাও ছিল আশ্চর্য ধরনের।

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسٰى فَارِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

"সকালে মুসাজননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মুসাজনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্ববাসীগণের মধ্যে।'[২]

বেচারী কান্নাকাটি করছিলেন। মায়ের মন তো। রাত পার হয়ে গেল, আমার বাচ্চার কী অবস্থায় আছে? কাঁদছে, নাকি হাসছে? ঘুমিয়েছে, নাকি জেগে আছে? কার হাতে আছে? এসব ভাবনায় তিনি অস্থির ছিলেন। নিজের মেয়েকে পাঠালেন বাচ্চার খবর নিতে। বললেন, যাও তোমার ভাইয়ের কোনো খবর পাও কিনা দেখো। সে দৌড়ে ফেরাউনের বাড়িতে গিয়ে দেখল, অনেক মহিলা এসেছে বাচ্চাকে দুধ পান করানোর জন্য। কিন্তু কারো দুধ সে পান করছে না। সে ফেরাউনকে বলল,

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

---

১. সূরা কাসাস, আয়াত- ১২

২ সূরা কাসাস, আয়াত- ১০

'আমি তোমাদের এমন একটি পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের জন্যে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙ্ক্ষী?'[১]

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, একথায় ফেরাউনের মনে একটু খটকা লেগেছিল। বলল, সে কে যে এই বাচ্চার হিতাকাঙ্ক্ষী? মেয়েও তো নবীর বোন ছিলেন। বললেন, না মানে আমরা সবাই তো আপনার প্রজা। আমরা সবাই আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। ফেরাউন বলল, ও এই কথা? ঠিক আছে। তাঁকে নিয়ে আসো। বোন এসে মাকে নিয়ে সেখানে গেল। তিনি বাচ্চাকে দুধ পান করালেন। এখন ফেরাউনও খুশি হলেন। বললেন, এই বাচ্চাকে আপনাদের বাড়িতে নিয়ে যান। ভালোমতো দেখাশোনা করবেন। তাঁকে দুধ পান করানোর টাকা আমি পাঠিয়ে দেব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

'অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না।'[২]

দেখলেন তো আল্লাহর ওয়াদা কীভাবে তিনি সত্য করে দেখালেন? এজন্যই বলা হয়েছে, আল্লাহর চেয়ে বেশি সত্য বলার আর কে আছে? সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহর সাহায্যের আশ্চর্য ওয়াদা

আল্লাহ তা'আলা রশদপত্র ছাড়াও বান্দাদের সফল করে দেখিয়েছেন। দেখুন, সাহাবায়ে কেরাম এক সময় দুর্বল ছিলেন। তাদের সামনে এমন কিছু কিল্লা ছিল, যেগুলো তারা বিজয় করতে পারবেন বলে ভাবতেন না। কাফেররাও মনে করত, মুসলমানরা আমাদের এসব কিল্লা জয় করতে পারবে না। তাতে অনেক উঁচু দেওয়াল ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেই কাজকে একেবারেই সহজ করে দিয়েছিলেন। এই আয়াতটির প্রতি মনোযোগ দিন। বনু কুরাইজার ইহুদিরা কিল্লার ভিতর ছিল অনেক দিন থেকে। কিল্লার ভিতরেই ছিল তাদের জীবনযাপন। তারা ভাবত, আমাদের এই কিল্লা কেউ

---

১. সূরা কাসাস, আয়াত- ১২

২. সূরা কাসাস, আয়াত- ১৩

জয় করতে পারবে না। মুসলমানদের মনেও ছিল, এই কিল্লা জয় করা খুবই কঠিন হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি এমন ব্যবস্থা করেছি, যাতে এই কিল্লা সহজেই মুসলমানদের হাতে চলে আসে। আমি কাফেরদের অন্তরে মুসলমানদের ভয় ঢুকিয়ে দিলাম। কাফেররা বসে পরামর্শ করতে লাগল, মুসলমানগণ যেখানেই যায় সেখানে তারা বিজয় অর্জন করে। আমাদের এই কিল্লাও হয়ত তারা জয় করে নিতে পারে। তখন আমাদের কী অবস্থা হবে? তার চেয়ে বরং আমরা কোনো নিরাপদ স্থানে চলে যাই। সুতরাং তারা নিজেরাই এই কিল্লা ছেড়ে অন্যস্থানে চলে গেল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِيْ أَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوْا ۖ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۖ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِأَيْدِيْهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

'তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের, তাদের প্রথমবার একত্রিত করে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে এল, যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ি-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।'[১]

আমি যখনই, চাই তখন মজবুত দুর্গে বসবাসকারীদের দুর্বল লোকদের হাতে নাস্তানাবুদ করে দেই। দেখুন, আল্লাহর ওয়াদা কীভাবে সত্যে পরিণত হলো। আমাদের উচিৎ আল্লাহর ওয়াদার উপর ভরসা করে সেই পথে চলা, যে রাস্তা আমাদের কুরআন দেখিয়েছে। কুরআন বলেছে, হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি-নাছারাদের তোমাদের বন্ধু বানিয়ো না।

---

১ সূরা হাশর, আয়াত- ২

কাফেরদের অবিচার

পরাশক্তিগুলোর অবিচার দেখুন। কোনো অন্যায় কাজ যদি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র করে, তখন পরাশক্তিগুলো বলে, ভালো করেনি, তবে করে যখন ফেলেছে তখন আর কী করা? একই কাজ যদি কোনো মুসলিম রাষ্ট্র করে, তাহলে বলে, তোমরা অন্যায় করেছ। এর ফল তোমাদের ভোগ করতে হবে। তাদের জন্য বাঁচা হারাম করে তোলে। তারা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে পরামর্শ দেয়, তোমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা মজবুত করার দরকার নেই। আমাদের উপর ভরসা করো, যাতে আমরা তোমাদের দুই টুকরা নয় বরং চার টুকরা করে দিতে পারি। যখন আমাদের ইচ্ছা হয় তোমাদের মাটির সাথে মিলিয়ে দেব। বলে, আমরাই তোমাদের রক্ষা করব। আত্মমর্যাদাশীল কোনো গোষ্ঠী কাফেরদের একথার উপর ভরসা করতে পারে না। আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করব।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ছাওয়াব

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বলেছেন যতটা পারা যায় শক্তি অর্জন করতে। তাই মুসলমানদের উচিৎ আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করা, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

মনে রাখবেন, নফল নামায, নফল তেলাওয়াত, নফল ইবাদতের চেয়ে গবেষণাগারে বসে বিজ্ঞানচর্চার মধ্যে অনেক বেশি ছাওয়াব পাওয়া যাবে।

ইসলামের বিজয়

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণার মাধ্যমে মুসলিম দেশের শক্তি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের নিশ্চয় অনেক ছাওয়াব দান করবেন।

প্রত্যেক ময়দানে সামনে বাড়ার চেষ্টা করতে হবে। কাফেরদের ভয় করার দরকার কী? দেখুন, হাদীছ শরীফ থেকে জানা যায়, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এবং তিনি একে ভালো মনে করেছেন যে, মুমিনগণ উপকরণের দিক দিয়েও এগিয়ে থাকুক। এর দলিল হাদীছে আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবন স্থলযুদ্ধ করেছেন। তবে তিনি পরিষ্কার বলেছেন, আমি সেই যোদ্ধাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছি, যারা সর্বপ্রথম ইসলামের জন্য পানিতে যুদ্ধ করবে।

অর্থাৎ আমি তো স্থলযুদ্ধ করেছি। আমার পরে যারা ইসলামের জন্য পানিতে যুদ্ধ করবে, তাদের আমি জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছি। মাশাআল্লাহ। দীনের কাজ যদি পানির যুদ্ধের মাধ্যমেও করতে হয়, জাহাজের মাধ্যমে করতে হয়, তখন যারা ইসলামের জন্য এই যুদ্ধ করবে, তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। সুবহানাল্লাহ!

এজন্য কাজ করে যান। মেহনত করুন। আমরা মুসলমান মায়ের সন্তান। বন্ধুগণ! আল্লাহর কসম, আমাদের মায়েরা যখন আমাদের দুধ পান করাতেন, তখন বিসমিল্লাহ বলতেন। দোলনা ঠেলার সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতেন। বিছানায় শোওয়ানোর সময় সুবহানাল্লাহ বলতেন। কখনো হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল পড়তেন আর কখনো পড়তেন হাসবী রাবী জাল্লাল্লাহ।

এই পদ্য আমি ছোটকালে আমার মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। হে কাফেরের দল, তোমরা এরকম মানুষদের বলছ, আমাদের উপর ভরসা করে থাকো; আমরা তোমাদের হেফাজত করব?

কেন? আমরা কি নিজেদের হেফাজত করতে পারি না? আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দাদের উত্তম বিনিময় দান করুন, যারা ইসলামের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আপনাদের হাতেও যখন কোনো জিনিস থাকবে, তখন কাফেররা সামনে বাড়ার আগে একটু চিন্তা করবে। এটম বোমা প্রয়োগ করার প্রয়োজন যেন না হোক। আল্লাহ না করুন এমন সময় কখনো না আসুক যেন মানুষের জন্য ক্ষতিকর কোনো কিছুর ব্যবহার করতে হয়। কাফেররা যখন সেসব জিনিস হাতে নিয়ে বসে আছে, তখন মুসলমানরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে কেন? মুসলমানদের হাতেও ওদের চেয়ে আরো বেশি শক্তি থাকা চাই।

নবযুগের উত্থান

আজ দেখুন, বিজ্ঞানীরা গমের উপর মেহনত করেছেন। তাই গম এখন আগের চেয়ে বেশি উৎপাদন হচ্ছে। এক সময় ছিল, যখন একটি দানা থেকে দশটি দানা হতো। তারপর হয়েছে পনেরটি। তারপর হয়েছে ত্রিশটি। এখন নাকি মেক্সিপ্যাক গম এসেছে, এ থেকে বত্রিশ দানা হচ্ছে। বড়ই উন্নতি করেছে। এর চেয়েও বেশি পাওয়ার কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন। তোমরা এক দানা ঢালবে তাতে সাতটি শীষ গজাবে। প্রত্যেক শীষে একশটি দানা ধরবে। এভাবে এক দানার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা সাতশ দানা দিবেন।

আমরা তো এখনো বত্রিশ দানাতে পৌঁছেছি। কুরআন বলছে, আমরা সাতশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। সুতরাং এগ্রিকালচার ময়দানে আগে বাড়ুন। এমনিতেও এটা এগ্রিকালচার ইন্সটিটিউট। সুবহানাল্লাহ! এখনো পর্যন্ত আপনারা অনেক কষ্টে পঁচিশ দানা পর্যন্ত হয়ত পৌঁছেছেন। তাহলে দেখুন, আপনাদের সফরে এখনো কত পথ বাকি রয়ে গেছে। কুরআন কতটা টার্গেট দিয়েছে আর আপনারা কতটুকু পৌঁছেছেন। সুতরাং নিজের জিম্মাদারি পালন করুন। আমানতদারীর সাথে জীবনযাপন করুন। আল্লাহ আপনাদের কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দিবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আপনাদের সফল করবেন।

হিম্মতে মরদাঁ মদদে খোদা (বান্দার চেষ্টা আল্লাহর সাহায্য)

তবে অস্থায়ীভাবে কিছু সমস্যা সামনে আসতে পারে। এটা আগেও এসেছে। আমরা যখন সাহসিকতার সাথে সামনে এগিয়ে যেতে কদম বাড়াব, আল্লাহর হক আর বান্দার হক আদায় করব, ইসলামের মর্যাদার জন্য কাজ করব, তখন আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন।

হাদীছ শরীফে এসেছে, মুমিনদের বলে দিন, আমার ইজ্জতের কসম, আমার জালালের কসম, আমি আমার বান্দাদের কাফেরদের সামনে অপমান করব না। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সফল করুন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এক প্রিয় বান্দার কাছে এলহাম করেছেন, হে আমার প্রিয় বান্দা, আপনি মানুষদের বলে দিন, তোমরা যখন গোনাহ্ কর, তখন তোমরা সেই দরজাগুলো তো বন্ধ করে দিচ্ছ, যেগুলো দিয়ে মানুষ তোমাকে দেখবে, কিন্তু যে দরজা দিয়ে আমি দেখব, সেটি তো বন্ধ করছ না। তাহলে কি তোমার দিকে যারা দেখে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম মর্যাদা কী আমার বলেই মনে করছ?

আল্লাহর ভয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى وَقَالَ اللّٰهُ فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ. سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

ভয় আর আশার সারমর্ম

মুমিনের অন্তরের দুটি বিপরীতধর্মী অবস্থা হয়ে থাকে। একটি ভয় অন্যটি আশা। কখনো আশা প্রাধান্য লাভ করে আবার কখনো ভয় প্রাধান্য লাভ করে। আশার অর্থ হলো, আল্লাহর রহমতের উপর এতটা ভরসা হয় যে, মনে হয় তিনি আমার সব গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং আমার পরিণাম ভালো হবে। আর ভয়ের অর্থ হলো, আল্লাহর জালালে শানের কারণে তার বড়ত্ব অন্তরে এভাবে বসে যাওয়া যে, মানুষ গোনাহ থেকে দূরে সরে যায়। তার মন থেকে গোনাহ করার ইচ্ছা দূর হয়ে যায়। একারণে বলা হয়েছে–

اَلْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ

ঈমান হলো ভয় আর আশার মাঝখানে।

আশা আর ভয় কোনটা কখন হওয়া উচিৎ?

মানুষের অন্তরে কখন আল্লাহর আশা প্রাধান্য পাওয়া দরকার? আর কখন আল্লাহর ভয় প্রাধান্য পাওয়া দরকার? এ বিষয়ে মাশায়েখে কেরাম বিস্তারিত লিখেছেন। ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন, যুবক অবস্থায় মানুষের মনে আল্লাহর ভয়ের প্রাধান্য থাকা উচিৎ, যাতে নফসের জোর কমে যায়। আর বুড়ো অবস্থায় আশার প্রাধান্য থাকা উচিৎ, যাতে মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে যায়। সুস্থ অবস্থায় অন্তরে ভয় বেশি থাকা উচিৎ আর অসুস্থ অবস্থায় আশা বেশি থাকা উচিৎ। খুশির অবস্থায় ভয় বেশি থাকা আর পেরেশানির অবস্থায় আশা বেশি থাকা উচিৎ।

মুমিন আর ফাসেকের অবস্থা

যুবকদের উচিৎ তারা যেন আল্লাহর ভয় অন্তরে আসার জন্য দু'আ করে। এটি এমন একটি নেয়ামত, যার কারণে মানুষ ভালো কাজ করতে পারে আর গোনাহ থেকে বাঁচতে পারে। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে না, তার জন্য গোনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। মুমিন বান্দা গোনাহকে এভাবে মনে করে, যেন মাথার উপর একটি পাহাড় ঝুলে আছে আর তা এখনই মাথার উপর পড়বে। আর ফাসেক মনে করে, একটি মশা গায়ের উপর বসেছে, যা তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সমাজে গোনাহকে একেবারেই হালকা মনে করা হচ্ছে। মিথ্যা বলা, গীবত করা, চোগলখুরি করা, হারাম দৃষ্টি ইত্যাদি একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। হালাল-হারামের মধ্যে কোনো ফারাক করছে না। মসজিদে নামাযও পড়ছে আবার বাইরে গিয়ে হারাম কাজও করছে।

এর মূল কারণ এই যে, অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই। মুখে বলে, আল্লাহ বড়। কিন্তু আল্লাহর বড়ত্বের এস্তেহজার অন্তরে নেই। হাফেয ইবনে কাইয়িম (রহ.) লিখেছেন, গোনাহ ছোট নাকি বড় তা দেখো না, বরং সেই সত্তার বড়ত্ব দেখো, যার হুকুমের নাফরমানি তুমি করছ। কত আশ্চর্য কথা বলেছেন। নাফরমানি করা হচ্ছে তাও আবার পরওয়ারদেগারে আলমের! আল্লাহু আকবার। আল্লাহর নাফরমানি কখনো ছোট হয় না। এটা তো আল্লাহর মেহেরবানি যে, তিনি ক্ষমা করে দেন।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

বনী ইসরাইলে দামুছ (রহ.) নামের এক বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। একবার তিনি তার গ্রামের বাইরে বের হলেন। দেখলেন, সামনে একটা পাহাড়। তাতে গাছ-পালা কিছুই নেই। সব কিছুই যেন শুকনা। তিনি মনে-মনে বললেন, এই পাহাড়ে যদি সবুজ বন, লতা-পাতা, বৃক্ষ, পাখপাখালি হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো। দেখতেও সুন্দর লাগত। তখন আল্লাহ তার অন্তরে এলহাম করলেন, হে আমার প্রিয় বান্দা, তুমি তো আমার ইবাদত ছেড়ে আমার পরামর্শদাতা হয়ে গেছ। আমার সৃষ্টির মধ্যেও তুমি এখন অপূর্ণতা দেখতে পাচ্ছ।

এই এলহামের পর তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি মনে-মনে নিয়ত করলেন, এই গোনাহ আল্লাহ আমাকে যতক্ষণ ক্ষমা করে না দিবেন, ততক্ষণ আমি নিজেকে শাস্তি দিতেই থাকব। এটা আল্লাহর বান্দাদের একটি পদ্ধতি

যে, কোনো গোনাহ হয়ে গেলে তারা নিজের উপর কোনো শাস্তি নির্ধারণ করে নেন। দামুছ (রহ.)ও নিয়ত করলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে না দিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খানাও খাব না আর পানিও পান করব না। রোযার অবস্থাতেই থাকব। এটা আল্লাহ আর বান্দার মধ্যে একটি বিশেষ ব্যাপার হয়ে থাকে। হযরত থানবী (রহ.)ও লিখেছেন, বান্দার যদি কখনো কোনো গোনাহ হয়ে যায়, তাহলে সে যেন নিজের উপর কোনো শাস্তি নির্ধারণ করে নেয়। যেমন– দান-ছদকা করা, নফল নামায আদায় করা ইত্যাদি। এতে নফস ভয় পেয়ে গোনাহ ছেড়ে দিবে।

দামুছ (রহ.) তিন-চার দিন পর এক গ্রামে গেলেন। সেখানে একটি খানাপিনার আয়োজন হচ্ছিল। গ্রামবাসীরা খাবার রান্না করছে। যখন সবাই খানা খেতে বসছিল, তখন দামুছ (রহ.)কেও তারা খেতে অনুরোধ করল। তিনি বললেন, না, আমি খাব না। তারা আরো বেশি জোর দিয়ে বলল, তখন তিনি বললেন, না আমি খেতে পারব না। তারা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি ঘটনা খুলে বললেন। তারা বলল, ও এই কথা? এটা কোনো বড় বিষয় না। আপনি খানা খান। সেই গোনাহের শাস্তি আমরা সবাই মিলে ভোগ করে নেব। যখন তারা একথা বলল, তখন দামুছ (রহ.)-এর কাছে আল্লাহ এলহাম করলেন, আপনি এই গ্রাম থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যান। তিনি যখন গ্রাম থেকে বের হলেন, সাথে-সাথে আল্লাহ সেই গ্রামকে মাটিতে ধসিয়ে দিলেন।

গোনাহ থেকে বাঁচার একটি উপায়

দুনিয়ার পুলিশ মানুষকে গোনাহ থেকে বাঁচাতে পারে না। আর কোনো মানুষও অন্যকে গোনাহ থেকে বাঁচাতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর ভয় এমন একটি নেয়ামত, যা মানুষকে একাকি অবস্থায়ও গোনাহ থেকে বাঁচাতে পারে। আপনি চিন্তা করুন, যার ফাঁসীর আদেশ হয়ে গেছে, কালই যাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে, আজ কি সে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতে পারে? সে তো পেরেশান যে, কাল সকালে আমাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। তার তো অশ্লীল কাজের দিকে মনই যাবে না। যেভাবে ফাঁসির ভয়ে সে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, একইভাবে আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিগণ আল্লাহর ভয়ে গোনাহ থেকে বিরত থাকেন।

দুশ্চিন্তা আর ভয়ের মধ্যে পার্থক্য

মাশায়েখে কেরাম লিখেছেন, দুশ্চিন্তা আর ভয়ের মধ্যে ফারাক আছে। দুশ্চিন্তা বলা হয়, ভিতরের পেরেশানিকে আর ভয় বলা হয় বাইরের শঙ্কাকে।

যখন মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়, তখন সে খানাপিনা ঠিকমতো খেতে পারে না। আপনারা হয়ত খেয়াল করে থাকবেন যে, যে মায়ের সন্তান মারা গিয়েছে; তিনি কিছু দিন ঠিকমতো খানাপিনা খেতে পারেন না। খেতে মন চায় না। যে ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করেছে, সেও ঠিকমতো খেতে পারে না। ব্যবসায়ী যখন লোকসানের খবর শোনে, সেও খানাপিনা ঠিকমতো খেতে পারে না। আর যখন মানুষের মনে আল্লাহর ভয় থাকে, তখন তার দ্বারা গোনাহ সংগঠিত হয় না।

দুধের বাটির হেফাজত

একলোক এক বুজুর্গ ব্যক্তির নিকট গেলেন। গিয়ে বললেন, হযরত! আমি বাজারে কাজ-কারবার করি। তাতে বেগানা মহিলাদের দিকে চোখ যায়। আমি চেষ্টা করি সে দিকে না দেখার জন্য; কিন্তু পারি না। বুঝতে পারছি না, আমি কী করব। বুজুর্গ বললেন, ঠিক আছে; আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

বুজুর্গ বললেন, আমি আপনাকে এক বাটি দুধ দিচ্ছি। এই দুধগুলো আপনি বাজারের ভিতর দিয়ে গিয়ে অমুক বুজুর্গের কাছে নিয়ে যাবেন। তবে একটি শর্ত আছে, আপনার সাথে আমি একজন মানুষ দেব। কোথাও যদি এক ফোঁটা দুধও পড়ে যায়, তাহলে সে আপনাকে সাথে-সাথে জুতা দিয়ে বাড়ি দিতে থাকবে। সে বলল, ঠিক আছে দিন; আমি নিয়ে যাচ্ছি। বুজুর্গ একটা বাটি দুধে পূর্ণ করে তাকে দিলেন। সে দুধগুলো নিয়ে বাজার পার হয়ে যাচ্ছে। এক ফোঁটা দুধ যেন কোথাও না পড়ে, সেজন্য দুধের দিকে এক ধ্যানে চেয়ে থাকল। বলা তো যায় না, যদি একটু পড়ে যয়ি, তাহলে বাজারের মধ্যেই জুতার বাড়ি খেতে হবে। সাথের মানুষটিও মাশাআল্লাহ মোটাসোটা আছে।

যুবক আল্লাহ আল্লাহ করে বাজার অতিক্রম করে যেখানে দুধ নিয়ে যাওয়ার কথা সেখানে নিয়ে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, হযরত! দুধ পৌঁছিয়ে দিয়েছি। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, এবার বলুন, বাজারে কতগুলো চেহারা দেখেছেন? তিনি বললেন, সেদিকে তো আমার খেয়ালই যায়নি। কারণ, আমার খেয়াল ছিল দুধের দিকে, যাতে দুধ না পড়ে যায়। হযরত বললেন, কারো চেহারার দিকে খেয়াল গেল না কেন? তিনি বললেন, হযরত আমার ভয় করছিল, যদি একটু দুধ পড়ে যায়, তাহলে এ আমাকে বাজারের মধ্যেই অপমান করে দেবে।

তার জবাব শুনে হযরত বললেন, আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদেরও এই অবস্থা হয়ে থাকে। তাদের অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ থাকে। তারা নিজেদের বাঁচানোর ফিকিরের মধ্যে থাকে সব সময়, যাতে এমন যেন নাহয় যে, কোথাও গোনাহ হয়ে গেল আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন সবার সামনে অপমান করে দেন। আল্লাহর বান্দারা ভয় পান, যাতে কিয়ামতের দিন লজ্জিত না হতে হয়।

পবিত্র ব্যক্তিবর্গ

ইমামে রাবানী মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) বলেন, এই উম্মতের মধ্যে এমন পবিত্র ব্যক্তিও ছিলেন, চল্লিশ বছর পর্যন্ত গোনাহ লেখার ফেরেশতারা যাদের গোনাহ লিখতে পারেনি। শরীয়তের অপছন্দ তাদের নিজের স্বভাবের অপছন্দে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। শরীয়তের বিপরীত কোনো কাজ করার চিন্তা তাদের মাথায়ও আসত না। তারা আল্লাহর বড়ত্ব বুঝতেন। আল্লাহর শান ও শওকত বুঝতেন। আল্লাহর ভয় তাদের অন্তরে সদা জাগ্রত থাকত।

আল্লাহর ভয় আসার জন্য মাছনুন দু'আ

হাদীছ শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা যেন আল্লাহর ভয় অন্তরে আসার জন্য দু'আ করি। আল্লাহর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنِیْ وَبَيْنَ مَعْصِيَتِیْ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার এমন ভয় চাই, যা আমার আর আমার গোনাহের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়।'

এক রাখালের অন্তরে আল্লাহর ভয়

একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) কোনো এক জঙ্গলে বসা ছিলেন। সেখানে এক রাখাল এল। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, এসো আমাদের সাথে খাও। সে বলল, আমি রোযাদার। হযরত আশ্চর্য হলেন। ভাবলেন, সারা দিন গরম রোদের মধ্যে ছাগল চরিয়েও এই যুবক রোযা রেখেছে। মনে-মনে বললেন, তাঁকে একটু পরীক্ষা করা যাক। বললেন, তোমার ছাগলগুলোর মধ্য থেকে একটা আমাদের কাছে বিক্রি করে দাও। জবেহ করে আমরা খাব আর সন্ধ্যার সময় তুমিও খাবে। সে বলল, এই ছাগলগুলো আমার নয়। এগুলো আমার মালিকের। হযরত বললেন, মালিক

তো এখানে নেই। বলে দিয়ো, একটা ছাগল বাঘে খেয়ে ফেলেছে। যুবক বললেন, আমার মালিক নেই ঠিক; তবে তার মালিক তো আছেন। আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন।

সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে আল্লাহর ভয় সদা জাগ্রত থাকত যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। একারণে তারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতেন।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একবার হযরত ওমর (রাযি.) রাতের বেলা গলিগুলোতে পাহারা দিচ্ছিলেন। ভোরের দিকে এক ঘর থেকে মহিলাদের কথা বলার শব্দ আসছিল। তিনি কাছে গিয়ে শোনার চেষ্টা করলেন। এক বৃদ্ধা তার মেয়েকে বলছে, ছাগল কি দুধ দিয়েছে? মেয়ে বলল, জি আম্মা, দিয়েছে? বুড়ী বললেন, কত দিয়েছে? মেয়ে বলল, অল্প। বুড়ী বললেন, দুধওয়ালা এলে তো সে পুরো দুধই চাইবে। মেয়ে বলল, দুধ তো পেয়েছি অল্প। বুড়ী বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তাতে একটু পানি মিশিয়ে দাও। মেয়ে বলল, আমি কেন তাতে পানি মিশাব। মা বললেন, হযরত ওমর তো আর এখানে আমাদের দেখছেন না। মেয়ে বলল, হযরত ওমর না দেখলেও তার মালিক তো আমাদের দেখছেন, আল্লাহ তো আমাদের দেখছেন।

ওমর (রাযি.) একথা শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন আর চলে এলেন। সকালে তাদের ডেকে পাঠালেন। জানতে পারলেন, মেয়েটির বিয়ের বয়স হয়েছে। হযরত নিজের ছেলের জন্য মেয়েটিকে পছন্দ করলেন। তাঁকে ছেলের বউ বানালেন। পরে এই মেয়েই হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের মা হয়েছিলেন।

আল্লাহর ভয়ের স্তর

আল্লাহর ভয়ের বিভিন্ন স্তর হয়ে থাকে। ইমাম গাযযালী (রহ.) তা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।

১. সাধারণ মানুষের ভয়

তিনি বলেন, আল্লাহর ভয়ের মধ্যে প্রাথমিক হচ্ছে সাধারণ মানুষের ভয়। তাদের ভয় এরকম যেমন আমি যদি এই গোনাহ করি, তাহলে মানুষ আমাকে অপমান করবে। তিনি বলেন, তার উপমা এরকম যেন বাচ্চা কোনো ভুল করলে তার বাবার হাতে মার খাওয়ার ভয় করে।

২. সালেহীনদের ভয়

আরেকটি ভয় আছে আরো একটু উপরের স্তরের, যাকে সালেহীনদের ভয় বলা হয়। সেটা এরকম যে, তারা ইবাদত তো করেন, তবুও ভয় করেন যে, যতটা ইবাদত করা প্রয়োজন ছিল ততটা হয়নি। জানি না, আল্লাহ কবুল করছেন কিনা। নামাযও পড়েন আবার ভয়ও করেন কবুল হলো কিনা ভেবে। কেউ যদি তাদের বলে, আপনি হজ করে এসেছেন, আপনাকে মোবারকবাদ, তখন তারা বলে, দু'আ করুন যেন আল্লাহ কবুল করেন। নেক কাজও করেন আবার কবুল হলো কিনা এ নিয়ে ভয়ও করেন। যেমন– কোনো মেয়েকে তার বান্ধবীরা বিয়ের জন্য সাজাচ্ছে। সবাই তার রূপের প্রশংসা করছে আর সে কান্নাকাটি করছে। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, তুমি কাঁদছ কেন, সে বলল, যার জন্য তোমরা আমাকে এত সাজাচ্ছ আমি তার পছন্দ হই কিনা তা ভেবে কাঁদছি। তার যদি পছন্দ না হই, তাহলে এত রূপের আর মূল্য কী? তার কাছে পছন্দ হলেই শুধু এই রূপের দাম আছে। নাহলে নেই। এটাই সালেহীনদের ভয়ের উপমা। নামাযও পড়েন, তেলাওয়াতও করেন; আবার কবুল হলো কিনা তা নিয়ে ভয়ও করেন।

৩. আরেফীনদের ভয়

আরেকটা ভয় আছে আরো একটু উপরের স্তরের। একে আরেফীনদের ভয় বলা হয়। তারা ইবাদতও করেন আবার মনে করেন যে, আমার এই ইবাদত আল্লাহর শানের সামনে কিছুই না। ইমাম আজম (রহ.) চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার নামাযের অজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। আর যখন হারাম শরীফে গেলেন, তখন মাকামে ইবরাহীমে দুই রাকাত নামায পড়ে দু'আ করছিলেন, হে আল্লাহ! যেভাবে আপনার ইবাদত করা প্রয়োজন ছিল, সেভাবে করতে পারিনি। আর যেভাবে আপনাকে চেনা প্রয়োজন ছিল, সেভাবে চিনতে পারিনি।

৪. কামেলীনদের ভয়

ভয়ের আরেকটি স্তর আছে আরো একটু উপরের। একে কামেলীনদের ভয় বলা হয়। তাঁরা আমল করেন, তারপরও ভয় করেন, আল্লাহ তা'আলার অমুখাপেক্ষিতার দৃষ্টি যেন আমার উপর না পড়ে যায়। তাঁরা জানেন, আমার ইবাদাত আল্লাহ শানের সামনে কিছুই না। আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতার দৃষ্টি যখন উঠে যায়, তখন বালআম বাউরের চারশত বছরের ইবাদতকেও তিনি

অকেজো করে দেন। আমাদের পাল্লায় তো চল্লিশ বছরের ইবাদাতও নেই। তাঁরা এই বিষয়টিকে ভয় করেন যে, আল্লাহ তা'আলার কোনো গোপন তদবীর যেন সামনে এসে না যায় আর মৃত্যুর সময় যদি কালেমা নসিব হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের আগে এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষ সকালে ঈমানদার থাকবে আর সন্ধ্যায় ঈমান ছাড়া হয়ে যাবে। আমরা আজকাল সেই যামানায় জীবনযাপন করছি।

আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের ভয়

এক সাহাবী বসে কাঁদছিলেন। কেউ একজন জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর বড়ত্বের কথা চিন্তা করে ভয়ে কাঁদছি। জিজ্ঞেস করলেন, কোনো গোনাহের কাজ হয়ে গেছে নাকি? সাহাবী সামনে পড়ে থাকা গমের একটি দানা হাতে নিয়ে বললেন, আমি কসম করে বলতে পারি, আমার জীবনের গোনাহগুলো এই গমের ওজনের চেয়েও কম হবে, তবুও কাঁদছি একারণে যে, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে শেষে ঈমান থেকে বঞ্চিত না করেন।

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাযি.)-এর অন্তরে আল্লাহর ভয়

একারণেই উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) সারা রাত এই আয়াতটি পড়ে কাটিয়ে দিয়েছেন,

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ
الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

'যদি গোনাহগারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা কেয়ামতের দিন সে সবকিছুই নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেবে। অথচ তারা দেখতে পাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না।'[১]

যদিও এই আয়াত কাফেরদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, তবুও তিনি আয়াত পড়ে কাঁদছেন যেন আমার বেলায়ও এই অবস্থা না হয়।

---

১ সূরা যুমার, আয়াত- ৪৭

হযরত ওমর (রাযি.) ও আল্লাহর ভয়

একবার হযরত ওমর (রাযি.) পান করার জন্য পানি চাইলে তাঁকে শরবত দেওয়া হলো। তিনি শরবত পান করছিলেন আর তাঁর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। কেউ জিজ্ঞেস করল, হযরত! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমাকে কুরআন মজিদের একটি আয়াত কাঁদাচ্ছে। এমন যেন না হয় যে, আমাকে বলে দেওয়া হয়–

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

'তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ।'[১]

এখানে যা নেয়ামত আমি পাচ্ছি, তা যেন দুনিয়াতেই আমার নেকীর বদলা হয়ে না যায়। তিনি এতই কাঁদতেন যে, চোখের পানি পড়ার কারণে তাঁর গালের উপর দাগ পড়ে গিয়েছিল। অথচ তিনি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ সাহাবার মধ্যে ছিলেন। তারপরও তিনি বেশি কাঁদতেন। মানুষ যত দিন এই দুনিয়া থেকে চলে না যায়, তত দিন শয়তানের হাতকড়ার কোনো বিশ্বাস নেই।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর আল্লাহর ভয়

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। তাঁর শেষ অবস্থায় শাগরেদগণ কালেমা তাইয়িবাহ পড়ছিলেন। হযরত শুধু পড়ছিলেন 'লা'। আর কিছুই পড়ছিলেন না। বারবার তিনি একই শব্দ বলছিলেন। শাগরেদগণ পেরেশান হয়ে গেলেন। পুরো কালেমা কেন মুখে আসছে না? আল্লাহ তা'আলা রহমত করেছেন তিনি একটু সুস্থতা বোধ করলেন। ছাত্রগণ জিজ্ঞেস করলেন, হযরত আমরা সবাই যখন কালেমা পড়ছিলাম, তখন আপনি শুধু 'লা' বলছিলেন কেন? তিনি বললেন, সেই সময় আমার সামনে শয়তান এল। সে আমাকে বলছিল, আহমদ ইবনে হাম্বল, আপনি তো ঈমান নিয়েই দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। তখন আমি শয়তানকে বলছিলাম 'লা'। না হে মরদুদ শয়তান! যতক্ষণ না আমার রূহ চলে যাচ্ছে তখন পর্যন্ত তোমার শয়তানী থেকে আমি নিরাপদ নই। যেসব পবিত্র আত্মা সারা জীবন দীনের জন্য মেহনত করেছেন, কুরআন মাখলুক কিনা তা নিয়ে যাকে এত দোররা মারা হয়েছে যে, হাতিকে মারলেও তাঁর অসহ্য হত,

---

১ সূরা আহযাব, আয়াত- ২০

এরকম বড় কোরবানীদাতা ব্যক্তি পর্যন্ত শেষ সময়ে এতই ভয় পাচ্ছেন যে, জানি না, আমার কি অবস্থা হয়। আমাদের অবস্থা একটু চিন্তা করুন।

হযরত হাসান বছরী (রহ.) ও আল্লাহর ভয়

সাহাবী, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন-এর যুগে ময়াশায়েখে কেরাম বেশি ছিলেন। হাসান বসরী (রহ.)-এর ব্যাপারে বলা হয়, তিনি যখন হাঁটতেন, তখন তাঁকে খুব পেরেশান দেখাত, যেন কোনো ব্যক্তি এখনই তাঁর বাবাকে দাফন করে আসছে। আর যখন বসতেন, তখন এমন মনে হতো যেন কোনো অপরাধের কারণে ফাঁসির আদেশ হয়ে গেছে। তিনি এতই কান্নাকাটি করতেন যে, তাঁর চোখের পানি মাটিতে গড়িয়ে পড়ত।

রাবেয়া বসরীর আল্লাহর ভয়

রাবেয়া বসরী (রহ.)-এর ব্যাপারে কিতাবে লেখা আছে, তিনি আল্লাহর ভয়ে এতই কাঁদতেন যে, তাঁর চোখের পানি মাটিতে পড়ত। কোনো-কোনো সময় এত বেশি পড়ত যে, মাটিতে ঘাস গজিয়ে যেত।

হযরত হানযালা (রাযি.) ও আল্লাহর ভয়

আমাদের আকাবিরদের মনের অবস্থা সামান্য পরিবর্তন হলেই তাঁরা কান্না শুরু করে দিতেন। একবার হযরত হানযালা (রাযি.) ঘর থেকে বের হয়ে বলতে লাগলেন, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার সাহচর্যে আমাদের মনের যে অবস্থা থাকে বাড়িতে গেলে তা আর থাকে না। হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে।

মুনাফিকির ভয়

হযরত ওমর (রাযি.)-এর ব্যাপারে লেখা আছে, তিনি তাঁর খেলাফতের যুগে একবার হযরত হুযায়ফা (রাযি.)কে ডেকে বললেন, ভাই! আপনাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের নাম বলেছেন আবার এই নামগুলো কাউকে বলতেও নিষেধ করেছেন। আমি তো সেই নামগুলো জিজ্ঞেস করতে পারি না, তবে আপনি আমাকে এতটুকু বলে দিন যে, আমার নাম সেই তালিকায় নেই তো?

আমার বন্ধুগণ, এই ঘটনাগুলো কোনো সাধারণ ঘটনা নয় যে, আমরা পড়ে সামনে চলে যাব বা এক কানে শুনে অন্য কানে বের করে দেব। বরং এগুলো আমাদের কিছু সবক দিচ্ছে যে, আমাদের অন্তরেও আল্লাহর ভয়

থাকা চাই, যাতে আমরা গোনাহ থেকে বাঁচতে পারি। আজকাল তো গোনাহে লিপ্ত হওয়া এতই মামুলি বিষয় মনে করা হচ্ছে, যেন কোনো একটি খড় ছিঁড়ে টুকরো করে দেওয়া। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কোনো চার বছরের বাচ্চাও যদি কারো সামনে থাকে, তখন কেউ অশ্লীল কাজ করে না। কিন্তু যখন একাকী হয়ে যায়, তখন আল্লাহ জানেন কত রকমের অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাঁর এক প্রিয় বান্দার কাছে এলহাম করেছিলেন, হে আমার প্রিয় বান্দা, আপনি মানুষকে বলে দিন, তোমরা যখন গোনাহ কর, তখন মাখলুক দেখতে পারে এমনসব দরজা বন্ধ করে দিয়ে থাক, কিন্তু সেই দরজা বন্ধ কর না যা দিয়ে আল্লাহ দেখতে পারেন। তাহলে তোমাদের দিকে যারা দেখতে পারে, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কম মূল্য তুমি আল্লাহকেই দিলে!

একটি ইলহামী কথা

আমরা আল্লাহর দেওয়া খানা খাই আবার তাঁর বদনামও করি। তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে অলসতা করি। আতা ইবনে আবি রাবাহ (রহ.) বলেন, একবার আমার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এলহাম করলেন, হে আমার প্রিয় বান্দা, তুমি সামান্য কষ্ট পেলেও মানুষের কাছে আমার শেকায়ত শুরু করে দাও। অথচ তোমার গোনাহে ভরা আমলনামা আমার কাছে আসে; আমি তা নিয়ে ফেরশতাদের মাঝে বসে তোমার শেকায়েত করি না।

সবচেয়ে উচ্চ স্তরের ভয়

সবচেয়ে উচ্চ স্তরের ভয় হলো, মানুষ গোনাহ করবে না, তারপরও ভয় করবে এই ভেবে যে, না জানি আল্লাহ আমার অবস্থা কেমন করেন। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দুধের বাচ্চার জানাযা পড়িয়ে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! একে কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ তো ছোট বাচ্চা! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ বলেছেন–

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

'আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।'[১]

---

১ সূরা সোয়াদ, আয়াত- ৮৫

যেভাবে আগুন ধরানোর জন্য চুলায় লাকড়ি দেওয়া হয়, সেভাবে আল্লাহ তা'আলা যদি বাচ্চাদের সৃষ্টি করে জাহান্নামে ঢেলে দেন, এটাও তাঁর ইনসাফ। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। কারো কিছুই বলবার থাকবে না। হে আল্লাহ! এরকম কেন করলেন? জিজ্ঞেস করবার কারো অধিকার নেই। তিনি সৃষ্টিকর্তা। আর সৃষ্টিকর্তার একক অধিকার থাকে। কোনো মানুষ যদি বাজার থেকে লাকড়ি কিনে আনে, পরের দিন যদি সে তা আগুনে নিক্ষেপ করে, তাহলে কার কী বলার থাকতে পারে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পূর্ণ এখতিয়ার আছে; তিনি যদি এরকম ছোট বাচ্চাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন, তবুও কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার অধিকার রাখে না।

এক হাদীছে এসেছে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট্ট মেয়ের জানাযা পড়ার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ফিরে আসার সময় ঘরের কোনো এক মহিলা বলল, ছোট্ট মেয়েটি জান্নাতের পাখিদের মধ্যে একটি পাখি ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কী জান, আল্লাহ তার পরিণাম কী করবেন?

ভয় কত টুকু?

যতক্ষণ না মুমিন বান্দা পুলসিরাত পার হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ ভয় থাকবে। একথা ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন। কেননা, কুরআন মজিদে আছে,

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না। এটি আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা।'[১]

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

'অতঃপর আমি পরহেযগারদের উদ্ধার করব এবং জালেমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।'[২]

বোঝা গেল, মুমিন যতক্ষণ পর্যন্ত পুলসিরাত পার হয়ে না যাবে, ততক্ষণ সে ভয় থেকে নিরাপদ নয়। যে মুহূর্তে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে, তখন থেকে ভয় চিরতরে দূর হয়ে যাবে এবং চিরস্থায়ী খুশির সময় শুরু হয়ে যাবে।

---

১ সূরা মারয়াম, আয়াত- ৭১

২ সূরা মারয়াম, আয়াত- ৭২

আল্লাহর ভয় কামনা করার পদ্ধতি

আমরা যেখানে দুনিয়াবী বিভিন্ন নেয়ামত আল্লাহর কাছে চেয়ে থাকি, সেখানে আল্লাহর ভয়ও কামনা করব। এটি এমন একটি নেয়ামত, যার কারণে মানুষ গোনাহ ত্যাগ করতে পারে। এজন্য দু'আ করার সময় বলবেন, হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এমন ভয় কামনা করছি, যা আমাকে গোনাহ থেকে দূরে রাখবে।

ভয়ের স্তর

মানুষ আর জিন ছাড়া অন্য সকল প্রাণীর মধ্যে ভয়ের স্তর বিদ্যমান। হে মানুষ, তুমি আশরাফুল মাখলুকাত। কিন্তু তোমার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই। উচিৎ ছিল, অন্য সকল প্রাণীর চেয়ে তোমার মধ্যে আল্লাহর ভয় বেশি থাকবে।

ফেরেশতাদের মধ্যে আল্লাহর ভয়

হাদীছ শরীফে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে যাওয়ার সময় যখন সপ্তম আসমানে পৌঁছলেন, তখন তিনি এমন অনেক ফেরেশতা দেখলেন, যারা সিজদার অবস্থায় রয়েছে। তাঁরা এত বড় ছিল যে, তাদের গর্দানের মাঝখানে কয়েক মাইলের দূরত্ব হবে। তাদের অনেকগুলো পাখা ছিল। তাঁরা সিজদায় পড়ে কাঁপছিল। কাঁপার কারণে তাদের শরীর থেকে এক প্রকার শব্দ বের হচ্ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? তাঁরা সিজদায়ও আছে আবার তাদের শরীর থেকে শব্দও আসছে? জিবরাঈল (আ.) উত্তর দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এরা যখন থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তখন থেকে সিজদার অবস্থায় রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা এই অবস্থায়ই থাকবে। তাদের উপর আল্লাহর ভয় এতই প্রভাব ফেলেছে যে, তাঁরা আল্লাহর ভয়ে কাঁপছে। এই কাঁপুনি থেকেই শব্দ বের হচ্ছে।

হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আল্লাহর ভয়

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, হে জিবরাঈল, আমার রহমাতুল লিল আলামীন হওয়া থেকে আপনি কি কোনো অংশ পেয়েছেন? জিবরাঈল (আ.) বললেন, পেয়েছি হে আল্লাহর নবী! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

জিজ্ঞেস করলেন, তা কীভাবে? জিবরাঈল (আ.) বললেন, দুনিয়াতে আপনার আগমনের পূর্বে আমি নিজের পরিণাম সম্পর্কে খুব ভয়ের মধ্যে থাকতাম। আমি অনেক ভালো মানুষের খারাপ পরিণতি দেখেছি। শয়তানের পরিণতিও আমার সামনে ছিল। যে কারণে আমি খুব ভয়ের মধ্যে থাকতাম যে, না জানি আমার পরিণাম কী হয়। কিন্তু যখন আপনি তাশরীফ আনলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর একটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

নিশ্চয় কুরআন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী,

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ

যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী,

مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন।[১]

এর দ্বারা আমি আমার পরিণাম বুঝতে পারলাম। আপনার রহমতুল লিল আলামীন হওয়ার উসিলায় আমার উপর দুশ্চিন্তার যে বোঝা ছিল, তা থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি। সুবহানাল্লাহ!

আরশে আল্লাহর জালালের প্রভাব

হাদীছে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আরশের উপরে যাচ্ছিলেন, তখন আরশ থেকে এমন শব্দ আসছিল যেমন কোনো কিছুতে ভারী জিনিস রাখলে হয়। যেমন কোনো চেয়ারে যদি কোনো ভারী মানুষ বসে, তখন সেখানে একটু আওয়াজ হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের আওয়াজ? তিনি উত্তর দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আরশের উপর আল্লাহর জালালের এমন প্রভাব পড়েছে যে, আরশ তাতে শব্দ করছে।

মাখলুকাতের তাসবীহ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষ ছাড়া আল্লাহর যত মাখলুকাত আছে, সবাই আল্লাহর ইবাদত করে। কুরআনুল কারীমে আছে–

---

১ সূরা তাকভীর, আয়াত- ১৯-২১

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

'এবং এমন কিছু নেই, যা তার প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না।'[১]

মাখলুকাতের মধ্যে নামাযের আরকানের ভাগ

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ

'প্রত্যেকেই তার যোগ্য ইবাদত, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে।'[২]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা গাছগুলোকে কিয়ামের অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। তারা সারা জীবন কিয়ামের অবস্থায় থাকবে। আল্লাহ তা'আলা চতুষ্পদ প্রাণীকে রুকুর অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। তারা সারা জীবন রুকুর অবস্থায় থাকবে। আল্লাহ তা'আলা পোকা-মাকড়কে সিজদার অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। তারা সারা জীবন সিজদার অবস্থায় থাকবে। আল্লাহ তা'আলা পাহাড়গুলোকে আত্তাহিয়াতুর অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। তারা সারা জীবন আত্তাহিয়াতুর অবস্থায় থাকবে।

হে আদম সন্তান, মাখলুকাত শুধু একটি করে ইবাদত পেয়েছে; তারা সারা জীবন সেটিই আদায় করে যাচ্ছে। আর তোমাকে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ইবাদাতের সমষ্টি দিয়েছেন। তুমি কিয়াম করলে গাছের ইবাদতের সাথে একটি সাজুয্য পাওয়া যায়। তুমি রুকু করলে চতুষ্পদ প্রাণীর ইবাদতের ছাওয়াবও তোমাকে দেওয়া হয়। সিজদা করলে তোমাকে পোকামাকড়ের ইবাদতের ছাওয়াবও দেওয়া হয়। আত্তাহিয়াতুতে তোমাকে পাহাড়ের ইবাদতের ছাওয়াব দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কত বড় দয়া করেছেন যে, তোমাকে পরিপূর্ণ ইবাদত দিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, তুমি যখন নামাযে দাঁড়াও সেখানেও তুমি দুনিয়ার চিন্তা কর।

---

১ সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত- ৪৪

২ সূরা নূর, আয়াত- ৪১

গাছের রুকু ও সিজদা

হাদীছ শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা ছায়াদার ও ফলদার গাছের নিচে প্রস্রাব-পায়খানা করো না। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাল্লাহ, এতে হেকমত কী? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গাছের ছায়া যখন ছোট-বড় হয়, তখন গাছ রুকু-সিজদা করে।

উটের মনে আল্লাহর ভয়

হাদীছ শরীফে এসেছে, এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। হুজুর বললেন, কী কথা? সাহাবী বললেন, আমার একটি উট আছে। আমি সারা দিন কষ্ট করি। উটের পিঠে করে জিনিসপত্র এদিক-সেদিক নিয়ে যাই। আমি উটের খানাপিনা ঠিকমত দেই। কিন্তু যখন আমি রাতে ঘুমাতে যাই, তখন সে এমন শব্দ করে যে, আমি ঘুমাতে পারি না। আপনি একটু দু'আ করুন, যাতে এই উট আমাকে ঘুমাতে দেয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন, এক পক্ষের কথা তো শুনলাম; এখন অন্য পক্ষের কথাও শুনতে হবে। তুমি উটটি নিয়ে আসো। কিতাবে লেখা হয়েছে, উটটি আদবের সাথে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আত্তাহিয়াতুর অবস্থায় বসল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটকে বললেন, তোমার মালিক তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, সে তোমার খানপিনা ঠিকমত দেয়; তবুও তুমি রাতে এমনভাবে শব্দ কর, যাতে তাঁর ঘুমের অসুবিধা হয়; এর কারণ কী?

এই কথা শুনে উটের চোখে পানি চলে এল। সে বলল, ইয়া রাসূল্লাল্লাহ, আমরা দুজনই সারা দিন মেহনত করি। তিনি আমার খানাপিনা ঠিকমত দেন। আমিও চেষ্টা করি তাঁর যেন সমস্যা না হয়। তিনি আমার পিটে বোঝা রাখেন আর আমি তা জায়গামত নিয়ে যাই। আমরা দুজনই একে অপরের ভালো সাথী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তাঁকে ঘুমাতে দাও না কেন? সে বলল, ইয়া রাসূল্লাল্লাহ, মাঝে-মাঝে তিনি যখন ক্লান্ত অবস্থায় ঘরে আসেন, তখন মাগরিবের পর খানা খেয়ে তিনি একটু কোমর সোজা করার জন্য বিশ্রাম নেন। ভাবেন, একটু পরে উঠে ঈশার নামায পড়ে নেব। কিন্তু ঘুম এত বেশি এসে যায় যে, তিনি আর উঠতে পারেন না। ঈশার নামায আর পড়া হয় না। রাত অনেক হয়ে যায়। যেহেতু

আমি পাশেই থাকি, আমার ঘুম আসে না এই ভেবে যে, তাঁর যদি নামায কাজা হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ যদি আমার কাছে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তোমার সাথীকে জাগালে না কেন? হে আল্লাহর রাসূল! আমিও সারা দিন মেহনতের পরে ক্লান্ত থাকি; ঘুম আসতে চায়। তবুও আল্লাহর ভয়ে না ঘুমিয়ে আওয়াজ করি, যাতে আমার মালিক উঠে নামায আদায় করে নেন।

হে মানুষ, একটি প্রাণীর মধ্যে আল্লাহর ভয় এত বেশি যে, কেউ আল্লাহর ইবাদতে অবহেলা করছে বলে তাঁর ঘুম আসছে না। আর তুমি আশরাফুল মাখলুকাত হয়ে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানছ না। তোমার ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে জবেহ করা হচ্ছে; কিন্তু তোমার কাছে তাঁর খবর নেই। তোমার সন্তান তোমার চোখের সামনেই আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছে; কিন্তু তোমার অন্তরে তাঁর অনুভূতি নেই। একটি সময় তো আসবে, যখন আমাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার প্রয়োজন অনুভূত হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের আল্লাহর ভয়

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) সারা জীবন হাদীছ পড়িয়েছেন। এমনকি একই সময় চল্লিশ হাজার পর্যন্ত ছাত্র তাঁর কাছে হাদীছ পড়তেন। যখন ইন্তেকালের সময় এল, তখন তিনি শাগরেদদের বললেন, আমাকে খাট থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখো। নিচে কোনো কার্পেট, বিছানা, মোজাইক কিছুই ছিল না। শাগরেদগণ আদেশ পালন করলেন, তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে ছাত্ররা কাঁদতে শুরু করে দিলেন যে, তিনি তাঁর দাড়ি ধরে কপালকে মাটির সাথে ঘষতে লাগলেন আর দু'আ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আবদুল্লাহর এই বুড়ো অবস্থাটার উপর একটু দয়া করুন। আল্লাহু আকবার!

যিনি সারা জীবন হাদীছ পড়িয়েছেন, তিনি একথা বলেননি, আমি হাদীছ পড়িয়েছি, মানুষকে দীনের প্রতি দাওয়াত দিয়েছি, ভালো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছি। তিনি কোনো আমলকেই আল্লাহর সামনে পেশ করার উপযুক্ত মনে করেননি। শুধু আল্লাহর কাছে মিনতি করছিলেন, হে আল্লাহ! আবদুল্লাহর বুড়ো অবস্থার উপর দয়া করুন। নিজের সাদা দাড়িকে সামনে করে ধরছিলেন, হে আল্লাহ আপনার সামনে পেশ করার মতো কোনো আমল আমার কাছে নেই। আপনি আমাকে শুধু রহম করুন। আমাদেরও এভাবে

করা উচিৎ যে, আমরাও নিজের গোনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহর সামনে লজ্জিত হব। তাঁর ভয় অন্তরে আনব, যাতে গোনাহ থেকে বাঁচতে পারি। এভাবে চাইব যেন আমাদের যা কিছুই দরকার সব যেন শুধু আল্লাহর কাছেই চাইব। এই দরবার ছেড়ে অন্য কোথাও আমরা কিছুই পাব না।

আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার পদ্ধতি

আমাদের মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, কোনো ছোট বাচ্চার কিছু দরকার হলে যেভাবে সে তাঁর মায়ের কাছে চায়, মা তাকে দেবে না বলে দিলেও সে চাইতেই থাকে। এমনকি মা যদি থাপ্পরও লাগায়, তবুও সে কান্নাকাটি করে চাইতে থাকে। মাকে জড়িয়ে ধরে। বলে, আম্মু এবার দিয়ে দাও। বাচ্চার কাছে ইয়াকিন আছে, তার আম্মুকে রাজি করিয়ে নেওয়া যাবে এবং তার আম্মুর কাছেই সে পাবে। আমাদের চেয়ে সেই বাচ্চা অনেক ভালো, যে এই মারেফতকে বুঝে নিয়েছে এবং কেঁদে-কেঁদে নিজের মাকে রাজি করিয়ে নেয়। কিন্তু আফসোস! আমরা কেঁদে-কেঁদে আমাদের পালনকর্তাকে রাজি করাতে পারলাম না। আমরা ক্ষমা চেয়ে থাকি; কিন্তু অন্তরে লজ্জাবোধ পুরোপুরি থাকে না। আমাদের উচিৎ সত্য মনে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। বারবার ক্ষমা চাওয়া। অনুনয়-বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, হে পরওয়ারদেগার! আপনার কাছে তো আমার মতো কোটি-কোটি বান্দা আছে, কিন্তু আমার কাছে আপনার মতো মাবুদ তো আরেকজন নেই। রবে কারীম! আপনি মেহেরবানি করুন। আমার গোনাহ ক্ষমা করে দিন।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

হাফেয ইবনে কাইয়িম (রহ.) একটি আশ্চর্য ঘটনা লিখেছেন। তিনি বলেন, একবার আমি এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, একটি ঘরের দরজা খুলেছে। ঘরে এক ছেলেকে তার মা পিটাচ্ছিল। বাচ্চার বয়স সাত-আট বছর হবে। দরজা খুলে মা ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন। বললেন, তুই নাফরমান হয়ে গেছিস, তুই আমার কোনো কথাই শুনছিস না। তোকে এই ঘরে আমি আর দেখতে চাই না। এই বলে তার মা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। হাফেয ইবনে কাইয়িম (রহ.) বলেন, আমি কিছুক্ষণের জন্য সেখানে দাঁড়ালাম। দেখলাম, বাচ্চাটা কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর আস্তে-আস্তে হাঁটা শুরু করে দিল। গলির বাঁক পর্যন্ত গিয়ে সে দাঁড়িয়ে কী যেন চিন্তা

করল। তারপর আবার আস্তে-আস্তে বাড়ির দিকে আসতে লাগল। দরজায় যখন এল, তখন দেখল দরজা বন্ধ। সে ক্লান্ত ছিল। সেখানে দরজার চৌকাঠে মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর তার মা কোনো কাজে ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন। দেখলেন, বাচ্চা দরজায় ঘুমিয়ে আছে। তখনও তার রাগ কমেনি। তিনি বাচ্চাকে চুল ধরে টেনে তুললেন, বললেন, তুই এখান থেকে যাস না কেন? এখানে পড়ে আছিস কেন? বাচ্চার চোখ দিয়ে আবার পানি পড়তে লাগল। সে বলল, আম্মু তুমি যখন আমাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলে, তখন আমি ভাবলাম কোথাও চলে যাব। বাজারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করব অথবা মানুষের জুতা পালিশ করব। এই ভেবে আমি গলির বাঁক পর্যন্ত গিয়েছি। আবার মনে হলো, আমি চলে গেলে খানা তো পাওয়া যাবে; কিন্তু মায়ের মহবত তো আমি আর কোথাও পাব না। মায়ের মহবত শুধু এই বাড়িতেই পাওয়া যাবে। তাই আবার চলে এলাম। এখন আমি এই দরজায় থাকব। আম্মু তুমি ধাক্কা দিলেও আমি আর কোথাও যেতে পারব না। তোমার মতো মহবত আমাকে আর কেউ দিতে পারবে না।

ছেলের কথা শুনে মায়ের মন নরম হয়ে গেল। বললেন, তুই যখন বুঝতে পেরেছিস, আমার মতো মহবত তোকে আর কেউ দিতে পারবে না, তখন তোর জন্য এই ঘরের দরজা খোলা। আয় ঘরে আয়।

হাফেয ইবনে কাইয়িম (রহ.) বলেন, বান্দারও উচিৎ এভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। এভাবে বলা যে, হে আল্লাহ! আপনার দরবারেই তো শুধু গোনাহের ক্ষমা পাওয়া যায়, অন্য কোনো দরজা তো নেই যেখানে গোনাহ ক্ষমা করা হয়। আমি আপনার দরজা থেকে অন্য কোথাও যেতে পারব না। যখন বান্দা এভাবে ক্ষমা চায়, তখন আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেন।

একটি মর্মস্পর্শী দু'আ

কেউ খুব প্রিয় কথা বলেছেন,

اِلٰهِیْ عَبْدُكَ الْعَاصِیْ اَتَاكَ + مُقِرًّا بِالذُّنُوْبِ وَقَدْ دَعَاكَ

فَاِنْ تَغْفِرْ فَاَنْتَ لِذَاكَ اَهْلٌ + وَاِنْ تَطْرُدْ فَمَنْ یَرْحَمْ سِوَاكَ

হে আল্লাহ! আপনার গোনাহগার বান্দা আপনার দরবারে হাজির হয়েছে, গোনাহের স্বীকার করছে এবং আপনার কাছে দু'আ করছে। আপনি যদি ক্ষমা

করেন, তাহলে তা-ই আপনার জন্য উপযুক্ত আর যদি ধাক্কা দেন, তাহলে আর তো কেউ নেই, যে আমাকে দয়া করবে।

আমার বন্ধুগণ, আজকের এই মাহফিলে আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জীবনের পেছনের সব গোনাহের ক্ষমা চাইব। আগামীর জন্য আল্লাহর কাছে এমন ভয় কামনা করব, যাতে আমরা গোনাহ থেকে বাঁচতে পারি, যাতে আমরা গোনাহ থেকে বেঁচে পবিত্র জীবন নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে পারি।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত